বাঙলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা

ডঃ মধুসূদন চক্রবর্ত্তী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

প্রচ্ছদ
আব্দুল বাসেত

উৎসর্গ

আমার পরম আরাধ্য পিতৃদেব
৺শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী
ও
পরম আরাধ্যা মাতৃদেবী
পারুলবালা দেবীর
করকমলে—

গ্রন্থকারের কথা

শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হল। সুরুতেই স্বীকার করতে দোষ নেই, আমার মত এক অনভিজ্ঞ লেখকের পক্ষে এ ধরনের বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। এবং এর জন্যে দোষী আমি নিজেই।

গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য অনুমোদন করায় আমি কৃতার্থ। বিষয়টি নির্বাচনের পর থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হই। আমার যেটুকু পরিতৃপ্তি তা এই যে, আমিই বোধ হয় বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করার সাহস দেখাই। এর পিছনে যাঁদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা আছে তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

বাঙ্‌লা বিভাগের পর ভাবের আদান-প্রদান লুপ্ত। ওদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানা যেত না। যা জানতে পারা যেত তাও পুরোপুরি নয়। এরপর বাঙ্‌লাদেশের সৃষ্টি। সেই সময় বাঙ্‌লাদেশে যাবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল। ভারত-বাঙ্‌লাদেশ মৈত্রীতে ভারতীয় রেলওয়ের কিছু দায়িত্ব বর্তাল। সে সময় বাঙ্‌লাদেশে কাজের অবসরে ঘুরে ঘুরে ওদের কবিতা পড়ে আমি অভিভূত হলাম। অবশ্য তার আগে ডঃ অমিয়কুমার হাটি, সনাতন কবিয়াল, প্রয়াত কবি দুর্গাদাস সরকার, প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও দু'একজন সাপ্তাহিক বসুমতী, বাঙ্‌লাদেশ সাপ্তাহিকীতে কিছু কিছু লিখেছেন ওদেশের কবি ও কবিতা সম্বন্ধে। খুব অল্প হলেও নগণ্য নয়—আমার কাছে তার দাম ছিল অপরিসীম। বেশ কয়েকবার বাঙ্‌লাদেশ গেলাম। যশোর, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ঘুরলাম হেঁটে, বাসে, এয়ারবাসে, নৌকায়। দেখা করলাম তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে। ওনার বাড়ীতে বসেই কথা হল ডঃ মণিরুজ্জামানের সঙ্গে। উৎসাহ দিলেন খুব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ও কৃতী অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ভ্রাতৃস্নেহে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। এটা যে কত বড় সহায় তা আমি আজ লেখে বোঝাতে পারবো না। আমিও চরম উৎসাহে এগিয়ে চললাম। এ প্রসংগে বললে অত্যুক্তি হবে না, যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করবার জন্য নির্দেশ দিলেন, সেদিনের সে আনন্দ আমার ভোলার নয়। তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে ১৯৭৪ সালেই পুরোপুরি

ঝাঁপিয়ে পড়লাম কাজে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভৌমিককে বিরক্ত করেছি, উৎসাহ পেয়েছি ততোধিক। এঁদের আশীর্বাদ, সাহায্য না পেলে এ গ্রন্থ কোনদিনই লেখা হত না। গবেষণার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আমি তাই প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই এঁদেরকে।

আমার গবেষণার গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ। বাঙলা বিভাগের কিছু আগে থেকে বাঙ্‌লাদেশ সৃষ্টি পর্যন্ত আমার গবেষণা কাল। পূর্ব বাঙ্‌লার নবীন ও প্রবীণ কবিদের সম্মিলিত সাধনায় যে কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে তার একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে চেয়েছি, সময়ের হের-ফের তাতে কিছু হয়েছে, সেটাও গবেষণার প্রয়োজনে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জিনিসকে সংগ্রহ করতে কিছু হেরফের ঘটেছে—কিছু কিছু বিষয় হয়তো গণ্ডী পেরিয়ে গেছে গবেষণার খাতিরেই। নানান কবিকে নানান দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছি। এই দেখাকে সত্য করতে চেয়েছি তথ্য দিয়ে, কোনো কবিকেই খাটো করবার কথা কখনও মনে আসেনি। হয়ত লেখার মধ্যে ত্রুটি থেকে গেছে, তার জন্যে অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকার প্রাক্তন পরিচালক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, অধুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর (ইউ. জি. সি.) প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ মযহারুল ইসলাম এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। বিদগ্ধ এই অধ্যাপকের দান আমি জীবনে ভুলব না। তাঁর মত সদাব্যস্ত মানুষ আমার কথা ভেবেছেন এতেই আমার পরম পুরস্কার লাভ ঘটেছে। তাঁর মত হৃদয়বান মানুষের আশীর্বাদ পাওয়া দুর্লভ। এছাড়াও বিশ্বভারতীর বাংলা ভাষা বিভাগের প্রধান ডঃ ভবতোষ দত্ত গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্য যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, খবর নিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন তাও ভোলার নয়। এঁর উৎসাহ আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করে রাখল।

ইস্টার্ণ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রচুর উৎসাহ পেয়েছি এই কাজে। সর্বাগ্রে যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রী আর. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর চেষ্টা ছাড়া এভাবে ইচ্ছামত বাঙ্‌লাদেশ যাওয়া সম্ভব হোত না। এছাড়াও সাহায্য করেছেন শিয়ালদহ বিভাগের ম্যানেজার শ্রীশান্তিকুমার বসু, প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছেন বর্তমান শিয়ালদহ বিভাগের প্রধান শ্রীসীতেশ রঞ্জন সরকার, সিনিয়র ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরমেশ চন্দ্র হাওলাদার, শ্রীনীহাররঞ্জন ঘোষ প্রমুখ। নির্ঘণ্টের কাজে এবং সব সময় উৎসাহ দিয়েছেন, আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী চিত্রা চক্রবর্তী। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীস্বপনকুমার চক্রবর্তী ও আমার

দুই কন্যা কুমারী শর্মিষ্ঠা ও শর্বরীর কাছে। শ্রীমতী চক্রবর্তীর সব সময় সাহায্য ও উৎসাহ আমাকে বারপর নাই উৎসাহী করেছে।

সবশেষে যার কথা না বললে কিছুই বলা হবে না সে আমার বাল্যবন্ধু অগ্রজ-প্রতিম কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের এনটোমলজির প্রধান ডক্টর অমিয়কুমার হাটি। গ্রন্থ রচনার প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অমিত উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে আমাকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল। তার সাহায্য ভোলার নয়। কৃতজ্ঞতা জানাবার সম্বন্ধও তার সাথে নাই। ডঃ হাটির সাহায্য ছাড়া এ গ্রন্থ বেরুনো দুষ্কর ছিল।

সর্বশেষে জানাই, অনেক চেষ্টা সত্বেও বোধহয় অনভিজ্ঞ বলেই ত্রুটিমুক্ত করতে পারলাম না গ্রন্থটিকে। আর স্বীকার করতেও লজ্জা নেই এর দায়দায়িত্ব সবটাই আমার। 'সাহিত্যশ্রী'র শ্রীতপনকুমার ঘোষ বহু অসুবিধার মধ্যেও গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারলেন এটাই আমার সান্ত্বনা। তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারিনি তার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। দায়িত্ব আমার নিজেরই। যাই হোক একটি সংশোধনী তালিকা গ্রন্থটির শেষেই দিয়ে দিলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গ একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন।

ভূমিকা

বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সাতচল্লিশের পর থেকে দুটো দেশের অধিবাসী, একাত্তরে এসে আবার একটি দেশ থেকে নতুন আর একটি দেশের জন্ম হয়েছে, যার নাম বাঙ্‌লাদেশ। ব্রিটিশ ভারতে, এমন কি বলা যায় মুঘল আমল থেকেই বাঙ্‌লাদেশ বলতে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকেই বোঝাত। পূর্ববাংলা, পাকিস্তানী আমলের পূর্ব-পাকিস্তান, স্বাধীনতার পর একাত্তর থেকে বাঙ্‌লাদেশ নাম গ্রহণ করায় ভারতীয় বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ নামেই কৃত্য। বাঙালীর এখন দুটো দেশ,—বাঙ্‌লাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)। পূর্ববাংলা নামটি এখন অপাংক্তেয়, পূর্ব-পাকিস্তান চিরতরে মৃত। বাঙ্‌লাদেশের বাঙালীদের আলাদা পোশাকে চিহ্নিত-করবার জন্য পঁচাত্তর-পরবর্তী সামরিক জান্তার তথা স্বৈরশাসনের নায়কগণ বাংলাদেশী শব্দটি ব্যবহার করছেন, তার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতার দূষিত মানসিকতা। বাঙালীর আবাসভূমির উপর সাম্রাজ্যবাদ কসাইদের খড়্গ চলেছিল সাতচল্লিশে, এবার তার নামাঙ্গে সমানে করাত চলছে, বাঙালীকে নিয়ে আরও কত খেল অবশিষ্ট আছে, কে জানে।

একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, বাঙালী একটি জাতি। মানুষ ধর্মান্তরিত হলেই জাত্যন্তরিত হয় না। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অসার বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতায় তা প্রমাণিত। সুতরাং একটি দেশ বিভক্ত হলেই সংস্কৃতির হয় না। দুই জার্মানী, দুই কোরিয়া, দুই ইয়েমেন হলেও তাঁরা আলাদা আলাদা সংস্কৃতির পত্তন করেছেন একথা কোন বাতুলেও বিশ্বাস করবে না। বাঙ্‌লাদেশের অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্‌লাদেশের সংস্কৃতি একই সূত্রে গ্রথিত—এই সূত্রের সৃষ্টি কয়েক হাজার বছরের সাধনা ও আচার-আচরণে। অবশ্য পরিবেশ ও জলবায়ুগত কারণে বাঙ্‌লাদেশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছুটা ভিন্ন এবং বাঙ্‌লাদেশের সংস্কৃতিতেও সেই ভিন্নতা দুর্লক্ষ্য নয়—কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বলতে যা বোঝায় তা অভিন্ন এবং শাশ্বত। বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্যের ধারা বা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষা ও কথ্যভাষার রীতি সম্পর্কেও এই একই কথা সত্য। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য ও বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্যের মধ্যে কোন ভেদাভেদ টানা যায় না। বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্য স্বয়ম্ভূ নয়—একই ইতিহাসের লালনে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্‌লাদেশের সাহিত্যের উদ্ভব এবং শ্রীবৃদ্ধি।

তথাপি সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর এবং একাত্তর থেকে বর্তমানের একাশি বাঙ্‌লা দেশের রাজনৈতিক ধারাকে নানাভাবে আলোড়িত করেছে এবং এই আলোড়নের

তরঙ্গ লেগেছে সংস্কৃতির অঙ্গেও। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, রবীন্দ্র বর্জনের ষড়যন্ত্র, চুয়ান্ন সালের নির্বাচন ও বাঙ্‌লা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা, ছেষট্টি সালের ছয় দফা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম, শেখ মুজিবকে হত্যা করে সামরিক জান্তার ক্ষমতা গ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদ চক্রের সুদৃঢ় আসন, আমেরিকা, চীন, সৌদী আরবের অবাধ প্রভাব, জিয়ার স্বৈরশাসন ও বুদ্ধিজীবী ক্রয়ে সাফল্য ইত্যাদি ঘটনা আমাদের সাহিত্যকে কম-বেশী গৌরবদীপ্ত বা খর্ব করেছে, যেমন করেছে জাতি হিসাবে আমাদের পরিচয়কে। সিকান্দার আবুজাফর যখন বলেন,

মায়ের বাড়ী যখন ইচ্ছে এসো
অষ্ট প্রহর সব দরজা খোলা
পথ চিনতে কষ্ট কেন হবে।
হাড়ের গুড়ো, মাথার খিলু
কলজে ছেঁড়া ছেঁড়া
সাজিয়ে পথের নিশান করা আছে
দেখা মাত্র অমনি যাবে চেনা॥

তখন আমাদের কবিতার অঙ্গনে করুণ বাতাসের এক বেদনাবিধুর দীর্ঘশ্বাস অনুভব করি—কবিতা একুশের রক্ত মেখে এক নতুন গৌরবে ভাস্বর হয়। একুশ নিয়ে কবিতা লেখেননি এমন কবি বাঙ্‌লাদেশে নেই। অন্য পক্ষে ফজল শাহাবুদ্দীন যখন বলেন,

তোমাকে চাই ক্ষুধার চির ছায়াতে
হারামজাদী শরীর ভরা কায়াতে
তোমাকে চাই ইচ্ছা আর আশাতে

তখন বুঝি এ কবি শুধু বিকৃত নন বিক্রীতও বটেন। আয়ুব আমলে যেমন ঘটেছিল। বুদ্ধিজীবীদের কেনাবেচা অনুন্নত দেশগুলির নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

কেউ কেউ বাঙ্‌লাদেশের কবিতায় দুটো ধারা দেখেন, ইসলামী ঐতিহ্যপুষ্ট এবং সমাজ চেতনায় সমৃদ্ধ। আমার মনে হয়, সাহিত্য বিচারে ধর্মকে এভাবে না টানাই সমীচীন। আসলে আধুনিক কবিতার নির্দিষ্ট কোন বিষয় নেই—ইলিশ মাছ, সিলিং ফ্যান, হাতের শাঁখা, রাখালের গামছা, মহিলার কোর্টেক্স—সবই কবিতার বিষয় হতে পারে। কবিতার সার্থকতা বিষয়ে নয়, বিষয়ীর সংবেদনশীল মননের অভিব্যক্তিতে এবং তাঁর নির্মাণ কুশলতায়। ইসলামী বা অন্য যে কোন ধর্মীয় বিষয় আধুনিক কবিতার বিষয় হতে বাধা নেই। কিন্তু বিষয় যাই হোক কবিতাকে কবিতা হতে

হবে। বাঙলাদেশের কবিতায় এমনি ইসলামী বিষয় এসেছে, এসেছে আরবীয় মরুভূমির বায়ু-হিল্লোল, কিন্তু তা বলে তার নাম দিতে হবে, কিম্বা দেওয়া যায় ইসলামী, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আধুনিক কবিতাকে এভাবে বিষয়বস্তুর নিরিখে চিহ্নিত করা যায় না। অথবা কবির নাম মুসলমান অতএব তাঁর রচনা মুসলিম সাহিত্যভুক্ত, নাম হিন্দু সুতরাং তাঁর সাহিত্য হিন্দু সাহিত্যের প্রাচীরবদ্ধ, সাহিত্য বিচারে এসব যুক্তি অসার। দুর্ভাগ্য মধ্যযুগের সাহিত্য বিচারে যেমন, আধুনিক সাহিত্য বিচারেও তেমন আমরা এই প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। দৌলত কাজী মুসলমান বলেই তাঁর সাহিত্যকে ইসলামী আখ্যা দেবার পক্ষে সামান্যতম সমর্থনও আমি খুঁজে পাইনি। এই দুর্ভাগ্য নজরুলের ললাটেও বর্তেছে।

বাঙলাদেশের কবিতার সঠিক মূল্যায়ন তাই অন্যত্র অন্বেষণীয়। কবিতার শরীর নির্মাণ, অবয়বের সঙ্গে তার প্রাণশক্তির কতটা সুসমঞ্জসতা, শব্দচয়ন, যুগস্বীকৃতি, সামগ্রিক কাঠামো গঠনে সুসনিবদ্ধতা, আবেগের ঋজুতা, সংযমের ঘনপিনদ্ধতা ইত্যাদি এবং আধুনিক কবিতার আরো অনেক শর্ত কতটা সার্থকভাবে অনুসৃত, বাঙলাদেশের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় তার গুরুত্বই সমধিক বলে আমি মনে করি। কবি আঙ্গিক চেতনায় কতটা প্রখর তাঁর ভাবনা ও উপস্থাপনা অবিচ্ছিন্নভাবে অবলীলায় দানা বাঁধতে পেরেছে কিনা, তিনি তাঁর বক্তব্যে আন্তরিক কিনা, বক্তব্য শুধুই ভঙ্গীসর্বস্ব কিনা, বাঙলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানুষের সাথে তিনি হৃদয়ের দিক থেকে কতটা ঘনিষ্ঠ, এসব বিচার-বিবেচনা একান্ত প্রয়োজন। একথা স্বীকার্য যে, বাঙলাদেশে যে আধুনিক কবিতার ধারা এখন প্রবহমান, তার উৎসস্থল রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যের জমিতে প্রোথিত—নজরুল-যতীন্দ্রনাথ থেকে তিরিশের কবিদের নিশান যেখানে উড়ছে। চল্লিশের দশকের কয়েকজন কবি এই আধুনিকতার বার্তা বাঙলাদেশের আবহাওয়ায় নিয়ে আসেন। পঞ্চাশের দশকে এসে এই বার্তা ধীরে ধীরে পরিণত হয় বিশ্বাসে, বিশ্বাস প্রজ্ঞাময় ও প্রত্যয়দৃঢ় অনুশীলনে। ষাট ও সত্তর দশকে চলেছে তারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে অনুবর্তনের ও স্বীকরণের পাল্লাটি বেশী ভারী আর তাই স্বীকৃতির উজ্জ্বলতা প্রায়ই অনুপস্থিত। কৃতিত্ব স্বকীয়তার অভাব বাঙলাদেশের কবিতায় পীড়াদায়কভাবে বিদ্যমান। তবে আমি নৈরাশ্যবাদী নই, এর মধ্যে দিয়েই নতুন কবি পৌরষের আবির্ভাব ঘটবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত।

প্রীতিভাজন শ্রীমান মধুসূদন চক্রবর্তী বাঙলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) আধুনিক কবিতার ধারা গ্রন্থটি রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। গ্রন্থটি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গৃহীত হয়েছে। শ্রীমান মধুসূদন পেশায় রেলওয়ের একজন কারিগর (ইঞ্জিনীয়ার), কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং তিনি তাঁর দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে পালনে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর সমালোচনার ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা খুব প্রখর ও বলিষ্ঠ একথা বলা যাবে না। তবে তিনি যে তাঁর বক্তব্যে সনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করেছেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বিচার-বিবেচনা মাঝে মাঝে অবিন্যস্ত, বাক্য গঠনের রীতিও মাঝে মাঝে শিথিল কিন্তু তথাপি তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাঙলাদেশের আধুনিক কবিতার ধারা নিয়ে গ্রন্থ রচনায় সৎসাহস দেখিয়েছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য পেশ করে রীতিমত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এদিক থেকে তিনি আমাদের সবার ধন্যবাদের পাত্র। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এরকম একটি গ্রন্থ বাঙলাদেশেও নেই। উভয় বাঙলায় তাঁর এই উদ্যম অনুসরণীয়। পশ্চিম বাঙলার সুধী সমাজে বাঙলাদেশের কবিতা সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ আছে। এই গ্রন্থটি সেদিক থেকে এক বিরাট অভাব পূরণ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। গ্রন্থটিতে একটি ধারাবাহিক আলোচনার সূত্র রয়েছে এবং বাঙলাদেশের কবিদের পরিচিতি ও তাঁদের কবিতাংশ পাওয়া যাচ্ছে যা এখানে রীতিমত দুর্লভ। শ্রীমান মধুসূদনের আলোচনার সাথে আমরা সব সময় একমত না হতে পারি কিন্তু তিনি যে আলোচনার সূত্রটি সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে আমাদের সামনে ধরিয়ে দিয়েছেন এইজন্য তাঁকে সাধুবাদ দিতেই হবে। এই গ্রন্থের পশ্চাতে একজন তরুণ অথচ সাধনাদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার অধিকারী অধ্যাপকের অনুপ্রেরণা আছে, যা এই গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

আমি এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

বিষয়সূচী

এক

পটভূমিকা

[১৯০০ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত কালের ইতিহাস : সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রবীন্দ্রনাথ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্যবাদ, অতি আধুনিক কবিতা-চিন্তা, পল্লী কবিতার ধারা, লোকসাহিত্যের ধারা, পশ্চিমবঙ্গের (কলকাতার) সঙ্গে সাহিত্যিক পার্থক্য, পৃথক সুর নির্দেশ, আধুনিক কবিতার পটভূমিকা ।]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সেকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার। বিচিত্র সে রাজনৈতিক আবর্ত। সারাদেশে জগদ্দল পাথরের মত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন। শোষণ সেখানে বল্গাহীন। নিত্যনতুন অত্যাচার, উৎপীড়ন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই শোষিত। অথচ তারা কখনও এক হতে পারছে না তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে। ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় বিপ্লবে (তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ) ইংরাজদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছিল। তারা তখন থেকেই প্রথমেই এদেশে তাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য নীতি হিসেবে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিল সুকৌশলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, গোড়া থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে সাড়া দিতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রবেশ ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসকে অনেক ক্ষেত্রেই কলঙ্কলিপ্ত করে রেখেছে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমান ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সেখানে সামান্যই রূপ পেয়েছে। চতুর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের বিভেদনীতির খেলায় চরম জয়ী হয়েছে—রেষারেষির পরিণামে ভারতবর্ষ প্রথমে হয়েছে দ্বিখণ্ডিত, তারপর এসেছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুটি স্বতন্ত্র-রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের সঙ্গে সঙ্গে বৈরিতা, বারংবার যুদ্ধ, যার ফলে এখনো আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম, উন্নয়নশীল দেশ মাত্র !

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। প্রথম সভাপতি ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী। বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতে, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেই

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৮৬-তে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সভাপতি দাদাভাই নওরোজীর ভাষণ—

"Then I put the question plainty : Is this congress a nursery for sedition and rebellion against the British Government (cries of no no) or is it another stone in the fountation of the stability of that Government (cries of yes, yes)[১] ?...

এরপর দ্রুতগতিতে ইতিহাসের পটপরিবর্তন শুরু হল। এ সময় লর্ড কার্জন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেন।[২] শিক্ষক সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হন। ১৯০৫-এ বঙ্গ বিভাগ হল। এও কার্জনের কীর্তি। বঙ্গভঙ্গ রদ করবার জন্য বিশাল আন্দোলন দানা বাঁধল। বৃটিশ পণ্য বর্জন শুরু হল। কিন্তু মুসলমানরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিলেন না। মুসলমানরা মিল মালিক ছিলেন না। তাই তাঁদের চোখে বৃটিশ পণ্য বর্জনের অর্থ দাঁড়াল হিন্দু মিল মালিকের মুনাফাবৃদ্ধি। অবশ্য শিক্ষিত মুসলমানদের কেউ কেউ যেমন আবদুল রসুল, আবুল কালাম আজাদ, মুজীবর রহমান, মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রভৃতি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় কম, তাঁদের প্রভাবও ছিল সীমিত, একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই, মুসলমান সমাজ তখন খুবই পিছনে পড়ে আছে। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার আরম্ভ হয় অল্পাধিক। মুসলমানদের মধ্যেও রাজনৈতিক চেতনার সূচনা লক্ষিত হয়। ১৯০৬ সালে এক মুসলিম প্রতিনিধিদল আগাখানের নেতৃত্বে ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে দেখা করেন এবং চাকুরী, নির্বাচন, শাসন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের আবেদন জানান। এর কিছুদিন পরেই ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "মুসলীম লীগ" জন্মগ্রহণ করল। এই লীগ কিন্তু বঙ্গভঙ্গের সমর্থন ও বয়কট আন্দোলনের নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেয়। অথচ ১৯০৫ ও ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদ ও বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হল। লীগ ও কংগ্রেসের কোন্দলের সূত্রপাত হল জন্মলগ্ন থেকেই।

১. Report ot the 2nd Indian National Congress, 1886, Page 52.

২. Rev. C. F. Andrews "The renaissance in India", 4-5 Quoted in Farquhar, p. 360.

Farquhar, J. N. (1924) *Modern Religious Movements in India,* Macmillan and co., London.

লীগের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ১৯০৯ সালে লীগের আন্দোলনের ফলে মর্লিমিণ্টো রিফর্ম। এতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বাঙলায় সন্ত্রাসবাদের ঢেউ বয়ে যায়। ১৯১১ সালে এই সন্ত্রাস বাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠার কালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হল। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। এই সালেই বল্কান যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়। ভারতীয় মুসলমানরা শাসকগোষ্ঠীর উপর তাই আবার বিরূপ।

১৯১৩ সাল। মুসলীম লীগ অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনই লীগের লক্ষ্য বলে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।

১৯১৪ সাল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে কংগ্রেসে যোগ দেন। এর পর তিনিই ধীরে ধীরে কংগ্রেসের নেতায় পরিণত হন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই কংগ্রেস পরিচালিত হতে থাকে। ১৯১৪ সালেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তুরস্ক জার্মানীর পক্ষ নেয়। ভারতও তুরস্কের সমর্থক মুসলীম নেতারা বন্দী হন।

কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরের কাছে আসে। ১৯১৮ সালের কুখ্যাত মণ্টেগু চেমস-ফোর্ডকে লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই প্রত্যাখান করে। ইংরেজের দমননীতি আরও প্রচণ্ড হয়। ১৯১৯-এ গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া রাউলাট এ্যাক্ট এ উপরোক্ত রিপোর্টই গৃহীত হয়।

অসন্তোষ সর্বত্র। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতাকে আক্রমণ করল ইংরাজ। বর্বর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালালো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিবাদে নাইট উপাধি পরিত্যাগ করলেন।

গান্ধী, তিলক প্রমুখ কংগ্রেসীরা খিলাফৎ প্রশ্নে মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯২০ সালের নাগপুর অধিবেশনে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই অধিবেশন চলাকালেই আবার জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯২০-২১ সালে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের কালে হিন্দু-মুসলমান কাছাকাছি এসেছিলেন। একটা সম্প্রীতির ভাবও গড়ে ওঠে। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের এই সদ্ভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একটা মিলিত ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের যে সম্ভাবনা ছিল, তা বিনষ্ট হয়ে যায় অঙ্কুরেই। ডঃ মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী করেছেন 'আন্দোলনের হিন্দু চরিত্র প্রতিষ্ঠার

জন্য গান্ধীর অবিরাম প্রয়াস'কে।[১] এর মধ্যে ১৯২২ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজাফফর আহমদ নিজে সাহিত্যিক। নজরুলের কবি প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

১৯২৭-এ বসল সাইমন কমিশন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিধানসভা চালু হল ১৯৩৫-এ।

লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শ নীতিগত বিরোধ ক্রমবর্ধমান হতে আরম্ভ করে। মতিলাল নেহরু কমিটি ১৯২৮ সালে শাসনতন্ত্রের নীতি নির্ধারণ বিষয়ে যে সুপারিশ করেন তাতে মুসলমানরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ১৯২৯ সালে দিল্লীতে আগা খাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের দাবি উত্থাপিত হয় নতুনভাবে। ঐ বৎসর দিল্লীতে লীগের অধিবেশনে জিন্নাও মধ্যপন্থী সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

এদিকে ১৯২৯-এ কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে।

কিন্তু মুসলিম সমাজের বৃহদংশ এতে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা দেখতে পেলেনি না। ১৯৩২-এ যে ভারতীয় গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধি-বেশন হয়, তাতে এ-বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হল।

বস্তুত: তখন লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একপ্রকার বৈরিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই দেখতে পাওয়া যায়, ১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কার অনুসারে ১৯৩৭ সালে যখন সাধারণ নির্বাচন হল, কংগ্রেস জয়ী হয়ে ৭টি প্রদেশে যখন সরকার গঠন করল, তখন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের লীগ প্রস্তাব কংগ্রেস সরাসরি অগ্রাহ্য করল।

১৯৩৮ সালে মুসলিম লীগের পাটনা অধিবেশনে সভাপতি জিন্নার ভাষণ :—

"The congress has now, you must be aware, killed every hope of Hiudu Muslim settlement in the right royal fashion of Fascism. The congress does not want any settlement with the Muslims of India. As the chairman of reception committee has said in his address, the congress wants the Muslims to accept settlement as a gift from the majority. The congress

[১] মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান (১৬ই জুন, ১৯৭০) আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৬।

is nothing but a Hindu body. That is the truth and the congress leaders know it.[১]

এর দুবছর পর ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লীগের অধিবেশনে দ্বিজাতিতত্ত্বের 'থিওরী' খাড়া করেন জিন্না, লীগের মুসলমানদের চিন্তায় তখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরি- কল্পনা, এদিকে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঐ লীগ অধিবেশনে গৃহীত হল। এরপর জিন্নার নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই লীগের মুখ্য আন্দোলন হয়ে দাঁড়াল। লীগ-কংগ্রেস বিরোধ পৌছুল চরম পর্যায়ে।

এই হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর চার দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমি। আন্দোলন মুখ্যতঃ উচ্চশ্রেণী ও উচ্চ মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা। বিরোধ মজ্জাগত। ক্ষমতা দখলের কারসাজি। কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ব্রিটিশের উস্কানি। ধরতে গেলে ফি বছরই বিভিন্নস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা। সুস্থ ও স্বস্থ নয় এ রাজনীতি। কোথায় যেন ধরা পড়ে দেউলিয়াপনা। মনে হয় সবটাই এর ইংরাজ প্রভুদের দিয়ে জোর করিয়ে গেলানো। তারা যেমন খেলিয়েছে, উভয় পক্ষ তেমনি খেলেছে। ভবিষ্যতের বংশধরদের কী আপশোষের সীমা-পরিসীমা থাকবে যে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষ পাদে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ! বিচিত্র রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে এই উপ-মহাদেশের জীবন যেন নির্বীর্য, বিষাক্ত, অভিশাপগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। এখন পদে পদে প্রতি মুহূর্তে আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। নির্মম ইতিহাস মুখ টিপে হাসছে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' লিখতে গিয়ে এই পটভূমিকা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[২]

এই কালের হিন্দু মুসলমান সমাজের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? এদেশের সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ়মূল ছিল সেই সময়। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রম ছিল তখনো কঠোর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রের ব্যবধান ছিল যথেষ্টই। হরিজনরা ছিল অন্ত্যজ। বহুবার বহুস্থানে হরিজনরা নিগৃহীত হয়েছেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা নিবারণের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা

১. Select Documents on the History of India and Pakistan, vol. IV. Evolution of India and Pakistan, 1858-1947 Edited by C. H. phillips and others, London (1962), p. p. 350-51.

২ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৮৪) "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত" দশম—বিংশ শতাব্দী (তৃতীয় সংস্করণ) মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা।

সত্বেও আজও ভারতে এই ব্যাধি বিদ্যমান। আজও নিম্নশ্রেণী অবহেলিত, উপেক্ষিত।

আর একটি সুবিধাবাদী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল—বুর্জোয়া সমাজ। জমিদার প্রথার কল্যাণে একদিকে যেমন ভূমিহীন দাস সৃষ্টি হচ্ছিল লাখে লাখে, অন্যদিকে তেমনি বিলাস ব্যসনে মত্ত ছিল জমিদাররা। এদের আয়ের উৎসই ছিল জমিদারী। নিষ্কর্মার মত অপরকে খাটিয়ে বঞ্চিত করে এরা অর্থের পাহাড় জমা করত। এই জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে গজিয়ে উঠল নতুন এক ধরনের বড়লোক—শিল্পজাত ও ব্যবসায়ী এরা। মুনাফার বাজার স্ফীত হয়ে উঠল—এরাও কুক্ষিগত করে নিল ভারতের ধনসম্পদ। আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার ও শিল্পপতি-শ্রেণী তাদের শোষণ ও শাসন চালালো। এরা, বলা বাহুল্য বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের বংশবদ ভৃত্য—শোষণে তাদের সাহায্য করাই এদের স্বধর্ম। অবশ্য এই দলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিল—কারণ এ রকম শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সেটাই সম্ভব। মুষ্টিমেয় একদল ধনী ও দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ গরীব—খেটে খাওয়া চাষী মজুর। এরাই সাধারণ হিন্দু-মুসলমান। এরাই দেশের শতকরা ৯০ ভাগ। দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন, নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত, চালকহীন।

আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে থাকে। কৃষক তারা অধিকাংশ। এছাড়া শ্রমিক-মুটে-মজুর এরাই বেশি। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এদের মধ্যে থেকে কোনদিনই আসেনি—এসেছে এক শ্রেণীর উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে। এইসব নেতারা ওদের মাথায় বরাবর কাঁঠাল ভেঙ্গে এসেছেন।

ফলে, যখনই যে দলের প্রয়োজন হয়েছে, জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এর বিচিত্র রূপ। কখনো তা স্বাভাবিকভাবেই গণ আন্দোলনের আকার নিয়েছে, কখনো সরকারের স্বার্থে বা দলের স্বার্থে সাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণ করেছে।

দরিদ্র, অবহেলিত উপেক্ষিত এই আমাদের শ্রেণী বিভক্ত সমাজ, যেখানে সহজেই নানান ধরনের প্রলোভনের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাতিয়ে দেওয়া যায় ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামে, ব্যবহার করা যায় যথেচ্ছভাবে। হিন্দু-মুসলমানের কথায় আসা যাক। একই দেশে জন্ম। আবহমান কালের পরিচয়। একই আকাশতলে মানুষ। একই পারিপার্শ্বিকতা। মাটি তাদের এক। তবু কত তফাৎ! বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে অবস্থার খুব কমই পরিবর্তন হয়েছে। মানুষ হিসেবে হিন্দু-মুসলমান কি আলাদা? কারুর কি হাত পা বেশী ছিল? রক্ত কি কারুর

হলদে বা নীল? অথচ আশ্চর্য আমাদের মানসিকতা। হিন্দুরা মুসলানদের সঙ্গে একত্র জলপান পর্যন্ত করত না। আহার, পংক্তিভোজনে তো দূরের কথা! মসজিদে মন্দিরে রেষারেষি—ধর্মের আফিং খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করে দেওয়া··পরস্পরের প্রতি অপরিসীম সংশয়, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ, ঈর্ষা!

অথচ গরীব হিন্দু, গরীব মুসলমান একই কায়দায় একইভাবে শোষিত হয়, রোগে শোকে মহামারীতে ভুগে প্রাণ হারায়, শিক্ষা জোটে না তাদের, জোটে না পরনের বস্ত্র।

এই বঞ্চনার ইতিহাস, এই বঞ্চনার পাহাড় জমেছে ইংরেজ শাসনের সেই আদি যুগ থেকেই। বৃথাই ধর্ম নিয়ে মৌলভীতে ও পণ্ডিতে যুদ্ধ করেছে—আখের গুছিয়ে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার পক্ষ-পুষ্ট আধা সামন্ততন্ত্রের জমিদার ও বুর্জোয়া শ্রেণী।

একালের সমাজ সম্বন্ধে তাই যে যতই বলুক না কেন বড় বড় কথা, যে যতই আদর্শবাদ প্রচার করুক না কেন, তার স্বপক্ষে ওকালতি করুক না কেন, আসলে এক অতি পচনশীল সমাজ—ভেঙে পড়ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মূল্যবোধ দ্রুত অবলুপ্তির পথে, ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, বেকারী, অশিক্ষা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। বারবার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ পদধ্বনি, মহামারী, মড়ক। গ্রামের দিকে দৃষ্টি নেই। শ্মশান। শ্রীহীন। সহরমুখীন ভীড় সেখানেও অস্থিরতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা। দৈন্য। দুর্যোগ খুব প্রকট। সীমাহীন সমস্যা। নানান ত্রুটি ও অসঙ্গতি। এককালে খুব গুণগান করা হত একান্নবর্তী সমাজের। এখন তা ফেটে চৌচির। মুসলিম সমাজ আরো অনগ্রসর। বহু বিবাহ প্রথা। বহু কুসংস্কার। হিন্দুদেরও কুসংস্কার নানান বাঁধনে বেঁধে রেখেছে।

বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই ক্ষতদুষ্ট।

এর প্রথম এবং প্রধান কারণ অবশ্যই অর্থনৈতিক দুর্যোগ। আমাদের সোনার দেশ, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ ধীরে ধীরে দিনে দিনে কঙ্কালসার হয়ে পড়ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শাসনের কালে যা পারে, যতটুকু পারে, যেভাবে পারে, লুটে পুটে নিয়ে গেছে। এরপরও আধা সামন্ততন্ত্রের শোষণ। গ্রামীণ অর্থনীতি একেবারে দেউলিয়া। ভাবনার কেউ নেই, কিছু নেই, শিল্প প্রতিষ্ঠা নগণ্য মাত্র। বৃটিশ রাজের শোষণের দিকে লক্ষ্য রেখে পিছিয়ে পড়েছে সমগ্র জাতি। শিল্পে বিজ্ঞানে অনগ্রসর। শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ আছড়ালো না। স্বনির্ভর হবার কোন সুযোগই পেল না। সে সুযোগ দেবেই বা কেন ইংরেজ বেনিয়ারা! দেশের যুবকবৃন্দ কর্মহীন নিরাশ! কোন পরিকল্পনা নেই। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বন্যা, ভূমিকম্প

খরা। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত। স্ত্রী পুরুষে অসমতা। পুরুষ প্রধান সমাজ। স্ত্রী স্বাধীনতা অনেক পরে স্বীকৃত। সন্তান ছাড়া অন্য কোন উৎপাদন কাজে লাগে না। মেয়েছেলে জন্মালে অনেক সময় নানা প্রক্রিয়ায় তাকে হত্যা করা হত। জীবন দুর্বিষহ। সমস্তই অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার পরিণতি।

অবিভক্ত বাঙ্‌লাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের যখন এইরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভগ্নদশা, তখন আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্যের কি হাল ?

সমগ্র দেশের মানুষ কিন্তু জেগে উঠছে। মানস পটভূমিকায় আলোড়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাতীয় চেতনায় যে উজ্জীবনের জোয়ার এসেছিল, তার উত্তাল তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সাহিত্যে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্যে আমাদের সব থেকে বড় লাভ, মানুষ তার স্বমহিমায় সে সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, সে সাহিত্য শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায়, বঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করতে চাইছে, সমস্ত বন্ধন শৃংখল থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির অনাবিল আনন্দে অবগাহনের জন্য উন্মুক্ত।

সমগ্রভাবে পর্যালোচনা করলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের বাংলা সাহিত্য একটি আশ্চর্য উজ্জ্বল অধ্যায়—আমাদের জাতীয় ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় এই কাল। জীবন ও জাগরণের বাঁধভাঙা বন্যা উচ্ছ্বসিত। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে শ্রীহীন অবস্থা, অব্যবস্থিত চিত্ততা তিক্ততা ও বিদ্বেষ, তার পটভূমিতে রেখে আমাদের সাহিত্য-সাধনাকে বিচার করতে গেলে বেশ অবাকই হতে হয়। ঋজু সুন্দর সাহিত্যের পথরেখা ফুটে উঠেছে, শতদল পদ্মের মত ছড়িয়ে দিয়েছে সৌরভ দেশে বিদেশে। এ নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানি। হঠাৎ চমকের মতও নয় এ সাহিত্য। দেশের মাটির সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে জড়িত। মানসপ্রবণতার দিক দিয়ে, কোন সন্দেহ, বাঙালী এ যুগে অনেক অনেক এগিয়ে, সে আজ যা ভাবে, সমগ্র ভারত আগামীকাল তা ভাবে। চিন্তা বুদ্ধি ও মননশীলতায়, মানবিক মূল্যবোধের নব নব উন্মেষশীলতায় তার যে অভাবনীয় স্ফূর্তি, তা প্রতিফলিত দেখতে পাই সাহিত্যের দর্পণে। বাঙ্‌লা সাহিত্য তার বিভিন্ন শাখার গুণ ও গৌরব নিয়ে, অপরূপ রূপৈশ্বর্য নিয়ে বিশ্বের দরবারে গর্বভরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এঁকে দিয়েছে আলোর আল্পনা। ব্যাপ্তিতে, বিস্তারে, বৈচিত্র্যে, গভীরতায় এ সাহিত্য একদিক দিয়ে তুলনাহীন, বাঙালী জাতি যেন তার প্রাণভোমরা ধরে রেখে দিয়েছে সাহিত্যের কৌটায়। তার বিচিত্রমুখী কলরব মুখরিত জীবনের অনবদ্য নৈবেদ্য সাজিয়েছে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে।

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শ্রেষ্ঠ উপহারই বা কী? ধন নয়, মান নয়, পদ নয়, এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তরই হতে পারে—তার সাহিত্য!

আগেই বলেছি, এ সাহিত্য ভূঁইফোড় নয়। দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নের দিকে। বাঙ্‌লা গদ্যের উন্মেষ পর্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উইলিয়াম কেরী, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, রাজীবনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্‌লা গদ্য রচনায় ব্রতী হন। বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) বাঙলা গদ্যের বিকাশে বিশেষ সহায়তা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) একটি সুনির্দিষ্ট পথে গদ্যের ধারাকে বইয়ে দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী রচনায় সেকালেই অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮১০-১৮৮৬) নামোল্লেখ করা দরকার। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮১৭-১৯০৫) বাঙ্‌লা গদ্যে ভাবুক মনের সঞ্চার করেন। নব্য উপন্যাস সাহিত্যের স্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮০) কাছেও বাঙ্‌লা সাহিত্য অপরিসীম ঋণী। স্মরণযোগ্য মহাভারতের অনুবাদক এবং হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রণেতা কালীপ্রসন্ন সিংহের অবদানও। এই কালে উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রবন্ধকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮১৭-১৮৯৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), তারাশঙ্কর তর্করত্ন (?—১৮৫৮) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) প্রমুখ। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ধরতে গেলে নতুনভাবে রূপান্তর ঘটল বাঙ্‌লা গদ্যের, 'প্রাণের বিচিত্র ছন্দায়িত স্পন্দনে আন্দোলিত জীবন তরঙ্গের বহুমুখী উদ্বেলতায় উচ্ছ্বসিত[১] হয়ে উঠল।

এতো গেল উনিশ শতকের গদ্যের দিগঙ্গন। আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের দিগন্ত উন্মোচিত হল প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) 'আলালের ঘরের দুলালের' মধ্যে দিয়ে। বাঙ্‌লা উপন্যাসের ধারায় এরপর উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) উপন্যাস রচনায় বঙ্কিম প্রবর্তিত পথই অনুসরণ করেছেন। মুসলিম সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯৪২) প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) রচনায়। উপন্যাসটিতে তাঁর মানস স্বাভাবিক বিশিষ্টতা নিয়ে স্ফূর্ত। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত। 'রত্নাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালে। উল্লেখযোগ্য রসরচনামূলক উপন্যাস—গাজী 'মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯)। বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের উন্মেষ পর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রাম-

১, বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারায়ণ তর্করত্ন ও কালীপ্রসন্ন সিংহ এই কয়জনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিকাশ পর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র আপন আপন মহিমায় দীপ্ত। এঁরা উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকার।

অত্যল্প পরিসরে বাঙলাকাব্যের পটভূমি বিশ্লেষণে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে আরও একটু অতীত-মুখী করতে চাই। এ কালের কাব্য বৈশিষ্ট্যের দিগ নির্ণয় সে ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হবে বলেই মনে করি।

১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান। এরপর, ঈশ্বর গুপ্তের কবি প্রতিভা বিকাশের সময় পর্যন্ত প্রায় একটি শতাব্দী বাঙলা সাহিত্যের সঙ্কটকাল। এইকালে দেখি, পুঁথি সাহিত্যের প্রসার, কবিগানের প্রচার, পাঁচালী, প্রণয় সঙ্গীত, টপ্পা, জারি ও সারি গানের বিস্তার, গ্রামের দিকে বিশেষ করে বাউল গানের প্রসার (লালন শাহ, পাগলা কানাই, পদ্মলোচন, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্জা শাহ প্রভৃতি)।

গীতিধর্মী বাঙালী গান ছাড়া, ছন্দছাড়া প্রাণ পায় না। এসব প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে বাঙালী চেয়েছে তার জীবন ছন্দকে রূপ দিতে, ধরে রাখতে। সব সময় যে সুস্থ, স্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় ছিল, তা কিন্তু নয়। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, জনসংযোগ ছিল ঐ সব পুঁথি সাহিত্য, কবিগান, বাউল, জারি ও সারি গানের মাধ্যমে। এ যেন জনগণের সাহিত্য। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রামীণ লোকজীবন এ সবের বিষয়বস্তু, সেইহেতু আসল বাঙলার খুঁটিনাটি ছবি এসবে বিধৃত। কোন কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট নয়। সাবলীল স্বতোৎসারিত যেন এবং আশ্চর্য হতে হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্ত ভেদ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। মানবমিলনের মহান সুর ঝঙ্কৃত। সেদিক দিয়ে এগুলির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদের নবমূল্যায়ণ বিধেয়।

আধুনিক বাঙলা কবিতার ধারায় পুরানো এবং নতুন যুগের সন্ধিক্ষণে ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) আবির্ভাব। তাঁরই অন্যতম শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৬)। তাঁকে কোন কোন সমালোচক নবীন যুগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১] বাঙলা কাব্য সাহিত্যে প্রবেশ করলেন অমিত শক্তিধর মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। অপরূপ বিভামণ্ডিত হয়ে উঠলেন কাব্যলক্ষ্মী। তাঁর অক্ষম অনুসরণ করলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮০৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)। তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল বাঙলা কাব্য। "বাংলা গীতি কবিতা-

১. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—(১৯৫৯) আধুনিক বাঙলা কাব্য (২য় সং) মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা

কুঞ্জের ভোরের পাখি" হয়ে এলেন বিহারীলাল (১৮৩৫-১৮৯৪)।[১] বাঙ্‌লা কাব্য-লক্ষ্মীর কোমল দেহে এলো সুষমা। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙ্‌লা কাব্য ও কবিতা প্রাণবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হল।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই আশ্চর্য দ্রুত বিকাশের ক্ষেত্রে একটি বিষয় কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। হিন্দু সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ও বিকাশ যত দ্রুত হয়েছিল, মুসলমানদের ক্ষেত্রে সে রকমটি দেখা যায় না। কেন এমনটি ঘটল? কোন মুসলিম সমালোচক বলেছেন, 'মুসলমানদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক চেতনার অভাব, সর্বোপরি দুরদর্শিতার অভাবই এর জন্যে দায়ী'।[২] ঐ কালে যে সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তা সমস্ত জাতিরই, হিন্দু-মুসলমান সমভাবে তার অংশভাগী। সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় মুসলমানরা পিছিয়ে রইলেন। সাহিত্যকে অবশ্য ধর্মের নিরিখে বিচার করা ঠিক নয়। তাহলেও জাতীয় জীবনের সঙ্গে হয়ত বা মুসলমানদের যোগসূত্র তেমনভাবে রচিত হয়নি। হয়ত বা স্বাতন্ত্র্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বেশী মাত্রায়। হয়ত বা প্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা সক্রিয় হননি মুসলমান সমাজ। হয়ত বাঙ্‌লা ভাষাকে নিজের বলে গ্রহণ করতে অনেকেই তখন অগ্রসর হতে পারেননি। অশিক্ষা মুসলিম সমাজকে বেশী রকম গ্রাস করেছিল হিন্দুদের থেকেও। হিন্দুদের প্রাধান্যও হয়ত বা কিছুটা হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছিল মুসলিম মানসে। হয়ত মুসলমান সমাজ এমন পরিবেশ তৈরী করতে পারেনি, যার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে উপযুক্ত সৃষ্টিশীল প্রতিভা। কারণ হয়ত এ সবেরই সংমিশ্রণ। সে যাই হোক না কেন, বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ততখানি উল্লেখযোগ্য নয়।

তাহলেও মুসলিম সমাজেও তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা নবাব আবদুল লতিফ। মুসলমানরাও ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। আরও উল্লেখযোগ্য, সমস্ত কুসংস্কার, জাড্য প্রভৃতি দূরে সরিয়ে জনগণের কল্যাণ ও শিক্ষার ব্রত নিয়ে কেউ কেউ সাহিত্যকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে তা ধর্ম ও মুসলিম জাতি মাহাত্ম্য প্রচারের রূপ নেয়। সাহিত্যের রূপ, রস, গতি ও প্রকৃতির দিকে এঁদের নজর পড়ে অল্প, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মনে ধর্মবোধ,

---

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৮)—আধুনিক সাহিত্য (জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ)।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, (আধুনিক যুগ) আজহার ইসলাম, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা-১। ১ম সংস্করণ (পুণর্মুদ্রণ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) পৃ. ৪১।

দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধ উজ্জীবিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানী ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙ্‌লা সাহিত্য সৃষ্টি করা।[১] বাঙ্‌লা সাহিত্যে সৈয়দ সামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম গদ্য লেখক।[২] এই সময় সুধাকর (১৮৮৯) নামে এক পত্রিকায় মৌঃ মেয়রাজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন আহমদ মাজাহাদী, শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদের লেখা প্রকাশিত হত। ধর্মমূলক রচনাসমূহ। প্রচারধর্মী। হয়ত সাহিত্যিক মূল্য তেমন কিছু দেওয়া যায় না, কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় যেহেতু লেখা এগুলি, সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষিত হবার নয়। মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশের অধিকারবোধ জাগ্রত তাঁদের মধ্যে। এর পরই উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন। তাঁকে যোগ্য সাহিত্যিকের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হলে তো চলবে না কোন রকমেই। তাঁর ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। তাঁর রচনা সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। আবেগধর্মী। সাহিত্যরস মণ্ডিত। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "বিষাদ সিন্ধু" বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি অন্যতম স্তম্ভ। উপন্যাস, নাটক, প্রহসন জাতীয় কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের বহু শাখায় তিনি পদচারণা করেছেন স্বচ্ছন্দেই। তাঁর পরেই উল্লেখ্য মুসলিম কবি কায়কোবাদ (৮৫০-১৯৫২)। তাঁর বিরহবিলাপ (১৮৭০), কুসুম-কানন (১৮৭৩) ও অশ্রুমালা (১৮৯৪) প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এগুলি গীতিধর্মী। তবে স্বকীয় বিশিষ্টতার তেমন কোন ছাপ নেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারদশকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে (সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৮৯০-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বদলে গেল বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপরেখা। একচ্ছত্র সম্রাটের মত তাঁর উপস্থিতি। সাহিত্য আরও ঐশ্বর্যমণ্ডিত, প্রাণবন্ত, সুখ-পাঠ্য হয়ে উঠল। জীবনের তন্ত্রীতে প্রত্যক্ষভাবে তার সুরের ছোঁয়াচ লাগল। অর্থাৎ সাহিত্য জীবনের আরো কাছাকাছি এসে গেল, রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের বৃহত্তর আধুনিক পটভূমি। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্‌লা সাহিত্য একটা সর্বজনীন সংস্থা হয়ে উঠতে পারল। যে সৃজনী চাঞ্চল্য জেগে উঠল, বোধকরি তা' এই সাহিত্যের ব্যাপকতার জন্যেই। কল্পনা থেকে বাস্তবের মধ্যে উত্তরণ ঘটল অনেকখানি। প্রথমতঃ, উপলব্ধি-সঞ্জাত অনির্দিষ্ট কোন অনুভূতি নয়, দেশকাল ও

---

১. কাজী আবদুল মান্নান (১৯৬৯)—আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। (দ্বিতীয় সংস্করণ) স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

২. ঐ ঐ

জনগণ সম্পর্কে বাস্তব রূপরসগন্ধবর্ণস্পর্শের সমভিব্যাহারে প্রয়োজন-ভিত্তিক নিগূঢ় আবেগের সঞ্চার হলো আমাদের কবিতায়। দ্বিতীয়তঃ, এরই পথ বেয়ে দেশের মানুষের সঠিক অস্তিত্ব সম্পর্কে এলো সজ্ঞান অনুভূতি। তৃতীয়তঃ, হল প্রেমের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক স্বীকৃতি। যার ফলে একটি অমোঘ আরোপিত সঙ্কোচ ও সংস্কার থেকে মুক্ত হল বাঙালী কবি মানস - পূজা ও প্রেমকে এক করা বা এক ভাবার দায় আর রইল না।

এইভাবে নতুন করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভাবনার যে দিগন্ত উন্মোচন করলেন, পরিসর ও পরিবেশের যে বিস্তৃতি ঘটালেন, মুসলিম সাহিত্যিকদের পক্ষে সেই পথ অনুসরণ করে এগিয়ে আসা সহজতর হল। রবীন্দ্রনাথ 'বাঙলার ও বাঙালীর আপামর ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে সকলের সহজ ও আধুনিক গতিময় বিকাশের ভূমি। প্রস্তুত করেছেন, 'সব সূত্রকে তিনি সন্থিত করেছেন, বিকশিত করেছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে তা' সঞ্চালিত করে দিয়েছেন।'[১]

১৮৯০ থেকে ১৯৪০ এই দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর রবীন্দ্রপ্রভাব সক্রিয়। তাঁর সচেতন সৃষ্টিশীলতার জন্যই র‍্যাশানালাইজেশনের দৃঢ় বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হল বলা যেতে পারে বাঙলা কাব্যে। এরপর থেকেই সেই পথ বেয়ে এল মোহিতলালের জীবনবাদ, সত্যেন দত্তের বস্তুচেতনা ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ এবং সময় সংক্রান্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নজরুল স্বতন্ত্র এবং বিশেষ ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ যুগসমাজ-চেতনার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও আমাদের সমগ্র বাঙালীজাতির জাতীয় কবি। এঁদের কাব্যসাধনার ধারা অনুসরণ করে আধুনিক বাঙলা কাব্যের বিবর্তন দ্রুততর হল। সমাজ এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র স্বাদ নিয়ে সম্প্রসারিত হল। এঁদের কাব্য-ভাবনার মধ্যে আধুনিক কবিতার অতি প্রাথমিক যেসব লক্ষণ, তার উপস্থিতি দেখতে পাই। তবে মোহিতের আবেদন মননধর্মী। চিন্তার গভীরে আলোড়ন আনে। সত্যেন যতখানি ছন্দের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, ততখানি ভাব গম্ভীর নন, আবেদন ক্ষণিক। যতীন সর্বজনীন আবেদন ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে ততখানি সক্ষম হননি! নজরুল কিন্তু বক্তব্যে বলিষ্ঠ। গণসংবেদ্য তাঁর ভাষা। আবেগ ও আলোড়ন জাগিয়েছেন সহজেই। নজরুল এদিক দিয়ে অধিকতর অগ্রসর। তিনি জনগণের সব থেকে কাছের কবি।

কাজেই দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ র‍্যাশানালাইজেশনের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, যে যুক্তিসিদ্ধ ভাবধারার আমদানি করেছিলেন, তারই সূত্র অনুসরণ করে

১. হাসান হাফিজুর রহমান—আধুনিক কবি ও কবিতা। ১৩৭৯, (দ্বিতীয় সংস্করণ) বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করতে চেয়েছেন কোন কোন কবি, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার অগ্রদূত এঁরাই। নতুনতর নানা উদ্ভাবনায় বিভিন্ন দিকে এঁরা রবীন্দ্রপ্রভাব ছাড়িয়ে গেছেন। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে নয় কিন্তু।

এই ধারায় আগের অনুচ্ছেদ কয়টিতে আলোচ্য চারজন কবির কথা প্রথমেই এসে পড়ে। এই পর্যায়েরই আধুনিকতম অধ্যায়ে প্রমথ চৌধুরী, জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ কবিদের অবস্থান। এঁরা নতুন নতুন দিগন্তে উন্মোচন করেছেন নতুন নতুন পথ নির্মাণ করেছেন, আধুনিক যুগ ও জীবনের যন্ত্রণাকে বিচিত্রভাবে নিজস্ব ভাষায় ও টেকনিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন সর্বপ্রযত্নে। এঁদের সৃষ্টিশীলতা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ। নজরুল অনুসারী বলতে পারা যায় আসরাফ আলী খান ও বেনজীর আহমদকে। বাঙলা কবিতার আধুনিক প্রকরণের যে কয়জন বিশিষ্ট কবির নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদেরই সমগোত্রীয় ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, হাসান হাফিজুর রহমান, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস, শামসুর রহমান, মণিরুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান, আতাউর রহমান প্রমুখ কবিবৃন্দ। এই কবি-কুল রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে স্বস্তি পাননি। নানাভাবে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজেছেন, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আর এক ধারায় দেখতে পাই, একদল কবি রবীন্দ্রবলয় অতিক্রম করতে পারেননি। রবীন্দ্র অনুবর্তনেই তাঁরা দিন গুণেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯০৪), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক কালিদাস রায় প্রমুখ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী, তাঁর রচনার আঙ্গিকে যদিও বা কিছু রবীন্দ্র প্রভাব পড়েছে, কিন্তু মানসিক স্বাতন্ত্র্যে ও স্বকীয়তার ভিন্ন জগতের অধিবাসী। দুই কবির মধ্যে স্বতন্ত্র ও মৌলিক পার্থক্য ছিল। রজনীকান্ত সেনের কবিতায় দ্বিজেন্দ্র প্রভাব অনুভব করা যায়।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রয়াস হিসেবে এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মুসলিম কবি ও তাঁদের কাব্যের নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। ওঁরা খুব উঁচু মানের কবি ছিলেন তা নয়, কিন্তু এঁদের রুচি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল। দোভাষী কাব্যের, পুঁথির বৈচিত্র্যহীনতায় এঁরা ভেসে যাননি। এ মুষ্টিমেয় সাহিত্যসেবী যেমন একদিক দিয়ে মধ্যযুগের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, অন্যদিক দিয়ে তেমনি আধুনিকতার অনুশীলনও

করেছেন। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও এঁদের উল্লেখ প্রয়োজন। সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস যে মুসলিম জনমানসেও আলোড়ন তুলেছিল, এতে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমে একটি তালিকার মাধ্যমে যতদূর সংগ্রহ করতে পারা গিয়েছে, মুসলিম কবি ও কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হল :—

তালিকা—১

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কবিদের কাব্য

কবির নাম	কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য	প্রকাশ কাল
খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮—১৮৭০)	ভাবলাভ	(১৮৫৩)
	শুরত জান	
আবদুর রহিম	প্রেমলীলা	(১৮৬১)
আইন আলি শিকদার	বিধবা বিলাস (ঢাকা থেকে প্রকাশিত)	(১৮৬৮)
মুহম্মদ আবেদিন	ধর্ম প্রচারিণী	(১৮৭৫)
ওবায়দুল হক	পদ্যমালা	(১৮৭৬)
মইনুদ্দীন আমেদ	কবিতা কুসুমাঙ্কুর (রামনারায়ণদাসের সহযোগিতায় এই বইখানি রচিত। ঢাকা থেকে প্রকাশিত)	(১৮৭৬)
হামিদুল হক	বিরহ দর্পণ	(১৮৭৭)
মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)	গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু	(১৮৭৩)
	সঙ্গীত লহরী	(১৮৮৭)
	পঞ্চনারী পদ্য	(১৮৯৯)
	প্রেম পারিজাত	
কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)	বিরহ বিলাপ	(১৮৭০)
	কুসুম কাননে	(১৮৭৩)
	অশ্রুমালা	(১৮৯৫)
মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)	কুসুমাঞ্জলি	(১৮৮১)
	অপূর্ব দর্শন	(১৮৮৫)
	প্রেম হার	(১৮৯৮)
নওশেরআলি খাঁ (১৮৬৪-১৯২৪)	শৈশব কুসুম	(১৮৯৫)

কবির নাম	**কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য প্রকাশ কাল**	
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)	অনল প্রবাহ	(১৮৯৯)

এরপর আর একটি তালিকা প্রদত্ত হল, যেখানে বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কাব্যের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

তালিকা—২

বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কবিদের কাব্য

মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)	মৌলুম শরীফ	(১৯০৫)
	বিবি খোদেজার বিবাহ	(১৯০৫)
	হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ	(১৯০৫)
	হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ	(১৯০৫)
	হজরত বেলালের জীবনী	(১৯০৫)
	মদিনার গৌরব	(১৯০৬)
	মোস্লেম বীরত্ব	(১৯০৭)
	বাজীমাত	(১৯০৮)
কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)	অমিয় ধারা	(১৯২৩)
	শিব মন্দির	
	শ্মশান ভস্ম	(১৯৩৪)
	মহাশ্মশান	(১৯০৪)
	মহরম শরীফ	(১৯৩৩)
মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)	জাতীয় ফোয়ারা	(১৯১২)
	হজরত মোহাম্মদ কাব্য	(১৯৩০)
মুন্সী দাদ আলী (১৮৫৬-১৯২৭)	ভাঙা প্রাণ	(১৯০৫)
	আশেকে রসুল (১ম ও ২য় খণ্ড)	(১৯০৭)
	শান্তিকুঞ্জ	(১৯১৭)
সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০) চিকিৎসক	যমজ ভগিনী বা সিরাজদৌল্লা উপন্যাস	(১৯০৫)
	স্বর্গারোহণ কাব্য	
	জীবন্ত পুতুল কাব্য	(১৩১৪)

	স্বাধীন খাতুন	(১৯৪২)
	হাবশী বাদশা (গদ্যে পদ্যে)	(১৯২৫)
নওশের আলী খাঁ ইউসফজী	মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত	
(১৮৬৪-১৯২৪)	শৈশব কুসুম	(১৩০২)
	ভাঙ্গা প্রাণ	(১৩১২)
আবদুল হামিদ খাঁ ইউসফজী	উদাসী	(১৯০০)
	কিরণ প্রভা	
	অরুণ ভাতি	
মতীয়র রহমান খান	এজিদ বধ কাব্য	
আর্যমন্দ আলী চৌধুরী	হৃদয় সঙ্গীত	
মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪)	বঙ্গ বীরাঙ্গনা কাব্য	(১৯০৬)
	কাব্য যূথিকা	(১৯৬০)
আবদুলবারী (১৮৭২-১৯৪৪)	কারবালা	(১৯১৩)
আবদুল মা আলী মহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪)	ভ্রাতৃবিলাপ	(১৯০৩)
	কবিতাকুঞ্জ	
শেখ ওসমান আলি	হাফেজ নাহেব	
	দেবলা	(১৯০১)
শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯০৬)	তৃষ্ণা	(১৯০০)
	পরিত্রাণ	(১৯০৩)
	সরল পদ্য বিকাশ গাথা	(১৯১৩)
	ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি	
কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)	আঁখিজল	(১৯০০)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭০-১৯৩১)	অনল প্রবাহ	(১৯০০)
	উচ্ছ্বাস	(১৯০৭)
	স্পেন বিজয় কাব্য	(১৯১৪)
	সঙ্গীত সঞ্জীবনী	(১৯১৩)
	নব উদ্দীপনা	
	উদ্বোধন	
	মহাশিক্ষা (মহাকাব্য) প্রেমাঞ্জলি	

কবি	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬)	ডালি	(১৯১৩)
শেখ হবিবর রহমান (১৮৯১-১৯৬১)	কোহিনুর কাব্য	
	চেতনা	
	বাঁশরী	
	পারিজাত	
	গুলশান	
	আবেহায়াত	
শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৪-১৯৫৩)	মৃদঙ্গ	
	চিত্রপট	
	মসনদের মোহ	
	কল্পলেখা	
	সরফ রাজখাঁ	
	রূপছন্দা	
শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫)	আমার প্রিয়া	
	পীযূষ প্লাবনী	
	মর্মবাণী	
	মুক্তিবীণা	
কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩)	নওরোজ	(১৯৩৮)
	পল্লীবাণী	(১৯৪৩)
	পথের বাঁশী	(১৯৪৫)
	আমরা বাঙালী	(১৯৪৫)
গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	রক্তরাগ	(১৯২৪)
	খোশরোজ	(১৯২৯)
	কাব্যকাহিনী	(১৯৩২)
	সাহারা	(১৯৩৬)
	হাস্নাহেনা	(১৯৩৮)
	বনি আদম	(১৯৫৮)
	তারানা-ই-পাকিস্তান	(১৯৪৮)
	মোসাদ্দাস-ই-হালী (অনুবাদ গ্রন্থ)	(১৯৪৯)

	কালাম-ই-ইক্‌বাল	(১৯৫৬)
	আলকুরআন—বাংলা তর্জমা	
	শেকোয়া ও জবান-ই শিক্‌ওয়া	(১৯৬০)
	কবিতার সংকলন—বুলবুলিস্তান	
আশরাফ আলী খাঁ	ভোরের কুহু (গজল গান)	
	কঙ্কাল	
	শেকোয়া (ইকবালের অনুবাদ)	
জসীম উদ্দীন	রাখালী	(১৯২৭)
	পদ্মাপার	(১৯৫০)
	বালুচর	(১৯৩৭)
	ধানক্ষেত	(১৯৩২)
	নকসী কাঁথার মাঠ	(১৯৩৬)
	সোজন বাজদিয়ার ঘাট	(১৩৩৩)
	সুচয়ণী	(১৯৬১)
	রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (২য় সংস্করণ)	(১৯৪৬)
	রূপবতী	(১৯৪৬)
	মাটির কান্না	
	সাকিনা	(১৯৪৬)
	জলের লিখন	(১৯৬৯)
	ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে	(১৯৭২)
বেনজীর আহমদ (১৯০৩-	বন্দীর বাঁশী	
	বৈশাখী	
আবদুল কাদির (১৯০৬-)	দিলরুবা	
	উত্তর বসন্ত	
মহীউদ্দীন (১৯০৬-	পথের গান	
	স্বপ্ন সংঘাত যুদ্ধ বিপ্লব	
	গরিবের পাঁচালী	
বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-)	ময়নামতীর চর	
	অনুরাগ	
কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০৯-)	মরাল	

	নীল কুমুদী	
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯১০-)	পশারিণী	(১৯৩১)
	মন ও মৃত্তিকা	(১৩৬৭)
বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-)	সাঁঝের মায়া	(১৯৩৮)
	মায়া কাজল	(১৯৫১)
	মন ও জীবন	(১৯৫৭)
	প্রশস্তি ও প্রার্থনা	(১৯৬৮)
আজহারুল ইসলাম (১৯১৩-)	ছায়াপথ	(১৯৬৬)
	রুবাইয়াৎ সাখাউদ্দীন (অনুবাদ)	
	উত্তর বসন্ত	(১৯৭৩)
রওশন ইজদানী (১৯১৭-১৯৬৭)	চিনুবিবি	(১৯৫১)
	রঙিনা বন্ধু	(১৯৫১)
	খাতামুন নবীঈন	(১৯৬০)
	বজ্রবাণী	(১৯৪৭)
	রাহগীর	

আলোচ্য তালিকা দুটি সম্পূর্ণ নয়, সে চেষ্টাও করা হয়নি, শুধু এইটুকুই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত এবং বিভক্ত বাঙ্লায় মুসলিম লেখকরাও তাঁদের সামর্থ্য মত বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন, কাব্যের বীণাবাদনে এগিয়ে এসেছেন। কে কতখানি সার্থক হয়েছেন অবশ্যই এ প্রশ্ন আসে, কেউ কেউ এমন কি গোলাম মোস্তফা প্রমুখের মত কবিও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকারেই ডুবে থেকেছেন, মুসলিম ধর্মজীবন নিয়েই কারুর কারুর কাব্যকর্ম আবর্তিত হয়েছে। মুসলিম জীবন দর্শন কারুর কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীতে এঁদের অবদান তাই ততখানি হৃদয়ে নাড়া দিতে পারে না। যুগ ও জীবনের দাবি অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত। এঁরা কেউ কেউ যেন পিছিয়ে দিতেই চেয়েছেন সাহিত্যের অগ্রগতিকে। আধুনিক কাব্যের দরবারে এঁরা বৃথাই আবেদন করেছেন, আধুনিক কবি হিসাবে এঁরা স্বীকৃতি পেতে পারেন না। তবুও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন কারণে এঁদের কয়েক জনের কবিকৃতির আলোচনা আমরা করেছি উপযুক্ত বক্তব্য সহকারে। যে আধুনিক কবিদের কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গের কাব্যসাহিত্যে নবজীবনের জোয়ার, তার উৎসসন্ধান করতে এবার অগ্রসর হওয়া যাক।

একথা প্রথমেই স্বীকার করা ভাল যে, উভয় বঙ্গের আধুনিক কবিকুলের মধ্যে তাঁদের কবিতার আকৃতি প্রকৃতিতে, বিষয়বস্তু পরিবেশনায়, চিন্তায় কর্মে ও মননে অমিলের থেকে মিল খুঁজে পাবার সম্ভাবনাই বেশী।

প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ ধর্মভিত্তিক নয়। যুগচেতনার আভাস ও যুগ-যন্ত্রণার উন্মথন দেখা যায়। মানবিক, সামাজিক এবং শৈল্পিক মূল্যবোধের উপর সংস্থিত হবার একটা যুগ এসেছিল আধুনিক কবিতায়। আমরা দেখেছি জীবন-চেতনা, সমাজ-চেতনা, যুগ-চেতনা। বাঙ্‌লা কবিতায় আধুনিককালে প্রতিফলিত হয়েছে অধিকার-চেতনা, শ্রেণী-চেতনাও। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কথা, অধ্যাত্ম দর্শন ছিল প্রচ্ছন্নভাবে, ভোগের কথা কারুর কাব্যে। কেউ যেন বেশী রকম ঐতিহ্য ও নীতি সজাগ। কোথাও বা আঙ্গিক সর্বস্বতা, সৌন্দর্য রুচি ও বৈদগ্ধ্য পরিচর্চা করেছেন কেউ কেউ। প্রথম তিন দশকে এই যে ধারাগুলি আধুনিকতার বিবর্তন নিয়ে এল, তা পরবর্তী দশকেও সংক্রামিত হল। এর সঙ্গে বিশের শেষে ও ত্রিশের যুগে দেখতে পাই বিদ্রোহের সুর। এ বিদ্রোহ প্রথমতঃ, মন ও প্রবৃত্তির স্বাধিকার ঘোষণার দাবী নিয়ে। কল্লোলগোষ্ঠী গড়ে উঠল, বাঙ্‌লা কাব্যধারায় এক অভিনব পালাবদল হল। বলা যেতে পারে বৈপ্লবিক। এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধরে এগিয়ে এলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এতকাল মানসী পত্রিকা রবীন্দ্র বাণীরই বার্তাবহ ছিল। প্রকাশিত হল কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৭) এবং ঢাকা থেকে প্রগতি (১৯২৭), বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা বেরুল ১৯৩০ সালে। বেরুল প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা (১৯৩২)।

বিধিনিষেধ, নীতিনির্দেশ, শাসন ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ। কিন্তু লক্ষণীয়, মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে নয়। তাই দ্বিতীয়তঃ, এই বিদ্রোহের একটি গঠনমূলক দিকও রয়েছে। পূর্ববর্তী চেতনা চিন্তা ও দর্শনের সঙ্গে এই বিদ্রোহের সুরও মিশল, সংক্রামিত হল চল্লিশের দশকে।

অবশ্য কোন কবির ক্ষেত্রেই কোন পর্যায় বিভাগ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া যায় না, বা তাঁর কাব্য সেইভাবে বিচার করাও সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর দশকগুলির চেতনা-চিন্তাদর্শন এই কারণেই এক দশক থেকে অন্য দশকে, একজন থেকে অন্যজনে এবং এক কবির এক কাব্য থেকে অন্য কাব্যে অবলীলায় সংক্রামিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। পারম্পর্য, সজ্ঞানতা এবং বিশ্লেষণমূলকতা ত্রিশের পরবর্তীকালে বাঙ্‌লাকাব্যে অধিকমাত্রায় দৃষ্টিগোচর হল। বাঙ্‌লাকাব্যে চতুর্থ পর্যায়ে এল আর একটা জিনিস—অব্যবস্থিতচিত্ততা। যুগ-যন্ত্রণা তার কঠিন কুটিল দংশনে সাপের মত বিষ

ঢালছে। নতুন কোন মূল্যবোধ আজ আর জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না। অতীতের মূল্যবোধগুলি বরং ভেঙ্গেচুরে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকারের বাসা। কেউ কেউ পুনরুজ্জীবন চাইছেন রোমান্টিকতার, শাশ্বত মূল্যবোধের অথবা আদর্শের। কিন্তু স্ববিরোধিতা সবিশেষ প্রকট। অবক্ষয়, বিনষ্টস্বাদ, ভ্রষ্টচরিত্র। কেউ কেউ শুধু আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপ্ত। চল্লিশ থেকে ষাট এবং সত্তরের দশক বাঙলা কবিতার এই চরিত্র।

কাজেই, অন্যান্য দেশের সমসাময়িক কবিতা আন্দোলনের মতই একালের আধুনিক কবিতা কোন বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেনি পূর্ববঙ্গেও। নানা প্রচেষ্টা চলেছে এবং চলছে। অবশ্য এই প্রচেষ্টার মধ্যেই তো কাব্যের ভবিষ্যৎ। প্রতিক্ষণেই নতুন না হলে কবিতা বাঁচবে কী করে।

মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্—পূর্ববঙ্গের আধুনিক কাব্য প্রেরণার উৎস কী এবং কোথায় ?

আমাদের মনে হয়, আবহমানকালের বাঙলা সাহিত্যকাব্যধারা, যা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে তাই হচ্ছে পূর্ববঙ্গের আধুনিক কাব্যধারার উৎস। আবার বলা প্রয়োজন ভুঁইফোড় নয়। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যই পূর্ববঙ্গের প্রেরণা, উৎস ও ঐতিহ্যের আধার। পূর্ববঙ্গের কোন সাহিত্যিক বলতে চেয়েছেন, তাঁদের সাহিত্যের উৎস হবে মুসলিম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মীর মোশাররফ হোসেন ও নজরুল অনুসৃত বাঙলা সাহিত্যের ধারা।[১] তাঁর আরো বক্তব্য, মুসলিম বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন উপাদান আমাদের সাহিত্যে স্থান পাবে না এ ধারণা যেমন অযৌক্তিক, তেমনি মুসলিম বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়াকেও সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশ্রয় দেওয়া মনে করাও সঠিক ভাবনা নয়। এখানে আমার স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, মুসলিম বৈশিষ্ট্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বতন্ত্র আলেখ্য রচনার মূল সূত্রকে ধরিয়ে দিচ্ছে এবং বিশেষভাবে আমাদের সাহিত্যের নতুন উদ্ভাবনা ও সক্রিয়তার প্রাথমিক উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করছে।[২]

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? বাস্তব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার মানদণ্ডে কি কোন সাহিত্যের বিচার চলতে পারে ? আমরা কখনই তা মনে করি না। মানুষের জীবন, পারিপার্শ্বিকতা, আবেষ্টনী, ধর্ম, সমাজ, নীতি, আচার ব্যবহার এসব নিয়েই সাহিত্য, শুধু ধর্ম নিয়ে কোন মতেই হতে পারে না। বস্তুতঃ, পূর্ববঙ্গের আধুনিক সাহিত্যের

১. হাসান হাফিজুর রহমান—আধুনিক কবি ও কবিতা. পৃ. ১৩০
২. ঐ পৃ. ১৩১

চেহারাও তা নয়। সমালোচক বিদগ্ধ হয়েও ভাবের ঘরে চুরি করতে চেয়েছেন। মূলকথা, ধর্মনিরপেক্ষ আবহমানকালের বাঙ্‌লা কাব্যের ধারাই পূর্ববঙ্গের আধুনিক কাব্য প্রবাহিত। বংশাণু বা 'জীন' যেমন বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয় রক্তের প্রতিটি কণায় সেই রকম ঐতিহ্য বহন করে চলেছে পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতা এবং সেই ঐতিহ্য নিয়েই সে আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তবে বৈশিষ্ট্যও কি নেই? নিশ্চয়ই বিশিষ্টতা-মণ্ডিত। প্রথমতঃ, মুসলিম মানস মোহমুক্ত উদার মানসিকতার সন্ধান আধুনিক কবিতায় দুরূহ নয়। কাজেই এ মানসিকতা বাঙ্গালী মানসিকতায় লীন হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। দেশের মাটি জল থেকে এ মুসলিম মানস তার প্রাণরস আহরণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম সমাজ জীবনের প্রতিফলন কাব্যে। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে এ প্রতিফলন অবাস্তব নয়, অসমীচীনও নয়। নগর এবং গ্রামজীবন প্রোথিত। সাহিত্যের ভাণ্ডার তাতে সমৃদ্ধই হয়েছে। পূর্ববঙ্গ গ্রামভিত্তিক। গ্রামীণ চিত্রাবলী সাদামাটা রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে কবিতায়।

তৃতীয়তঃ, ভাষা ব্যবহারে কিছু কিছু নিজস্ব দ্যোতনা লক্ষণীয়। স্থানীয় ভাষা, গ্রাম্য ভাষা কোথাও কোথাও প্রাধান্য পেয়েছে। কেউ কেউ উর্দু, ফারসী, আরবী ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে এনেছেন। কোথাও তা সুপ্রযুক্ত, কোথাও নয়। এ ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভাষার লাভই হয়। জনমানস এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠী নবাগত শব্দের কিছু চিরায়ত হিসেবে গ্রহণ করেন, কিছু বর্জন করেন। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিই ঘটে।

গ্রামীণ জীবন সেখানকার কাব্যধারায় স্ফূর্ত। কৃত্রিমতা ততটা নেই। সস্তা সাহিত্যিক চমক, দ্যুতি তেমন পরিলক্ষিত হয়ত হবে না। কিন্তু এক দিক দিয়ে সহজ বোধগম্য। ততখানি দুর্বোধ্য নয় কোন কবির তাবৎ কবিতা। দু'একজন ব্যতিক্রম মাত্র, কষ্ট-কল্পনা-প্রসূত নয়। অবোধ্য মনে হয় না। ভঙ্গীসর্বস্ব নয়।

বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতাতেও বহুক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের মতই নগর জীবনের বহু বিচিত্র প্রবাহ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের কাব্যের আঙিনা হতে বলা চলে সাম্প্রদায়িকতা মুছে গেছে, পূর্ববঙ্গে আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি অতটা নয়। তবে আধুনিক কাব্যধারায় পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব পড়েছে নিশ্চয়ই। তবে এ বিশ্বব্যাপী কাব্য আন্দোলনেরও ফলশ্রুতি। বিপরীত চিত্রও আছে। পূর্ববঙ্গের কাব্যসাহিত্যে সেখানকার রাজনৈতিক আন্দোলন যে রকম ঠাঁই পেয়েছে, বা পূর্ববঙ্গের কাব্যসাহিত্য যে-ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে এগিয়ে

দিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, সংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। শুধু স্লোগান ও রাজনৈতিক প্রচার সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না অবশ্যই কিন্তু জীবন ও জাগরণের ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে এমন কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে কবিতা শুধু স্লোগানধর্মীই থাকেনি, কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মানুষের মিছিলের সঙ্গে কবিতা অনেক সময় একাত্ম হয়ে গিয়েছে।

কবিতা নিয়ে অতি আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরাও সমান সজাগ, হয়ত এক অলক্ষ্য প্রতিযোগিতাই চলছে। সমগ্র বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে এও কম লাভ নয়। বাঙ্‌লা কবিতার অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার এতে করে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে বলেই আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১. মহঃ মনিরুজ্জামান
আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫০-১৯২০)
প্রথম প্রকাশ—১৬ই জুন, ১৯৭০, বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা।

২. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্‌লা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
(দশম-বিংশ শতাব্দী) ৩য় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

৩. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিকাশের ধারা

৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়
আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্য (২য় সংস্করণ, ১৯৫৯) মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আধুনিক সাহিত্য (১২৮৮, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ)।

৬. আজাহার ইসলাম
বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ)
(পুনর্মুদ্রণ-ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ) প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা—৫।

৭. কাজী আব্দুল মান্নান
আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) ১৯৬৯। ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা (১৩৭৯)।

৮. হাসান হাফিজুর রহমান·
আধুনিক কবি ও কবিতা (২য় সংস্করণ) মাঘ, ১৩৭৯
প্রথম প্রকাশ—১৩৭২। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা।

৯. Rev. C. F. Andrews
The Renaissance in India, Macmillan & Co. Ltd.

১০. Report of the second Indian National Congress, 1886.
Edited by C. H. Philips and others.

১১. Select Documents on the History of India and Pakistan Vol. IV, London, 1962.

১২। এ. কে. এস. আমিনুল ইসলাম·
বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য, (২য় মুদ্রণ) ১৯৬৯
প্রথম মুদ্রণ—১৯৫৯
বুকষ্টল, ৩১৭, নিউমার্কেট, ঢাকা—২

১৩ আবদুল হাই, মুহম্মদ ও সৈয়দ আলীআহসান
বাঙ্‌লা, সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আধুনিক যুগ,
৩য় সংস্করণ (১৯৬৮)। চট্টগ্রাম, নাসিমবাসু, বইঘর
প্রথম প্রকাশ—১৯৫৬
'বাঙ্গলা আদাব কি তাওয়ারিখ' নামে উর্দু ভাষায় অনূদিত।

১৪. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
ভাষা শিল্পী মশাররফ।
ঢাকা, সালেহা খাতুন, পঃ মিল্লাত লাইব্রেরী, ১৯৬৯।

১৫. Rabindranath Tagore—Nationalism in India.

১৬. আবদুল মজিদ—বাঙ্‌লার মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য, 'সওগাত'।
(শ্রাবণ, ১৩৩৩)

১৭. আহমদ শরীফ—পুঁথি সাহিত্যের ভূমিকা, 'মাহে নও' (ফাল্গুন ১৩৭১)

১৮. W. W. Hunter—The Indian Musalman.

১৯. A despatch by Lt. Col. John Coke, the Commandant at Moradabad just after Sepoy Mutiny.

দুই

১৯৪১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের কবিতা ভাবনা

(১৯৪১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের কবিতার পটভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। আগস্ট বিপ্লব, ১৯৪২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি, ১৯৪৫। লীগ মন্ত্রিসভা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ১৯৪৬। ১৩৫০-এর মন্বন্তর। স্বাধীনতা, ১৯৪৭। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙ্‌লাদেশের অভ্যুদয়ের সূচনা। ভাষা আন্দোলন, রাজনীতি।)

এই শতাব্দীর চারের দশক অবিভক্ত বাঙ্‌লা ও বাঙালীর ইতিহাসে হেনেছে আঘাতের পর আঘাত। বস্তুতঃ আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাহিত্যিক রূপান্তর ঘটিয়েছে চারের দশকটি—যেন পরবর্তী দশকগুলিকে সেইই নিয়ন্ত্রিত করছে।

পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক কবি ও কবিতার মূল্যায়নের পূর্বমুহূর্তে তাই তার পটভূমিকা-স্বরূপ চারের দশকের সতর্ক বিশ্লেষণ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নানান ঘটনার আবর্তে, বিভিন্নধর্মী আঘাতে জাতীয় জীবন তোলপাড়।

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সাহিত্যাকাশে সৃষ্টি করেছে বিরাট একটা শূন্যতা। রবীন্দ্রনাথ বলতে গেলে পরিণত বয়সেই পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু তবু যেন বাঙালী জাতি এবং বাঙ্‌লা সাহিত্য ঠিক এই ইন্দ্রপতনে প্রস্তুত ছিল না। বিশেষতঃ যুদ্ধের বীভৎস পটভূমিকায় পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের নতুন পরিবর্তন এবং রূপান্তর পরিলক্ষিত হচ্ছিল—জাতীয় জীবনে আরো বৃহত্তর পটভূমিকায় তিনি বোধ হয় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন, সমস্ত মোহাবরণ ও কুহক ছিঁড়ে ফেলে তিনি সাধারণ মানুষের অত্যন্ত কাছে নেমে আসতে, পাশাপাশি হাঁটতে চাইছিলেন, নাগিনীরা চারিদিকে যে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছড়াচ্ছে, সেখানে শুধু শান্তির ললিত-বাণী সিঞ্চন না করে দানব উচ্ছেদে তারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের ডাক দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বাঙ্‌লায় রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি চাঞ্চল্য ও শিহরণ জাগিয়ে বৃটিশের রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে তাদের একদম বোকা বানিয়ে দামাল ছেলে সুভাষচন্দ্র আফগানিস্তান হয়ে পাড়ি দিলেন জার্মানীতে। বাঙালীর তারুণ্য, মূল থেকে নাড়া খেলো।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছে, পৃথিবীতে তোলপাড় হচ্ছে। মদমত্ত হিটলার অট্টহাসি হাসছে, এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ঘনঘটা।

১৯৪০ সালের মার্চে জিন্নার সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের দাবি নিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। পরের বছর অবশ্য জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে পাকিস্তান সম্পর্কে সমঝোতার জন্য চেষ্টা করেছিলেন (১৯৪১ সালের ২রা মার্চ পাঞ্জাব মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের বিশেষ পাকিস্তান অধিবেশন প্রসঙ্গ)[১] যেটা কার্যকর হলে দেশ বিভাগ না হয়ে একটা প্রশাসনিক বিভাগ মাত্র হত। যাই হোক, এ প্রচেষ্টা বানচাল হল।

১৯৪১-এ জার্মান আক্রমণে বৃটেন বিধ্বস্ত হচ্ছে। হিটলার এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রাশিয়া আক্রমণ করল ১৯৪১ সালের ২২ জুন। ফলে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনল। যুদ্ধের মোড় ঘুরল। প্রকৃতিও বদলে গেল।

১৯৪২-এ বৃটিশ জাপানের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে রেঙ্গুন হারিয়ে চাটগাঁয় আশ্রয় নিল। রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় সুভাষচন্দ্র আই. এন. এ গড়ে তুললেন। এদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল।

১৯৪২-এর মাচ মাসে ক্রিপস্ মিশন। ব্যর্থ হল কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ ক্যাবিনেটের বোঝাপড়া। এরপর এলো মহাত্মাজীর ভারত ছাড় আন্দোলন। সরকার গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করল আন্দোলনের পূর্ব মুহূর্তেই। কিন্তু এ আন্দোলন শুধু কংগ্রেসের বা শুধু অহিংস হয়ে থাকল না, সহিংস রূপ নিল। সরকারী হিসাব মতে ২৫০-এর উপর পোষ্ট অফিস আক্রান্ত হয়েছিল, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের কোন কোন রেলপথ বহুদিন অচল হয়েছিল, অনেক জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছিল বিচ্ছিন্ন। দেড়শো সরকারী অফিস ও থানা আক্রান্ত হয়েছিল। বিহারের ও উত্তরপ্রদেশের কোন কোন জেলা ও বাঙ্‌লায় মেদিনীপুর জেলার অনেক অংশ থেকে ইংরাজ সরকারের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল।

প্রচণ্ড দমননীতির জন্য ও কোন প্রকৃত সংগঠন না থাকায়, কংগ্রেসের পিছিয়ে যাওয়ার কারণে আন্দোলন ব্যর্থ হল।

১৯৪৩। বৃটিশ সরকারের বঞ্চনা নীতির জন্য বাজার থেকে চাল উধাও— মজুতদার মুনাফাখোর ও চোরা কারবারীদের গুদামে।' বাঙ্‌লায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। বেসরকারী মতে পঁয়ত্রিশ লাখ লোক মারা গেছে।

১৯৪৪ সালে যুদ্ধের অবস্থার আমূল পরিবর্তন। নাজী ও নাৎসী বাহিনী হারছে।

১. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬৭), বিপ্লবের সন্ধানে, পৃ. ৩১৫, ডি. এন. বি. এ. ব্রাদার্স, ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯।।

গান্ধীজী মুক্তি পেলেন মে মাসে। ১৯৪৫-এর গোড়ায় হিটলারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের লড়াই শেষ। মাস কয়েক পরে জাপানের পিছু হটাও সম্পূর্ণ।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ঘোরালো। যুদ্ধ শেষ হলে নতুন নির্বাচনের কথা উঠল—কংগ্রেস ও লীগের সমান সমান প্রতিনিধি নিয়ে ব্যবস্থাপক সভ্য গঠিত হবে বলে মতৈক্য হল। লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন ঘুরে এসে হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রতিনিধিত্ব ঘোষণা করলেন। আশুলাভের জন্ম দু'দলই টোপ গিলল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়াভেল প্ল্যানও ভেস্তে গেল।

কংগ্রেস নেতারা তখন মুক্তি পেয়েছেন। আজাদ-হিন্দ বন্দীদের বিচার চলছে। তাদের মুক্তির দাবিতে দেশ উদ্বেল। নভেম্বরের কলকাতায় জনসমাবেশ, সভা, মিছিল, পুলিশের তাণ্ডব। গুলি চলছে। শহীদ হলেন ছাত্র রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অনমনীয় দৃঢ়তা, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। ভারত নতুনভাবে অশান্ত, বিলাতে লেবার পার্টির গভর্নমেণ্ট হল। এই সময় গভর্নর কেসীর সঙ্গে মহাত্মাজীর গোপন দীর্ঘ পরামর্শ, তারপর থেকেই কংগ্রেসী নেতারা প্রচারে নামলেন—স্বাধীনতা ভারতের দরজা ঠেলাঠেলি করছে।

বোম্বাই-এর নৌ বিদ্রোহ। জ্বলন্ত আগুন, অভূতপূর্ব প্রতিবাদ ও যুদ্ধ। ইংরাজ মরিয়া হয়ে রক্তের বান ডাকালো। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল বিদ্রোহীরা।

নির্বাচন হল। কেন্দ্র ও প্রদেশে প্রায় সব অ-মুসলমান জেনারেল সীট দখল করল কংগ্রেস আর সব মুসলমান সীট পেল লীগ। শুধু ফ্রণ্টিয়ার গান্ধী আবদুল গফুর খানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লীগ হারলো এবং কংগ্রেস জিতল। প্রদেশগুলোয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করল।

কিন্তু এই নির্বাচনের জন্য, কংগ্রেসের ইংরাজদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির জন্ম ও পাকিস্তানের দাবির জন্ম হিন্দু-মুসলমান বিরোধ চরমে উঠল। 'ক্যাবিনেট মিশন' এই বিরোধকে টিকিয়ে রাখতে শেষ পর্যন্ত যে রিপোর্ট দিল, সেটা ঠিক সুপারিশ নয়, রোয়েদাদ বা এওয়ার্ড। এটা প্রকাশিত হল ১৯৪৬ সালের মে মাসে।

কিন্তু গণ্ডগোল মিটল না। প্রদেশগুলোকে হিন্দু প্রধান, মুসলমান প্রধান ও হিন্দু-মুসলমান সমান সমান এই রকম A. B. C তিন ভাগে ভাগ করার ব্যবস্থা হল। ঠিক হল রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে, কিন্তু তবু গণ্ডগোল বাধল। বাঙলা ও পাঞ্জাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য তীব্রতর হল, মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিও হল প্রবলতর, লীগ তুলল ডিরেক্ট এ্যাকশ্যানের নীতি। ফলে ১৬ই আগস্টের হরতাল—

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান—ভয়াবহ দাঙ্গা কলকাতার বুকে—আবার এর জবাবে নোয়াখালি, বিহার, গড়মুক্তেশ্বরে। বাঙ্‌লায় তখন লীগ মন্ত্রিসভা। পাকিস্তান হাসিল করতে বা দেশবিভাগ ঘটাতে কলকাতার দাঙ্গা যে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে পড়েছিল, তাতো কারুরই অস্বীকার করার উপায় নেই। লিওনার্ড মোসলের "The last days of the British Raj."—বইতে এর একটা পরিপূর্ণ চিত্র পাই। বাঙ্‌লার আবহাওয়া তখন বিষাক্ত। শুভ বুদ্ধি হয়েছে অন্তর্হিত। এ সাম্রাজ্যবাদী কামড়—তাদের ষড়যন্ত্রের অধিকার বজায় রাখার। অতি সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষের সারাদিন কী হয় কী হয় ভাব। হিন্দু-মুসলমান একই ছিলাম আমরা। আমরা ছিলাম বাঙালী—ভারতবাসী। কিন্তু বিদ্বেষ জাগল। ধর্ম হল বড়। মনুষ্যত্ব লোপ পেল।

১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী পৌছুনোর দিন থেকে কাহিনীর শুরু। দেড় মাস পর কংগ্রেস—লীগ কোয়ালিশন গঠন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালু করার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু কংগ্রেস চাইল প্রথম ভাগ গ্রহণ করতে, (গ্রুপিং সিস্টেম)। লীগ চাইল গ্রহণ করতে দুই অংশই, অর্থাৎ গ্রুপিং সিস্টেম ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে ওয়াভেল মিশন কোয়ালিশন না করার অজুহাত দেখালেন। ইংরাজের সুচতুর চাল জয়ী হল। এর পরই ১৬ই আগস্টের ডিরেক্ট অ্যাকশন এর প্রস্তাব পাশ হল ২৯শে জুন, (১৯৪৬) লীগের কাউন্সিল মিটিং-এ।

শেষ অঙ্কে বাঙ্‌লার আকাশে কলঙ্করূপে দেখা দিল সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডিরেক্ট অ্যাকশন–অবাঙালী মুসলমান জনসমাবেশে ঘোষিত হল—এ সংগ্রাম গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে নয়; এ কাফের হিন্দুর বিরুদ্ধে। সমস্ত দেশে থমথমে অবস্থা। কী হয় কী হয় ভাব! ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারীতে বৃটিশ রাজের ঘোষণা, তাঁরা ঠিক করেছেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর। যেন গরজটা তাঁদেরই। ভারতবাসীর মিলিত প্রতিষ্ঠান যদি নাও থাকে, তাঁরা যেখানে যাঁদের প্রাধান্য দেখবেন, সেখানে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন।

এই জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী কারসাজিতে যেটুকু ঐক্যের গরজবোধ ছিল সেটুকুও উপে গেল। ১৯৪৭ সালের গোড়াতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত বিভাগের মতলব আঁটছে বোঝা গেল এবং সেই ফাঁদে কংগ্রেস ও লীগ পা দিল।

গোপনে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা চলল। লর্ড ওয়াভেলের বদলে এলেন

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। খাড়া হয়ে গেল দুমাসের মধ্যে "Indian Independence Act"—এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হল ৩রা জুন। ৫ই জুন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বললেন, যে এই বছরেই (১৯৪৭) তিনি স্বাধীনতা দিয়ে দিতে চান, দেরী করতে চান না।

অতএব ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ পরম গাম্ভীর্য সহকারে সমাধা হল। ভারত স্বাধীন হল, দুটুকরো হল। মাউণ্টব্যাটেন হলেন ভারতের প্রথম বড়লাট, জহরলাল নেহেরু হলেন তাঁর প্রধান মন্ত্রী। পাকিস্তানের বড়লাট হলেন মহম্মদ আলী জিন্না। গণ্ডগোল উঠল বাঙ্‌লা ও পাঞ্জাব নিয়ে। এ দুটো জায়গায় হিন্দু-মুসলমান সমান সমান। অতএব ভাগাভাগির ব্যবস্থা হল। পাঞ্জাবটা চটপট বিভক্ত হল। সমস্যা দেখা দিল বাঙ্‌লাকে নিয়ে।

মুসলমান বেশী বলে পাকিস্তান পুরো বাঙ্‌লা দাবী করলে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করল, এর মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু ও সুরাবর্দী সাহেব একযোগে ধুয়ো তুললেন, ঝগড়া বন্ধ হোক, বাঙ্‌লা একটা পৃথক অটোনমাস স্টেট হোক। এর পিছনে ক্যাবিনেট মিশনের সি গ্রুপ স্টেটের আইডিয়া ছিল। কিন্তু এটাকে কেউ বড় একটা আমল দিল না। হিন্দু মহাসভা, শ্যামাপ্রসাদ ও কংগ্রেস কর্মীদের সোরগোলে ও বিশেষ চেষ্টায় বঙ্গ বিভাগই হল। পূর্বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হল—দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এক জনসমষ্টিকে রাতারাতি পৃথক করল।

বাঙ্‌লা তথা ভারত বিভাগের এই হল রাজনৈতিক ইতিহাস। বিভেদ, বিরোধ, বিদ্বেষ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূট কৌশল এরই যূপকাষ্ঠে বলি সাধারণ মানুষ।

হতচকিত সকলেই, বিশেষ করে জনগণ। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর স্রোত এল পূর্ববঙ্গ থেকে। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান, অন্যদিকে খণ্ডিত বাঙ্‌লা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান। বাঙ্‌লার অঙ্গচ্ছেদ হল রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে। একই ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে দুটুকরো করার চেষ্টা হল প্রথম থেকেই। আবহমানকালের বাঙ্‌লার হৃদয়কেই যেন ভেঙ্গে দুটুকরো করা হল। লর্ড কার্জনের সময় যে ব্যভিচারকে রোধ করা গেছল, এবার আর তা সম্ভব হল না। দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। বিবদমান রাষ্ট্র, বিজাতীয় রাষ্ট্র, বিধর্মী রাষ্ট্র। রাতারাতি বিভক্ত হলাম আমরা—জনসাধারণ, শুধুমাত্র শাসকের স্বার্থে। ধর্মের জিগির হচ্ছে পাকিস্তান জন্মের মূল ভিত্তি এবং দুটি স্বতন্ত্র ভাষা-ভাষী জাতির তথাকথিত একমাত্র ঐক্যসূত্র। শাসকগোষ্ঠী দেখল সেই ধর্মকে অহিফেন করে তুলতে না পারলে, ধর্মের ব্যবসা না চালালে

পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। মুহম্মদ আলী জিন্না ও তাঁর চেলাদের ধর্মের চোরাবালির উপর নির্মিত পাকিস্তানের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা জানা কি ছিল না?

সে যাক। কিন্তু পূর্ব বাঙ্‌লার সঙ্গে গভীরতর যোগ পশ্চিম বাঙ্‌লার। সে যোগ আত্মার—বহু যুগ যুগান্তের। ভাষাসাহিত্য, শিক্ষাদীক্ষা, পোষাকআষাক্, রুটি রোজগারের প্রাচীর তুলে দিলেই কি একদিনে বদলে যাবে? মনের ও সংস্কৃতির যোগাযোগ এইভাবে বিচ্ছিন্ন করা কি যায়? ইতিহাসের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে সফল হতে পারল কি সংস্কৃতির দস্যুরা?

অমিল যা তা ধর্মীয় আচারের। তার মধ্যেও সাধারণ জনগণ সেতুবন্ধন করেছিল। পীরদর্গা, ওলাবিবি, সিন্নিমানতের কথা ছেড়েই দিলাম। বড় আদর্শ বড় কৃষ্টি নিয়ে দেখলেও, আধুনিক যুগে জীবনযুদ্ধে মানুষ যখন বিপর্যস্ত, ধর্মের প্রকোপ তখন প্রতিদিন ক্ষীয়মান। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে পাকিস্তান স্রষ্টারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ইসলামভিত্তিক একটি অভিনব সঙ্কর সংস্কৃতির জন্ম দিতে চাইলেন। তার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আগের সমস্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অস্বীকার করার—তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তোলার। ভবি ভুলল না। না জেনে না বুঝে চরমতম বেদনার স্থানে আঘাত করে বসলেন ওঁরা। নতুন ছাঁচে ফেলে সাধারণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার বদমায়েশী দুশ্চেষ্টা ফানুষের মতই মিলিয়ে গেল তাই।

মধ্যপন্থী কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী ভেবেছিলেন ইসলামের নামে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মিত হয়েছে, সেই ইসলামকে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। তাঁরা ফাঁক ও ফাঁকিটা ধরতেপারলেন না। ইসলামের নামে যে একদল পুঁজিপতি শোষণ করতে নেমেছে এটা বোঝা খুব কঠিন না হলেও ধর্মীয় উন্মাদনা খুব সহজেই সবকিছু আচ্ছন্ন করে দিতে পারে। এঁদের বেলায় হয়েছিল তাই। কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী দৃঢ়ভাবে এই ধারণা আঁকড়ে থাকলেন। সাময়িকভাবে কেউ কেউ এর শিকার হলেও পরে বুঝতে পারলেন এবং তখন দৃঢ়চিত্তে তার প্রতিবাদ জানালেন। এসম্বন্ধে পূর্ব বাঙ্‌লার বোধহয় সবচেয়ে সাহসী সংস্কৃতি সেবী বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ে মুসলমানদের 'তাহজীব', 'তমদ্দুন' ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণার অবর্তমানে কেউ এ সবের দ্বারা মনে করল কোর্মা, পোলাও, কোফতা ও গরু খাওয়ার স্বাধীনতা।[1] এছাড়া ভাবনাটা আরও বিভিন্নভাবে এগুলো। কিন্তু

[1] বদরুদ্দীন ওমর—(১৯৭১) পূর্ব বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা।

কিছুদিনের মধ্যেই এই কৃত্রিম তাহজীব ও তমদ্দুনের নির্ণীয়মান গজদন্ত মিনার ভেঙে পড়ল, কেননা মিথ্যা ও প্রোপাগাণ্ডার চোরাবালির উপর ভিত্তি করে তা গড়ে উঠেছিল। এর বদলে বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বাস্তব সমাজকে, অর্থনৈতিক জীবনের সত্যকে জানলেন, তাঁরা একাত্মবোধ করলেন অগণ্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

এই বুদ্ধিজীবিগণ ও সংস্কৃতি সেবকগণ সকল উদ্ধত খড়্গাঘাত থেকে রক্ষা করেছেন বাঙ্‌লা সংস্কৃতিকে এবং ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন আপনাদের আসল সাংস্কৃতিক আদর্শকে। সেই আদর্শে বাঙ্‌লার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্‌লা ভাষা সাহিত্য ও সঙ্গীতের অবদান আছে, বাঙলার সমগ্র উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্যের স্বীকরণ আছে, এমন কি স্ব স্ব ধর্মীয় ভাবও বোধহয় অবর্তমান নেই। পূর্ব বাঙ্‌লার মানুষরা নতুন করে বাঙ্‌লা ভাষার সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করলেন। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের হল পুনর্বাসন। আসলে মনে হয়, পূর্ব-বাঙ্‌লার সাহিত্য সবচেয়ে বেশী inherit করেছে বিদ্রোহী মধুসূদনকে, তার উপযুক্ত শিষ্য (বিদ্রোহী বলেই) নজরুলকে। কিন্তু অপরাপর পূর্বসূরীরাও আপন মহিমায় সেখানে অধিষ্ঠিত। বাঙালী জাতীয়তাবাদ গঠনে পূর্বসূরীরা মৃত্যুর পরপার থেকেও যেন আশীর্বাদ ও নির্দেশ পাঠাচ্ছেন।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা কী দাঁড়াল ?

বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান, বিশেষ করে সামন্ত-তান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মনে করতে পারেননি কখনোই। অনেকটা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত ছিল তাঁদের অবস্থা। এই একটা কারণের জন্যই বোধকরি এদেশের সংস্কৃতিতে মুসলমানদের সমানুপাতিক অবদান দেখা যায় না। এ মানসিকতা ছিল ধর্মভিত্তিক। উর্দু ফার্সীতে কথা বলতেন, নিজেদের জাতিগত-ভাবে মনে করতেন আরব, ইরাণী, তুর্কী প্রভৃতি। ধর্মের ভাষাও ছিল আরবী ফার্সী।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরই কিন্তু এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। এর আগে বাঙ্‌লা মাতৃভাষা স্বীকার করলে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত, নাজেহাল হতে হত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান "মুসলমান বাঙালীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করল"[১] এবং ইতিহাসের এই জটিল মুহূর্তে উর্দুকে একদম বাতিল করে দিয়ে বাঙ্‌লাকে নিজের মাতৃভাষা মর্যাদা দিয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করল।

১. বদরুদ্দীন ওমর (১৩৮০)—সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িকতা। মওলা ব্রাদার্স, ৩১ বাঙ্‌লাবাজার, ঢাকা—১।

কিন্তু কী ভাবে? কোন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় এত অল্প সময়ে এই অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল?

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী খুব বেশী দিনতো নয়। তাই বা বলি কেন, তার আগেই, পাকিস্তানের প্রায় জন্মলগ্নেই ভাষার প্রশ্নে পূর্ববঙ্গের মানুষ আশ্চর্য রকম সংবেদনশীল।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র চরিত্রই এজন্য মূলতঃ দায়ী। পাকিস্তান কি সত্য অর্থে ছিল ধর্মীয় আন্দোলন? ধর্ম ছিল সুগার কোটিং—সাধারণ সরল মানুষদের দলে টানবার জন্যই। মূলতঃ মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলন। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে জনগণ দেখল ইসলামের রাজত্ব কোথায়? এতো বুর্জোয়ার রাজত্ব!

পূর্ববঙ্গের প্রতি কতখানি বিমাতৃসুলভ বিষম আচরণ করা হয়েছিল এবং কেন্দ্রের শোষণের প্রকৃতি পরিমাণই বা কি ছিল এইবার তার যৎকিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা বিধেয়। অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যল্প কালের মধ্যে দেউলিয়াপনায় এসে দাঁড়িয়েছিল দেশের।

সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ। কাজেই কেন্দ্রের উচিত অর্থ ও রাজস্বের ৫৬ ভাগ পূর্ববঙ্গের জন্য খরচ করা। কিন্তু তা হয়নি কখনও। সিংহ ভাগ ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫২৮ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৫১০ কোটি টাকা, ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য ১১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ হিসেব করলে দাঁড়ায় পূর্ববঙ্গের জনগণ মাথাপিছু পেল ৯০ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু পড়ল ১৩৮ টাকা।

পাকিস্তানের বেশীর ভাগ মানুষ পূর্ববঙ্গে বাস করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজধানী হল করাচী পরে ইসলামাবাদ। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান হবার শুরুতেই ভারত ছেড়ে আশ্রয় জমিয়েছিলেন আদমজী, ইসপাহানী, দাউদ, সায়গল, হাবিব, দাদা প্রভৃতি পুঁজিপতিরা। সে তুলনায় পূর্ববঙ্গে পুঁজিপতি বলতে কেউ ছিলেন না। পূর্ববঙ্গে এ সুযোগ নিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিবৃন্দ। লুঠের জায়গা পাওয়া গেল ভাল। যেসব স্বল্প শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী হল, তাদের মালিক হলেন পূর্বোক্ত শিল্পপতিরা! পূর্ববঙ্গ হল তাঁদের বাজার বিশেষ। এক পাট-শিল্প ছাড়া। অন্য কোন শিল্প সংগঠিত হয়নি বলা চলতে পারে।

পুঁজিপতিদের শোষণ তো অব্যাহত ধারায় চলল। সাধারণ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

এবার অন্যরকম শোষণ ও বঞ্চনার কথা।

(অ) শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা গেল, পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়ে যাচ্ছে :

I. শিক্ষিতের সংখ্যা

১৯৫১	ম্যাট্রিকুলেট	গ্রাজুয়েট	পোষ্টগ্রাজুয়েট
পূর্ব বাঙলা	২,৮২,১৫৮	৪১,৪৮৪	৮,১১৭
পশ্চিম পাকিস্তান	২,৩৯,৬৯৮	৪৪,৫০৪	১৪,৭২৯

১৯৬১			
পূর্ব বাঙলা	২,৯৯,৭৬৭	২৮,০৬৯	৭,১৪৬
	(+৬.৩)	(−৩২.৩৩)	(−১২)
পশ্চিম পাকিস্তান	৫,৭৪,১৮১	৫৪,০০০	১৪,৩২৪
	(+১৪৩ ৭)	(+২১.৩)	(+৬৮)

[ ] বন্ধনীর মধ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাসের হার দেখান হয়েছে।[১]

II. স্কুল কলেজ

	সরকারী স্কুল	মোটকলেজ	সরকারী কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়
পূর্ববঙ্গ	৯০	২২৫	৩১	৪
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৩৫	২৭৫	১১৪	৫[২]

III. বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ব্যয় লক্ষ টাকার অঙ্কে

	পূর্ববঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান	অনুপাত
১৯৫৪—৬৩ দশবছরে	১৯১	৭৬২	১ : ৪[৩]

---

১. Adopted from Jayanta Roy : Democracy & Nationalism on Trial. Simla (1968)

২. A case for Bangladesh—C. P. I. Publication ; Delhi (1971)

৩ অমিতাভ গুপ্ত (১৩৭৬) : পূর্ব পাকিস্তান, কলকাতা ।

IV. একটি সমশ্রেণীর টেকনিক্যাল পরীক্ষার ফলাফল—

	ঢাকা	করাচী
মোট পরীক্ষার্থী	১৪০	১২৭
উত্তীর্ণ	১০০	১২৭
অনুত্তীর্ণ	৪০	০
প্রথম শ্রেণীতে	১২	১২৬[১]

[illegible]

I. মোট পদ	বাঙালীদের অধিকারে	শতাংশ
২,০০,০০০	২০,০০০	১০[২]

II. দপ্তর অনুসারে	বাঙালীর শতকরা হার
(ক) প্রেসিডেন্টের দপ্তর	১৯
(খ) প্রতিরক্ষা	৮·১
(গ) শিল্প	১২·৭
(ঘ) স্বরাষ্ট্র	২২·৫
(ঙ) শিক্ষা	১৭ ৩
(চ) তথ্য	২০·১
(ছ স্বাস্থ্য	১৯
(জ) কৃষি	২১
(ঝ) আইন	৩৫
(ঞ) পাবলিক সার্ভিস কমিশন	৩·৫

III. বৈদেশিক চাকরি

পদ	বাঙালী	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রদূত ও অফিসার	৫৮	১৭৯
দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী	৪৮	১৯৬[৩]

---

১. Adopted from Jayanta Roy : Democracy & Nationalism on Trial—Simla (1968)

২. Adopted from Asit Bhattacharya : Pakistan Elections, Calcutta, (1970).

৩. Adopted from Amitabha Gupta, Purba Fakistan, (1970)

(ই) উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ—কোটি টাকার অঙ্কে :

	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৬০-৬৫		তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৬৫-৬৮	
	পূর্ব বঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব বঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান
I. সরকারী সেক্টর	৫০১·৭	৫৬৯·২	৬৩৭·৭	৫৮৮·৬
II. বেসরকারী সেক্টর	৪০০	৭৫০০	২৬৯·৫	৯৫৫·৫[1]

(ঈ) ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী :

	ব্যাঙ্ক	বীমা	বীমা কোম্পানীর লগ্নীকৃত টাকা (কোটিতে)
পশ্চিম পাকিস্তান	১৬	৩০	২৬
পূর্ববঙ্গ	২	৩	২[2]

(উ) রফতানি আমদানি

I. রফতানি—হাজার টাকার অঙ্কে

	পূর্ববঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭—৫২	৪৫, ৮১, ৫৯৬	৩৭, ৪৫, ৯০৬
১৯৫২—৫৭	৫৮, ৬৯, ৭৬৬	৩৪, ৪০, ৩৭১
১৯৫৭—৬২	৫৫, ০৮, ৩৫৫	২৭, ২৪, ১৬৯
১৯৬২—৬৭	৬৯, ২২, ৬৯০	৫৭, ৫৪, ৩৬৮
মোট ২০ বছর	২০৯, ৮২, ৩৯১	১৫৭, ০৪, ৭১৪

II. আমদানি

	পূর্ব বঙ্গ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭—৫২	২১, ২৮, ৬২৮	৪৭, ৫৮, ৯২৩
১৯৫২—৫৭	২১, ৫৯, ৫৫২	৫১, ০৫, ০৯৩
১৯৫৭—৬২	৩৮, ৩১, ৯২৪	৮৫, ৫৪, ১৭০
১৯৬২—৬৭	৭০, ৬৩, ৬৯২	১, ৫৯, ৬০, ০২৫
২০ বছর	১৫১, ৮৩, ৯৭৬	৩৩৩, ৪৪, ২১১[3]

১. হাসানমুরশিদ : বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, (১৩৭৮) কলকাতা

২ হাসানমুরশিদ : বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, (১৩৭৮), কলিকাতা,

৩. Adapted from A case for Bangladesh, P.—17

C. P. I. Publication, New Delhi (1971)

III.	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন	আমদানি করতে দেওয়া হয়েছে (কোটি টাকায়)	মতামত
পূর্ববঙ্গ	২০৯৮	১৫১৮	সম্ভব হয়েছে পূর্ববাঙ্‌লার উপার্জিত ৫০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করে এবং বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ আপন কাজে লাগিয়ে।
পশ্চিম পাকিস্তান	১৫৭০	৩৪৩৪	

(ঊ) অর্থনৈতিক অবস্থায় বৈষম্যের হার :

I.		
	১৯৫০	১৮%
	১৯৬০	২৫%
	১৯৬৫	৩১%
	১৯৭০	৪৮%

II. আরও কিছু পরিসংখ্যান

	মাথা পিছু আয় বছরে	ভূমিহীন কৃষক শতকরা
পূর্ববঙ্গ	৩৫০ টাকা	১৭.৪৫
পশ্চিম পাকিস্তান	৬০০ টাকা	৮.০৫ জন

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে শিক্ষা, চাকুরী, উন্নয়নকার্য, রাজস্ববণ্টন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বৈষম্য পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানে।

যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে, এই বৈষম্য ও বঞ্চনা তাঁদের কাছে অচিরেই ধরা পড়ে যায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাঁদের কাছে মূল্যহীন মনে হয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব দিয়ে একে আর চাপা দেওয়া কোন মতেই সম্ভব হয় না। শোষকদের মুখোস খসে পড়ে। বল্গাহীন অপশাসনের সঙ্গে এসে মেশে হুমকী—ওরা হাত বাড়ায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে। তাহলে আরো বোকা বানানো যাবে, প্রতিবাদ করবার থাকবে না কেউ।

কিন্তু ওরা কি অতই শক্তিধর? ইতিহাসের ধারা পাল্টানো কি এতই সোজা? ওরা খেলছিল ব্যুমেরাং নিয়ে। এর পরিণতি—একে টিকিয়ে রাখতে

হলে ইসলামের জিগির তোলা দরকার এবং সেটাই সোজা, শাসনকর্তাদের মনে হল, সেটাই হবে অধিক কার্যকর। তাই উর্দু চালাবার চেষ্টা জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ববঙ্গের ঘাড়ে। এই মোটা চাল কিন্তু ধরা পড়ে গেল, তৌহিদবাদ ও ইসলামী তমদ্দুনের প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির ধাক্কা ধোপে টিকল না।

সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতার মোহ এবং কুহকাবরণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের কাছে।

উর্দু‌ওয়ালারা যুক্তি দেখিয়েছেন অনেক। কিন্তু বদ যুক্তি। প্রথম যুক্তি ছিল কেন্দ্রের যে ভাষা প্রচলিত, পূর্ববঙ্গে তা' না হলে রাজনৈতিক ও কৃষিগত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। অভিন্ন রাষ্ট্রের অভিন্ন ভাষা।

কিন্তু সেটা সম্ভব কী করে? সব বাঙালীকে উর্দু শেখানো যাবে না। ইতিহাসেও এর নজীর নেই। আরব ও ইরাণের মধ্যে তৃতীয় দেশ না থাকলেও, মুসলিম আরবরা ইরাণ দখল করলেও ইরাণের ফার্সী ভাষাকে দমানো যায়নি। তুর্কের বেলাতেও তুর্কী ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হয়েছিল। পাঠান মোগল এবং পরাক্রান্ত ইংরাজ যুগে দেশী ভাষাগুলি—হিন্দী বাঙ্‌লা লুপ্ত হয়ে যায়নি।

আরও যুক্তি ছিল। উর্দু না শিখলে কেন্দ্রের বড় বড় চাকরী পাবে না, কেন্দ্রে গিয়ে বক্তৃতা দিতে পারবে না। এ সবই হাস্যকর। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করলে তার অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব সেটাই আধুনিক রীতি। চাকরীর পরীক্ষা নিজ নিজ ভাষায় হতে পারে। কেন্দ্রের হুকুম ফরমান এলে কী হবে? তার জন্যেও অনুবাদের ব্যবস্থা থাকতে পারে।

উর্দু চালানো গেলে যে টাকার দরকার তা শিক্ষাখাতে ব্যয় করা অসম্ভব—অন্য সব ছেড়ে উর্দু শেখাতে হবে। আর এজন্য বাঙালী শিক্ষকদের চাকরী যাবে। এর জন্যই কি পাকিস্তান? মাতৃভাষা ছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক, মগজে ঢুকবে কি? পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে লেখার গ্রন্থকার জুটবে কি করে? উর্দুর ছাপাখানা, কম্পোজিটর, প্রুফরীডার কোথায়? বাঙ্‌লা প্রেসগুলোর হবে কি? শৈশিক্ষার হাল কিহবে?

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যভাষা জবরদস্তি ঘাড়ে চাপালে কী হয় ইতিহাসে তার নিদর্শন আছে। পোপের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য লাতিন যখন জগদ্দল পাথরের মত ইউরোপের জনমানসে চেপে বসেছিল, তখন তার থেকে মুক্তির জন্য লুথার প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মের মত নবীন সংস্কার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। জার্মানীতে বা রুশদেশে ফরাসী ভাষা এইরকম নাগপাশ রচনা করেছিল—যার থেকে মুক্ত হতে দেশ দু'টির অনেক বৎসর লেগেছিল। যুক্তি হল, বাঙ্‌লা হিঁদুয়ানী ভাষা। কিন্তু

খাঁটি হিন্দু ভাষা কি বাঙ্‌লা? বরং বাঙ্‌লা ভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।[১] বলতে গেলে বৌদ্ধ চর্যাপদ দিয়ে বাঙ্‌লাভাষায় লিখিত রূপ শুরু। বৈষ্ণবধর্মকে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েই দিতে হয়েছিল প্রচলিত সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে। এই বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হয়েছিল বাঙ্‌লায়। কেচ্ছা সাহিত্য নিশ্চয়ই হিন্দু ঐতিহ্যে গঠিত হয়নি। রামায়ণ মহাভারতের বাঙ্‌লা অনুবাদ প্রকাশে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন মুসলমান নবাবগোষ্ঠী।

যুক্তি ছিল, কেন্দ্রের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের হৃদ্যতা বাড়বে ভাষা এক হলে। কিন্তু ভাষা এক হলেই হৃদ্যতা বাড়ে কি? তা হলে আমেরিকানরা ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল কেন? আইরিশম্যান ইংরাজদের বিপক্ষে লড়েনি? পক্ষান্তরে সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া, চীনদেশে বহুভাষাকে কীভাবে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে?

ইত্যাদি সমস্ত যুক্তিই অসাড়। আসলে শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানে আরো অনেক ভাষা আছে। অন্যান্য ভাষা বাদ দিয়ে পড়ল বাঙ্‌লাকে নিয়েই। এও কম অদ্ভুত নয়।

নানান বদ মতলব। চেষ্টা করা হল বিদেশী শব্দ বিশেষ আরবী ফার্সীতে বাঙ্‌লা ভাষা বোঝাই করতে। কিন্তু শিক্ষা, গবেষণা আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে এর কোন প্রয়োজন ছিল না। মূঢ়তাপ্রসূত এ প্রচেষ্টা।

হরফ পরিবর্তনের আওয়াজ তোলা হয়েছিল ১৯৪৭ সালেই, তুলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। বাঙ্‌লা হরফ বাদ দিয়ে আরবী হরফের সুপারিশ করা হয়। কারণ, বাঙ্‌লা দেবনাগরী, কাজেই হিন্দু হরফ। অর্থাৎ কিনা ভাষারও ধর্মান্তর করার চেষ্টা! কেউ কেউ আবার 'অবৈজ্ঞানিক' বাঙ্‌লা হরফের বদলে 'বৈজ্ঞানিক' রোমান হরফ পরিবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনের চমৎকার ল্যাবরেটরি পেয়েছিলেন বাঙ্‌লা ভাষাকেই!

এসব সহ্য করল না শিক্ষিত সমাজ এবং দেশের এক বিরাট প্রভাবশালী অংশ। ১৯৪৮ সালে রুখে দাঁড়াল তারা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এটি পূর্ববঙ্গে। হরফ সংস্কার ধামাচাপা পড়ল সাময়িকভাবে।

'৪৮-এর আন্দোলনের পর ঐ প্রশ্ন উঠল আবার। ১৯৪৯ সালে মৌলানা আক্রাম খানের সভাপতিত্বে যে কমিটি হল, তার অন্যতম দায়িত্ব ছিল হরফ সংস্কার প্রশ্ন বিবেচনা। ১৯৫০-এ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। কিন্তু তা চাপা থাকে। প্রকাশ পায় ১৯৫৮ সালে।

---

১. সৈয়দ মুজতবাআলী (১৯৭০): পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। নবজাতক প্রকাশন, ৬ নং এণ্টনী বাগান লেন। কলিকাতা-৯

কী ভীষণ উদ্বেগ ভাষার জন্ম ! হিন্দু ও সংস্কৃতের প্রভাব তাড়াতে হবে। এর জন্য বাক্যরীতি বর্জন বা বিসর্জন করে ইসলামী ভাব ঢোকাতে হবে, যেমন 'আমি তোমায় জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না' এর বদলে হবে 'আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না।'

বাঙ্‌লা ভাষা নাকি সরল নয়। সহজ করতে হবে। উদাহরণ—'মাসের পরিসমাপ্তিতে ঋণ শোধ করিব' এর বদলে বলতে হবে 'মাস কাবারিতে দেনা বা করজ আদায় করিব।'

বাঙ্‌লা হরফ অবৈজ্ঞানিক। টাইপ রাইটারে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই অক্ষর বর্জন করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সুপারিশ অনুযায়ী বাদ দিতে হবে ঙ, ঈ, ী, ঊ, ূ, ঋ, ঐ, ঔ, ৈ, ৌ, ঞ, জ্ঞ, ক্ষ ! এবং এই ধরনের আরও কিছু কিছু। না হলে নাকি শিশুদেরও হরফ শিক্ষার অসুবিধা হবে। ভাষার উপযোগী করে যন্ত্র সৃষ্টি নয়—যন্ত্রের উপযোগী করে ভাষা সৃষ্টি করতে হবে। আর শিশুরা এতকাল বোধহয় বাঙ্‌লা ভাষা শেখেনি !

চক্রান্ত নানা দিক দিয়ে। সরকার থেকে গঠন করা হল একটা টেকস্‌ট বুক কমিটি। এসব রচনা করল দালাল বুদ্ধিজীবীরা—সহজেই যাদের পয়সা ছড়িয়ে কিনে নেওয়া যায়। এক এক শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটি মাত্র টেকস্‌ট বুক পাঠ্য হিসাবে গণ্য হল। এর বিষয়বস্তু বড় অদ্ভুতভাবে ইচ্ছে করেই চয়ন করা হয়েছিল। প্রথম রচনা ইসলাম ও পয়গম্বর নিয়ে। বলা বাহুল্য ইসলামী মাদ্রাসা মক্তবেও এরকম কখনো ছিল কিনা সন্দেহ। সব ধর্মাবলম্বীকেই এ পড়তে হবে। দ্বিতীয় রচনা পাকিস্তান নিয়ে। সেখানে বলা হচ্ছে পাকিস্তান মুসলমানদের পবিত্র 'ওয়াতন'। শেখান হতে লাগল হিন্দুরা শত্রু—তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে পাকিস্তান (ইংরাজরা ?), ভারতকে সব সময় বলা হয়েছে হিন্দুস্তান। সরকারী প্রচার যন্ত্রেও এইভাবেই বলা হতে থাকল। ছাত্র-ছাত্রীরা আরও শিখল, নজরুল দরিদ্র বলেই রবীন্দ্রনাথ হতে পারেননি। যেন প্রতিভা ধনী গরীব হবার উপর নির্ভর করে। নজরুল অসুস্থ হয়ে না পড়লে এবং রবীন্দ্রনাথের মত বেশীদিন কর্মক্ষম থাকলে তাঁর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যেত। এত বিদ্বেষপরায়ণ এসব দালাল যে প্রতিভার ক্ষেত্র যে এক নয় এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দুজনের অবদানই যে বাঙ্‌লা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে, এই সাদামাটা কথাটাও শিশুমন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হল।

দেখা যাচ্ছে ১৯৪৭ থেকে পূর্ববঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি। কিন্তু এর ফল কী হয়েছে ? বজ্রআঁটুনি দিতে গিয়ে গেরো ফস্কা হয়ে গেছে।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সালে যা ঘটেছে, তাতে বলা চলে ভাষার প্রশ্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রূপ নিল রাজনৈতিক আন্দোলনে। এর মূলে সেই একই বিশ্লেষণ—রাষ্ট্রচরিত্র—স্বাধীনতার আগে যে স্বর্গীয় চিত্র অঙ্কিত করেছিল পাকিস্তানের স্রষ্টিকর্তারা, তার দৈন্যদশা অচিরেই প্রকট হয়ে পড়ল, পাকিস্তানের স্বরূপ বোঝা গেল, শোষণ শাসন অব্যাহত রইল—নিজদেশে পূর্ববাঙলার মানুষ হল পরবাসী।

এই শঠতা, শোষণ এবং বঞ্চনা অতিষ্ঠ করে তুলল মানুষকে। সহ্যসীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা এমন মুহূর্তে। বারুদে আগুন লাগল। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় এটি বলা যেতে পারে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু খুনই ঝরল না ঢাকার রাজপথে। আবুল-সালাম-বরকত শহীদ হলেন যে শুধু তাই নয়, আন্দোলন শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের রূপ নিল!

কাজেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন হয়েছিল বলেই পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তাদের পৃথক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রূপ দেবার জন্যই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, এই বিশ্বাস আর রইল না—এর ভিত্তি-ভূমিই ধ্বসে গেল।

এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর হিন্দু সংস্কৃতির ভয় কোথায়? এইজন্যই সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্যে থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত মনোভাব অনেক পরিমাণ বিদূরিত হল। সাম্প্রদায়িকতার উপরে উঠে খোলামন নিয়ে তাঁরা সবকিছু বিচার করতে চাইছেন। স্বাদেশিকতার নতুন এক আহ্বান শুনতে পেয়েছেন তাঁরা। নতুন এক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বাঙলা ভাষাই এই জাতীয়তাবোধ, ঐক্য ও সংহতি এনে দিয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এইভাবেই পূর্ববঙ্গের মানুষের মনে জেগে উঠেছে নবমূল্যবোধ।

এর সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচার। নানা ধারা বেয়ে, নানা পথে, নানা কায়দায়। বলা হতে লাগল রবীন্দ্রনাথ হিন্দুদের কবি—হিন্দু সংস্কৃতির কথা আছে তাঁর কাব্য-কবিতায়। ফলতঃ, সবদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্য সাহিত্যের বিরোধিতা করে বাঙলা সংস্কৃতির বিরোধিতা করা হতে লাগল। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মাইকেল সবাইকে মুছে ফেলার চক্রান্ত চলতে লাগল, বঙ্কিমের বদলে দাঁড় করানো হল মীর মোশাররফ হোসেনকে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হলেন নজরুল। মীর মোশাররফ যদি বেঁচে থাকতেন এবং নজরুল যদি প্রকৃতিস্থ থাকতেন তাহলে তাঁরাও অট্টহাসি হেসে উঠতেন বালখিল্যদের এই সাহিত্য সংস্কৃতির অমল বেদীর উপর অনর্থ অনাচার চপলতা দেখে।

এমনকি ভারত থেকে বই আমদানী বন্ধ করা হল। এত ভয় ওখানকার শাসকদের। টেকস্‌ট্‌ বইয়ের মধ্যে দিয়েও রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে হেয় করার চেষ্টা করা হল।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করে দেওয়া হল ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে। এইভাবে মনে করা হল, একজনকে খতম করলে পরে পরে বাঙ্‌লা সাহিত্যের রথীমহারথীদেরও খতম করা যাবে একে একে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের দিগঙ্গন থেকে।

সীমাহীন স্পর্ধা কতদিন চলতে পারে? সত্যকার বুদ্ধিজীবীরা কতদিন দাসত্বের শৃঙ্খল পরে থাকতে পারেন? পূর্ববঙ্গ সেরকম নরম মাটি নয়—সেখানকার বুদ্ধি-জীবীদের মানসে দৃঢ়তা, সাহস, বল আছে, আছে সংগ্রামী চেতনা। কাজেই সাম্প্র-দায়িক এবং রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচারে সৈয়দ সাজ্জাদ হুসেন, মহাম্মদ শাহাবুদ্দীন, মুহাম্মদ মুনিম-এর মতো শিক্ষক, তালিম হোসেন, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, ফররুখ আহমদ ও আহসান হাবীবের মত কবি এবং কিছু গায়ক বাদক জুটলেও এঁরা জনমতকে এবং অধিকসংখ্যক সংগ্রামী বুদ্ধিজীবীকে নিরস্ত করতে পারলেন না—রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন নবজন্ম লাভ করলেন ওদেশের মাটিতে, একটি জাতিকে সংহত করলেন বাঙ্‌লার ঐ কবি ও সাহিত্যিকগণ। ওঁরাই হলেন পূর্ববঙ্গের বাঙালী জাতির ভগীরথ। একটি স্বাধীন অথচ শোষিত জাতির ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত স্মরণীয় কাল। সমগ্র পৃথিবীতে এমনটি হয়েছে কী না সন্দেহ— সাহিত্য একটি জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে, প্রাণ দিয়েছে নতুন করে, নবজন্ম হয়েছে তার। সেই সন্ত্রাসেরই রাজত্বে বসে, অমর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাহীনতায় ভূষিত হবার কথা জেনেও, প্রাণের ভয় আছে ভেবেও যেসব সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী নির্ভয়ে সরকারের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের ইতিহাসে অক্ষয় আসন থাকবে। এঁদের মধ্যে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবদুল হাই, প্রফেসর সরওয়ার মুরসেদ, ডঃ আহম্মদ শরীফ, নীলিমা ইব্রাহিম, ডঃ আনিসুজ্জামান প্রমুখ শিক্ষক এবং ডঃ কুদরতই খুদা, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, বদরুদ্দীন ওমর প্রমুখ বুদ্ধিজীবী।

কিন্তু দুই বাঙ্‌লার কাব্যসাহিত্য যে জীবনকে প্রতিফলিত করেছে, তার মধ্যে এই সময়ে আমরা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে গভীর সাযুজ্য খুজে পাই। পরস্পর পরস্পরকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত করছে এই মনে হয়।

অবিভক্ত বাঙ্‌লার কাব্যসাহিত্য একটি দৃঢ় পরিণতির দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের জাগরণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বাঙ্‌লা সাহিত্যে। সংস্কৃতিতে নতুনতর জোয়ার। বাঙ্‌লা

সাহিত্যে শতপুষ্প মঞ্জুরিত। রবীন্দ্রনাথ একাই ম্লান করে দিয়েছিলেন সকলকে। যদিও অপূর্ণতার সুর, জনগণের একান্ত আপন না হবার সুর তাঁর নিজের কণ্ঠেই। তাঁকে অতিক্রম করবার যে চেষ্টা করেছিলেন কল্লোলগোষ্ঠী কেউ কেউ কোন কোন বিশিষ্ট দিকে সার্থকও হলেন কিছুটা। মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলেন বন্দে আলী মিয়া, গোলাম মোস্তাফা, আবদুল কাদির, বেনজীর আহমদ, মহীউদ্দীন, কাজী কাদের নওয়াজ, সুফী মোতাহের হোসেন, আজহারুল ইসলাম, রওসন ইজদানী, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ। শামসুর রহমান, আতাউর রহমান প্রভৃতি তরুণ কবিরা তখন সবে কবিতা লেখা শুরু করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শূন্যতা নেমে এলেও সাহিত্যের গতিপথ পশ্চিমবঙ্গে থেমে থাকেনি—বস্তুতঃ তা সম্ভবও ছিল না, সেই দারুণ গতিশীল দিনগুলিতে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে ও কাব্যে এসো নানান ধরনের বিদ্রোহ। নজরুল এবং সুকান্ত সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করলেন। এই পথ ধরেই এসেছিলেন বিষ্ণু দে। দিনেশ দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিমল ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মানবতাবাদী কবির কবিতায় সমসাময়িক যুগ ও জীবন প্রতিফলিত। এক একটি নতুন দিগন্তের আবরণ উন্মোচনে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ কবিরা তন্ময় তাঁদের সাধনায়। সব থেকে বড় বিস্ময় চিত্ররূপময় কবি জীবনানন্দের নতুন মূল্যায়ন। বিষ্ণু দে এলিয়টের অনুগামী হয়ে পড়লেন, তাঁর কাব্য সাধারণের কাছে থেকে কিছুটা দূরে সরে গেল, দুরূহতায় আচ্ছন্ন হল, যদিও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ছাপ রইল সে বুদ্ধিদীপ্ত কবিতাবলীতে। বুদ্ধদেব বড় বেশী দেহবাদী হয়ে পড়লেন, কখনও মাতলেন মালার্মে নিয়ে, তবুও আশ্চর্য ক্ষমতা, সুন্দর দীপ্তিতে উজ্জ্বল তাঁর কবিতা, তবে গণমুখীন আর তেমন রইল না। প্রেমেন্দ্র মিত্র থাকতে চেয়েছেন মানুষের কাছাকাছি—সাধারণ মানুষ ও দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ—তাঁকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর ক্ষমতা অসীম—কবিতার জগৎ-এ তাঁর পদচারণ অনন্ত এবং নতুন স্বাদে তাঁর কবিতা উজ্জীবিত। তিনি গল্প এবং উপন্যাস জগতেও সাড়া জাগিয়েছেন। আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠলেন বাঙালীর প্রতিমুহূর্তের ঘরের কবি প্রকৃতি সচেতন বাঙ্‌লার রূপ মন্থনকারী জীবনানন্দ। দুই বাঙ্‌লার যেন তিনি প্রতীক।

এইসব আধুনিক কবিদের কাব্যকৃতি সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিদের গড়ে উঠল সশ্রদ্ধ মনোভাব। দেশ পৃথক হয়ে গেছে, কিন্তু ভাষা পৃথক হয়ে গেল না। যেতে পারত। সর্বনাশা যেসব সংস্কার চালু করানোর চেষ্টা হয়েছিল তাতে ওদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যদি সায় দিতেন, ধর্ম ও দ্বিজাতিতত্ত্বের টোপ যদি

গিলতেন, তাহলে যে বাঙলা ভাষার রূপ দেখতাম, তার আভাস পূর্ববর্তী আলোচনায় ভালভাবেই আমরা পেয়েছি। ভাষাসাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সে বলাৎকারের চেষ্টা মূলেই রুখলেন ওদেশের বুদ্ধিজীবী ও জনগণ জানপ্রাণ দিয়ে।

পাকিস্তান সৃষ্টির অত্যল্প কাল পরেই জবরদস্ত রাষ্ট্রশক্তিকে পরোয়া না করে এই যে বাঙলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির সূত্র ধরে এক হওয়া, লড়াই করা, এগিয়ে যাওয়া, এটা ভাষা ও সংস্কৃতির বজ্রদৃঢ় শক্তিরই পরিচয় বহন করে।

শুরু হল অভিনব অধ্যায়। দুই দিকে দুই বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে তুলেছে। মনে হয়, দুই বাঙলার হৃদয় যেন একটিই। একটি হৃদয় থেকে দুটি ধ্বনি উঠছে—'লাবডুপ', 'লাবডুপ'। তাৎপর্য একই—বেঁচে থাকা এবং বাঁচার মতই বেঁচে থাকা—সারস্বত প্রাণ-প্রবাহ যেন নিত্য বহমান থাকে—মানুষ যেন স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। এই কথাই দেখতে পাই এদেশের একটি কবিতায়—

বুকের মধ্যে স্বপ্নরা স্নান করে
শব্দ শোনে লাবডুপ লাবডুপ,
দুই বাঙলা তুলছে গড়ে রোমাঞ্চ অন্তরে
একটি হৃদয়, সবুজ সোনা রূপ!

দূরে থাকলেই চিনতে পারি
চিরটা কাল কেমন করে
সহ্য করব ছাড়াছাড়ি।
তুমি আছ, আমি আছি
অলীক প্রাচীর
তাই ভেঙ্গে চৌচির।

নিত্য বহমান
সারস্বত প্রাণ—
বেঁধেছে মন, পরায় রাখী, জুড়ায় হৃদয়,
তারি জন্যে কান্না ঝরে, কান্নাতো নয়,
বৃষ্টি পড়ে টাপটুপ, টাপটুপ।
দুই বাঙলার একটি হৃদয় তুলছে ধ্বনি
লাবডুপ লাবডুপ।[১]

---

১. অমিয়কুমার হাটি, 'দুই বাঙলা' পাক্ষিক দেহাত, ১লা আগস্ট, (১৯৬৯)।

১. নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় — বিপ্লবের সন্ধানে। ডি. এন. বি. এ. ব্রাদার্স, ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলি-৯।

২. বদরুদ্দীন ওমর — পূর্ববাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা-৯
সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (২য় প্রকাশ) অগ্রহায়ণ, ১৩৮০। মাওলা ব্রাদার্স, ৩১, বাঙ্‌লা বাজার, ঢাকা—১।

৩. হাসান মুরশিদ — বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি। (ভাদ্র-১৩৭৮)। সত্য আনন্দ প্রকাশন। মুজিবনগর, বাঙ্‌লাদেশ।

৪. সৈয়দ মুজতবা আলী — পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। নবজাতক প্রকাশন, ৬ এণ্টনী বাগান লেন। কলি-৯।

৫. আনিসুজ্জামান — মুসলিম মানস ও বাঙ্‌লা সাহিত্য (১৯৬৪) লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা।

৬. নরহরি কবিরাজ — স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্‌লা (১৯৫৭) ন্যাশানাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা।

৭. প্রমথ চৌধুরী — প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু মুসলমান (১৩৬০) বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

৮. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙ্‌লা সাহিত্য (১৩৬৭) বসুধারা প্রকাশনী, কলিকাতা।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৫৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা। দ্বি. সং, স্টুডেণ্ট ওয়েজ (১৯৬৪)।

১০. অন্নদাশঙ্কর রায় — লালন ও তার গান (১৩৮৫) শৈব্যা প্রকাশন। কলিকাতা—৭৩

১১. Jamaluddin Ahmed (ed) — Speeches and Writings of Jinnah. Vol. 1. (1946).

১২. C. F. Andrews & Girija Mukherjee — The Rise and Growth of the Congress in India. George Allen & Unwin, London (1938).

১৩. Anonymus — Mutiny of the Bengal Army (Red Pamphlet). London (1857).

১৪. Maulana Abul Kalam Azad — India Wins Freedom. Orient Longmans, Calcutta, Reprint (1959)

১৫. W. C. Banerjee — Indian Politics (1893)

১৬. J. N. Farquhar — Modern Religious Movements in India. Macmillian & Co. London (1924).

১৭. Ram Gopal — British Rule in India (1963). Asia Publishing House. London.

নির্বাচিত দলিলসমূহ

Select Documents on the History of India and Pakistan. vol. iv, Evolution of India and Pakistan, 1858 to 1947. Edited by C. H. Philips and others, London, 1962.

সহায়ক প্রবন্ধ ও পত্রিকা

আনিসুজ্জামান—"মুসলিম বাঙ্‌লার সাময়িক পত্র", সাহিত্য পত্রিকা, বাঙ্‌লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা শীত (১৩৭০)।

অমিয়কুমার হাটি—'দেহাত', পাক্ষিক পত্রিকা, ১লা আগস্ট, (১৯৬৯)।

তিন

পূর্বপাকিস্তানী (বাঙ্‌লাদেশের) কাব্য কবিতার মূল সুর

[পূর্ব-পাকিস্তানী (বাঙ্‌লাদেশ) কাব্য কবিতার মূল সুর, মূল সুরের আনুসঙ্গিক অন্যান্য অপ্রধান সুর, পূর্ববঙ্গের (বাঙ্‌লাদেশের) কবিতার প্রধান ও অপ্রধান সুরের প্রভাব ও প্রতিধ্বনি : নাটকে, কথা সাহিত্যে, সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের কাব্য ধারার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা।]

একটি জাতির জীবনকে কবিতা কতখানি অনুপ্রাণিত, উদ্বোধিত ও উদ্বেলিত করতে পারে, পূর্ববঙ্গ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সেখানে মনে হয় যেন কবিতার আর এক নাম জীবন, জাতির স্নায়ুমূল জুড়ে ব্যাপ্ত, প্রাণস্পন্দনে অভিসিঞ্চিত, প্রেরণার উৎসস্থল, জাগ্রত যৌবনের অগ্রদূত, আলোক পথের দিশারী।

পূর্ববঙ্গের কবিতা শুধু কবিতাই নয়, অগ্নিকান্তি প্রতিজ্ঞা, একটি দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ জাতির হৃদয়ের রক্তরঙীন প্রতিধ্বনি।

পূর্ববঙ্গের কবিতার মূল সুর জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই স্বদেশপ্রেমের অপরূপ মন্ত্রোচ্চারণে পরিশুদ্ধ, দীপ্ত দ্যুতিময়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, অন্ধকার থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার আনন্দ তার অঙ্গজুড়ে।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্ন সত্যই ছিল অন্ধকারাবৃত। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষময় সৃষ্টি। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সঞ্জাত। ক্লেদাক্ত এক রাজনৈতিক পটভূমিকায় হঠাৎ পঙ্কজের জন্ম—বুকের ধন ভাষা-মাতৃভাষা-মুখের ভাষা— মধুর ভাষা। তাকে রক্ষা করতেই হবে।

সেই ভাষার উপর সরাসরি আক্রমণ। জঘন্য বেইমানী।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার। বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচিত হয়েছিল এই প্রেক্ষাপটের উপরেই।

দেশ বিভাগের ঠিক আগে এবং পরে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও একটা উগ্র ধর্মান্ধতায় আচ্ছন্ন হন। পাকিস্তানের শাসকরা চাইলেন পূর্ববঙ্গের প্রাক্ স্বাধীনতাকালের সমগ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অস্বীকার করতে, বেমালুম মুছে ফেলতে। এটা দরকার হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও শোষণ যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্যেই। কিন্তু কিভাবে পূর্ববঙ্গের আবহমানকালের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নষ্ট করা যায়? দরকার হল ধর্মীয় ছাঁচে ঢেলে একটা নতুন জগাখিচুরী সংস্কৃতি গড়ে তোলা, ইসলামের নামে জনগণকে ধোকা দেওয়া।

সংস্কৃতির প্রধান দুটি জিনিস (১) ভাষা ও (২) সাহিত্য। ভাষার দিক দিয়ে পূর্ব বাঙ্‌লার সঙ্গে পশ্চিম বাঙ্‌লার যোগ নিবিড়। এই রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করতে পারে, পশ্চিম বাঙ্‌লার সঙ্গে সখ্য সদ্ভাব সম্প্রীতি গড়ে উঠবে এই আশঙ্কা। তাই সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথমেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ভাষার অপরূপ যোগসূত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইল। নেওয়া হল সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। একটি দেশ থেকে ভাষাকে হত্যা করার চক্রান্ত। ঠিক করা হল, (ক) দুই তৃতীয়াংশ পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা বাঙ্‌লাকে কোনরকম গুরুত্ব দান করা হবে না, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার কথা উঠতেই পারে না, (খ) আরবি (আসলে

কিন্তু আরবি নয়, উর্দু, ধর্মের দোহাই দেবার উদ্দেশ্যেই আরবি বলে প্রচার করা হত) অথবা রোমান হরফে বাঙ্‌লা লেখার রীতি চালু করার পরিকল্পনা করা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে (গ) প্রচুর পরিমাণ আরবি ফার্সী উর্দু শব্দ ব্যবহার করে বাঙ্‌লা ভাষাকে বিকৃত করা, উর্দুর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার হুকুম জারী করা হল।

১৯৪৭ সালেই তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রস্তাব করেন বাঙ্‌লা ভাষার হরফের জটিলতাহেতু আরবি অথবা রোমান বর্ণমালা তার পরিবর্তে গৃহীত হোক।[১] এই প্রসঙ্গে হাসান মুরশিদ যে বিশ্লেষণ করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি ভেবেছিলেন আরবি হরফে বাঙলা লেখা হলে প্রচুর ফার্সী শব্দ ব্যবহারের দ্বারা বাঙ্‌লা ও উর্দুর ভেদ ঘুচিয়ে দেবেন তার দালালরা। অপরপক্ষে রোমান হরফে লেখা হলে উর্দু ভাষা ও রোমান হরফে লিখে বাঙ্‌লা ও উর্দুর একই রূপ দান করা হবে। ভবিষ্যৎ এই লাভ ছাড়াও উজিরের মনে এ পরিকল্পনা ছিল যে, আরবি অথবা রোমান হরফে লিখতে শুরু করলে প্রাক্-স্বাধীনতাকালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের অধিকাংশ যেহেতু নতুন হরফে মুদ্রিত হবে না এবং উচ্চারণও বিকৃত হবে, সেহেতু পূর্ববাঙ্‌লার লোকেরা এক দিকে যেমন হিন্দু প্রভাবিত বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হবেন ইসলামের পাক গগনে, তেমনি অন্যদিকে গৌরবোজ্জ্বল বাঙ্‌লা সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে দরিদ্র ও নির্জীব হবেন। পরিশেষে আধাহিন্দু বাঙালী মুসলমানরা হয়তো ইসলামী পথে ভাবতে শিখবেন।

বাঙ্‌লা ভাষাকে সেখানকার প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা বলতেন হিন্দুভাষা। যেন ভাষারও সত্যি সত্যি কোন ধর্ম আছে। ধর্মগ্রন্থ সব যেন বাঙ্‌লায় লেখা, বাঙ্‌লা ভাষা-ভাষী যেন অধিকাংশ হিন্দু। প্রচার কত সাংঘাতিক, কত মিথ্যা ও কত বিকৃত হতে পারে এ তারই প্রমাণ।

হিন্দু বাঙ্‌লাকে মুসলমান বাঙ্‌লায় রূপান্তরিত করতে সংস্কার কমিটি গঠিত হল।

পরিকল্পনাকারকরা সব বিচিত্র পথ ধরল, যেমন (ক) রবীন্দ্রবিরোধী প্রচার শুরু হল। (খ) ইসলামি পাঠক্রম নির্ধারিত হল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত (গ) ভারতীয় বইপত্র আমদানী করা নিষিদ্ধ হল (ঘ) গঠিত হল টেকস্‌ট বুক কমিটি।

বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ভাবের ঘরে চুরি করে ভাবতে থাকলেন, ইসলামের নামে যে নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে, সেই ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের

---

১. হাসান মুরশিদ : বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি ; ভাদ্র (১৩৭৮), পৃ. ১৩ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭।

কাজ। দেখতে পাওয়া যায় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ওখানে যেসব কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই সংবাদে আনন্দিত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ এতদিন পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমানদের কথা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি ভেবে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন এবং কী করে তা লিপিবদ্ধ হতে পারে তার চেষ্টা করছিলেন। এ ভাবে যদি সে সময়কার কবিদের কথা আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রথম শ্রেণীর মধ্যে আছেন গোলাম মোস্তফা ও শাহাদাৎ হোসেন স্পষ্টভাবে এবং সঙ্গে বেনজীর আহমদও। তাঁরা মুসলমানদের উন্নত এবং একটি নতুন ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে উল্লসিত হয়েছিলেন। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানের উপর কবিতা লিখেছিলেন, গান রচনা করেছিলেন এবং অপরিসীম আনন্দে পাকিস্তানের কোন কিছুই অভাব থাকতে পারে না এইকথা কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। শাহাদাৎ হোসেন তাঁর কবিতায় বলেছিলেন যে, পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে উল্লাস তাঁর চিত্তে জাগলো সে উল্লাসটা একমাত্র তাঁরই উল্লাস নয়, সে যেন সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের উল্লাস। তরুণ আর একদল ভেবেছিলেন, একটা মহৎ কিছু করবার স্পৃহা মুসলমান কবিদের মনে জাগা উচিত, অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত বাঙ্‌লা কবিতায় মুসলমানদের জীবনের যে সত্যটা ধরা পড়েনি, এখন নতুন রাষ্ট্রে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন সম্ভাবনা সচলতায় মুসলমানদের জীবনকে নিয়ে নতুন আনন্দের কথা বোধহয় লিপিবদ্ধ হতে পারে।

সৈয়দ আলী আহসানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী [১] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, এহেন কোন মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে একটি আকাঙ্ক্ষা, একটি ইচ্ছা মুসলমানদের মনে জেগেছিল যে, হয়ত একটি সুযোগ আসতে যাচ্ছে যখন তাঁরা তাঁদের কথা বলতে পারবেন, যখন তাঁদের ইতিহাসের কথা তাঁদের কবিতায় থাকবে, যখন তাঁদের সমাজের কথা তাঁদের কবিতায় ধরা পড়বে, যখন তাঁদের বিভিন্ন প্রকার ইচ্ছার কথা কবিতায় রূপ লাভ করবে।

এই আনন্দের অভিপ্রায় তখন কেউ কেউ ব্যক্ত করেছিলেন। কবিদের মধ্যে যিনি অগ্রসর ছিলেন তিনি হচ্ছেন ফররুখ আহমদ। সেই সময় তিনি ইসলামের প্রাচীন—প্রাচীন না বলে বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস স্মরণ করতে

১. সৈয়দ আলী আহসান : পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, আমাদের সাহিত্য। সরকার ফজলুল করিম সম্পাদিত (১৩৭৬), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

গিয়ে যে একটা রোমান্টিক ভাবাবহ সৃষ্টি করেছিলেন কবিতার মধ্যে, এতে আন্তরিকতা ছিল। ইসলামী ভাবাবহ বাঙলা কবিতায় আনয়ন করার চেষ্টা। কিন্তু সৈয়দ আলী আহসানের [১] মতে, কবিদের প্রজ্ঞা ও মনীষার অভাব ছিল, যে কারণে তাঁদের কবিতা ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা হয়েছে। তাঁদের কবিতায় রোমান্টিক রসের আশ্রয় আছে, প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় নিয়ে তাঁদের কোন কবিতা জাগ্রত হয়নি। এই ধারার অগ্রবর্তী কবি ফররুখ আহমদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'সাত সাগরের মাঝি' লিখেছিলেন। তাতে প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ তাঁর কবিতায় উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন, কৃতকার্যও হয়েছেন সেই সেই কালকে বিধৃত করতে। কিন্তু পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজুম মুণীরা' প্রথম কাব্য থেকে আরও উৎকৃষ্ট বলে তেমন বিবেচিত হবে না কোন সমালোচকের কাছেই, কারণ, প্রথমতঃ, পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থের উচ্ছলতা পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে অতিক্রান্ত হয়নি, দ্বিতীয়তঃ, আসল এইটাই যে, কাব্যগ্রন্থ-গুলিতে ধর্ম হয়ত আছে, কিন্তু জীবন তার দুঃখ, যন্ত্রণা, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তার আশ্চর্য হাসিকান্না হীরা চুনি পান্না নিয়ে করুণভাবে অনুপস্থিত। বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময়, হৃদয়ের আবেগ, এষণা আবর্ত, আলো অন্ধকারের দোদুল্য-মানতা যদি নাই থাকল তাহলে কীভাবে সার্থক কাব্যের মর্যাদা রক্ষিত হবে?

ফররুখ আহমদের ধারার অনুসরণ এবং অনুকরণ করতে গিয়েছেন আর দু-একজন কবি, এঁদের মধ্যে অন্যতম তালিম হোসেন। কিন্তু তাঁর কবিতা ফররুখ আহমদের মত এতটা উজ্জ্বল নয়। কবিতার ধ্বনি ও ছন্দ সম্পর্কে তীক্ষ্ণজ্ঞান অতটা দেখি না। শব্দ ব্যবহারের মাধুর্য তাঁর মধ্যে লক্ষিত হয় না। কাজেই তালিম হোসেন প্রমুখের কবিতায় অনুকরণের বিষফল রূঢ়তা এসেছে, প্রাণস্পন্দন নেই, দীপ্তি সচলতা নেই।

দেখতে পাচ্ছি শুধু ধর্ম নিয়ে কবিতা রচনা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। অথবা অন্যভাবে বলতে পারা যায়, এই মনোভাবাপন্ন কবিরা এই ধরনের কবিতা লিখে পূর্ব বাঙলার কাব্য জগতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যেতে পারেননি যা চিরকালীন সৃষ্টি বলে গণ্য হবে, সাহিত্যে স্থায়ী সংযোজন হয়ে থাকবে।

কবিতাকে এইভাবে বিশ্লেষণ করলে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মানুষদের মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ পাই। জীবন যৌবন পারিপার্শ্বিকতা যে দ্রুত বদলে

১. সৈয়দ আলী আহসান: পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা, আমাদের সাহিত্য; সরকার ফজলুল করিম সম্পাদিত (১৩৭৬), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মুসলমান সমাজ যে পরিচিত হচ্ছেন, গ্রহণ করছেন সেই ধ্যান-ধারণা, ছুঁড়ে ফেলছেন অতীতের অন্ধ সব কুসংস্কার, এটা বুঝতে পারি। আর তাঁরা অন্ধ বদ্ধ হয়ে শুধু ধর্ম আঁকড়ে পড়ে থাকতে চান না।

বদরুদ্দীন ওমর তাঁর "সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি"[১] প্রবন্ধে একটু অন্যতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, কেন সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ-সাধন সেখানে কাম্য ছিল না। তাঁর মত, একথা সত্য যে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতার, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাস্তব ভিত্তি পূর্বের তুলনায় অনেক দুর্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ এখনো সাধিত হয়নি। এর অন্যতম মূল কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে সাম্প্রদায়িকতা এদেশে এখনো কার্যকর এবং ব্যবহারযোগ্য। তিনি বলেছেন এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহকে বাধাগ্রস্ত এবং ধ্বংস করার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা স্পষ্ট হলেও জনসাধারণের চেতনায় ঐ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা থাকে না, বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক প্রচারণার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময়ে। এর ফলে ঘটনা উত্তরকালে উচ্চ মধ্যবিত্তের সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতির পরিচয় কিছুটা লাভ করলেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা পুনরুত্থিত হলে তারা সহজেই আবার পূর্বের মতোই বিভ্রান্ত হয় এবং সাম্প্রদায়িকতা শ্রেণীস্বার্থ উদ্ধার কার্যে ব্যবহৃত হয় বলেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং দাঙ্গার পৌনঃপুনিকতাকে কিছুতেই রোধ করা যায় না। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থের এই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ারের যথার্থ চরিত্রকে কৃষক মজুর অল্পবিত্ত জনসাধারণ যতদিন পর্যন্ত না উপলব্ধি করতে সমর্থ হচ্ছে ততদিন এদেশে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেই সুস্থ পথে এবং সুষ্ঠুভাবে তার পরিণতির দিকে চালনা করা সম্ভবপর নয়। একারণে এদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য সব থেকে বেশী প্রয়োজন সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, তার বিভিন্নরূপ এবং বহিঃপ্রকাশের পরিচয় লাভ এবং তাকে যথাযথভাবে প্রতিরোধ করার সক্রিয় প্রচেষ্টা। এদেশে বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য তাই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্ট মানসিক অচলায়তনকে সর্বভাবে এবং সর্বক্ষেত্রে ধ্বংস করার প্রয়োজন সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

তাহলে আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও তার কূপমণ্ডুকতা থেকে প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রথম থেকেই। দেখতে হবে এই প্রয়াস পরিচালিত হল কোন্ পথে?

১. বদরুদ্দীন ওমর (১৯৭১) সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অগ্রগতি ; পূর্ববাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক সঙ্কট, পৃ. ১৬৮, নবজাতক প্রকাশন, ৬ এন্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়ে উঠল পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল সবুজ প্রান্তরে, সেখানকার আশ্চর্য শক্ত দৃপ্ত দৃঢ় মানুষগুলির অন্তরে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন ঘটল কবিতায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলন শুরু হল। ভাষা আন্দোলনকে ঘিরেই দানা বাঁধল জাতীয়তাবাদ। পূর্ব বাঙ্‌লার জনতা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে এরই ভিত্তিতে মাতৃ-ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য এক হল, তাদের একটিই দাবিকে ঘিরে আন্দোলন গড়ে উঠল।

১৯৪৮-এর ১৯শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, পাকিস্তানের কায়দে আজম বা শ্রেষ্ঠ নেতা ঢাকায় এলেন। এর আগে ২৫-শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরাজী ও উর্দুর সংগে বাঙ্‌লা ভাষাও অন্যতম ভাষা হিসেবে মর্যাদালাভ করবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন লিয়াকত আলী খান, পাকিস্তানের সে সময়কার প্রধান মন্ত্রী।

প্রস্তাবটি এনেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। উল্লেখ করা দরকার বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এই বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক ও রাজনৈতিক নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। লিয়াকত আলী একেবারে ক্ষেপে যান। তিনি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে দেশদ্রোহী এবং বিচ্ছিন্নতাকামী আখ্যা দেন। শাসক শ্রেণীর বক্তব্য, পাকিস্তানে একটি সাধারণ ভাষা থাকবে, সে ভাষা হবে উর্দু। উর্দু নাকি মুসলিম সংস্কৃতির ভাষা এবং উর্দু ভাষাই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ঢাকার নবাব পরিবারের বাঙালী মুসলমান নাজিমুদ্দীনও প্রভুর স্বরে কণ্ঠ মেলালেন। জনমত না জেনেই ফরমান দিলেন যে পূর্ব বাঙ্‌লার অধিকাংশ অধিবাসীই নাকি চায় উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে।

২৫শে ফেব্রুয়ারী গণপরিষদে বাঙ্‌লাভাষার দাবি অগ্রাহ্য হল। ঢাকায় আন্দোলনের তরঙ্গ বয়ে গেল। ঢাকার ছাত্রশক্তি জানাতে চাইল মাতৃভাষার অপমান তারা বরদাস্ত করবে না। এরই মাধ্যমে রাজনৈতিক দিকটাও স্পষ্ট হল—পশ্চিমের শাসন এবং শোষণও পূর্বের মানুষ সহ্য করবে না মুখ বুজে।

২৬শে ফেব্রুয়ারীই ঢাকায় ছাত্ররা ধর্মঘট পালন করেন, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে, এর জন্যে একটা সর্বদলীয় সভা হয় ফজলুল হক হলে ২রা মার্চ। এ সভায় ছিলেন মুজিবর রহমান, তাজউদ্দীন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, বর্তমান বাঙ্‌লা জাতীয় দলের নেতা আলি আহাদ, কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার প্রভৃতি।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল, ১১ই মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে ভাষার দাবিতে হরতাল ডাকা হল। হরতাল ভাঙার প্ররোচনা এল অনেক। যারা হরতাল ডাকছে তারা দালাল, হিন্দু-সংস্কৃতির ধারক, পাকিস্তানের শত্রু, এইসব প্রচার চলল। কিন্তু মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল কাসেম, অজিত গুহ প্রমুখ সাহিত্যিক ও শিক্ষক এবং পূর্বকথিত ছাত্রনেতাগণ মূল সমস্যার গুরুত্ব বুঝেছিলেন। তাঁদের সার্থক নেতৃত্বে ১১ই মার্চ ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। বিক্ষোভ দমন করার জন্য কোন কোন জায়গায় পুলিশ লাঠি চালায় এবং বেশ কিছু ছাত্র আহত হন। কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয়।

পাকিস্তান সরকার এর মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ও হিন্দুর চক্রান্ত দেখলেন ······"থানা তল্লাসীর ফলে যে সমস্ত প্রমাণাদি এখন সরকারের হস্তগত হয়েছে, তার থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে হতবুদ্ধি সৃষ্টি করে পাকিস্তানকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে।"

ঢাকার মত খুলনা, যশোর, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও হরতাল পালিত হয়। খুলনা ও যশোরে পুলিশের সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষ বাঁধে।

কায়েদ আজম বা শ্রেষ্ঠ নেতা ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকায় এলেন কিন্তু তথাকথিত জাতির পিতা যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন না। ২১শে মার্চ রেসকোর্সে যে ভাষণ দিলেন তাতে বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি অপরিসীম অবহেলা ও অনীহা প্রকাশ করে সদর্পে ঘোষণা করলেন "উর্দু" এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।

তিনিও মত প্রকাশ করলেন, যারা বাঙ্‌লা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে বিদেশের অর্থভোগী দালাল। জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরানো, মুসলমান সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করাই এদের কাজ। এত তাঁর গোঁড়ামী ছিল যে যখন ভাষার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান তখন এই বলে তিনি তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে হিন্দু প্রতিনিধি রয়েছে।

২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে আর একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। এখানে আবার কায়েদে আজম ঘোষণা করলেন, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। মুহূর্তে চারিদিক থেকে ছাত্ররা অনেকেই 'না-না' বলে এই দম্ভোক্তির প্রতিবাদ জানালেন। একটা নতুন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ যথেষ্ট সাহসের পরিচয়। পাকিস্তানের একচ্ছত্র নায়কের আত্মবিশ্বাসেও

হয়ত ফাটল ধরেছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য শুধরে নিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন "ভাষার প্রশ্নটি নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই মীমাংসা করবেন।"

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের উপর সরকারী বিরূপতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দমন পীড়নের খড়্গ নেমে এসেছিল। সাময়িকভাবে আন্দোলন স্তিমিত হল। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রথম লাভ আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং দ্বিতীয় লাভ প্রাদেশিক সরকার আংশিকভাবে তার মনোভাব বদলায়, ফলে গণপরিষদের কাছে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ না জানালেও, প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের জন্য বাঙ্‌লায় যথাসম্ভব ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে নাজিমুদ্দীন সরকার বাধ্য হন।

এরপর এল স্মরণীয় অগ্নিগর্ভ ১৯৫২। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত হল।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দীন ঢাকার সভায় ঘোষণা করলেন, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রমহল বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। এবারের আন্দোলন আর শুধু ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না—নিল গণআন্দোলনের রূপ। সমস্ত রাজনৈতিক দল এক হয়ে যোগ দিলেন এই আন্দোলনে।

ছাত্রনেতারা ২৭শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মধুর ক্যান্টিনে সমবেত হলেন এবং গাজিউল হকের নেতৃত্বে ঠিক হল, ৩০শে জানুয়ারী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মঘট পালন করবে।

৩০শে জানুয়ারী ধর্মঘট পালিত হল যথারীতি। সাড়া পাওয়া গেল প্রচুর। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল একদিন ; যুবলীগ, খিলাফতে রব্বানি, আওয়ামি মুসলিম লীগ, ছাত্র লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের নিয়ে। শেখ মুজিবর রহমান তখন জেলে। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য আতাউর রহমান খান ও কাজী গোলাম মাহবুব। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ তোয়াহা, আল আহাদ, আবদুল মতিন প্রভৃতি।

৩০শে জানুয়ারীর পর আবার ধর্মঘট পালিত হল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। সেদিন বৈকালিক জনসভায় মৌলানা ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাঙ্‌লাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্য আবার অনুরোধ করলেন সরকারকে।

সরকার নীরব, কঠোর। ডাক দেওয়া হল প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের—২১শে ফেব্রুয়ারী।

সেদিন প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। গণ্ডগোলের আশঙ্কা

করে সরকার আগে থেকেই ১৪৪ ধারা জারী করেছে। গাজিউল হক, আবদুল মতিন, কমরুদ্দীন, হাবীবুর রহমান, শেলী, জিল্লুর রহমান, আবদুস সামাদ, এম. আর. আখতার প্রমুখ ছাত্রনেতা সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন।

সংঘর্ষ বাঁধলো। হিংস্র পুলিশ আক্রমণ—লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি। শহীদ হলেন জব্বার, রফিক ও বরকত।

এ খবর পেয়েও পুতুল মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন পরিষদ অধিবেশন চালিয়ে যেতে চাইলেন। প্রতিবাদে সকল বিরোধী সদস্য ও সরকার পক্ষের কয়েকজন সদস্যও পরিষদ ত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন।

এই নিষ্ঠুর পীড়নের বলি তিনজন। আহত ৩০০, বন্দী ২০০।

২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা আবার উত্তাল। বিশাল শোক মিছিল। শহীদের রক্তে কাপড় ভিজিয়ে তারই পতাকা বয়ে নিয়ে ঢাকার রাজপথে চলেছে ছাত্র-জনতা। নীরব মিছিল। এই শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপরও পুলিশ হামলাবাজি চালাল। গুলি চালাল। নিহত হলেন ছাত্র শফিকুর রহমান, আবদুস সালাম, একজন কিশোর ও একটি অন্ধ ভিক্ষুক। ছাত্র পরিষদ দাবি করলেন সরকারী গুলিতে নিহত হয়েছেন ৩৯ জন। আহতের সংখ্যা প্রায় দেড়শো।

প্রবল বিক্ষোভ। জনতরঙ্গ উত্তাল। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে।

গ্রেপ্তার করা হল অনেককে—আল আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক মুজফ্‌ফর আহমদ, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, পরিষদ সদস্য খয়রাত হোসেন, মৌলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মৌলানা ভাসানী প্রমুখ। ছাত্রনেতা গাজিউল হক প্রমুখ আত্মগোপন করে গ্রেপ্তার এড়ালেন।

মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঢাকার এই আগুনের বান ছড়িয়ে পড়ল। বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-জাগরণ। ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও জনগণের মধ্যে জাগরণের জোয়ার এল। এই আন্দোলন যেন আগুনের পরশমণি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাঙ্‌লায় গণতান্ত্রিক চেতনালাভের প্রথম জ্বলন্ত সংগ্রাম। সুদূরপ্রসারী এর তাৎপর্য। সাহিত্যিক আনিসুজ্জামান বলেছেন[১] বাঙ্‌লা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করার কর্মসূচী ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারীর একমাত্র লক্ষ্য। এমন কর্মসূচীভিত্তিক একটি দিন একটি জাতির ইতিহাসে যুগান্তরের কাল বলে বিবেচিত হল কেন? তার কারণ এই যে ভাষা

১. অমিয়কুমার হাটি, পূর্ববঙ্গ : সংস্কৃতি ও কবিমানস, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা—৫২, ১৯শে জুন, (১৯৬৯)। পৃ. ৩২৯৬।

আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত ছিল কতকগুলি মূলনীতির প্রশ্ন। সেই মূলনীতি-গুলোই আমাদের জাতীয় জীবনে তরঙ্গ তুলেছে বারবার, প্রশ্ন তুলেছে, সমাধান খুঁজেছে, মীমাংসা পেয়েছে।......২১শে ফেব্রুয়ারী একই সঙ্গে সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ও বিকাশের দিন। তাই ১৯৫২ সালের পর বাঙলাভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে কোন চক্রান্তই ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশবাসী সচেতন হয়েছেন। ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে এই সদাজাগ্রত মনোভাবই রবীন্দ্র বিরোধী সকল কর্মকৌশলকে পর্যুদস্ত করেছে।..... এ জন্যেই মনে হয় ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু কর্মসূচীভিত্তিক আন্দোলনের দিন নয়, আত্ম-সাক্ষাৎকারের দিন, আত্মবিশ্বাসের দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুভ সূচনার দিন, জনশক্তির বিজয়যাত্রার দিন। ২১ ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত দিন।

প্রথমতঃ, জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবোধ উদ্বুদ্ধ হল, তাঁরা রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের শাসকদের স্বরূপ চিনলেন। শাসন শোষণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংগঠিত সংগ্রাম সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়ল এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল তাঁরা বিজয় লাভ করলেন। মুখের ভাষা মাতৃভাষা কেড়ে নেবার, তাকে খর্ব করবার সবরকম দুর্বুদ্ধি এবং অপচেষ্টা রোধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন জনসাধারণ। শাসক-শক্তি ভয় পেল।

তৃতীয়তঃ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, সঙ্কুচিতচিত্ততা, কূপমণ্ডুকতা মুহূর্তে কেটে গেল—একটি উদার ঊষার আলো এসে পড়ল যেন পূর্ব বাঙলার মানস গগনে, বুদ্ধিদীপ্ত বেগ এবং আবেগ লাভ করল সাহিত্য ও সমাজ জীবন, নতুন করে প্রাণস্পন্দন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

চতুর্থতঃ, পরবর্তী সমস্ত আন্দোলনে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন প্রেরণা উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়েছে। আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে, ভবিষ্যৎ পথ নির্দেশ করেছে।

পঞ্চমতঃ, জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ। ভাষা আন্দোলন থেকে যার সূত্রপাত, সেই সূত্র ধরে পশ্চিমের সঙ্গে মতান্তর এবং মনান্তর তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। শাসকগোষ্ঠীর দোষ এবং দূরদৃষ্টির অভাবেই মিলনের সমতল ক্ষেত্র খুঁজে পায়নি পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলমান সমাজ। ধর্ম তাঁদের এক রাখতে পারেনি। মুসলিম সংস্কৃতি ঠুনকো কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ এর নেতৃত্ব দিয়েছে, সাহায্য করেছে ভারত ও সোভিয়েত দেশ, আধা-সামন্ততান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তানে বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৫২-র

আন্দোলনের অবদান এইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। আগামী দিনগুলোর দিকেও সে তাকিয়ে আছে, আবার কোন অগ্নি নির্ঝর নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে তারই দিকে চেয়ে। বস্তুতঃ বাঙ্‌লাদেশের নাট্যমঞ্চ ঘিরে সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন নাটকের সম্ভাবনা দানা বাঁধছে। একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় তাই সাহিত্যিক আনিসুজ্জামানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

॥ ২ ॥ ২১ ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে কবিতা লেখেননি এমন কবি বাঙ্‌লাদেশে নেই। যে কিশোর কবিতা লিখতে শেখে সেও ২১শে ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে কবিতা লেখে। আসলে ২১শে ফেব্রুয়ারী তো প্রতীক! জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সুন্দর চিত্র পাই। স্বদেশ-বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছিল কবিকুল ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মায়ের মুখ মনে পড়েছে, মাকে মনে পড়ছে নানাভাবে, নানা পরিসরে, নানা চিত্রকল্পে। দুঃখিনী মায়ের বাড়ীর পথ চিনিয়ে দিচ্ছেন সিকান্দার আবু জাফর—

'মায়ের বাড়ী যখন ইচ্ছে এসো
অষ্টপ্রহর সব দরোজা খোলা,
পথ চিনতে কষ্ট কেন হবে।
হাড়ের গুঁড়ো, মাথার ঘিলু
কলজে ছেঁড়া ছেঁড়া
সাজিয়ে পথের নিশান করা আছে
দেখামাত্র অমনি যাবে চেনা।

চলতে পথে বারে বারেই শিউরে উঠবে দেহ
মনে হবে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে বুঝি
কারো আশা ভালোবাসা কারও মায়াস্নেহ,
মায়ের বাড়ীর পথে যদি ঘনায় আঁধার নিশা,
কান পাতলেই ছেলে-মরা মায়ের কান্না শুনে,
মিলবে পথের দিশা।

(সিকান্দার আবুজাফর : মায়ের বাড়ীর পথ)[১]

১. শিলালিপি, মো: মোয়াজ্জেম হোসেন (১৯৭০) সম্পাদিত।

চিনে নিতে হবে সেই মার মুখ, প্রশোষণে জর্জরিতা, ক্ষুধায় কাতর যিনি :

'চিনে নেই মার মুখ, প্রশোষণে জর্জরিতা
ক্ষুধায় কাতর
মিছিলে সামিল হই প্রতিজ্ঞা ভাস্বর।'

(মযহারুল ইসলাম : সেই রক্তের দাগ : সূর্যের জন্মলগ্ন)[১]

কোন কবি দেখছেন কী অপরূপ অন্নপূর্ণাসম মাতৃমূর্তি তাঁর কল্পনায়—

'এক আকাশ মাতৃত্বের আঁচলে মুখ ঢেকে
বর্তমান সুপারীর এলো মাথারা
তীরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে য'কে
ধূসর বালকের নিষ্কলুষ কৌতূহল যেন
কোমরে আশ্রিত নিষ্পাপ কার হয়ে
সহস্র বৎসরের অনুচ্চার প্রশ্নের মত
আমাদের দেখে থাকে।

(আবদুল গণি হাজারী : অন্নপূর্ণার দেশ)[২]

অথবা,

মাকে চিনি
খেলার পুতুল, লালফুল, সাদা দেয়ালের
সব ছবি চিনি
তবু জানিনা কোথায়
নামের মাধুরী আছে লুকিয়ে ; মাকেও
মা বলে ডাকার সেই কথা আর সুরের সুন্দর
জানিনা মিশ্রিত মহিমা আছে কোথায় লুকিয়ে
একদা মায়ের মুখের সেই তৃষ্ণার আঁধার

১. জ্বালামুখ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন রাজশাহী জেলা শাখা কর্তৃক প্রকাশিত। [একুশের সঙ্কলন (১৯৭১), বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা]

২. আর্তনাদের পরে (১৯৭০) সম্পাদক : ওবায়দুল ইসলাম।

অতঃপর আলো হয়ে আমার অধরে
রেখেছে চুম্বন ; আমি মা বলে ডেকেছি যাকে।
আমি তোমাকে পেয়েছি আর মাকেও পেয়েছি।
(আহসান হাবীব : মায়ের মুখ থেকে।)[১]

বাঙলা ভাষা—মায়ের ভাষা—মায়ের গান—কী মধুর শান্তির সংগীত :—

'মনে আছে হৃৎপিণ্ডের সবগুলি পেশীর ঝংকারে
একটি মধুর গান : বাংলা ভাষা—আমার মায়ের ভাষা—
আমার মায়ের গাওয়া কী মধুর শান্তির সংগীত
ধান বোনো হে কিষাণ। গান গাও—গান গাও আজ।
তাঁত বোনো তাঁতী ভাই। গান করো—গান করো ভাই॥
বাতা বাঁধো হে কিষাণী। গান গাও—গান গাও তুমি।
মোট বও মুটে ভাই। গান করো—গান করো আজ॥
গান গাও উচ্ছল নদীর মত—দুর্বার ঝঞ্ঝার মত
মুখর বৃষ্টির মত—কাস্তে হাতুড়ি আর লাঙ্গলের ফলায় ফলায়,
নিবেদিত টংকারের মত

শিশুর বোলের মত
বধূর হাসির মত
ছয় ঋতু—বারোমাস—ঈদ—পূজা
মোহরম—খ্রীষ্টমাস—জন্মদিন—
বিবাহের উচ্ছল সুরের মত.. ..
সেই গান দোলা দিক দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে
ফসলের খেতে আর গোঠে গোঠে
রাখালী বাঁশিতে—জারী আর ভাটিয়ালী—
ভাওয়াইয়া—রূপকথা—গীতের আসরে—
পূব বাংলার নীল আকাশে আকাশে
কপোতের ঠোঁটে ঠোঁটে—কাকাতুয়া-কোয়েলের সুরে

১. বিক্ষুব্ধ বাঙলা, মস্তফা আলাম কর্তৃক প্রকাশিত।
[একুশের সঙ্কলন (১৯৭১) বাঙলা একডেমী, ঢাকা] পৃ. ১৮৬।

মাঠের শ্যামলে আর রূপালী শিশিরে
রক্তলাল কিংশুকে পলাশে!

(আশরাফ সিদ্দিকী: একুশের ভোরে।)[১]

লক্ষণীয়, অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। ঈদ্ পূজা, খ্রীষ্টমাস—মুসলমান, হিন্দু, খ্রীষ্টান সব সম্প্রদায়ের উল্লেখ। কিষাণ, তাঁতী মুটে সকল শ্রেণীকে আহ্বান।

অনেকদিন পর ১৯৬৯-এতেও কবি শামসুর রহমান দেখছেন, মানবিক বাগান, কমলাবন হচ্ছে তছনছ। সেই সঙ্গে দেখছেন, শহীদরা মরেননি—আবার তাঁদের

... .. হাত থেকে নক্ষত্রের মত,
ঝরে অবিরত অবিনাশী বর্ণমালা
আর বরকত বলে গাঢ় উচ্চারণে
এখনো বীরের রক্তে দুঃখিনী মাতার অশ্রুজলে
ফোটে ফুল বাস্তবের বিশাল চত্বরে
হৃদয়ের হরিৎ উপত্যকায়। সেই ফুল আমাদের প্রাণ
শিহরিত ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের রৌদ্রে
আর দুঃখের ছায়ায়।

(শামসুর রাহমান: ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯।)[২]

মায়ের কাছে ফিরে আসার জন্য অর্থাৎ মাকে পাবার জন্য কবির আকুতি—

"মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো মা তাই কি হয়?
তাই তো আমার দেরী হচ্ছে।
তোমার জন্য কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো।
লক্ষীমা রাগ করোনা
মাত্র তো আর কটা দিন।"

(আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ: একুশের কবিতা)[৩]

---

১. সুর্য সৈকত, সম্পাদক গিয়াস সিদ্দিকী, (১৩৭৩)।

২. বিদ্রোহী বর্ণমালা, ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত, (১৯৭০)

৩. মিছিল, এস. এম. তৌফিকুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত, (১৯৭০)

কেন ছেলেরা আসতে পারছে না মার কাছে? কোথায় বাধা, কোথায় সংকোচ? কোথায় লজ্জা? আসতে তো হবেই মার কাছে, সেদিন—খুশি হবেন মাও—প্রত্যাবর্তনের লজ্জা যাবে ঘুচে যখন ছেলে আনন্দে জড়িয়ে ধরবে মাকে—

"বাসি বাসন হাতে আম্মা আমাকে
দেখে হেসে ফেলবেন
ভালোই হলো তোর ফিরে আসা।
তুই না থাকলে বাড়ীঘর একেবারে
কেমন শূন্য হয়ে যায়।
স্যুটকেশ রেখে হাত মুখ ধুয়ে আয়
আমি নাস্তা পাঠাই।
আর আমি আনন্দে মা'কে জড়িয়ে ধরে
আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘষে ঘষে তুলে ফেলবো।"

(আল মাহমুদ : প্রত্যাবর্তনের লজ্জা)[১]

মহান বাঙালীত্বের কথা মনে পড়ছে কবির বিশেষ করে—

......মহান
আমার বাঙালিত্বটাকে
একেবারেই খারিজ কোরো না কো।
(যাই বলো, কতই বা আর পরিবর্তন হবে!)
সমুদ্রটা অনেক বড়ো আকাশটাকে ধারণ করে সে
কি ধন যে পালন করে, এখনো অনুভবে
উপলব্ধি ঘটেনি হায়, সে যাই হোক,
নয় আমাদের জন্যে—
আমরা বঙ্গভাষী।

(জিয়া হায়দার : বঙ্গভাষী আমরা)[২]

কী দারুণ বিদীর্ণ অন্তর নিয়ে সুব্রত বড়ুয়া লিখছে—

'সোনার গাছে ঝুলছে কেবল যন্ত্রণারা
হীরের পাখী করছে কূজন গাছের ডালে

১. স্পন্দন, পূর্ব পাক্ ছাত্রইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত, (১৯৭০)।
২. শাশ্বত ফাল্গুন, সম্পাদনা, দাউদ হায়দার ও গোলাম মোস্তাফা, (১৩৭৬)

বাতাস তো নেই তবু গাছের সকল সুফল
দিচ্ছে পাড়ি সময় থেকে মহাকালে।

এই বাগানে উড়ছে রূপোর মশামাছি,
এই বাগানে আমরা সকল সুখে আছি।
(সুব্রত বড়ুয়া : বাগান)[১]

আর দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা—

'মাগো,
তোমার বুকের
পীযূষ সুধা
পান
করেছি,
তোমার ব্যথায়
রক্ত দেওয়ার,
পণ করেছি।'
(পূর্ব বাঙলার কণ্ঠস্বর : মহান একুশে স্মরণে))[২]

কেন জাগিয়ে রাখতে চান একুশের স্মৃতি? কবির বক্তব্য—

……আজ জেগে থাকে
একুশের রক্তাক্ত স্মৃতি।

আজ লিখলাম
একুশে আমার রক্তে বাজায় অস্থিরতার সুর
বিপ্লব জানি মহামহীরুহ, একুশ তো অঙ্কুর।
(বুলবুল খান মাহবুব : আমার চেতনা)[৩]

এইরকম মাতৃ-বন্দনায় শত শত কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকুলের সংগ্রামী মানসিকতায় মায়ের অমল আসন পাতা। বৈশিষ্ট্যে এবং বৈচিত্র্যে

১. ঐতিহ্য, সম্পাদক, চৌধুরী জহুরুল হক।
[একুশের সঙ্কলন (১৯৭১) বাঙলা একাডেমী, ঢাকা]
২. দুর্গাদাস সরকার ও সনাতন কবিরাজ সম্পাদিত 'গ্রাম থেকে সংগ্রাম।' (১৯৭১) পৃ ১২।
নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি—১২।
৩. ঐ, পৃ. ১৪।

উজ্জ্বল। কখন মায়ের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করে তাঁর বন্ধনদশা জেনে তাঁদের যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, কখনো বা হতাশা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধকার কাটিয়ে উত্তরণের আশা—তাঁরা কিছুতেই মেনে নেবেন না তাঁদের মায়ের প্রতি এই অবিচার অত্যাচার থাকবে না অসহায় হয়ে. সংগ্রামী অঙ্গীকার উচ্চারণ হয়েছে তাই বারবার।

সহজ সরল কবিতা, কথার মারপ্যাঁচ বিশেষ নেই, সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে, অধিকাংশই সাবলীল, বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল। হৃদয়ের উত্তাপ সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁদের আকুতি কত তীব্র, মাকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল, কবিতায় তা' ফুটে উঠেছে।

আবেগমণ্ডিত স্বপ্নমাখা। স্বপ্ন এবং আবেগ না থাকলে কবিতা কি হয়? স্বপ্ন দেখলে তবেই তো স্বপ্ন সফল করার কথা আসে! আর স্বপ্ন এবং আবেগ যেমন আছে, তেমনি আছে ঐকান্তিকতা, আগ্রহ। লড়াই করতে কবিরাও পিছপা নন।

আরও একটি কথা, কবিতাগুলি কবিতাই হয়েছে, রাজনৈতিক ইস্তাহার নয়। কবিতার যে পেলবতা, কোমলতা, কুসুমসত্তা আমরা আশা করি, যে ধ্বনি, ছন্দ আমাদের মনে সাড়া জাগায়, তারা উপস্থিত। অথচ এই কুসুম কোমল কবিতাগুলির অন্তরে কী বজ্র কাঠিন্য!

॥ ৩ ॥ একুশের মহান ঐতিহ্যের পথ বেয়ে, শহীদের রক্তের ঢল অনুসরণ করে, স্বদেশ-বন্দনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সেদেশের কবিদের অনেকেই।

এ কোন্ স্বদেশ? পাকিস্তানের স্বপ্ন তখন অনেকের চোখ থেকেই কী মুছে যায়নি? স্বদেশ অর্থে পূর্ব বাঙ্‌লা তার শ্যামল সজল বন প্রান্তর নদীনালা নিয়ে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলোড়ন তুলেছে। আশ্চর্য হতে হয়। কবিরা যে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা তার প্রমাণ মেলে। বিচ্ছিন্নতার সুর, আপন অধিকার আপনার হাতে পাবার কথা তাঁদের কবিতায় তখন থেকেই।

এ এক নতুন যুগ, নতুন জীবন, নতুন জাগরণও। পূর্ব বাঙ্‌লার মুসলিম জনমানসের এই কি রেনেশাঁস? বস্তুতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে উন্মাদনা পূর্ব বাঙ্‌লার কিছু মানুষের মনে জেগেছিল, সেটা সাময়িক উচ্ছ্বাস। সকলের নয়। দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। শঠতা ও বঞ্চনা খুব তাড়াতাড়ি বুদ্ধিজীবী মানুষেরা বুঝে নিয়েছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তাই তাঁরা সাধনা

সুরু করলেন। বিপ্লব এল তাঁদের চিন্তা রাজ্যে, অল্প-সময়ের মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন তাঁরা, ঢেউ উঠল, ছড়িয়ে পড়ল তা জন সমাজে—শহরে গ্রামে।

স্বদেশের ভাবমূর্তি জীবন্ত, জলন্ত হয়ে উঠল। এগিয়ে যাবার স্পষ্ট একটা পথরেখ চোখের সামনে ফুটে উঠল। স্বদেশ প্রেমের, স্বদেশবন্দনার এমন কতকগুলি অনির্বচনীয় কবিতা :—

(ক) "স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অংশ'—এই আমি শিখেছি,
শিখেছি ধর্মে, সাহিত্য শিল্পে ও সবরকম সংস্কৃতির ইতিহাসে—
আমার বলায়, লেখায় ও কাজে এই ভাব প্রায়ই প্রকাশ পায়।
ইহাই নাকি আমার মহা অপরাধের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান এইভাবে পায় সম্মান !!

দেশমাতা ! তোমার নীরব ইতিহাসের পাতায়,
শুধু টুকে রেখো আমার অপরাধটুকু।
জানি—বাড়ি নয়, গাড়ি নয় ; কৃতীপুত্র বা প্রেয়সী ভার্যাও নয়,
ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বা উজিরী তো নয়ই—হয়তো এই নগণ্য অপরাধটুকুই—
আমাকে করে রাখবে তোমার অন্তরে চিরস্মরণীয় ॥

(আবুল ফজল : অপরাধ)[১]

(খ) একজন বৃদ্ধের কামনা :—

মাগো আবার জন্ম দিও
বাঙালী করে
তোমার কোলে।
আমি তোমায় ভালবাসি ॥

(শঙ্কর বিশ্বাস : তিনটি জবানবন্দী)[২]

(গ) তোমার নামের মধু ঝরে
সুখের সভাতে আজ গড়ে তুলি
সহস্র মনের ধ্যানের মোহন সৌধ।
তোমার প্রাণের স্পর্শ লেগে আছে
সেই তো পরম,
আমরা নিশ্চিত যাব
নির্ধারিত পথে।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ১৯
২. ঐ পৃ. ৪২

তোমার বিজয় রথে
পেয়েছি যা অম্লান আলোকে
তাই আজ নিত্য নব প্রেরণার
উৎস সুধা হোক।
একটি উজ্জ্বল দিন একটি সে মণিবর্ণ আলো
এবার সবার প্রাণে কিমাশ্চর্য প্রদীপ জ্বালালো।

(মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান : মণিবর্ণ)[১]

(ঘ) যা আমার দেশের প্রতিটি রেণু
মাটির সোঁদা গন্ধে
লবণাক্ত আকাঙ্ক্ষার স্বপক্ষে
প্রেরণার সুগন্ধ দেবে।
এক ঝাঁক পায়রা তাদের ঠোঁটে ঠোঁটে
নতুন সংবাদ আনলো
এবার আমরা নতুন
প্রোজ্জ্বল
প্রদীপ্ত !
আমাদের প্রদীপ্ত সঞ্চয় এই আমার দেশের
মনিকোঠায় জড়িয়ে রাখলাম।

(মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম : প্রেম মাটিতে আমি।)[২]

(ঙ) আমার জন্মের পর প্রথম ভালোবাসলাম আমার মাকে
ভালোবাসলাম আমার মায়ের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল :
আহা কি অপূর্ব ! আশ্বাসভরা সে মুখ সে চোখ অতুলনীয় ;
আমি বুঝলাম আমার মা অটুট, আমার মা অনন্যা একক।
আমার মাকে আরো গভীর করে ভালোবাসলাম
ভালোবাসলাম আমার দিয়ে
আমার রৌদ্রালোকিত দিনে, মাকে আরো গভীর করে
ভালোবাসব বলে শপথ নিলাম।

(নার্গিস খানম : শপথ।)[৩]

---

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৪৭
২. ঐ পৃ. ৫০
৩. ঐ পৃ. ৫১

(চ) মধুর মধুর দেশের মাটি
খাঁটি যে তার বুক।
এই মাটিতে জনম নিয়ে
পেলাম পরম সুখ।
এই মাটিতে ফসল ফলাই,
মনের সুখে সকলে খাই,
এই মাটির বুকে বুক মিলিয়ে
ভুলি সকল দুখ॥

(তারা ইসলাম : একটি গান)[১]

(ছ) অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র উল্লাসে।
চিনি তারে চিনি
অতনু প্রবাহ তার
অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিংকিনী
আচ্ছন্ন পূর্ণিমা— চাঁদ এই-ত স্বদেশ॥

(সৈয়দ আলী আশরাফ : পূর্ণিমা স্বদেশ।)[২]

(জ) • .. ..
আহত স্বদেশ এখন আন্দোলিত
উচ্ছলিত স্বদেশ এখন
শবাধার সামনে রেখে
প্রতিজ্ঞায় আতপ্ত :
ছিন্ন কুসুমের মালা কণ্ঠে তাঁর
অমরতার চেতনায় উজ্জ্বল এখন
আহত স্বদেশ আমার॥

(মোজাম্মেল হোসেন : আহত স্বদেশ।)[৩]

(ঝ) এত মৃত্যুর কথা স্মরণ করেই
আমাদের আয়ু মৃত্যুহীন
আর তোমায় ভালোবাসি বলেই,

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৪৯
২. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত—আধুনিক কবিতা, বাঙলা একাডেমী ঢাকা, (১৯৭১)। পৃ. ৫
৩. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৩৩

জীবন আমার,
এত সহজে প্রাণ দিয়ে যাই।
(আবদুল গণি হাজারী : ভালোবাসি বলেই।)[১]

(ঞ) "কোটি মানুষের হৃদয়ে মুখর হয়
রৌদ্র রাঙা শপথের স্বাক্ষর
: আমরা বাঁচতে চাই
: আমরা বাঁচতে চাই।
এই অগ্নিবলয়ের প্রান্তে
সরব হয়েছে অগণিত মানুষের দল
ঝড়ে ঝাপটায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন তরী
ভিড়েছে এই আলোর উপান্তে
যেখান থেকে ইতিহাসের যাত্রারম্ভ
সেখান থেকে সব মিছিলের
নব দিগন্তে পদ সঞ্চার।
(মযহারুল ইসলাম : অগ্নিবলয়ের প্রান্তে,
বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০)[২]

(ট) যেমন নদীকে তার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না
পাখীকে তার গান থেকে
এবং ফুলকে তার সৌরভ থেকে
তেমনি আমার সত্তা থেকে এই দেশকে।
... ...
তাকে কেউ আমার কাছ থেকে
কেড়ে নিতে পারবে না
কিংবা আমাকে তার কাছ থেকে।
... .
এই দেশ আমি বিকিয়ে দেবোনা পণ্যের বিনিময়ে
এদেশ আমার প্রেমে, অপ্রেমে ; শঙ্কা ও সংশয়ে

১. আধুনিক কবিতা পৃ. ১৩
২ ঐ পৃ. ৫১-৫২

শত্রুকে আমি দেবোনা এখানে অকারণ প্রশ্রয়,
রক্তের দামে কিনেছি এদেশ
আমার স্বদেশ, তবে আর কেন ভয় ?
বন্ধু এবং আত্মীয়জন, মোর প্রিয়তমা নারী
আমরা সবাই শত্রুর সংহারী।

(আবুহেনা মোস্তাফা কামাল : কান্তির গান,
মাহেনাও : ডিসেম্বর, ১৯৬৫)[১]

(ঠ) উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে জমিদার বেশভূষা মোগল প্রহরী
দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে প্রতিদিন আমার স্বদেশ।

(সুব্রত বড়ুয়া : স্বদেশ-টুরিস্ট ব্যুরোর ছবিতে,
সমকাল : ফেব্রু-মার্চ, ১৯৬৯)[২]

(ড) এমন মধুর প্রেমের ছবি
কোথায় খুঁজে পাবো—?
বাংলাদেশের মায়ের
মিষ্টি মধুর কথার মতো ?
ঘোমটা পড়া মা বোনেদের লজ্জা রাঙা বেশ।
সকল দেশের চাইতে সুন্দর মোদের এই দেশ॥
তাই, বড় ভালোবাসি আমি আমার এ দেশকে।
প্রীতির রঙে জড়িয়ে ধরি মাটির মমতাকে॥

(কল্পনা মোহরের : পথে পথে)[৩]

(ঢ) সেই ফুলের যাদুতে
আমি আর আমি থাকব না
আমি হব আমরা
আমি হব সকলের।

এরই নাম দেশ প্রেম
এরই নাম অমৃত

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৮৩-১৮৫
২. ঐ , পৃ. ২৬০
৩ গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৫৩-৫৫

তুমি ফুল হয়ে
আমাকে,
আমাদের সবাইকে
অমৃতের স্বাদ দিয়ে গেলে।

(শহীদুল্লা কায়সার : নক্ষত্র যখন ফুল হবে,
কিশোর শহীদ মতিয়ুরকে)[১]

দেশপ্রেম—তার আর একনাম অমৃত। জন্মের পর প্রথম ভালবাসা—মায়ের উজ্জ্বল অপূর্ব মুখমণ্ডল অনন্যা মা, সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসবার শপথ উচ্চারিত, কারণ, দেশকে, মাকে, মাটিকে নিজের সত্তা থেকে পৃথক করা যায় না, যেমন ফুলকে পৃথক করা যায় না তার সৌরভ থেকে, নদীকে তার স্রোত থেকে বা পাখিকে তার গান থেকে। এই দৃঢ় প্রত্যয়-মাকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না—এই দেশকে বিকিয়ে দেওয়া হবে না পণ্যের বিনিময়ে- কারণ রক্তের দামে কেনা স্বদেশ।

সেই আহত স্বদেশ কবিদের চেতনায় জ্বালা ধরিয়েছে। কারুর কল্পনায় স্বদেশ এখন আচ্ছন্ন পূর্ণিমা চাঁদ। এই স্বদেশ এখন প্রতিজ্ঞায় আতৃপ্ত। কণ্ঠে ছিন্ন কুসুমের মালা নিয়ে অমরতার চেতনায় উজ্জ্বল।

যে কবিদের উদ্ধৃতি এ পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে, তাদের প্রায় সকলেই পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি স্থানীয় খ্যাতনামা কবি। এদের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তরে অন্তরে দেশ মাতৃকার অসহায় বন্দীদশা প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয়েছেন, আতঙ্কিত হয়েছেন, কিন্তু হতাশ হননি, মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন, প্রতাপশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের কলমে শুধু শিল্পের জন্যই শিল্প সৃষ্টি হয়নি—রাজনীতিও এসেছে. এসেছে সংগ্রামের আহ্বান। এটাও বিশদভাবে লক্ষ্য করার জিনিস। পূর্ববঙ্গের ঘটনায় আর একবার প্রমাণিত হল শিল্পী কবি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব কতখানি। কবিতায় এখন শুধু প্রকৃতি থাকবেনা, হো-চি মিন যেমন বলেছিলেন, কবিতার মধ্যে এখন ইস্পাতের ঝন ঝন আওয়াজ, মুক্তিললিত লগ্নের স্বপ্ন, কবির কর্তব্য শুধু কবিতা লেখাই নয়। হো-চি-মিন বলেছেন……

··"আজকে আমরা লোহা ইস্পাত এসব নিয়ে ও
কবিতা লিখতে দিয়েছি মন

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৫৭

এবং কবিও জানবে কী ভাবে
চালনা করবে আক্রমণ।"
(হো-চি-মিন : এক হাজার কবির কবিতা সঙ্কলন পড়ে।
অনুবাদক : সনাতন কবিয়াল)[১]

সাহিত্যিকের লেখনীই ক্ষুরধার তরবারি, কিন্তু পূর্ববঙ্গের কবিদের কর্তব্য এখানেই শেষ হয়ে থাকেনি। কবিরা দূরে থেকে, গজদন্ত মিনারে বসে শুধু স্বপ্ন দেখেননি, পথে নেমেছেন, মানুষের মিছিলে সামিল হয়েছেন, বৃদ্ধা কবি বেগম সুফিয়া কামালও মিছিল পরিচালনা করেছেন, গুপ্তঘাতকের হাতে শহীদুল্লা কায়সারের মত উদীয়মান প্রগতিবাদী কবির জীবনাবসান ঘটেছে, তাঁকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি। শিল্পী জাহির রায়হানেরও (শহীদুল্লা কায়সারের ভাই) এই একই পরিণতি হয়েছে।

সংস্কৃতির সাধকদের উপর আক্রমণের এহেন ঘটনা পূর্ববঙ্গেই প্রথম নয়। এই-ভাবেই প্রগতিশীল আন্দোলনের যাঁরা প্রতীক, যাঁরা বুদ্ধিজীবী, তাঁদের স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে সর্বত্র—জারের আমলে, ফ্যাসিষ্ট শাসনে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে। বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রচণ্ড সেসব দমননীতির ফল কি দাঁড়িয়েছে? ইতিহাসের চাকা কি উল্টোদিকে ঘুরেছে? ঘুরতে পারে কখনও? গোর্কীর মা তাই আজও ধ্রুপদী সাহিত্য, স্মরণীয় লেনিনের সাহিত্য কীর্তি, বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্—আজও অমর, অমর নজরুলের অগ্নিনির্ঝর রচনাবলী।

পূর্ববঙ্গের কবি সাহিত্যিকরাও তাঁদের মৌল দায়িত্ব পালন করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গেই। মৌল দায়িত্ব এই জন্যেই, স্বাধিকার না এলে, আপন দেশকে আপনার করে না পেলে জীবন যৌবন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে না, মানুষের, সমাজের, সভ্যতার অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়, শোষণ-অনাচার-নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মত জাতির মাথায় চেপে থাকে, জাতি ভোগে হীনমন্যতায়। সেই হীনমন্যতা থেকে, শোষণ অনাচার নিপীড়ণ থেকে মুক্তির জন্য যাঁরা ডাক দেন, ইতিহাসে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখা হয়ে থাকে। তাঁদের ভূমিকা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগণ্য।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাঙলায় কবিসমাজ যে আলোকিত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যে সংগ্রামী মনোবল দেখিয়েছেন, যে অপূর্ব আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে

১. মাসিক বাঙলাদেশ—দীপাবলী সংখ্যা, (১৯৭৪), পৃ. ৪৪।
সনাতন কবিয়াল—হো-চি মিন, সাহিত্যের আলোকে।

তাঁদের দৃপ্তলেখনী পরিচালনা করেছেন, যে সাহস নিয়ে এগিয়েছেন তা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

কবির মুখ থেকে কী জলন্ত ফরমান বের হয়েছে :—

হুজুর এবার 'গদ্দি' ছাড়ুন
ফুসমন্তর যতই পাড়ুন
কাজ দেবে না, কাজ দেবে না
লোক ক্ষেপেছে এবার দারুণ।
হুজুর যতই সেপাই জোটান
পটকা বাজি যতই ফোটান
দেবে না, কাজ দেবে না
হুজুর এবার নাটাই গোটান।

(খলিলুর রহমান : হুজুর এবার)[১]

ধর্মদ্রোহী, জাতিবৈরী বেইমান যে তাঁরা নন, এক অমল শপথ উচ্চারণের মাধ্যমে কবিতা জানাচ্ছেন :—

ধর্মদ্রোহী জাতিবৈরী বেইমান তুমি নও?
স্বার্থ গৃধ্নু মোল্লা তন্ত্রের ঘৃণ্য ফতোয়ার
কপটচ্ছায়ে লালিত এ প্রশ্ন অর্থহীন স্বভাবত ;
তবুও স্মিত হাস্যে আমার অটল সোচ্চার প্রতিবাদ
না · ··· না··· · ···না।
···· ·· ··· ··· ···
······এ দেশই আমাকে অন্ন দিল ;
ভাষা দিল ; দিল প্রাণবায়ু ;
দিল প্রেম ; দিল গতি এবং অনন্ত পরমায়ু।
আমি তো ক্লীব নই, অকৃতজ্ঞ মীরজাফর নই ;
আমি মৈত্রেয়ীর সন্তান।

বিদ্রোহী ভৃগু কিংবা নির্ভীক নচিকেতার সার্থক উত্তর পুরুষ। তাই শুনে রাখো শেষ ঘোষণা আমার বিচারকর্তা বন্ধুরা :

সবার উপরে মানুষ যদি আমি হই—
প্রতিজ্ঞা আমার : এদেশের মর্যাদা আমি রাখবোই-রাখবোই

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম প. ৩০

জীবনের বাণী হাতড়াতে গিয়ে বারংবার
তোমাদের পানে চেয়ে—ওরা জীবনভীরু প্রভাবিত হবে না আর।
(শেখ সাবির আলি : শপথ।)[১]

কবি জানেন, সংগ্রাম এবং শহীদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, ধ্রুবতারা প্রতীক্ষারত—

... ...

মরণ
জয়ী মানুষের রক্তের কণায়
সূর্যোদয়ের মতন সে রক্তাভায়
উদ্দাম এদের প্রত্যাশিত দিগন্ত
যারা পিছু টানে না পড়ন্ত
বেলায় যারা উন্মুখ নতুন
সূর্যের। এদের বাসনায় প্রসূন
বাড়ছে শনির বলয়ে এবং অতঃপর
জন্ম নেবে আবশ্যিক নিয়মে। প্রহর
প্রতীক্ষারত নিশ্চিত ধ্রুবতারা তাই
প্রভূত রক্তের সাথে মিতালি পাতাই।
(শেখ মাহমুদল হক : ধ্রুবতারা প্রতীক্ষারত।)[২]

তীক্ষ্ণ মনের অধিকারী সেখানকার কবি, সমস্তকালেই তার এমন্বিধ ভূমিকা—
তার দিব্যি চোখের সম্মুখে রোম পোড়ে,
আর নীরো বেহালা বাজায়। জ্ঞানী রাজা সলোমন দূর থেকে
দেখলেন, শেবার রাণীর তৈরী ফুলের নিকটে মাছি ওড়ে।
যাদু নগরীর গিরি শীর্ষ থেকে ইউলিসিস সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখে।
ট্রয়ের যুদ্ধভরা ইতিহাস আসে তার নখদর্পণে,
তার চেনা গল্পের ঘটনা আর হর্ষোৎফুল্ল, শোকাকুল নায়ক নায়িকা,
সে আছে অলক্ষিতে সব দৃশ্যে, সব অঙ্গনে,
সমস্ত কালেই তার উজ্জ্বল ভূমিকা।

(ওমর আলী : তীক্ষ্ণমন।)[৩]

১, গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ ৬৮—।
২. ঐ পৃ. ৬৬
৩. ঐ পৃ. ৬৩-৬৪

পূর্ববঙ্গের অন্যতম বিদ্রোহী কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনন্য ভাষায় বর্ণনা করছেন ইতিহাসের নীলাম, যে নীলামে ধূলার দামে নকল সোনার তাজ অবহেলায় অবজ্ঞায় বিলিয়ে যাচ্ছে মহারাজের চোখের সামনে, অন্যের কাছে, জনতার হাতে পড়েছে আজ তার প্রাণের চাবি—

পালিয়ে যাবে ?
রাস্তা কোথায় বলো ?
তোমার মাথায় টাল রাখতে
সব রাস্তায় তোমার তোলা
দেয়াল টলোমলো।
জানলে মহারাজ
সেই একুশের চুলোয় যারা—
পুড়িয়ে ফেলে ব্যর্থ প্রাণের লাজ
রঙ দিয়েছে রক্তজবা কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে—
আজও যাদের নামের আজান
আকাশ আগল ঠেলে
কাল বোশেখীর ঝঞ্ঝা হয়ে ওঠে
লাখো তাদের ভাই বোনেরা
পথে পথে মুখোশ দিচ্ছে ছিঁড়ে।
মুখ লুকোবে ?
জায়গা কোথায়
এত চোখের ভিড়ে ?
ইতিহাসের সর্বনাশা নীলাম ডাকে আজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে
নকল সোনার তাজ।

(শিকান্দার আবুজাফর : ইতিহাসের নীলাম।)[১]

সত্য সত্যই ইতিহাসের এত বড় নীলাম পৃথিবীতে ইদানীং কালে আর কোথায় হয়েছে ? ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এ এক অভিনব আশ্চর্য নাটক অভিনীত হল। নাটকের সব অঙ্ক হয়তো এখনো শেষ হয়নি, যবনিকা পতনের এখনো হয়ত বহু দেরী,

১, গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৬১-৬২

তাহলেও অঙ্ক থেকে অঙ্কান্তরে দ্রুততালে এগিয়ে যাচ্ছে নাটক তার রুদ্রবিষাণ বাজিয়ে।

স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে পূর্ববঙ্গবাসী প্রাথমিকভাবে জয়ী। তাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, পশ্চিমের শাসন ও শোষণকে দূরে হঠিয়ে দিয়েছেন বাহুবলে, তাঁদের কবিদের স্বপ্নে দেখা 'বাঙলাদেশ' আবির্ভূত হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সত্তা নিয়ে। এই 'বাঙলাদেশ' সৃষ্টির সাধনায় রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর জাগ্রত সংস্কৃতির প্রভাব অসামান্য বললেও অত্যুক্তি হয় না।

মুখ্যতঃ ভাষা নিয়ে যে সংগ্রামের শুরু, যার মধ্যে দিয়ে জনগণ উপলব্ধি করেছে পশ্চিমের উপনিবেশ—সুলভ শাসন ও শোষণের প্রত্যক্ষ কুফল, সেই আন্দোলনই সংগঠিত বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে ধর্মের আগল ভেঙ্গে প্রতিষ্ঠা করল বাঙালীদের স্বাধিকার রক্ষার ভিত্তিতে একটি জাতীয়তাবাদী ধর্ম রাষ্ট্র 'বাঙলাদেশ'। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারায় এই তাৎপর্যটুকু বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য।

একটি জাতির স্বাধিকার আদায় করা নিশ্চয়ই কষ্ট সাধ্য, বিশেষ করে একালের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যখন নানান ধরনের জটিলতা, পারস্পরিক স্বার্থ, বিবাদ, বিসম্বাদ জড়িত। জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, অন্য কোন পরাক্রমশালী রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়তে পারে, বিরাট বড় ঝুঁকি নিয়েছেন ওদেশের মানুষ।

দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে সেখানকার সাহিত্য সংস্কৃতিসেবীদের মধ্যে এখন তাই দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রচুর। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিলে এই দ্বিধা ও সংশয়ের সঙ্গে পরিচয়লাভ করা যাবে। শামসুর রহমানের একটি কবিতাকে লেখক বলেছেন, 'পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে শামসুর রহমানের কবিমানসের যে দ্বিধা ও সংশয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে, সে দ্বিধা ও সংশয় শামসুর রহমানের একার নয়, পূর্ব বাঙলার অভিজাত মহলের কবি সাহিত্যিকদের ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা আজ প্রগতিশীল বলে পরিচিত, তাঁদের সকলেরই। এমনকি যাঁরা আজ সাহিত্যাঙ্গনে স্পষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তারাও আজ দ্বিধামুক্ত নয়। সকলেই আজ দেশের বর্তমান অভিজাত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারুণ সংশয় পোষণ করেছেন, তবুও এই শ্রেণীর উপর থেকে মোহ কাটাতে পারছেন না, বিচ্যুত হতে পারছেন না এই শ্রেণী থেকে।'

ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার আর
মোক্তার আর রাজনীতিবিদ

আদার ব্যাপারী আর ব্যাঙ্কার
পেডেণ্ডো আর মিহি কলাবিদ
খুঁটবে আমার কাব্য !
তাদের জন্যে লিখবো এবং
তাদের জন্যে ভাববো ?
শকুন উকিল আর ঘোর ঠিকাদার
আর নিধিরাম সর্দার আর
হুজুরের জী-হাঁ হুঁকোবরদার
বৈদ্য এবং বৈশ্য
ঘাঁটবে আমার প্রাণ-নিঙ্‌ড়ানো
সাধের অনেক শস্য !
তাদের জন্যে সকাল সন্ধ্যে
গাধার খাটুনি খাটবো ?
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগা
সরু দড়িটায় হাঁটবো ? [১]

লেখক বলছেন, 'এই দ্বিধা থেকে মুক্ত হওয়ার সময় এসেছে এখন।' কাদের জন্য লিখবো ? কাদের জন্য কাজ করবো ? এইসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট সমাধান ছাড়া আমাদের দেশে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজগঠন প্রভৃতি বিষয়কে সৃজনশীল পথে বিকশিত করা আজ অসম্ভব। ঐতিহাসিক পটভূমিতে আমাদের দেশের সমাজ কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে আজ আমাদের ইতিহাসকে এগিয়ে নেওয়ার পথ স্থির করতে হবে, পথের বিঘ্নকে অতিক্রম করতে হবে। মুমূর্ষু অভিজাত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় নাকউঁচু বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে বাহবা লাভের মোহ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে আজ জনগণের দ্বারস্থ হতে হবে সৃজনশীল প্রতিভাকে।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চেতনা পূর্ব বাঙ্‌লার সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে গেছে। সামন্তবাদী জীবন-ভাবনাকে বিসর্জন দেওয়ার এক বলিষ্ঠ প্রয়াস তখন থেকে তরুণ লেখকদের মধ্যে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী যুগের জীবন ভাবনাকে বিসর্জন দেওয়ার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। আর নজরুল—সুকান্ত—মানিক—সুভাষ প্রবর্তিত সাম্যবাদী ধারার প্রতিও তরুণ লেখকদের আগ্রহ দেখা দেয়।" এই লেখক এরপরেই মত প্রকাশ করেছেন যে,

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, কালের যাত্রার ধ্বনি, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা—১ (১৯৭৩) পৃ. ৬৬।

"ভাষা আন্দোলনের পর থেকে আমাদের লেখকরা পুরোনো মূল্যবোধকে যতটা অস্বীকার করেছেন, নতুনের অম্বেষণে ততটা অগ্রসর হননি। ভাষা আন্দোলন যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিক পথ ধরে যৌক্তিক পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি, সাহিত্যও তখন আর প্রগতিশীল পথে অগ্রসর হতে পারেনি—হতাশার অন্ধকারে নিমগ্ন হয়েছে"[১]

অন্যত্র প্রবন্ধ লেখক আরও বলেছেন, "আজ পূর্ব বাঙ্লা এক সমূহ সর্বনাশের মাঝখানে এসে পৌছেচে। দারিদ্র, অপমান, লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা শতকরা নব্বই জনেরও অধিক বাঙালীকে আজ পঙ্গু করে দিয়েছে, সমাজ ভেঙে পড়েছে, দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচার সর্বত্র একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য বহিঃশক্তির শোষণ ও অশুভ প্রভাব আজও পূর্ব বাঙ্লাকে গ্রাস করে রেখেছে। এই অবস্থায় পূর্ববাঙ্লার জনগণের মুক্তি আজ কোন্ পথে এটাই সকল প্রশ্নের মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আজও জনগণের জানা নেই। চিন্তার দিক থেকে সমাজের যে অংশ অগ্রবর্তী তাঁরা হলেন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবিদ, শিল্পী সাহিত্যিক প্রমুখ; এ প্রশ্নের উত্তর আজ তাঁদেরই দিতে হবে সর্বাগ্রে। সমাজের যে অংশ চিন্তার দিক থেকে পিছনে পড়ে রয়েছে তার চিন্তাকে এগিয়ে দেওয়া অগ্রবর্তী অংশেরই কর্তব্য। এই কর্তব্য সমাধা করার জন্য প্রয়োজন নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে যাঁরা চিন্তার দিক থেকে অগ্রবর্তী তাঁদেরই আজ এগিয়ে আসতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটি কথা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, সমাজের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিন্তাবিদ শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা সকলেই প্রগতিশীল নন এবং সকলেই জনগণের স্বার্থে কাজ করেন না, অনেকেই হীন উপায়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের সহযোগিতা করে ও জনগণের সর্বনাশ করে। প্রগতিশীলদের কর্তব্য প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ও সেইসঙ্গে সঠিক চিন্তাধারার দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা—যাতে জনগণ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন সাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

পূর্ববাঙ্লার জনগণের কণ্ঠ থেকে আজ মূলতঃ দুটি দাবি নিঃসৃত হচ্ছে। একটি হল সাম্রাজ্যবাদী ও অপর সকল বহিঃশক্তির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্ব বাঙ্লাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। অপরটি হল, পূর্ব বাঙ্লার বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এমন একটি সমাজ

---

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক—কালের যাত্রার ধ্বনি, পৃ. ১০৫

ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে মানুষের শোষণ নিপীড়ণ ও আধিপত্য বিলুপ্ত হবে এবং অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত এক নতুন সমাজ ও জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণের দুটি দাবি কি ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে এ সম্পর্কে জনগণের চিন্তা যথেষ্ট অগ্রসর নয়। তাছাড়া বহুকালের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস আজও জনগণের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অবস্থায় সমাজের চিন্তাশীল অংশ যদি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সংস্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত থাকেন—সামাজিক দায়িত্ব পালন না করেন—তাহলে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসবে না! অবশ্য শিল্পী সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে যারা প্রতিক্রিয়াশীল—তারা সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য জনগণের সর্বনাশ সাধন করে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বংশবদ হিসেবে কাজ করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার নেই।

পূর্ব বাঙ্‌লার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এতদিন সাম্প্রদায়িক অসাম্প্রদায়িক দল দুটির মধ্যে যে বিরোধ ছিল, আমার ধারণা, দিন দিন সে বিরোধ কমে আসবে। কারণ, কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দল এখন চূড়ান্ত পরাজয়ের মুখে। অসাম্প্রদায়িক দলের সামনেও কোন মহান আদর্শ নেই, শুধুমাত্র নেগেটিভ বক্তব্য বলে ততদিনই অগ্রসর হওয়া যায়, যতদিন বিরুদ্ধশক্তি প্রবল থাকে। বিরুদ্ধশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে নেগেটিভ বক্তব্যের আবেদন নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন প্রয়োজন হয় 'নিগেশন অব নিগেশন' এর, আমার মনে হয় অসাম্প্রদায়িক দল এই নিগেশন অব নিগেশন পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারবে না। তাই আজ পূর্ব বাঙ্‌লার জনগণকে সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির শোষণ নিপীড়ণ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার জন্য নতুন শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার অন্যায়, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নতুন শক্তির আবির্ভাব যত দ্রুত হবে ততই মঙ্গল।[১]

এই লেখকের বক্তব্য বিষয় একটু ভিন্ন ধরনের। এঁর বক্তব্য আলোচনা করার আগে আমাদের আরো কয়েকটি বিষয় বিশদভাবে বিবেচনা করার আছে। আমরা দেখেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই পূর্ববঙ্গবাসী বাঙালীর চেতনায় ধর্মের মোহ কোন ছাপ ফেলতে পারেনি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায় করতে সে দেশের বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। স্বভাবতই অন্য সুর ছাপিয়ে সাহিত্যের অন্যান্য অংশ থেকে কবিতায় দেশপ্রেম অর্থাৎ স্বাদেশিকতা মাথা তুলেছে, মূল সুর হয়ে উঠেছে। ওদেশে যে বুর্জোয়া আন্দোলন হয়েছে, তার হাতিয়ার হিসেবে কাজ

---

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, কালের যাত্রার ধ্বনি, পৃ.—১৪৩-৪৫

করেছে কবিতার এই মূল সুর, কিন্তু কৃষি প্রধান ও দেশের সমাজের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্থ ব্যবস্থার অন্তরের অন্ত স্থলে সত্যকার সন্ধানী আলো নিয়ে সে কবিতা কি প্রবেশ করতে পেরেছে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষার জগদ্দল পাথর নড়ানো সম্ভব হয়েছে কি? ধর্মীয় কুসংস্কারের শিকড় একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে? শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপ্ন কি সর্বাঙ্গীণ সার্থক হয়েছে? এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবুল কাসেম ফজলুল হকের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একটা বিরাট সম্ভাবনার অপরূপ ইঙ্গিত নিয়ে একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল, পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে কাব্যে যার প্রতিফলন সর্বাধিক, কিন্তু সেই স্ফুলিঙ্গ ভবিষ্যতে সে দেশের অধিক সংখ্যক জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির যজ্ঞে কোন দাবানল সৃষ্টি করবে, অথবা শ্বেত-সন্ত্রাসে স্তিমিত হয়ে তুষার ক্ষতে নিভে নিঃশেষ হয়ে যাবে, সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের গর্ভে। জাতীয়তাবাদ শেষ কথা নয় এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ অশেষ অকল্যাণ করতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজিরও দুর্লক্ষ্য নয়। বস্তুতঃ রাজনৈতিক জটিল আবর্তে আন্তর্জাতিক কূটনীতির খেলার অঙ্গন হিসেবে বাঙ্‌লাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এখন একটি নতুন অগ্নিগর্ভ অঞ্চল। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে কবিতা কি রূপ নেবে? কবিরা কোন পথে অগ্রসর হবেন? আগামী দিনের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা শোষণ শাসন মুক্ত কোন সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে তাঁরা কলম ধরবেন, সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন? তাদের সংগ্রামী সত্তা ইতিহাসের সরণি বেয়ে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে কি? পূর্ববঙ্গের কোন কোন বুদ্ধিজীবীর মনে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সে প্রশ্ন নিরর্থক মনে করি না। আবার এও মনে করি ঐতিহ্যপূর্ণ সেখানকার অদূর অতীত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাই হতাশ হবার কোন কারণ নেই। সেই সচেতনতার অভাব যদি ঘটে, পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে যদি বর্তমান কবিকুলের চিন্তাধারা, স্তিমিত হয় সংগ্রামী এষণা, মানবমুক্তির মহত্তর সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ হন যদি তাঁরা, সৃষ্টি হবে নতুন কবিকুলের, নতুন সংস্কৃতির জয়ধ্বজা বহন করে জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যাঁরা এগিয়ে যাবেন রক্ত শপথ উচ্চারণ করে।

পূর্ববঙ্গের কবিতায় উপরোক্ত মূল সুরের সঙ্গে অনুরণন তুলেছে আরো কতকগুলি গৌণ বা অপ্রধান সুর। কবিতা রামধনু। একটি দেশের কবিতায় সেখানকার সব রঙ। বিচিত্র বর্ণালীসহ ধরা পড়েছে। কালের সবকথা লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি, নিসর্গ চেতনা, যৌবন, প্রেম, অস্থিরতা, স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সবকিছু ছায়া ফেলে কবিতার মুকুরে। বিশাল ঊর্মিমুখর সমুদ্র বা অগণিত শিখর সমন্বিত ব্যাপ্ত হিমালয়ের সঙ্গেও তুলনা করা চলে কবিতার। হাজার হাজার তরঙ্গ বুকে

নিয়ে সমুদ্রের যে বিস্তার, কবিতারও তাই, কিম্বা হাজার পাহাড় দিয়ে গড়া হিমালয়ের মতই কবিতার হৃদয়, গহণ অরণ্য, স্বচ্ছতোয়া নদী, হিমবাহ ও তুষার মণ্ডিত শিখরের মতই বৈচিত্র্যে অনন্ত। নানা তরঙ্গে উদ্বেলিত পূর্ববঙ্গের কবিতার কান্তি আস্বাদনে তার বৈচিত্র্য ও বৈভবে, সম্পদে ও বৈশিষ্ট্যে শ্রদ্ধাশীল না হয়ে থাকা যায় না।

খালবিল, নদীনালা, বন বাদাড়ের দেশ পূর্ববঙ্গ। প্রাণময়ী পদ্মা, মন্দ্রিতা মেঘনা, ধবলী, ধলেশ্বরী প্রবাহিত ও মাটির শিরায় শিরায়। 'অবারিত মাঠ, গগন ললাট। চরণ ধৌত সাগর জলে, সুন্দরবন তার গহণ গভীর, ভয়াল ভীষণ অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত ছয় ঋতুর অপরূপ বাহার। শস্যের সমারোহ, আম জাম কাঁঠালের বন। নারিকেল বীথি। শ্যামল সবুজ পেলব কোমল মোহময় প্রকৃতি। জাতি বাঙালী। কবিতা তাদের প্রাণের সঙ্গে স্বতোৎসারিত।

প্রকৃতির অকৃপণ ক্ষুধা সেখানে মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে। কবিকে আকৃষ্ট করে সহজেই।

প্রকৃতি প্রেম কবির সহজাত প্রবৃত্তি। প্রকৃতির অপরূপ ছোঁয়া থাকলে কবিতা প্রকৃত কবিতা হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতায় নিসর্গচেতনা কতখানি, প্রকৃতির রূপলাবণ্য তাঁদের কবিতায় কতটা প্রতিফলিত, তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন হয়ত সহজ নয় খুব, তাহলেও এই ধরনের কবিতার রসাস্বাদনে এবার আমরা অগ্রসর হব।

দেশের মাটি জল আকাশ বাতাসের সঙ্গে মানুষের নাড়ীর সম্পর্ক। দেশকে তাই সে ভালবাসে দেশমাতৃকারূপে পূজা করে, মানুষ এবং প্রকৃতির সত্তা একীভূত হয়ে যায়।

সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় পূর্ব বাঙলার নিসর্গ শোভা সুন্দর রূপ পেয়েছে। 'আমার পূর্ব বাঙলা—দুই' শীর্ষক তাঁর একটি পুরা কবিতা :—

আমার পূর্ব বাঙলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালোকেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি

আমার পূর্ব বাঙলা বর্ষার অন্ধকারের
অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া
সিক্ত নীলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনকলতায় ঘেরা
কবরী এলো করে আকাশ দেখার
মুহূর্ত
অশেষ অনুভব নিয়ে
পুলকিত স্বচ্ছলতা
এক সময় সূর্যকে ঢেকে
অনেক মেঘের পালক
রাশি রাশি ধান মাটি আর পানির
কেমন নিশ্চেতন করা গন্ধ—
কতদশা বিরহিণীর—এক দুই তিন
দশটি—
এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল
অভিসার
ঘর আর বিদেশ আঙিনা
আকুলতায় একাকার
তিনটি ফুল আর অনেক পাতা নিয়ে
কদম্ব তরুর একটি শাখা মাটি
ছুঁয়েছে
আরও অনেক গাছ পাতা লতা
নীল হলুদ বেগুনী অথবা সাদা
অজস্র ফুলের বন্যা অফুরন্ত
ঘুমের অলসতায় চোখ বুঁজে আসার মতে
শান্তি—
কাকের চোখের মতো কালোচুল
এলিয়ে

পানিতে পা ডুবিয়ে -রাঙা—উৎপল
যা'র উপমা
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে
দেহ ঘিরে
সে দেহের উপমা স্নিগ্ধ তমাল—
তুমি আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা
পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ।

(আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা—দুই।)[১]

আমার পূর্ব বাঙ্‌লা নিয়ে 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' গ্রন্থে তিনটি কবিতায় কবির চিত্তে প্রকৃতি অনুরণন তুলেছে, সংবেদনশীল কবির কবিতায় রূপমণ্ডিত হয়ে উঠেছে পূর্ব বাঙ্‌লার প্রকৃতির চিরন্তন ভাব সম্পদ। সহজ স্বাভাবিকভাবে ধরা দিয়েছে এখানে প্রকৃতি। স্নিগ্ধ মধুর আলেখ্য রচিত হয়েছে—

আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা কি আশ্চর্য
শীতল নদী
অনেক শান্ত আবার সহসা
স্ফীত প্রাচুর্যে আনন্দিত
... ...
কতবার বক আর গাঙ শালিক
একটি কি দু'টি মাছরাঙা
অবিরল কয়েকটি কাক
বাতাসে বাতাসে প্রগল্‌ভ কাশবন
ঢেউ-ঢেউ নদী প্রচুর কথার
কিছু গাছ আর নারকেল শনপাতার
ছাওনির ঘর নিয়ে
এক টুকরো মাটির দ্বীপ······

(আমার পূর্ব বাঙ্‌লা—এক।)[২]

আবার আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৯৬।
২. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৯৭

বৃষ্টি বৃষ্টি এখানে সেখানে
পৃথিবীর সর্বত্র
শিকাগো শহরে নিউইয়র্কে প্যারিসে
কোথাও আলো ছুঁয়ে, কোথাও
জানালার কাচে
কোথাও মসৃণ ঐশ্বর্যের গাড়ী, বর্ষাতি,
ছাতা—
আমার পৃথিবীর বৃষ্টি—মাটির
গন্ধ, ধানক্ষেত ভেসে যাওয়া
আমগাছের ডাল ভেঙে পড়া
হঠাৎ গরুর ডাক, ভিজে-যাওয়া
পাখীর ডানা ঝাপটানো
আবার পুকুরে, নদীতে
ডোবায় লাবণ্যের সাড়া
... ...
এবং সমস্ত শব্দের একাগ্রতায়
আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা
একাকী একটি বৃষ্টি রাত্রের শব্দের মতো
আমার পূর্ব-বাঙ্‌লা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো ।

(সৈয়দ আলী আহসান, আমার পূর্ব বাঙ্‌লা—তিন)[১]

হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরী, হঠাৎ গরুর ডাক, একগুচ্ছ স্নিগ্ধ তমাল, কালোকেশ মেঘ, কনকলতা, অনেক মেঘের পালক, রাশি রাশি ধান মাটি, কদম্ব তরুর শাখার মাটি ছোঁয়া, নীল হলুদ বেগুনী সাদা অজস্র ফুলের বন্যা, শীতল নদী, গাঙ শালিক, মাছরাঙা, নারকেল, শণ পাতার ছাউনি, বৃষ্টি বৃষ্টি, আমগাছের ডাল ভেঙ্গে পড়া, এইসব চিত্রের কুশলী সমন্বয়ে শ্যামল সবুজ শোভন সহজ সুন্দর পূর্ব বাঙ্‌লার রূপ ও ভাবের যে দ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন, তাতে আমাদের চিত্ত অলৌকিক পুলক ও বেদনায় মথর হয়ে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয় কবিতাগুলি, শিল্পের দিক থেকেও সুন্দর, ভাবের অভিব্যক্তিতে অনন্য। এইরকম নিসর্গচেতনা সংগ্রামী কবি সিকান্দার আবু জাফরের কবিতাতেও দুর্লভ নয়, আকাশ শীর্ষক অতি সুন্দর কবিতায় কবি

১. সৈয়দ আলী আহসান (১৩৬৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ।

আকাশের অসীম বিস্তারের মধ্যে দেখেছেন আপনার জীবনের ব্যাপ্তি—হৃদয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন আকাশকে আপন করে, কারণ আকাশ দুর্মূল্য স্বস্তির মত ওতঃপ্রোত অস্তিত্বে তাঁর প্রত্যহের ঘনিষ্ঠ দুর্লভ অনুভূতি।

আকাশ আকাশ ভালো লাগে
সোনালী রূপালী কৌটা খুলে
বেহিসাবী ঢেলে দেওয়া প্রচুর প্রচুর
নীল অথবা ধূসর তামা
আয়োজন বিচিত্র বর্ণের
বারম্বার সুপ্রাচীন এক চিত্রলিপি
······পোষমানা পায়রার ঝাঁক,
তাদের ডানায় নেই আকাশের বিস্তৃতির নেশা
সুতো বাঁধা ঘুড়ির মতন
অসম্বৃত দুশ্চিন্তার সে চারণ ভূমি
আমার আকাশ নয়,
অকস্মাৎ আশ্বিনের হিমঝরা রাতে
উন্মুখর শেফালীর আনন্দের মত
যে আকাশ জড়িয়ে রেখেছি
হৃদয়ের সমস্ত জগতে।
যত উর্ধ্বে যেতে চায়
আরো উর্ধ্বে মেলে রাখে পথের ঠিকানা
নিশ্চিহ্ন আকাশ।
ভয়ার্ত স্বপ্নের শেষে হঠাৎ জাগায়
দুর্লভ স্বস্তির মত যে আকাশ
ওতঃপ্রোত অস্তিত্বে আমার
প্রত্যহের অনুভূতি ঘনিষ্ঠ দুর্লভ।

(সিকান্দার আবু জাফর : আকাশ)[১]

এই কবিতাটিতে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, শুধু নিসর্গ সৌন্দর্য নয়, প্রকৃতির জগৎ থেকে কবি এখানে জীবনের প্রেরণা আহরণ করতে চাইছেন।

১. আধুনিক কাব্য সংগ্রহ, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, কার্তিক (১৩৭০)।

সরল সুন্দর সজীব ভাষায় এইরকম নিজের দেশের প্রকৃতির প্রাণময় চিত্র এঁকেছেন গানে গানে মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান।

ফুল পাখী তটিনী কি
পাহাড় মরু
বনের তরু
সকাল দুপুর সাঁঝে
যা কিছু দেখি
সেতো আমার দেশের প্রিয়
সচল ছবি ॥
প্রজাপতি উড়ে বসে
ফুলের বনে
মহুয়ার মধু সেতো
আনে গোপনে
... ...
ছলকে কলস কাঁখে
বধুয়া আসে
ফসলের স্নেহ তার
নয়নে ভাসে
... ...
মাল্লার হাতে দাঁড়
ছন্দে নাচে
ঢেউ ভাঙে দু'পাশের
সোনালী কাচে
উন্মন সুরে ঘুরে
দোলায় সবি
এতো আমার দেশের প্রিয়
সচল ছবি ॥

(মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান : ৩০ সংখ্যক গান)[১]

১ মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, (১৯৬৮) অনির্বাণ, রেনেসাঁস 'প্রিন্টাস', ১০ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা। পৃ. ৬।

আবার—

ঘাসের শিশির
তটিনীর নীর
আমার দেশের প্রিয় গল্প বলে।
স্বপ্ন অলির
শুনি মঞ্জির
মনের হরিণতায় ছন্দে চলে॥

ক্ষিপ্র চরণে আসে ঝর্ণাধারা
দুর্বার বেগে যেন পাগল পারা
সে যে সাগরের কানে কানে কৌতূহলে
আমার দেশের প্রিয় গল্প বলে॥

(মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান : ৩১ সংখ্যক গান)[1]

আরও

এদেশের সোনার দেহে
লাগে নতুন ছন্দ
আমাদের অযুত প্রাণে
আজ কী আনন্দ॥
যেন নতুন বাউল এসে
গেল গান শুনিয়ে ভেসে
ওই মাঠের অপার শস্যে দোলে
কী মধু গন্ধ॥
যেন বকুল বকুল মৌ
বকুল মৌ
মিষ্টি হাসির মুকুল বনে
কওনা কথা বৌ।

(মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান : ৩৭ সংখ্যক গান)[2]

কবি মোহাম্মদ মণিরুজ্জামানের এইসব সহজ সুরের গানে ফুটে উঠেছে পূর্ব বাঙলার পেলব চিত্র—ফুল, পাখি—তটিনী, পাহাড়, মরু, অলিগুঞ্জন—ক্ষিপ্রচরণ

১ অনির্বাণ, পৃ. ৪০
২ অনির্বাণ, পৃ. ৪৬

ঝর্ণাধারা, বাউল, শস্যের মধুগন্ধ, বকুল মৌ, বৌ কথা কও, প্রজাপতি, মহুয়ার মধু, খড়ের ঘর, কলস কাঁখে বধূ, ঘাসের শিশির, তটিনীর তীর প্রভৃতি সুন্দরভাবে গ্রথিত—আবেগ ও অনুভূতিতে ঋদ্ধ।

গ্রাম বাঙ্‌লার প্রভাত সূর্য, হেমন্ত মাঠ, পল্লীর দুলালী বধূ, পুকুর ঘাট, রোদের পাখা, মাঠের বিচূর্ণ সোনা, লাঙলের ফলা প্রভৃতি নিয়ে বর্ণোচ্ছল চিত্র এঁকেছেন হাবিবুর রহমান—

প্রভাতের সূর্য আজ কি সোনা ছড়িয়ে দিলো
হেমন্তের মাঠে
পল্লীর দুলালী বধূ কী মায়া বুলায়ে দিলো
পুকুরের ঘাটে।
মুঠি মুঠি কাঁচা রোদ মাঠ ভরে দিয়ে গেল
ঐশ্বর্য অক্ষয়
শ্যামলী গাঁয়ের মেয়ে ঘাট জুড়ে রেখে গেল
কালো পরিচয়
মাঠ দেখে ভরে ওঠে বুক
ঘাট দেখে নয়ন উন্মুখ।
বাতাসে ভরিয়া আসে দূরায়ত কার স্মৃতি
রোদের পাখায়,
মাঠের বিচূর্ণ সোনা মুঠি মুঠি হাতে লয়ে
নয়নে মাখায়।
পুকুরের ক্লান্ত ঘাটে, থমকি থমকি আসি
চকিতে তাকায়,
চোখের কাজল লয়ে মনের অঞ্জন টানি
মাটিতে মাখায়
মাঠে হেরি সুবর্ণের সুখ
ঘাটে আসি নয়ন উন্মুখ।
এ সোনা আমার চেনা এ স্বপ্ন হেরিয়া ছিনু
লাঙল ফলায়,
এই স্নিগ্ধ মুগ্ধমায়া আমারি খড়ের ঘরে
জাগে নিরালায়

আমার মনের সোনা, আমার আঁখির মায়া
রোদের ঝর্ণায়,
মাঠ জুড়ে, ঘাট জুড়ে অগোচরে আত্মমুগ্ধ
কে যেন ছড়ায়,
মাঠে যার চিনিয়াছি মুখ—
ঘাটে দেখি সে জন উন্মুখ।

(হাবীবুর রহমান : উপান্ত)[১]

রোমান্টিক ভাবুলতার স্পর্শে কবিতাটিকে বেশ জীবন্ত মনে হয়।

বাঙ্‌লাদেশের অকাল বৃষ্টির অসামান্য রূপ দেখেছেন কবি সানাউল হক, তিনদিন তিন রাত অনর্গল জলের মাদল, কার্তিকের আইবুড়ো ধানের ক্ষেতে, রোদ শুকনো ডোবায়, রূপালী রেখা শান্তশ্রী নদীতে, ধানকন্যের মুখ চেয়ে কবির কবিতা—

তিনদিন তিন রাত অনর্গল
জলের মাদল
ঝির ঝির ঝির।
হিম তাড়িত বুনো হাসের দল
আকাশ ভেঙে নামল
কল কল কল।
নামল নামল নামল
বৃষ্টি : বৃষ্টি : বৃষ্টি :
কার্তিকের আইবুড়ো ধানের ক্ষেতে
রোদ শুকনো ডোবায়
রূপালী রেখা শান্তশ্রী নদীতে—

হে ধান কন্যে!
শুধু তোমার মুখ চেয়ে
তোমার সোনা দানায়
আমাদের ঘর ভরে দেবে আশায়
আমার দুর্লভ ছুটীর এ কয়টা দিন

১. হাবীবুর রহমান (১৯৬২) উপান্ত, কাবুল পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২

বৃষ্টির হাতে সঁপে দিলাম—
তোমার সোনালী চুলের গুচ্ছে
স্বপ্নের শিবির বাঁধলাম

(সানাউল হক : ধানকন্যার জন্য)[১]

বৃষ্টির অনবদ্য রূপ বর্ণনা করে চলেছেন কবি—

এই যে বৃষ্টি
সন্ধ্যার আগে ভাগে এসে
সবুজের অন্ধকার মুঠি মুঠি নিয়ে
ঘাস বনে ধান ক্ষেতে
বাবুই পাখীর নীড়ে
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে
ঝুপ ঝুপ ঝরে
উঠোনো পুকুরে
অনর্গল ঠিক এক সুরে।
সেকি ভেঙে পড়া আকাশের
পাখা পেয়ে ছুটে এল

এই যে বৃষ্টি
সে কি সাড়া দেয়া আকাশের মন ?
ডানা মেলা ঊর্ধ্বমুখী পাখী
দিনমান গেল যারে ডাকি
সে কি তার পিপাসার ধন ?

এই যে বৃষ্টি
সে কি ছাড়া পাওয়া আকাশের মন
জলধির ডাক শুনে
হল জাতস্মর ?
বিরহিনী সমুদ্র কন্যার
এলোকেশী ছায়া মুখ

১. আধুনিক কাব্য সংগ্রহ, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, কার্তিক, ১৩৭০

দীর্ঘশ্বাস, বুকের হুতাশ,
জমেছিল ছায়া মেঘ যত
নদীর মনের কথা
আত্মভোলা কোমরের দোলা
... ...
সব তার সূর্য গুঁড়ে গুষে
কার সেই সুস্পষ্ট গোপন
ভরেছিল এক চক্ষু ভাণ্ডারীর ধন

এই যে বৃষ্টি
সে কি সমুদ্রের, সরসীর ঘরে ফেরা মন ?
(সানাউল হক : এই যে বৃষ্টি)[১]

বাঙ্‌লার একটি নির্জন নদীতীরের চর—কাশবন, বাবলার ঝোপঝাড় নিয়ে কবির তুলিকায় যেমন রূপ পেয়েছে—

কাশবন ঝাড়গুলি যেন একখানি রূপালী চাদর
বিছানো রয়েছে এই সীমাহীনচরের উপর
বাবলার ঝোপ ঝাড়,
গৃহে ফেরা রাখালের দূরাগত ভাটিয়ালী সুরে
মন যে হারিয়ে যায় অসীমের অনাদি সুদূরে।
(আজিজুর রহমান : দিনান্তে গোরাই নদীর তীরে)[২]

আলমাহমুদ চণ্ডীপদ চক্রবর্তীকে নিবেদিত 'রাস্তা' নামক কবিতায় পূর্ববঙ্গের আবহমান কালের গ্রামের একটি বড় বাস্তব চিত্র এঁকেছেন—

যদি যান,
ঝাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘর বাড়ী।
চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।

১. আধুনিক কাব্য সংগ্রহ.
২. ,, ,, ,,

কিষাণের ললাট রেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।
দেখবেন লাউয়ের মাচায় ঝোলে
সিক্ত নীল সাড়ীর নিশেন।
শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ
দেখবেন ভাদুগড়ের শেষ প্রান্তে
এক নির্জন বাড়ীর উঠোনে ফুটে আছে
আমার মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাসবতী
একটি ম্লান দুঃখের করবী !

(আলমাহমুদ : রাস্তা, চণ্ডীপদ চক্রবর্তীকে)[১]

কবিতাটি কুশলী শিল্পীর রচনা। লাউয়ের মাচায় সিক্ত নীল সাড়ীর নিশেন, চাষা হাল বলদের থমথমে হাওয়া, কিষাণের ললাটরেখার মত নদী, শুঁটকির গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ প্রভৃতি প্রতিদিনের চিত্রকল্প এক ঘরোয়া রূপ নিয়ে তাঁর কবিতায় উপস্থিত।

দুর্বিষহ দিন যাপনের ক্লান্তির রেখাচিত্র 'এবারের আশ্বিন' কবিতায় এঁকেছেন কায়সুল হক—

"আশ্বিন এসেছে
পাটের দাম না পাওয়া
হাড় জিরজিরে কৃষকের মতো।

আশ্বিন এসেছে
কাজ না-পাওয়া কামলার
বিরস দিন নিয়ে।

আশ্বিন এসেছে
তিন দিন দাড়ি না কামানো
ইস্কুল মাষ্টারের চেহারা নিয়ে।

আশ্বিন এসেছে
অল্প বেতন কেরাণীর
ন্যুব্জ দেহের মতন।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৭২

আশ্বিন এসেছে
বেকার যুবকের
মলিন পাৎলুন এঁটে।

পূজোর ঢাকেও বুঝি
তাই পড়ে না কাঠি।[১]

কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকৃতির কবিতায় জীবনের অসহ অবস্থা, দেশের পরিবেশ, এই হিসেবে কবিতাটি মূল্যবান।

এই ধরনের কবিতা, যেখানে অনন্ত শোভার আস্পদ প্রকৃতির দুর্দশার সর্বনাশা চিত্র এঁকেছেন কবি, সেগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রকৃতি জীবন ও সংগ্রাম সেখানে একাকার, যেমন—

(ক) গভীর চেতনার যে ঘণ্টাধ্বনি বাজছে
তাকে আমি কেমন করে ভুলব।
সবুজ আস্তরণটায় যে প্রশান্তি
নির্জন বটমূলে যে বাউল
গানের দ্বিধায় উচ্চকিত যে বাঁশী
তার ছায়া
তার ধ্যান
তার গমক
আমার ব্যাকুলতার প্রিয়চর।
বকুল যেমন কুলের নারীকে ব্যাকুল করে
তেমনি আমের বোলের স্বপ্নে সারি সারি পিঁপড়ে
অপেক্ষমান চাঁপা ও করবী ধারাস্নানে।

(খ) অথচ এখনই কেমন
চিনিনা-চিনিনা-গন্ধে
ত্রস্ত যুবকেরা,
ছিন্নমূল,

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম। পৃ. ৭৭

গ্রামের কর্দমাক্ত পথ, মায়ের মুখ,
পিছিয়ে পড়া সহপাঠীর ছোট ডিঙিটা,
কি গোরুর গাড়ী
যদি এক লহমায় ভোলা যেত,
যদি মনের মধ্যে থেকে কথা বলে ওঠার
কেউ না থাকত,
যদি না সূত্রাধার হত দশ চক্রে,
তবে ঐ সব যুবকেরা
মুক্তি পেত
তুলা তুলার লজ্জা থেকে।

(গ) অথচ পত্রকার—প্রিয় রূপশ্রী স্বদেশ
সাজানো বাগানের শোভা ;
মাধবী কুঞ্জের ওপরে শরৎ মেঘের পুঞ্জ
খান-দুই ডেক চেয়ার
ও মার্কিন রুবাঈ .....
কিন্তু দ্রুত করতালির আগেই
ঘূর্ণিঝড়ে বন্যায়
ছিটিয়ে দিল কাদা
নয়নাভিরাম
ছবির উপরে
গলিত ভ্রাতৃশব .....

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : চেতনায় যে ধ্বনি)[১]

কবি আহসান হাবীবের সাদামাটা কবিতায় নিসর্গ শোভার চিরন্তন সুর ফুটে উঠেছে।

সোনামুখী নারকেলের শাখায় শাখায়
আর দুধ-সুপুরির বনে
এখনো কি হাওয়া বয় বঙ্গোপসাগর থেকে
বিকেলে ? সোনালী রোদ
এখনো কি মুখ দেখে জোয়ারের জলে ?
বিকেলে ঢেঁকির পাড়ে ক্লান্তি এলে

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ-৭৯

ঘুম পেলে
পা নামিয়ে—
হেলির পাতায় বোনা নরম পাখায়
কিছু হাওয়া খেয়ে,
তার পরে,
পুকুরে ঘাটের শেষে
গঙ্গাজলে বুক রেখে
এখনো কি তুই চোখ ছলছল করে
আর জল ঝরে?

(আহসান হাবীব : জল পড়ে, পাতা নড়ে)[১]

সোনামুখী নারকেল শাখা, দুধ সুপুরীর বন, ঢেঁকির পাড়, হেলির পাতা প্রভৃতি ছবি মনের মুকুরে ছায়া ফেলে।

এমনকি ফররুখ আহমদও যখন পূর্ব-বাঙ্‌লার প্রকৃতি তাঁর কবিতায় সন্নিবেশিত করেন তখন অপরূপ ভাব সম্পদে প্রাণময় হয়ে ওঠে—কবির রোমান্টিক মন বারবার শাহের জাদীর ঝরোকার উদ্দেশে ভেসে যায়, মরু সাহারা থেকে ফিরে আসে, শেষ পর্যন্ত মন স্বস্তি পায় কোন মরুস্থানে নয়, বাঙ্‌লার চিরপরিচিত পদ্মবনে—

তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ,
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে·········
ভ'রে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি, পদ্মের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
·········জানিনা কোথায়—

(ঝরোকায়)[২]

কুমড়ো ফুল; সজনে ডাঁটা, ডালের বড়ি, নারকেলের চিঁড়ে, উড়কি ধানের মুড়কি, এইসব চিরন্তন গ্রামবাঙ্‌লার কথা স্মরণ করায়,—

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ছাব্বিশ
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. আটাশ

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি
ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি,
খোকা,
তুই কবে আসবি?
কবে ছুটি?"
"... ... ...
লক্ষীমা রাগ করোনা
মাত্র তো আর ক'টা দিন!"

নারকেলের চিড়ে কেটে
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে,
এটা সেটা,
আরও কত কী।
তার খোকা যে বাড়ী ফিরবে,
ক্লান্ত খোকা।

(আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ : কোন এক মাকে)[1]

'অরণ্যে একদা'—হেমায়েত হোসেন[2]-এর একটি দীর্ঘ কবিতা। জয়দেবপুরের অরণ্যের পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির রূপ লাবণ্যের সুগ্রন্থিত চিত্রমালা বিধৃত রয়েছে কবিতাটায়। দেখেছেন রোদ্দুরের অজস্র ফুল, হরিতকী, জামরুল, লেবুর পাতায়, আমলকী, ডুমুরের শাখায়, বাতাবী ফুলের পাপড়িতে। চড়ুইয়ের স্বর, দোয়েলের পাখার আওয়াজ। দু'চোখ জুড়ানো বনের সবুজ কবির অন্তরের একান্ত গভীরে প্রগাঢ় শান্তির ঢেউ আনে। অশ্বত্থের পাতার আড়াল। প্রত্যুষের কোমল শিশির যা ডানায় মাখে বুলবুলি অথবা শালিক, শালবন অবাধ চঞ্চল প্রজাপতিদের দেখেন কবি নির্জনে বসে, দেখেন শিরিষের ডালে খঞ্জন পাখীর নাচ, কাঠবিড়ালীর

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১২৬-২৭
২. ঐ ঐ, পৃ. ১৫৭

বিস্মিত চোখের দৃষ্টি, জারুলের মগডালে তার পালিয়ে যাওয়া। এইসব দেখতে দেখতে "নগরীর স্মৃতি যেন সবটুকু ম্লান হয়ে গেছে।"

স্বচ্ছন্দে ভ্রমর মুঞ্জরিত শালচুড়ে,
পিয়ালে, পলাশে,
গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের কোরকে।
ঝিঁঝির কিঙ্কিনী বাজে
যেন অবিরল নদীর নূপুর।
বাতাসে লেবুর ঘ্রাণ,
কোথাও ডাহুক ডাকে
একটানা,
হরিয়াল পাখীদের স্বর ;
অথবা ঘুঘুর ডাকে
অরণ্যের অখণ্ড স্তব্ধতা
হঠাৎ ভেঙ্গে দেয়,

কবির মন কোথায় কোন উদাসীন প্রান্তরের পারে চলে যায়।

মতিউল ইসলাম শরৎকালের স্বভাবসিদ্ধ বর্ণনা দিচ্ছেন—

এমন সুন্দর দেশ, এমন সুন্দর মাঠ বন,
নরনারী জনপদ, নগর বন্দর অগনন,
পটে আঁকা ছবি সম প্রতিক্ষণে তোমাকে আমাকে,
সম্মুখে পথের দিকে হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে ডাকে,
সে ডাকে চঞ্চল প্রাণ প্রতিবিন্দু ধূলিকণা মাটি,
সে ডাকে মুখর হয় গলি খুঁজি নিঃসঙ্গ পাড়াটি।

(এখন শরৎকাল)[১]

আকাশ সম্বন্ধে একটি কবিতায় রথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরীর[২] রোমান্টিক হৃদয়ে প্রকৃতি যেমন ধরা পড়েছে—

তুমি কাশবনে কন্যা গান গাও ভাটিয়াল সুরে,
বন্যা আনো রিনি ঝিনি ঢেউ এর নূপুরে,

১. মাহে নাও, নভেম্বর, (১৯৬১)
২. " , সেপ্টেম্বর, (১৯৬১)

জেগে থাকা কত চোখ তারা হয়ে সে আকাশে জ্বলে
পাখী হয়ে কতমন নিরুদ্দেশ রোমাঞ্চ অতলে
. . . . .তুমি কন্যা, আকাশের সুর
দুই চোখে তুলে নিয়ে গান গাও,
বন্যা আনে প্রাণের নূপুর।

এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, গ্রাম বাঙলার রূপকল্প যাঁর কাব্যে অপরূপ রূপ পেয়েছে, যিনি মেঘনা পদ্মা ধলেশ্বরীর প্রতীক, সেই জসীমউদ্দীনের কথা না বললে। শ্যামল সুন্দর বাঙলাদেশকে যদি খুঁজে পেতে চাই, তাহলে জসীমউদ্দীনকে অবশ্যই খোঁজ করতে হবে। সেখানে আছে ইতল বেতল ফুলের বন, ধানের আগা, ধানের ছড়া, টিয়া, দূর্বাবন, মেয়ের ঘাট, লাউয়েরডগা, লাউয়ের পাতা, আমের আঁটির বাঁশি, উঁচু ডালের বট বিরিক্ষি, পাকা কুল পাড়া, বাঁশের পাতার পথ, গাছের হার, বালুচর, আঁকা বাঁকা পথ, বেণুবন, তেপান্তরের মাঠ, পাকা তেলাকুচা, সাদামাটা বকের ছানা, বুলবুলি, দূর্বাশীষ ফুলের রেণু। সেখানে কোন চাষীর মেয়ে গা মাজে টিয়ার পাখা দিয়ে। কোন রাখালীকে অকারণে পথ হাঁটতে, আমের মুকুল কুড়াতে দেখা যায়। রূপকথার মধুমালা জীবন্ত হয়ে ওঠে, দিগন্ত প্রসারিত নকসীকাঁথার মাঠ চোখে ভাসে। বেদে বেদেনীর প্রেম-বিরহ, মিলন-মৃত্যুর গান শোনা যায়। সোজন বাঙদিয়ার ঘাট হাতছানি দেয়। রাখালী ও রূপবতীর কথা স্মরণ করায়।

বস্তুতপক্ষে কবি জসীমউদ্দীনের কবিতায় প্রাচীনকাল এবং আধুনিককাল যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। জীবনের অপরূপ ঐশ্বর্য গ্রামবাঙলায় হাটে মাঠে ঘাটে বাটে যে অবারিতভাবে ছড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারি অতি অল্প সময়ে, অতি অল্প আয়াসে। রক্তে রিনিঝিনি বাজে, সুরের মূর্চ্ছনা ওঠে, উদার আকাশ, নদী নালা, বন প্রান্তর হৃদয়ে দোলা জাগায়, এ রোমান্টিক নয়, প্রাণের প্রেরণায় দীপ্ত, দ্যুতিময়, জীবন্ত, উচ্ছ্বসিত ও উৎসারিত—

"ওই চরে বাঁধি ঘর,
ফুলের বিছানা পাতিও বন্ধু
উড়লি বালুর চর।"

জসীমউদ্দীনের বাঙলা তার প্রকৃতির অপরিমেয় ঐশ্বর্য নিয়ে চিরন্তনের—চিরকালের। একেই বলে ধ্রুপদী! এটাই শাশ্বত।

পূর্ব বাঙলার কবিতায় নিসর্গচেতনার বিচিত্র বর্ণময় অভিব্যক্তি বিশ্লেষণ করার

চেষ্টা করা হল। কয়েকটি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধিকাংশ কবিই সহজ সরল-ভাবে সাদামাটা ভাষায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের রূপ বর্ণনা করেছেন। তাই বোধগম্য, আমাদের সকলের কাছের কবিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দূরে সরে যায়নি, অনাদরে উপেক্ষিত হয়ে থাকেনি। কেউ কেউ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে জীবন নিরপেক্ষ, বিহ্বল, বিমুগ্ধ (যেমন সৈয়দ আলী আহসান) আবার অনেকেই কিন্তু প্রকৃতি থেকে জীবনের রসদ আহরণ করেছেন (যেমন সিকান্দার আবু জাফর), প্রেরণা পেয়েছেন, শুধু প্রকৃতির অনবদ্য শোভাই নয়, তার নগ্ন-নিরাবরণ, হাড় জিরজিরে বীভৎস রূপও কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে, (আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, কায়সুল হক প্রভৃতি), পরিবেশ ও প্রকৃতি একাকার হয়ে গেছে, কারুর কারুর কবিতায় (মতিউল ইসলাম, হেমায়েত হোসেন প্রভৃতি) রোমান্টিক ভাবরাজ্যের সন্ধান পাই—যার দিগন্ত প্রসারিত নিসর্গ শোভার মধ্যে দিয়ে। নিসর্গচেতনার সঙ্গে সংগ্রামী চেতনাও কখনো কখনো মূর্ত হয়ে উঠেছে। কোথাও আবার বিশুদ্ধ গীতি কবিতার অমলিন সুর।

এতসব সত্বেও ওদেশে যে বিপুল পরিমাণ কবিতার সম্ভার, তাতে প্রকৃতির প্রতি নিবেদিত সার্থক কবিতার সংখ্যা সত্যি সত্যিই নগণ্য। কোন কোন কবির ক্ষেত্রে জীবনানন্দ অনুসরণ ও অনুকরণের প্রবৃত্তি লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ মহিফুজউল্লাহর একটি কবিতা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, তাঁর কবিতায় প্রেমের অনুভব আছে, সেই অনুভব প্রকৃতির ভাবকল্পের মধ্যে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, কবিতার মধ্যে জীবনানন্দের ছায়াপাত হয়েছে—

> বকের ডানার মতো দুধ-শুভ্র মেঘের আস্তরে
> কখনো আকাশ-প্রান্তে ঢাকা পড়ে কার্তিকের চাঁদ,
> আকাশের হ্রদে ভেসে সারা দেহে নামে অবসাদ
> ডুবুরী মেঘের মনে ; কখনো ভেসে খেলা করে,
> কখনো হারায় চাঁদ ঘন সাদা মেঘের ভিতরে।
> হিমেল কুয়াশা ঘিরে মাঠ থেকে আরো দূর মাঠে
> ফ্যাকাসে চাঁদের আলো দেখে তার সারারাত কাটে—
> যে হৃদয় জেগে থাকে সন্ধ্যা-রাত্রি সারাক্ষণ ধরে'।
>
> (কার্তিকের চাঁদ : জুলেখার মন)[১]

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬১০-৬১১

এবং—

তার স্বপ্নে স্বপ্নাবতী সীমাহীন দিগন্তের তীর
সজল হেমন্তে একা আসে যদি স্নিগ্ধ সুষমায়—
উজ্জ্বল সোনালী ভোরে, মাঠে মাঠে কুয়াশা—নিবিড়
সে এসে বিছায়ে দেয়, শিশিরের স্ফটিক ছায়ায়
প্রতিভাত হবে আজ দূরান্তের সুনীল আকাশ
তা'র আগমনে জাগে শিশিরের স্বচ্ছ প্রতিভাস।
সে এলে নক্ষত্র হবে আকাশের বুকে স্পন্দমান,
বরফের মত চাঁদ ঢেলে দেবে নীল জ্যোৎস্নাধারা
পৃথিবীর অন্ধকারে———

('সেও যদি এসে থাকে' : "জুলেখার মন")[১]

এর তুলনায়, জসীমউদ্দীন প্রায় বিস্মৃত, তাঁর সার্থক উত্তরসূরী কারুকে সেখানে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবশ্য এ যুগে শুধু প্রকৃতি নিয়ে কবিতা রচনা সম্ভব নয়। জটিল হয়ে পড়েছে জীবন। গ্রামের পরিবেশ যাচ্ছে বদলে। কৃষক, মজুর, জেলে, মুটে, মুদ্দাফরাস এখন গ্রামবাঙলার চালচিত্রে। তাদেরও কথা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিরা একনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন কি ? (তবুও) কোথায় যেন ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে।

নিসর্গচেতনা সেখানকার কবিতার মূল সুর হয়ে ওঠেনি, অঙ্গাঙ্গীভাবে কবিতার সঙ্গে জড়িত বলেও মনে হয় না, এ নিয়ে কবিরা চিন্তিত বলেও প্রতীয়মান হয় না। যতটুকু লিখেছেন, সাবলীল ভাবেই, তার বেশি কিছু নয়।

এর আরও গূঢ়, হয়ত বা প্রধান কারণ এই যে, নগরচেতনা সেখানকার কবিদের চিত্তে অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা গেছে। খাল বিল নদী নালা বন বাদাড়ের দেশের কবিদের কবিতায় নগর সভ্যতা তার পারিপার্শ্বিকতা, তার পরিবেশ, তার সমাজ জীবন ও বৈশিষ্ট্য বেশিরকম ছাপ ফেলেছে একথা বিশ্বাস করতে কঠিন হলেও সত্য।

পৃথিবীর অন্যান্য চলমান শহরের তুলনায় পূর্ব বাঙলার রাজধানী ঢাকার পরিমণ্ডলে প্রকৃতির অকৃপণ ঐশ্বর্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। এখনো সেখানে বাগিচার সমারোহ, বুড়ী গঙ্গা প্রবহমানা, শান্ত নিস্তরঙ্গ পারিপার্শ্বিক ভৌগোলিক অবস্থান, মেঘ···, কুয়াশা, আকাশ, সূর্য অবারিত, আনন্দ সঞ্চয়।

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬১১।

অথচ তবু সেখানকার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতায় নগরজীবন এবং তার প্রশস্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নগর জীবনের কুৎসিত, পঙ্কিল চিত্রও বিধৃত।

এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের দেশের সমালোচক মন্তব্য করছেন,

"একটি দিক কিন্তু পীড়াদায়ক। এদেশের মতোই পূর্ববঙ্গেও নগর ভিত্তিক সভ্যতার জয়গান। গ্রামবাঙ্‌লাকে সেখানকার কাব্য সাহিত্যে কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হয়। হয়ত আধুনিকতার শিকার হতে চলেছি আমরা সবাই। সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাই হয়ত গ্রাম ভিত্তিক হতে পারবে না আর।"[১]

তবে, নগরমুখী সভ্যতার সঙ্গে কোন কোন কবির মনেই গ্রাম জীবনের সংঘাত এখনো বিদ্যমান। আবুল হোসেনের একটি কবিতায় এর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্ল্যাট এর আকাশ, ফ্ল্যাটের থাবা, আপিসের দেওয়াল পেরিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাদে গাছে ঘাসে দৃষ্টি যায়, দেখেন মাঠের সবুজ চোখ কখনো কখনো গড়াগড়ি দেয় আজও—

ধারালো ছুরির নদী ফ্ল্যাটের আকাশ
টিনের কারখানায় কাটা ভাঙ্গা দিন
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছাদে গাছে ঘাসে।

('ফাল্গুন ওগো ফাল্গুন')[২]

অথবা,

রাতের ফ্ল্যাটের থাবা, আপিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজ চোখ
কখনো কখনো
গড়াগড়ি দেয়, আজও, (কিমাশ্চর্যম্)[৩]

বিদগ্ধ কবি শামসুর রহমান, তার কবিতার নগর চেতনার বিভিন্ন রূপ, বিচিত্র বৈচিত্র্য। 'হরতাল' কবিতাটির কথা ধরা যাক। হরতালের শহর বিক্ষোভ আর প্রতিবাদকে যতটা না রূপ দিয়েছে, তার থেকে বেশি উপস্থাপিত হয়েছে নগরের একটা বিশিষ্ট চিত্র—

রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা সঙিন হ'য়ে বুকে
গেঁথে যায়, একটি কি দুটি

১. অমিয়কুমার হাটি, পূর্ববঙ্গ : সংস্কৃতি ও কবিমানস, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা ১৭, পৃ. ৩২৯৬ (১৯শে জুন ১৯৬৯,)
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. বত্রিশ
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. বত্রিশ

লোক ইতস্তত:

প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান

অথবা

ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জানালা থেকে সরু

পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক স্তব্ধতাকে খায়।[১]

লক্ষণীয়, এখানেও জীবনানন্দের মত উপমা ব্যবহার 'উটের গ্রীবার মত'...

আরও—

হেঁটে যেতে যেতে

বিজ্ঞাপন এবং সাইনবোর্ডগুলো মুছে ফেলে

সেখানে আমার প্রিয় কবিতাবলীর

উজ্জ্বল লাইন বসালাম,

প্রতিটি পথের মোড়ে পিকাসো মাতিস আর ক্যাণ্ডিনিস্কি দিলাম ঝুলিয়ে

চৌরাস্তার চওড়া কপাল,

এভেন্যুর গলি, ঘোলাটে গলির কটি,

হরবোলার বাজারের গলা

পাষাণ পুরীর রাজকন্যাটির মতো

নিরুপম সৌন্দর্যে নিথর।

('হরতাল')

আরও লক্ষণীয় মিছিল, বিক্ষোভ, জনতা, সংগ্রাম, এসব বাহ্য হয়ে গেছে. হরতালের শহরকে কবি শেষ পর্যন্ত রূপকথার রাজপুরীতে পরিণত করেছেন।

যেখানে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে অনেক শিল্পীর সত্তাকে বলি দেওয়া হয়, সেখানে প্রতিবাদ করার মত শিল্পীও থাকে। শামসুর রহমান এইরকম একজন কবি, যাঁর কণ্ঠে শিল্পীর স্বাধীনতার অধিকার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও যে কবিতার মধ্যে দিয়ে ওকথা বলেছেন, সেই কবিতাটিতে ও নগর জীবনের ছায়াপাত—

তবে বলছিলাম কি,

এয়ার পোর্টে, অফিসে—হোটেলে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে

এভেন্যু, মার্কেটে, দেয়ালে দেয়ালে

আমার ঘরের মধ্যে, আমার গলায়

কারুর দুর্দান্ত মহাজনী ফটো ঝুলিয়ে দিয়ে

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. উনসত্তর

বলবেন না,
তাকাও উনি যেভাবে তাকিয়ে আছেন,
হাসি ছড়াও অবিকল তাঁর হাসির মতো।
দয়া ক'রে আমাকে ঠিক নিজের মতোই থাকতে দিন।
আর আমি যদি লেখক হই, অনর্গলের প্রম্পটারের মতো
সর্বক্ষণ বিড় বিড় ক'রে ব'লে দেবেন না
কী আমাকে ভাবতে হবে, কী আমাকে লিখতে হবে।

(দুঃস্বপ্নে একদিন)[1]

বক্তব্য এমন তেজোদৃপ্ত, অথচ শান্ত কঠোর উজ্জ্বল সুন্দর কবিতার অবয়বেও শহর তার হাত বাড়িয়েছে।

ফজল শাহাবুদ্দীন বিংশ শতাব্দীকে আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায় স্নান করতে দেখেছেন, বিভ্রান্ত দিশা হারা হয়ে পড়ার চিত্র এঁকেছেন,

কেননা এই বিংশ শতাব্দীর সুতীব্র আলোকে
আমরা আজ বিভ্রান্ত দিশেহারা
এক নির্দয় আলোর আঘাতে আমরা আজ নগ্ন
আমাদের প্রতি অনু-পরমাণুতে এই নগ্নতার—
বৈদেহী চীৎকার
এই যান্ত্রিক উজ্জ্বল বিবিক্ত মত্ত নগ্নতার চাবুকে
আমরা আজ ভিন্ন ভিন্ন
আমরা শঙ্কিত নিজেদের নিষ্ঠুর নিঃস্বতায়।

(আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায়)[2]

আধুনিক সভ্যতার সবটাই কুৎসিত নগ্ন কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে, আধুনিক সভ্যতাকে ইচ্ছা করে কেউ কেউ কুৎসিত নগ্নতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে কিনা আমরা তাদের শিকার হয়ে পড়ছি কিনা এ নিয়েও তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু শহরের যে ক্লেদাক্ত অসুন্দর বীভৎস চেহারাটা ফজল শাহাবুদ্দীন এঁকেছেন, তার সঙ্গে আমাদের দ্বিমত হবার অবকাশ নেই—

সেই রোদ্রের মধ্যে ন্যাড়া গাছগুলোকে মনে হচ্ছিলো
উলঙ্গ কতকগুলি শরীর

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. সত্তর
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. ছিয়াসি

অশ্লীল রোগাক্রান্ত একালের অধিকাংশ মানুষের মতো
মনে হচ্ছিলো বাড়িঘর রেস্তোরাঁ দোকান পাট
রাস্তা—মন্দিরের চূড়ো মিনার এবং
লাইটপোস্ট ফেরিঅলার মুখ গাড়ীর শরীর
রমণীর অনাবৃত পিঠ ট্রাফিক পুলিশের ঘূর্ণায়মান দৃষ্টি
সব যেন ভয়ঙ্কর এক উজ্জ্বল অশ্লীলতার চীৎকারে
মুখর স্পন্দিত নিমজ্জিত—

(সন্ধ্যা যদি)[১]

কবি আব্দুল গণি হাজারীর প্রেসক্লাবে তোমরা কবিতায়[২] শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথা রয়েছে। এখানেও নগর জীবনের পরিবেশের ভিত্তিতে কবি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু পরিবেশন করেছেন—

বারান্দায় মানি-প্লাণ্টের ডগা
নতুন হাওয়ায় নাড়া দিয়ে যায়
শিকেয় অর্কিডের শরীরে পুষ্পের সকুণ্ঠ সাধনা
কাঠের সিঁড়িতে সহসা হৃৎস্পন্দন
নীচের তলায় অপরিচিতের ডাক
তক্ষকের গলার মত
দীর্ঘ বারান্দার কোণে ঈজি চেয়ারে
দুটি ঘনিষ্ঠ রিক্রুট
তার কোন আওয়াজ পায়না
যখন তোমরা ব্রিজ খেলো
প্রেস ক্লাবের অপ্রচুর আধারে।

অথবা, তাঁর 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতায়[৩]—

ভাঁড়ার আমাদের লক্ষ্মী
বালিশের ভাঁজে উদ্বৃত্ত হাত খরচ
আয়নার দেরাজে হেলেন কার্টিস
এনি ফেঞ্চ-মিল্ক

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. ছিয়াস
২. ,, ,, , পৃ. ২৫
৩. ,, ,, , পৃ. ২৮

এ্যাস্ট্রিনজেণ্ট
ডিওডরেণ্ট
হ্যাণ্ড লোশন
রেভ্‌লন
ক্রিশ্চিয়ান ডিয়োর
এবং রুবিনস্টিন

এঁদের স্বামীরা—
বাড়ী ফিরেও হায়
বন্ধুর প্রমোশনে ঈর্ষিত
বেনামী ব্যবসার লাভক্ষতি
তারপর টেলিফোন
তারপর টেলিফোন
তারপরও টেলিফোন

... ...

অতঃপর হে প্রভু
আমাদের রাত্রির শরীর পানসে
জানালার চাঁদ নিরক্ত
ব্যবহৃত—দেহ
নাক ডাকা স্বামী
বিনিদ্র রাত
এবং ট্রাংকুইলাইজার

হে প্রভু অনন্যোপায়
তোমার দিকে মুখ ফেরালাম
আমাদের কোন কাজ দাও
ভ্যানিটি ব্যাগে আয়না
ফাউণ্ডেশন আর গ্যালার রঙ
এবং সমাজ সেবা
কিণ্ডার গার্টেনের শ্রাদ্ধ
লেডিজ ক্লাবের সামনের সীটে

কিংবা স্বামীর পদাধিকারে
শিশু সদনের উদ্বোধন······(সূর্যের সিঁড়ি)[১]

আলাউদ্দীন আল আজাদের আর একটি কবিতা, 'রাত্রি ও নগরী'তেও[২] কুৎসিত শহরের চিত্র—

আরক্তিম তৃতীয়ার চাঁদ প্রভুভক্ত ক্লান্ত কুকুরের নির্জীব জিভের
মতো ঝুলে আছে, চারিদিকে চেয়ে নির্নিমেষ বোবা—অরণ্যের জিজ্ঞীবিষা
অন্ধকার গোরস্তানে উঠল ডেকে এক সমাজ শেয়াল হুক্কা হুয়া হুয়া
নির্জীব নদীর তীরে বসে বসে খড়ের আগুনে বিড়ি ফুঁকি, জুয়া জুয়া
হ্যাঁ হ্যাঁ জুয়া, খ্যাপা হাওয়ায় কাঁপানো মরা ঝোপ মাথার—ভিতরে এই এক
জপ জুয়া জুয়া, ফতুর ট্যাকের পয়সা ছক্কায় সঁপে করবো বাজিমাৎ
ক্রমে শেষ পরিশিষ্ট আলো, কালো কালো তমসারা কানাকানি—জড়াজড়ি
করে ঃ এক গুণ্ডা তরুণী বেশ্যারে ধরে তুললো নৌকায় দু-হাতে চেপে জেব
উঠে পড়ি, ঠকঠক ছুটেছে তাড়ির গাড়ি, অদূরেই জ্বলন্ত নগরী।

শহর এবং সভ্যতা নিয়ে, তার বিলাস ব্যসন বৈভব নিয়ে, তার যন্ত্রণা নিয়ে বিকার বৈকল্য নিয়ে সব দেশের আধুনিক কবিতাতেই বেশ কিছু কবিতা লেখা হয়েছে, এগুলো আধুনিক কবিতার রুচিকর উপাদান বললেও অত্যুক্তি হয় না। আর একজন কবি শহীদ কাদরী শহর সভ্যতা সম্পর্কে যে কবিতা লিখেছেন, তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—

আমাকে পিছনে রেখে চলে যায় সারে সারে কত ক্লার্ক
আঙ্গুলে কালির দাগ, মুখে ভয়
টাইপ রাইটারে ছাওয়া সারা দেশ, কি মুখর, উন্মুখর
কত না রঙ্গ জানে শো-কেসের সাজানো শেমিজ,······

(আমি কিছুই কিনবো না)[৩]

তাঁর কবিতায় শহীদ কাদরী আলাউদ্দীন আল আজাদ-এর মতোই দুঃসাহসীর মত অগ্রসর হয়েছেন শহর পরিক্রমায়। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় জ্বালা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহানুভূতি একান্তই দুর্লভ। সমালোচক বলেছেন,

'কাদরীর দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা শহরের সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো যে তাকে

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৩০
২. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ. ১১০
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. নব্বই

বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কবি শহরের বাইরে দৃষ্টি দান করতে পারেন না। এ শহর যতই বড় হোক বা ছোট হোক, নগরের সংজ্ঞা পূরণ করুক বা নাই করুক, আশৈশব পরিচিত শহরের অভিজ্ঞতায় কবির এতটুকুও ফাঁকি নেই।......শহীদ কাদরী কবিতায় শহর ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার।' নিদারুণ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে কত সহজভাবে ঋদ্ধ ভাষায় তিনি বলেন,

জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ণ থেকে নেমে
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগ্‌রে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্প্‌পোষ্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সব কিছু, রুদ্ধ চক্ষু সেই ব্ল্যাক আউটে আঁধারে।

(উত্তরাধিকার)[১]

পূর্ববঙ্গে গত দু দশকে জীবন আর শান্ত নিস্তরঙ্গ ছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যে সব কবিরা এসেছেন, প্রতিষ্ঠা, নাম, যশ, খ্যাতি অর্জন করেছেন, গ্রামের দিকে ফিরে যাননি, ফিরে তাকাননি। নগর জীবনের মোহ তাঁদের। কবিতায় তার স্পর্শ থাকবেই। তাই যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, আক্ষেপ, আর্তি যতই থাকুক না কেন, নগর জীবন যতই নিগড়ে জড়াক না কেন, গ্রাম, প্রকৃতি প্রান্তর থেকে ক্রমশই দূরে সরে এসেছেন, হয়ত বা সজ্ঞানে নয়; হয়ত বা প্রয়োজনের তাগিদেই। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক অথবা নূতন আবেষ্টনী ও পরিবেশের গুণেই হোক, অথবা বিদেশের প্রভাবের ফলেই হোক, কবিরা ভাবরাজ্য থেকে সত্যিকার গ্রামবাঙ্‌লাকে বিসর্জন দিয়েছেন। তার একটা প্রধান কারণ এই হতে পারে, অনেকের ধারণায় আমাদের সভ্যতা এখন নগরমুখীন সভ্যতা। আধুনিকতা কথাটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহরের ফ্যাসন চালচলন হাবভাবই গাঁয়ে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। কবিরাও এই ভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। পারা সম্ভবও হয়ত নয় এ যুগে। দ্রুততর গতির সঙ্গে তাল রেখে শহর যেমন এগিয়ে যায়, গ্রাম তেমনি পারে না। শুধু গ্রামের কথা বলা, শুধু গ্রামের চিত্র আঁকা, শুধুই গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কারুরই সমগ্র কবিতায় তেমন প্রত্যক্ষ নয়। জসীমউদ্দীনের মত আরও অনেক কবির জন্ম পূর্ব বাঙ্‌লার প্রকৃতির পরিবেশ গুণেই সম্ভব হতে পারত। কিন্তু সেরকম একজনও ঐ পথে পা বাড়াননি। জীবনানন্দের মতো আধুনিক মননশীলতাসহ গ্রামবাঙ্‌লাকে তুলে ধরলেও পারতেন কোন প্রতিভাবান কবি, কিন্তু এদিক দিয়েও কেউ যত্নবান হননি,

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. একানব্বই

কেউ অনুশীলন করেননি। জসীমউদ্দীন বা জীবনানন্দ অবশ্য একটা জাতির যুগে বা জীবনে একজন আধজনই আসেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গ যেহেতু সৃষ্টিশীল জাতি, সাহিত্যের আকাশ যেহেতু সেখানে উন্মুখর, প্রজ্ঞা, মেধা, নিষ্ঠা প্রভৃতির অভাব যেহেতু সেখানে এখনো পরিলক্ষিত হয়নি, সেইহেতু সেখানকার কবিদের কাছ থেকে সাহিত্যের বর্ণোজ্জ্বল আসরে আমাদের দাবীর পরিমাণও বেশি। পূর্ববঙ্গে কাব্যসাহিত্যের দিগন্তে যে অপরূপ রামধনুর বর্ণালী, সেখানে আর একটি বর্ণের সংযোজন এবং তার ঔজ্জ্বল্য আমাদের আরো খুশি করবে, আমাদের প্রত্যাশা আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই আরো মনে হয়, সাহিত্যের এই অঙ্গণে গ্রামবাঙলার চিরন্তন মাঠ-ঘাট বন-বাদাড় খাল-বিল নদী-নালা গ্রাম-গঞ্জ মানুষ-স্বজন নিয়ে ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাবান কবি আবির্ভূত হবেন, পটভূমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছে, সাধনা এবং প্রেরণারই শুধু প্রয়োজন। সে কবি শুধু প্রকৃতির বাহ্যিক চিত্রই নয়, অন্তরের অমূল্য সম্পদ সাহিত্যের শুভ্র মালিকায় সংযোজন করবেন, কষ্টকৃত হবে না, কষ্ট কল্পনা সৃষ্ট হবে না, শুধু সাবলীলও হবে না, বুদ্ধিতে সৌন্দর্যে, দীপ্তিতে, ঔজ্জ্বল্যে অপরূপ হয়ে উঠবে, নগরভিত্তিক না হয়ে গ্রামভিত্তিক সুন্দর উদার সমানাধিকার-বিশিষ্ট সমাজ জীবনের কথা থাকবে, আত্মীয়তার রেশ থাকবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূল সূত্র জড়িয়ে থাকবে, সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, মাটি, জল, বাতাসের জীবনে। এরই পরি-প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে শহর, গ্রামের রেশ সে শহরের উপর থেকে মুছে যাবে না। পূর্ব বাঙলার যে কোন বড় শহর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, পাবনা, যশোহর, মৈমনসিং গ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—নাড়ীর টান গ্রামবাঙলার সঙ্গে। কবিতায় তাই এই নাড়ীর টান ছিন্ন হয়ে যেতে দেখলে বুক টনটন করে উঠবেই। বাঙলাদেশের কবিতা এই অনন্তক্ষেত্রে যে অপরূপ সমারোহ সৃষ্টি করতে পারে, তার স্বাদ আমরা আজও পাইনি, কিন্তু ভবিষ্যতে সে স্বাদ পাব বলেই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি।

॥ ৪ ॥ ওপারবাঙলার কবিতায় আর একটি সুর—প্রেম, মানব-মানবীর সহজাত চিরন্তন প্রবৃত্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, ঘর বাঁধা, ঘর-গড়া। এক্ষেত্রেও নানাদেশের সমকালীন কবিতার মতো বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে আপন আসন দাবী করতে পারে। নানা বর্ণোচ্ছল চিত্রের সমারোহ।

প্রেমের কবিতায় আবহমানকালের রোমান্টিক আবহাওয়াও দেশের অনেক কবির উপজীব্য। ভাবগাহী কল্পনার প্রসার, রোমান্টিক স্বপ্ন দিদৃক্ষা, চির সুন্দরের আরাধনা, বিরহ-মিলনের মুহূর্তগুলিকে ঘিরে স্বর্গ সমীক্ষা, আপনার ভাবনার রাজ্যে

মনোময় মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা প্রভৃতি নিয়ে স্বাদুরম্য কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। স্বভাবতই পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এখানে কবিরা। রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত প্রভৃতির মধ্যে যে রোমান্টিক সুর, তারই রেশ ধরে এঁরা অগ্রসর হয়েছেন, মানসীকে নানান রূপে রসে সঞ্জীবিত করেছেন। পূর্ববর্তী কবিদের অনেক কবিতা যেমন গীতিধর্মী হয়ে পড়েছে, লিরিকের সার্থক পর্যায়ে নেমে এসেছে, এঁদের কবিতাতেও এইরকম রোমান্টিক লিরিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করা হল—

(ক) সেই-দিন,—হায় সেই প্রথম যৌবনে,
সেই ক'টি চাঁপা কলি,
সাধের গোলাপ বেলী,
দিয়েছিনু গুঁজে তোর কবরী-কুসুমে!
তুই আরো কাছে স'রে
বসেছিলি হাত ধরে
হেসেছিলি কি যে হাসি ভুলিব কেমনে!
কথা নাই, সাড়া নাই
নয়নে পলক নাই,
প্রেমের প্রতিমা যেন গঠিত কাঞ্চনে!
সেই অব্যক্ত প্রেম হাসি
সেই ভাল বাসা বাসি
ঢেলেছিলো কি মদিরা এ মরু জীবনে!
হয়েছিল কত কথা নয়নে নয়নে।

(কায়কোবাদ : উদাসীন প্রেমিক)[১]

প্রিয়তমার সঙ্গে মিলনের একটি দিনের স্মৃতি। হৃদয়ের প্রকাশ এখানে স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত। এই কবি, কখনো বা প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডারের মধ্যে তাঁর সহজ সুন্দর প্রিয়তমাকে খুঁজছেন—

"কে তুমি?
তুমি কি চম্পক কলি?
গোলাপ মতিয়া বেলী?
তুমি কি মল্লিকাযূথী ফুল্ল কুমুদিনী?

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৫৭।

সৌন্দর্যের সুধা-সিন্ধু,
শরতের পূর্ণ ইন্দু
আঁধার জীবন-মাঠে পূর্ণিমারজনী !
কে তুমি রমনী-মণি ?"

(কে তুমি ?)[১]

আবার,

"কে তুমি ডাকিছ মোরে অলক্ষ্যে বসিয়া ?
তোমার বীণার তান, তোমার মধুর গান
পাগল করিল মোরে মরমে পশিয়া !
... ...
আর কতদিন মোরে ভুলাইবে তুমি ?
সম্মুখে পুষ্পের কুঞ্জ, দেখাইছ পুঞ্জ পুঞ্জ
পশ্চাতে তোমার ওই ঘোর মরুভূমি ।"

(দুনিয়া)[২]

আবেগ, এষণা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অনুভূতি রোমান্টিকতায় স্নিগ্ধ ধারাস্নানে আপ্লুত, যদিও কবিতাটি পুরাতনপন্থী।

আহসান হাবীবের কবিতাতে আঙ্গিকের নতুনত্বে ও ভাবের পরিচর্যায় রোমান্টিক স্বপ্নমানস নতুন রূপ নিয়ে উপস্থিত—

"রাত্রি শেষ !
কুয়াশার ক্লান্ত মুখ শীতের সকাল—
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।
শিশির সন্নত ঘাসে মুখ রেখে শেষের কান্নায়
দু'চোখ ঝরেছে কার,
পরিচিত পাখিদের পায়
চিহ্ন তার মোছেনি এখনো,
আছে এখনো উজ্জ্বল—
কান্নার মাধুরীটুকু ঘাসে ঘাসে করে টলোমল।
মলিন চাঁদের টিপ আকাশের পাণ্ডুর কপালে।

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
২. " পৃ. ৪৫৮

প্রাত্যহিক পৃথিবীর পরিচিত সাত ডিঙার পালে
হাওয়া নেই।

এখন হৃদয়ে বারবার
নির্জন দ্বীপের সেই অপরূপ রাজ-দুহিতার
প্রথম প্রেমের সুর ঢেউ তোলে।"

(শীতের সকাল : ছায়া হরিণ)[১]

পরিচিত পৃথিবীর প্রাত্যহিক ধূলি মলিনতার বাইরে কবির হৃদয় তাঁর দয়িতার প্রথম প্রেমের সুরের জন্য উন্মন। এ বিশুদ্ধ রোমান্টিসিজম। কিন্তু এরই পাশাপাশি আবার প্রেম সাধারণ সমাজে তার দুঃখ কষ্টের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বমুখর হয়ে ধরা পড়েছে :—

দৃষ্টির সেই বিহ্বলতাকে সহজেই চিনি—
এখানে এ বেশে তোমাকে দেখবো ভাবতেই পারিনি।
মনে পড়ে সেই আলিফ-লায়লা রাতের কাহিনী
হৃদয়ে জ্যোৎস্নার কণ্ঠে কথার কলকিঙ্কিনী
আবের নৌকা পবনের পাল মনের আকাশ—
মনে পড়ে সেই কাকলীমুখর কুসুমের মাস।
আজো মনে পড়ে সেই চাঁদ সেই মুগ্ধ নয়ন
তোমার তনুর চন্দ্রিমালোকে সে-অবগাহন।
স্মৃতির তীর্থে আজো সেই চাঁদ আসে আর যায়,
ভাবতে পারিনি এখানে এবেশে দেখবো তোমায়।
নির্জন রাত মেঘলা আকাশ ঝড়ের হাওয়ায়
পৃথিবী কাঁপছে; ভয়ে থমথমে চোখের চাওয়ায়
এ কোন্ ব্যর্থ দিন যাপনের দুঃসহতার
ইতিহাস আজ লিখছো এখানে; এ অন্ধকার
কখন তোমার চোখের সে আলো করেছে হরণ।
কোন্ পাপে বলো এ নির্বাসন করেছো বরণ।
এলোমেলো চুল শীর্ণ দু'চোখ জীর্ণ শরীর
কোথায় কখন দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার তীর

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৮৩-৫৮৪

হেনেছে তোমায়, হয়তো জানোনা, তবু একবার
আজকে ঝড়ের আকাশে তাকাও। আজকে আবার
এড়িয়ে লজ্জা ভাবনা এবং ভয়ের বাঁধকে,
সন্ধান করো আলিফ-লায়লা রাতের চাঁদকে।

(একটি মহৎ কবিতার খসড়া : ছায়া হরিণ :)[১]

রোমান্টিক ভাব জগৎ থেকে এই স্বপ্ন ভঙ্গ—জগতের দিকে, সত্যের দিকে চোখ মেলে তাকানো, কবিতাটির সার্থকতা এইখানেই। এখন নির্জন, মেঘলা রাত, আকাশ ঝড়ের হাওয়ায় কম্পমান পৃথিবী, ব্যর্থ দিনযাপনের দুঃসহতায় দয়িতার ভয়ে থমথমে চোখের চাওয়া—শীর্ণ দুচোখ, জীর্ণ শরীর, দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার তীব্র আঘাত হানছে, কার জন্যে এ অবস্থা, হয়তো জানেনা দয়িতা, তাই দয়িতের অনুরোধ আজকে ঝড়ের আকাশে তাকাও, লজ্জা ভাবনা, ভয়ের বাঁধকে এড়াও—।

প্রেমের ক্ষেত্রে কোন এক সর্বনাশা ধ্বংসের করালরূপ দেখছেন কবি সৈয়দ আলী আশরফ—

"হে শিশুর দল –
মাঠে ঘাটে ঘরে ঘরে একই ছবি দেখেছি
অযাচিত একই ছবি-একই মৃত্যু নীল :
সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে দাঁড়ান দেখেছি
জ্বলন্ত অংগার-চোখে পাপের মিছিল :
আত্ম-পূজা-রত নারী বিবসনা চোখে
গর্বের প্রশস্তি গায় ; আগ্নেয় হাসিতে
জ্বালায় পুরুষ-মন , মারমুখি রোখে
স্বেচ্ছায় লোলুপ দাস ঝুলেছে ফাঁসিতে।
তীরের স্বচ্ছন্দ গতি-হেলেনের অবিনীত রূপ :
ইউলিসিস্ পথ-হারা, তবু তো জ্বলেছে ট্রয়ে চিতা ;
মজনুন্ কয়েসের অনর্গ-উল্লাস ;
প্রণয়ের বহ্নি রচে চিরঞ্জীব সতর্ক সবিতা ॥
—মুক্তি, মুক্তিপথ বলো—"

(বনি আদম, পাঁচ)[২]

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ. পৃ. ৫৮৪ ৮৫

২. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ. পৃ. ৬০১

এমন কি আব্দুলগণি হাজারীর মত মননশীল বিদ্রোহী কবিও রোমান্টিক ভাব দ্বারা তাড়িত—

রমনার
খালের ধারে
কয়েকটি
ইউক্যালিপটাস
তন্বী, শ্বেতাঙ্গিনী
সন্ধ্যায়, সকালে
কখনো দুপুর রোদে
জলের আয়নায় ফেলে
চিকন ছায়াকে
দেখে থাকে। (কয়েকটি যুবতী)[১]

অথবা, এই রকমই, আসরাফ সিদ্দিকীর কবিতায়—

ফুলে ঢাকা বিছানাতে সোনার পালংকে রেখে বুক
স্বপন দেখিছ মোর মুখ
নাম মোর 'সয়ফুল মুলুক'।
অনেক অনেক পরে: শাহ্‌জাদি। শাহ্‌জাদি!
পার হ'য়ে মাঠ ঘাট পার হ'য়ে কত না নগর
এঁদো ডোবা এঁদো ঝিল্‌ পার হয়ে কত প্রান্তর
তোমাদের দেশে এসে নাব্‌লাম।
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কবর শুধু
মহামারী বিষে বিষে সারা গ্রাম করিতেছে ধূ ধূ ..
শাহ্‌জাদি! শাহ্‌জাদি! শাহ্‌জাদি!
ডালিমের মত তব সুরক্তিম যৌবন প্রবাল—
কোন্‌ সে মায়াবী শ্বাসে পুড়ে পুড়ে হ'ল কংকাল।

(শাহ্‌জাদীদের দেশে : উত্তর আকাশের তারা)

তবে এরই পরে অন্য একটি কবিতায় দেখি সমস্ত রোমান্স ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে নদীর ভাঙা সাঁকোর ধারে পড়ে থাকা মহিলার মৃতদেহের বর্ণনায়—কবি এখানে সুদক্ষ-শিল্পীর মত যেন ছবি এঁকেছেন কলমের আঁচড়ে—

১ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০১-২

কপালের টিপটা তার মুছতে মুছতে
উপরের দিকে বেঁকে গেছে
হাতের কাচের চুড়ি গুলোর দুয়েকটি
ভেঙ্গে পড়ে আছে ঘাসের উপর
মুখখানা কাৎ হয়ে
না কিছুই দেখছে না সে
বুকের কাপড় পায়ের নগ্ন গোছা
কিছুই-না

(যখন কোন মহিলাকে)

রোমান্টিক মন নিয়ে কবি এইভাবে রাজপুত্র হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন রূপবতীর সন্ধানে? কোন শাহ্‌জাদী? রাজপুত্রী? মধুমালা? যুগের পরিবর্তনে তার মানস প্রতিমার একী দুর্দশা—

কুঁচের বরণ কন্যা—মেঘের মতন চুল—সেই ঘরে
শুধালাম : কেমন আছো?
: এতদিনে মনে প'লো? ছিন্ন কাঁথার মাঝে
ম্লানমুখ মধুমালা নীল হাসি হাসে।
: গজমোতি হার কই? মেঘডম্বরু শাড়ী?
মধুমালা! মধুমালা! এ কেমন দেখি?
... ...
শুধু মশকের ডাক! মধুমালা অচেতন!
ফিরিলাম। মোরও ঘুম নামে পাছে!!

(মধুমালা : সাতভাই চম্পা)[১]

সহজেই লক্ষণীয়—কবির রোমান্টিক ভাবস্বপ্ন অটুট থাকছে না, বিহ্বল হয়ে থাকছেন না কবি তাঁর একক প্রেমের অপরূপ সাম্রাজ্যে। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে স্বপ্নের সুষমা, বাস্তব এসে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে তাঁদের চেতনায় গভীরভাবে, দারুণ-ভাবে, অস্বস্তিকর পরিবেশে তখন তাঁরা স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুজে পাচ্ছেন না, হৃদয়ও হয়ত প্রতারিত হচ্ছে।

এইরকমই 'আবদুর রশীদ খান-এর একটি কবিতা, রোমান্টিক প্রেম ভাবনা কী ভাবে বেদনার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে—

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ- ৬০৪

গহন নিশির অতল মনে তবুও তার খানিক পরিচয়
মিথ্যা হবার নয়।
উনিশ বছর ধ'রে
তন্বী রোশনা বেগম ছিলেন আমার ঘরে॥
উনিশ বছর পরে
উল্লাপাড়ায় রোশনা বেগম এলেন হঠাৎ ক'রে।
চিনতে পারা কঠিন বটে চোখ দু'টো তার ছাড়া ;
স্বামী পুত্র মেয়ে নাত্‌নি নিয়ে আত্মহারা।

[উল্লাপাড়া ষ্টেশন : বন্দীমুহূর্ত][1]

উনিশ বছর আগে
রোশনা বেগম দাঁড়িয়েছিলেন সবার পুরো ভাগে।
চোখের দেখায় মনের নেশায় মত্ত ঝড়ের খেলা :
রক্তে নাচন বক্ষে কাঁপন, পৃথ্বী অবহেলা।
মনের আশা মুখের ভাষা সন্ত ফোটা পদ্ম ;
ধরায় কেবল দুইটি নয়ন নেশায় অনবদ্য।
রাত হলো দিন, দিন হলো রাত,
সৃষ্টি ছাড়া ঘূর্ণি-হাওয়া-ঘুর :
বুঝেছিলাম একটা নতুন সুর।
এরই মধ্যে উনিশ বছর বইলো কালের ধারা।
গাড়ীর চাকায় মনকে বেঁধে এখন উল্লাপাড়া॥
কাছে এলাম, দূরে গেলাম,
নতুন করে শপথ নিলাম।
যুদ্ধ এলো, চলে গেলো ; মড়ক এসে হাড় ছড়ালো ;
স্বাধীনতার নতুন আলো
চক্ষে লেগে ধন্য হলাম।
কোথাকার সে রোশনা বেগম
জীবন-যুদ্ধে কোন অতলে তলিয়ে গেলো ;

পাওয়া না পাওয়া, চাওয়া না চাওয়ার এই দ্বন্দ্ব এবং তার অনুরণন কবিতাটিকে মর্যাদা দিয়েছে।

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ পৃ. ৬০৬-৭

আব্দুর রশীদ খান মানব-মানবীর প্রেম ভাবনার একটি অন্যতর চিত্র এঁকেছেন। কাছে কাছে থাকলেই, হাতে হাত দিলেই দুটো মন এক হয়ে যায় না, কখন যে দুজনের মাঝে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে—

তুমি আমি আজো কাছে কাছে—
এই দেখো : তুমি তো আমার হাতে
তোমার কোমল হাত
আলগোছে রেখেছো এখন,
তবু জানি :
আমাদের ব্যবধান হাজারো যোজন,
গাড়ী যায়, গাড়ী আসে,
রেল-লাইন সমান্তরাল,
কা'রো চোখে মিশে গেছি,
তবু মিশি নাই
তবু কাছাকাছি :
এই রেল লাইনের মতো।

(রেল লাইন, নক্ষত্র : মানুষ : মন)[১]

ওমর আলীও প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন বিরহ প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার মধ্যে দিয়ে একই যাতনা বুকে নিয়ে পথ হাঁটছেন, অনুভব করছেন অশান্তি, ভীষণ অন্ধকার, বাতাসের দাপাদাপি, জলের ওপরে নীচে অজস্র সাপের হাহাকার, প্রেয়সীর সঙ্গে রাতের নৌকায় মুহূর্তগুলো তাই বেসামাল, ওমর আলী উত্তরণের অন্যপথ খুঁজেছেন, তাঁর দ্বন্দ্বকে পরিহার করবার জন্য, তিনি রোমান্টিক বীর নায়ক হতে চেয়েছেন—

তবু তুমি পেয়োনা ভয়, ধরে থেকো আমাদের
খুব ছোট নাওখানা মোচার খোলার মত শত
হাজার ঢেউ এর পরে যতো ডোবে আর ভাসে, ততো
মেঘের গর্জন, বৃষ্টি, ভাবো, বুঝি ইতি জীবনের ;
তখনো পেয়োনা ভয়, ধ'রে থেকো আমাকে দুহাতে
আমি নিরাপদে নৌকা নিয়ে যাবো সেই ঝড়ো রাতে।

(ঝড়ের রাত্রিতে নৌকায় : এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি)[২]

---

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. ছাপ্পান্ন-সাতান্ন

২ বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬১২

এখানে কোন সমাধানের নির্দেশ নেই শুধু আশ্বাস। ওমর আলীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি।' প্রেমের নানান আলেখ্যে সঞ্জীবিত গ্রন্থটি। মান-অভিমান মিলন-বিরহের বিভিন্ন মুহূর্ত আবেগ আনন্দ হৃদয় নিয়ে কথার মালিকার গেঁথেছেন। অনেক সময় ব্যবহার করেছেন 'স্তের ভাষাও—'একদিন তুমি ছিলে দুর্ধর্ষ রমণী।' আর আজ আমার বুকের সাথে পিঠ কোল বালিশের মতো অথবা তোমার কপালে টিপ,তাই তুমি অত্যন্ত সুন্দরী। তাই তুমি মিষ্টি, ভালো। প্রেয়সী তোমাকে আমি তাই আমার বুকের সাথে জড়িয়ে কত যে সুখ পাই। আমরা দুজনে কত কথা বলি, কতো গল্প করি। এ ধরনের অতি সাধারণ কথার মাধ্যমে তাঁর আবেগ ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছেন। এইরকম উষ্ণ আবেগ সঞ্চারিত ওমর আলীর আর একটি কবিতা

আমি কিন্তু যামু না। আমারে যদি বেশী চেষ্টা করো।
হুঁ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাকমু না।
আমারে যতই কও, তোতা পাখি, চান, মণি, সোনা।
আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরো।
শোবো না তোমার সঙ্গে, আমি শোবো অন্যখানে যেয়ে

(আমি কিন্তু যামু না)

প্রেমে যন্ত্রণার দাহন, তার নলিহান শিখাও ওমর আলি প্রত্যক্ষ করেছেন তার অতি সুন্দর বাস্তব, জীবন্ত, জ্বলন্ত একটি কাব্যমণ্ডিত চিত্ররূপ

একদিন একটি লোক এসে বললো, 'পারো ?'
বললাম, "কি ?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে', সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে—
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'
'কেন ' আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াব আগুনে।'

(একদিন একটি লোক)[২]

মাহাম্মদ মাহফুজউল্লাহও রোমান্টিক কবি, তাঁর কবিতায় বিশুদ্ধ রোমান্টিক রঙ, জীবনানন্দের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে চেয়েছেন, হয়তো বা সজ্ঞানেই—

আধুনিক কবিতা, পৃ আটাশি-উননব্বই।
২ " " পৃ. উননব্বই।

"তার স্বপ্নে স্বপ্নবতী সীমাহীন দিগন্তের তীর
সজল হেমন্তে একা আসে যদি স্নিগ্ধ সুষমায়—
উজ্জ্বল সোনালী ভোরে, মাঠে মাঠে কুয়াশা-নিবিড়
সে এসে বিছায়ে দেয়, শিশিরের স্ফটিক ছায়ায়
প্রতিভাত হবে আজ দূরান্তের সুনীল আকাশ
তা'র আগমনে জাগে শিশিরের স্বচ্ছ প্রতিভাস।
সে এলে নক্ষত্র নবে আকাশের বুকে স্পন্দমান,
বরফের মতো চাঁদ ঢেলে দেবে নীল জ্যোৎস্নাধারা
পৃথিবীর অন্ধকারে ... ...

(সেও যদি এসে থাকে : জুলেখার মন)[১]

প্রেমের কবিতায় সৈয়দ আলী আহসানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অন্তরে, সেখানে দেখি ইন্দ্রিয় ঘন অনুভূতি, প্রেমের বিচিত্র রক্তিম আবেগ, উত্তপ্ত অধীর আকাঙ্ক্ষা মুখর দেহের গান—

যখন তোমার উপর আমার দেহভাব অবনমিত হয়
তুমি শিহরিত হও আমাকে দেখে
তুমি একান্ত আমার
যেমন চক্ষু একান্ত ভাবে মুখমণ্ডলের
তুমি মৃত্যুর পথে নেমে যাবে
আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে (তোমাকে ধরা যায় না)[২]

এই রকম যেন চর্যাপদের জীবনে ফিরে যাওয়া কবির আশ্লেষ—

বন্ধুর পার্বত্য দিন—শবরী বালিকা
বল্কলে ঢেকেছে কটি-হৃদয় নিটোল
নয়নে আশ্চর্য মেঘ-মেঘ নয়, সূর্যের সায়র
দিবসের পাণ্ডুতাপে সে আমার কোমল মৃত্তিকা।
পুষ্পফল জীবনের দেহের দাহন
ভূমিকম্প দাবানল—অপাঙ্গে সংহার
হৃদয়ে দেহের শোভা স্নায়ু বিগলিত
পদ্মার প্লাবনে যেন বিচলিত তটভূমি সেই। (নায়িকা, এক)[৩]

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ দ্বিতীয়, পর্যায়, পৃ. ৬১১
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁয়ত্রিশ
৩. " " , পৃ. ছত্রিশ

এই রকম তৃষ্ণা, উন্মুখ কামনা, রক্তে আকুল দেহের স্বর্গে মহাকাব্যের ধ্যান—

(ক) বক্ষে তোমার আশ্রয় পেয়ে
যখন সহসা ভূকম্পন,
তখন কামনা উন্মুখ করে
কবিতা লেখার আকিঞ্চন। (সহসা সচকিত—১)[১]

(খ) তখন একটি কবিতাতো নয়,
যখন রক্তে আকুল বিনয়
দেহের স্বর্গে রাজ্য জয়ের
মহাকাব্যের ধ্যান। (সহসা সচকিত—২)[২]

(গ) হৃদয়কে কভু নয়নে অথবা দেহে,
স্নায়ুভারে কভু বিচলিত সত্তায়
উন্মুখ ক'রে ভেবেছি কাউকে দেব
কিন্তু তখন স্বর্গের তাপে হঠাৎ আশঙ্কায়
সর্ব হৃদয় সচকিত হ'য়ে সহসা বিলীন হ'ল। (সহসা সচকিত—১)[৩]

দেহজ প্রেম এবং রতির আধিক্য সেখানকার কাব্যেও ঢেউ তুলেছে। জীবনের ক্ষয়িষ্ণুরূপ ক্লেদাক্ত পঙ্কিল চিত্রের একটি কবিতা—

তুই আমার নতুন সঙ্গিনী, শস্তা, নাক বাঁধানো-নাগর,
এমন কি জানিস না অ আ ক খ, দিস না, রাখিস না,
জানিস ক' চিমটি লবণ হ'লে তা বিষ,
কখনো কোলের অন্ধকারকে তুলে দিস তোর স্তন,···

অথবা,

তুই আমার শস্তা, তোর মুখ মনে করায় শিশুর পেছনটা,
মধ্যে রক্তিম, পরে পরে পাণ্ডুর। তুই মনে রাখিস
আধলার দাম, এমনকি আমার মুখ
তোর কাঁধের আলনায় যখন ঝুলতে থাকে
শূন্য, বেফাঁস পাজামার মতো—
(সৈয়দ সামসুল হক : শূন্যতায়, শুধু শূন্যতায়, একদা এক রাজ্যে)[৪]

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. উনচল্লিশ
২. " " পৃ. উনচল্লিশ
৩ " " পৃ. আটত্রিশ
৪. " " পৃ. আটাত্তর

অথবা

গালবাদ্য করি সুরা পেটে গেলে পর,
বেশ্যাকে বসাই কোলে। বলে সে হঠাৎ,
মিয়া ভাই, কি জিগাম হাবি জাবি, বাতি
নিবাইয়া দেই, না, বাতি থাকব কন।
আমার ব্যারাম নাই, নিশ্চিন্তে করেন।

(সৈয়দ সামসুল হক)[১]

এই ধরনের নগ্ন শ্লীলতাহীন চিত্র অঙ্কনে বাহাদুরি হয়ত আছে, একটা যুগের অবক্ষয়, পঙ্কিলতা, গ্লানি, কদর্যতা হয়ত এর মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকবে, কিন্তু কবিতার অঙ্গন এখনো এধারায় অনভ্যস্ত। মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে ঠিকই; ভাঙনে, তাণ্ডবে, পাশবিক লালসার আগুনে জরাগ্রস্ত এ সমাজ, এও সত্য, কিন্তু মানুষ বর্তমানকে নিয়ে শুধু বেঁচে থাকে না, তার আর্তি আগামীকালের জন্যও, সেকাল সুন্দর সজীব প্রাণবন্ত জীবন যেখানে স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ সে চিত্র কবিতায় যখন মসীলিপ্ত হতে দেখি, তখন তিনি যত শক্তিশালী কবিই হোন না কেন, তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে যতই না কেন যুক্তির অবতারণা করা হোক, কবিতার অঙ্গন কলুষিত হয়ে ওঠে।

বাঁধ ভাঙা উচ্ছল জীবনের এইরকম চিত্র ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতাতেও সেখানে দেখি একাকী স্পন্দিত নিত্য রক্তের ক্ষুধার্ত অন্ধকারে উল্লাস, সঙ্গিনীর ক্ষুধার্ত তিমির অভিসার, দৈহিক অভিজ্ঞতা, নারী মাংসের ক্ষুধা, আসঙ্গলিপ্সা, লালসাবহ্নি উদ্রিক্ত এইরকম কবিতা—

অকস্মাৎ সেই শকুন তার ধারালো নখের আঘাতে, চঞ্চুর আঘাতে
ছিনিয়ে নিল আমার শরীর থেকে আমার মানুষীকে।
মুহূর্তে তার স্তনের মাংস উরুর মাংস সব টুকরো টুকরো
করে ছিঁড়ে ফেললো সেই ঘাসের ওপরে সবুজ
তৃণের রাজ্যে একটু একটু আগে যাকে আমি আদর করেছি
স্পর্শ করেছি চুমু খেয়েছি—যার উষ্ণতায়
আমি এক অনন্ত অতৃপ্তির সমুদ্রে ডুবে থাকতে চেয়েছি।

(দুঃস্বপ্নের মত একদিন, তৃষ্ণার অগ্নিতে একা)[২]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. উনআশি
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁচাশি

অথবা রক্ত মাংসে লালসায় তীক্ষ্ণ আমরা ক'জন
শীত গ্রীষ্মে বিড়ি ফুঁকে তাড়ি গিলে নিশ্চিত উন্মাদ
এই বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রণার কুহকে মাতাল
বিভ্রান্ত সৌরভে মগ্ন কয়েকটি কামুক কুকুর
দুপুরে সন্ধ্যায় নিকষ রাত্রিতে ক্লান্ত, ক্লান্ত, ক্লান্ত।

(কয়েকটি ক্লান্ত কুকুর)[১]

এর চেয়ে একাধারে কবি ও গীতিকার মোহাম্মদ মণিরুজ্জামানের কবিতায় প্রেমের যে স্নিগ্ধ দ্যুতিদীপ্তি তা' লিরিকের মর্যাদা পেয়েছে--

(ক) আমাকে পলাশ দিয়ে সে নিজেই হ'ল যে পলাশ,
হৃদয়ের মুগ্ধ প্রেমে স্বপ্ন তার চঞ্চল আকুল,
উন্নত অধীর সাধে অনুরক্ত রক্তলেখা কাঁপে
সবুজ পাতার কোলে। ঝুরু ঝুরু ভীরু পরাগের
ছন্দ দুলে দুলে যেন বলে ওই স্নিগ্ধ দাখিনায় ; (উৎসর্গ, দুর্লভ দিন)[২]

(খ) কান্না যেন রৌদ্রে জ্বলা মণি
ঝর্ণা নামা পাষাণে ঘুম ভাঙা
অনাবৃত অশঙ্ক আশ্লেষে
সিক্তস্মৃতি : কান্তি রাখে বুকে ॥ (কান্না যেন, দুর্লভ দিন)[৩]

(গ) লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি
এ তিন ভুবনে নেই তো তোমার জুড়ি ;
বিদ্যুতে মেঘে অর্পিত তনু কেশ (রূপম, দুর্লভ দিন)[৪]

(ঘ) রেখে যাও হাতের সোনা হাতে
খুলে নাও বর্ণমণি, সাথে
কি আছে কি নেই, অবহেলা,
করে কি ঝরবে সারা বেলা। (বর্ণমান, বিপন্ন বিষাদ)[৫]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁচাশি
২. ,, ,, ,, সাতাশি
৩. ,, ,, ,, সাতাশি
৪. ,, ,, ,, সাতাশি
৫. ,, ,, ,, আটাশি

সিকান্দার আবু জাফরের প্রেমের কবিতা বিষণ্ণ মধুর, রোমান্টিক আমেজ মাখানো।

কোন বিকৃত রুচির দ্বারা কবিচিত্ত আক্রান্ত নয়। প্রেম তার কাছে মূল্যবান, জীবনের মূলধন। অনেক সময় প্রেমের কবিতাগুলো গীতি কবিতার প্রসাদগুণ পেয়েছে। কবি প্রেমের প্রসাদ সমভাবে বণ্টন করে নেবেন[1]······

······'যা হবার হবে—আছিতো আমরা দুজনে
ভাগ করে নেবো দুজনেই (দুজনে)

জানেন, প্রেম তাঁর নিত্য সঙ্গী—

প্রতি পদক্ষেপে তবু, চতুর্দিক ঘিরে
তুমি সঙ্গে ছিলে।

প্রেমের মধ্যে পেয়েছেন গতির অপরূপ সন্ধান—

'আমার প্রেমের পাখী অবিশ্রান্ত গতি
পক্ষে তায় তার কণ্ঠে সুরের মিনতি। (জিজ্ঞাসা)

মান, অভিমান, কলহ সব নিয়েই প্রেম, তার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে 'প্রিয়তমাকে' কবিতায়। ভালবাসা তাঁর অনন্ত, ভালবাসা তাঁর বুক ভরা, তবু একটি ব্যর্থতার হাহাকার, প্রচ্ছন্ন বেদন বোধ—

'যত ফাগুনের আয়োজন ছিল
এখন রিক্ত ম্লান
দিন রাত্রির অযাচিত ব্যর্থতা
নীরব করেছে ভাষা
অন্তরে তবু জীবনের রসে এখনো সঞ্জীবিত
বঞ্চিত ভালবাসা। (কাহিনী)

হয়ত প্রত্যাখ্যান ছিল, বিরহ কি তাই মৃতস্বপ্ন দেখছে?

ফিরে গেছ তুমি প্রাণের প্রান্ত হতে
তবুও কি যেন রোমাঞ্চ ডাকে
ক্লান্ত মনের পাখি
ফিরে গেছ তুমি বিস্মরণের স্রোতে,
তবু বিস্ময় এখনো তোমাকে ডাকি।

১. অমিয়কুমার হাটি, পূর্ববঙ্গের কবি, সিকান্দার আবুজাফর, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা ৭৪, পৃ. ৫৫১.৫৪ (১৯৬৮)

প্রেম, প্রয়োজন ও বর্তমান জীবনের কথা লিখেছেন 'স্বপ্নের দিন' কবিতায়। ভালবেসেই তার সুখ, তাঁর আনন্দ, তাঁর দুঃখ, প্রতিদান তিনি চাননি। যুগ-যন্ত্রণা-মথিত প্রেমের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কতকগুলি কবিতায়। অন্যমনা হলেও প্রেমের প্রতি প্রেমিকের খেদ নেই, সেই প্রেমিকার জন্যই রেখে গেছেন 'এ প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়।'

—'আমার যা কিছু ছিল' কথার
সেতুর শেষে প্রেমের কি শেষ ?—
একদিন শেষে ফুরিয়ে গিয়েছে কথা,
আমাদের দুটি প্রাণের ভুবন ঘিরে
নেমেছে সুপ্ত রাত্রির নীরবতা
শেষ হয়ে গেছে কথা।'

'গতানুগতিক' কবিতায় প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করেছিল নায়ক। হ্যাঁ না কিছু সে দয়িতা বলেনি। জন্মদিনে দয়িতাকে দেখা গেল অন্য বন্ধুর গাড়ীতে। নায়ক কিন্তু অভিযোগ করছে না।

তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি কিনা ?
না
আমরা যে সমাজের জীব—
তারই ধারায় তুমি ভাসমান তৃণ !
ইতিহাস পরিবর্তনের দিন এলে
হৃদয় নিয়ে তুমি খেলবে না
আমি জানি।

'আকাশ' কবিতায় একই আকাশ প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে দুরকমভাবে প্রতিভাত। কল্পনার অভিনবত্ব এখানে লক্ষণীয়। একালের নায়িকা সাংসারিক দুর্দশাগ্রস্ত—

তুমি এক ভাঙা ঘরের ঘরণী
ফাঁকা অস্থির শীর্ণ কাঠামো নিয়ে
ব্যাধি দীনতার সমুদ্রতলে
জীবন খুঁজতে চির নিষ্ফল
নিয়ত জীবন দিয়ে—

(নায়িকা)

এ-যুগের দুঃখকষ্ট সমভাবে সইতে হবে—সুখ বৈভবে রাখতে পারবে না দয়িত তার দয়িতাকে। 'আমার সঙ্গে' কবিতায় তাই বলছেন,—

'তোমাকে কখনো সুখ বৈভবে
রাখতে যে পারব না।
নিত্য নূতন দুঃখের গ্লানি
বার বার ডেকে আনব,
কান্না মোছার আগেই হয়ত
নতুন অশ্রুজলে
দুই চোখ যাবে ভেসে
যদি সইতে পারো তবে এসো
আমার সঙ্গে এসো।'

পূর্ববঙ্গের কবিতার ধারায় প্রেম সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি রোমান্টিক মনোভাব, কোন কোন কবি শুধু রোমান্টিক ভাব জগতেই এখনও, এই যুগেও বিচরণ করছেন, কারুর এই পরিক্রমণ পারিপার্শ্বিক পরিবেশে, বাস্তবের কঠোর আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, কেউ এক্ষেত্রে জোড়াতালি দিতে চাচ্ছেন, শুধু আশ্বাসের কথা শোনাচ্ছেন, রোমান্টিক বীর নায়ক হতে যাচ্ছেন, কেউবা দয়িতাকে আপনার অক্ষমতা জানাচ্ছেন, সেক্ষেত্রেও এসে পড়েছে জীবন বিমুখতা, আবার অন্য কেউ সংগ্রামের সঙ্গী হিসেবে পেতে চেয়েছেন প্রেমিকাকে, সুখে দুঃখে জীবনকে ভাগ করে নিতে চাচ্ছেন। কামনা, বাসনা, আশ্লেষ আবেগ, রাত, অনুভূতি, দেহজ উষ্ণতা কারু কারু কাছে প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে, জীবনের এই একটি দিকই এরা বেশীভাবে দেখেছেন, কিন্তু কোন কোন কবি এরকম একচক্ষু নন, তাঁরা আরও জেনেছেন, জীবনের উৎস প্রেম, জীবন ধারণের শক্তি প্রেম, প্রেম মানুষের চিত্তের মহত্তম বৃত্তি—সেই অমলিন প্রেম প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও সংগ্রাম ও সাধনার প্রয়োজন। ক্লেদাক্ত জীবন ধারার অন্ধকার দিকটার লালসা-লোলুপ দিকটিও অনেক কবির কবিতায় খুব বেশীরকম ফুটে উঠেছে। এখানেও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনের এই অন্ধকার থেকে, অতৃপ্তি থেকে, অবসাদ থেকে, জরা থেকে মুক্তির কোন নির্দেশ যেহেতু নেই এসব কবিতায়। আরও একটা কথা বলার আছে। প্রেমের বিচ্ছেদ, মিলন, মন ভাঙা-ভাঙি স্বাভাবিক। সেসব চিত্র আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত থাকলেও সেখানকার মুসলমান কবিদের কবিতায় একনিষ্ঠ প্রেমেরই জয়গান। এদিক দিয়ে তাঁদের অধিকাংশের সততা একান্তভাবে অনুধাবনযোগ্য একথাও জোরের সঙ্গে বলা যায়, অধিকাংশ কবিই আলোকিত মনের কবি। জীবনের এই স্বাভাবিক

বৃত্তিটাকে সহজ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, অনর্থক জটিলতার ভারে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাননি ওঁদের অনেকেই। কেউ কেউ বলেন, প্রেমই কবিতার প্রাণ। আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি, কবিতার প্রাণই প্রেম। সেই প্রেমের, সেই কবিতার সার্থক চিত্র অঙ্কনে ওখানকার কবিরা অত্যন্ত আগ্রহশীল, সমধিক যত্নবান, তাঁদের নিষ্ঠা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত।

॥ ৫ ॥ পূর্ব বাঙ্‌লার কাব্য সাহিত্যের সোনালী অঙ্গে ফোকলোর বা লোকলোর, লোকসাহিত্য, লোকগীতি প্রভৃতিও এক একটি স্বর্ণপদ্ম সংযোজন করেছে। এ-বিষয়ে ডঃ মযাহারুল ইসলামের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর গবেষণার একটি অমূল্য ফসল[১] ফোকলোর পরিচিত এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন। প্রবন্ধ লেখক মুখবন্ধে বলেছেন, একটি প্রথাবদ্ধ ধারণা রয়েছে যে, ফোকলোর শুধু অতীতের— বর্তমানের উন্নত সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসরে বসবার তার কোন অধিকার নেই। কেননা তার শরীরে অতীতের অপরিচ্ছন্নতা ও ক্লেদ এবং বৈজ্ঞানিক চেতনায় উন্নত সমাজে বা সভ্যতায় তার কোন মর্যাদার ঠাঁই নেই।

কিন্তু ফোকলোরের নানা বিচিত্র শাখা থেকে দেশের সাংস্কৃতিক জীবন যেমন রস আহরণ করেছে, পুষ্প হয়ে উঠেছে, কবিতার ক্ষেত্রেও ঘটেছে এমনটি, উদাহরণ স্বরূপ গ্রাম্যকবি লালনশাহ, পাগলা কানাই, মনসুর বয়াতি, মদন বাউল, হাসন রাজা, প্রমুখের রচনা যদিও সঠিক অর্থে আধুনিক কাবতার দরবারে ঠাঁই পাবে না, তবুও জীবনের নানা বিচিত্র কলরবে মুখরিত। পরোক্ষভাবে তার প্রভাব পূর্ব বাঙ্‌লার কাব্য সাহিত্য কখনই অস্বীকার করতে পারবে না।

লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এক জায়গায় বলেছেন "প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী পথে সমাজ যখন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল, তখন সকল দেশেই স্মৃতি শক্তির যে রূপ অনুশীলন হইত, আজ আর কোথাও তেমন হয় না। সেই জন্যই একদিন যাহা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহাই লিখিত হইয়া সমাজের স্মৃতির ভার লাঘব করিতেছে।"[২]

এই প্রসঙ্গের জের টেনে ডঃ ইসলাম বলেছেন, "এই আলোচনার আলোকেই বলতে পারি, লোকসাহিত্য শুধু অতীতের সামগ্রী নয়, লোকসাহিত্য বর্তমানের ও জনসাধারণেরও সৃষ্টি হতে পারে। এজন্যই যে দেশে অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রায় নেই বললেই চলে, সবাই প্রায় যে দেশে শিক্ষিত, যে দেশে গ্রাম একান্তভাবেই বিরল,

১ ডঃ মযহারুল ইসলাম, 'ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন, বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, (১৯৬৭)।

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙ্‌লার লোক সাহিত্য, কলিকাতা, (১৯৫৭) ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১-১২

বাসস্থানমাত্রই প্রায় শহরে রূপান্তরিত, সেখানেও লোকসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম অবরুদ্ধ হয়ে পড়েনি—বরঞ্চ লোকসাহিত্যের ধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। .. সুতরাং লোকসাহিত্যের সৃষ্টিধারা মানব সমাজে অমর, সে লিখিতই হোক আর অলিখিতই হোক, সে সমাজ শহরেই হোক আর গ্রামকেন্দ্রিকই হোক।[১]

এইসব ক্ষেত্রে কবিতা কার রচনা, সেটা জানা যায় না। সমগ্র জাতির রচনা—সেই কালের সঙ্গে জড়িত। যেমন 'অজগর ও রাখাল রাজা' কাহিনীর একটি কবিতা—

তোমরা পিতা, তোমরা
কি মাতারে বাপু
তোমরা ধর্মের ভাই ওরে,
কি শোন শোন ও রাখাল রাজারে।

এ হচ্ছে রাখাল রাজার কাছে অজগর দম্পতির প্রাণ প্রার্থনা। রাখাল রাজা বনে আগুন লাগিয়েছিল। রাখালরাজা প্রার্থনা পূরণ করেছিল। অজগর দম্পতি তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল, তাকে সম্পদের অধিকারী করিয়ে দিয়েছিল, রাখাল ফিরে পেয়েছিল তার বাবাকে।

গীতি কবিতা লোকসাহিত্যে কি রকম চিন্তা ও চেতনার স্বাক্ষর প্রতিবিম্বিত করতে পারে তার একটি উদাহরণ, "যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে, তার স্মৃতি বাঙ্‌লাদেশের মানুষের নিকট সূর্যের মত সমুজ্জ্বল। সেই কারণেই বাঙ্‌লার লোককবিরা শহরে বন্দরে গ্রামে মাঠে সেই বেদনাঘন করুণ কাহিনী গানে, গীতিকায় (Ballad) এবং কথায় (Folktale) রচনা করে চলেছেন। এগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এবং .. কালের সকল পরীক্ষা অতিক্রম করে এগুলো একদিন কালোত্তীর্ণ হবে এবং সত্যিকার লোক-সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে—

আবার লাইন কর‍্যা গুলি ছোড়ে
কত মানুষ মারে
গোর খুদিয়া জান্ত মানুষ
মাটির নিচে গাড়ে।
দুঃখে বলবো কত মাথা নত
চোক্ষে ঝরে জল

১. ফোকলোর পরিচিতি পৃ. ২৪

রাস্তায় ঘাটে কত মানুষ
কান্দিয়া পাগল
মানব না আর টাকা খান, তামুক খান
হুক্কা খানে ভাই
মুক্তি সেনার খুঁজি লও সব
সংগ্রাম করতে যাই
মুক্তিসেনা নও জোয়ান
হয়েছে সামনে আগুয়ান
পিছায়না বাঙালী সন্তান
কারো ভয়ে রে
আয় সবে আয় সামনে যাব
বাংলার জয়ে রে।[১]

এইরকমই, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল—নিজের বলতে যা কিছু তার সবই অন্যের দ্বারা শোষিত হতে দেখে জনতার কবি গভীর দুঃখে উচ্চারণ করেন—

মিছাই বল আমার আমার
সকলই অপরের খামার
চারদিকে সব স্বর্থের বাহার
দেইখ্যা শুইন্যা বাঁচি না।[২]

অন্যত্র সাদামাটা জীবনের কত নিপুণ ছবি—

যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা অন্যে দেব ট্যাহা দামের মোটরী।[৩]

আবার আর একটি ছড়া—

খোকা এল বেড়িয়ে
দুধ দাও গো জুড়িয়ে॥
দুধের বাটি তপ্ত
খোকা হল খ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে॥[৪]

১. ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন, পৃ. ৪২০-২১
২. ” ” ” ” ” ” পৃ. ৪২৪
৩. ” ” ” ” ” ” পৃ. ৪৬৯
৪. ” ” ” ” ” ” পৃ. ৪৬৮

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ ছড়াটির আলোচনা ও সমালোচনা করে গেছেন।

লোকসাহিত্যে ছড়া হেঁয়ালী বা ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন, লোকগাথা, লোককথা (রূপকথা উপকথা) ও লোক সঙ্গীত বিভিন্ন বিচিত্র বহুমুখী রসাস্বাদ বহন করে আনে। আধুনিক যুগের মানুষের কাছেও, বলা বাহুল্য সে রস তার আবেদন হারায়নি। অপাংক্তেয় হয়নি। এই ধরনের 'লৌকিক কবিতার' মধ্য দিয়ে জাতির জীবন ইতিহাস ও সংস্কৃতি ভেসে ওঠে। কে বা কারা এর স্রষ্টা জানা যায় না। কারুর একক সম্পত্তি নয়—জাতীয় সম্পত্তি, উদার গণতান্ত্রিক এই চেতনাটুকু সবিশেষ লক্ষণীয়।

ছড়ার নানা রূপ, নানা শাখা, নানা ভঙ্গী, নানা রীতি। শিশু বিষয়ক ছড়ায় ছেলেমেয়েদের স্নান করানো, দুধ খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, শিশুকে শিক্ষা দেওয়া ও আনন্দ দেওয়া এইসব উপজীব্য। খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ছড়ার মধ্যে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে খেলার ছড়া, মেয়েদের আলাদা খেলা ও আমোদ-প্রমোদের ছড়া ইত্যাদি. বিবিধছড়া —অভ্যাস গঠনমূলক মিষ্টির বিষয়ে, সমস্যামূলক, প্রাকৃতিক ঘটনা-বিষয়ক, সামাজিক প্রতিক্রিয়ায়, স্বাস্থ্য-বিষয়ক, কাজে উৎসাহ ও শক্তি পাবার।

কৃষি-বিষয়ক ও খনার বচন, রূপকথা-উপকথা ইত্যাদিও অনুধাবনযোগ্য। সব ছড়ার মধ্যেই যে সার্বজনীন মানবিক আবেদন আছে তা' নয়। যেসব ছড়ায় সর্বজনীন মানবিক আবেদন আছে, সেগুলোই সাহিত্য পদবাচ্য। এগুলো থেকে নিগূঢ় রহস্যময় মানব মনের রসবোধ ও সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় পাই, জীবনের প্রেরণা লাভ করতে পারি। লোকসাহিত্যে ছড়া সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনাসহ বহু ছড়ার সঙ্কলন করেছেন মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী।[1] অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'বউ কথা কও' প্রবন্ধে[2] পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় এই পাখীর প্রসঙ্গে যে গল্প ও ছড়া আছে তার উল্লেখ করেছেন, যেমন, শ্রীহট্টে ঐ পাখীর নাম কাঁটাল পাখি। বাঘ এসে ভাইকে মেরে ফেলল, মরা ভাইকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে মরল বোনও। দয়া হল দেবতার, সে বোনকে কাঁটাল পাখি করে দিল, পাখি এখনো শোক ভুলতে পারে না। গান গায়

কাঁটাল পাখি নাইওর
ভাইকে খাইল বনের বাঘে।

১. মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী (১৯৬৮). লোকসাহিত্যে ছড়া. আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা পৃ. ১০৬

২. ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক—শারদীয়া সাহিত্য সংলাপ ; 'বউ কথা কও', গভঃ হাউসিং এস্টেট কলি—৩৯, (১৯৭৪)

আর একটি পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছড়ার উল্লেখ করেছেন এই প্রবন্ধে ডঃ ভৌমিক। কাঁঠাল পাকার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে থাকা মেয়েদের শুনিয়ে এ পাখি যেন বলে—

শুনছো মাগো, কাঁঠাল পেকেছে—
দেখছো না গো বাবা আসবে
নিয়ে যাবে কাঁঠাল পেকেছে।

বিবাহিত নারীর জীবনে বাপের বাড়ী তো কম নয়। সেখানে আছে স্নেহের ভাই, আদরের বাপ ও মমতাময়ী মা। এই ছড়ায় বিবাহিতা নাড়ীর বাপের বাড়ীর কথা মনে পড়েছে। পাখি যেন পিতৃকুলের কথা বলছে।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকসাহিত্য আধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্ববঙ্গে এই ধারাটি প্রাণবন্ত বহমান। আধুনিক কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে হয় বেঁচে আছে। ওখানকার সুধী সাহিত্যিকবৃন্দ সে চেষ্টা করেছেন। কবিরা রসদ আহরণ করছেন জীবনের চিত্রকল্পগুলি হতে।

॥ ৩ ॥ পূর্ববঙ্গের সারস্বত প্রাঙ্গণে কথাসাহিত্যের শাখাসমূহও বিকাশোন্মুখ। এক্ষেত্রেও কালান্তর এসেছে। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রয়াস সুস্পষ্ট।

দেশ বিভাগের আগেও উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকদের। পদচারণা লক্ষ্য করা গেছে। মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' একটি মাইল-স্তম্ভ বিশেষ। বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। এরপর অনেকেই উপন্যাস রচনা করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে মোজম্মেল হক-এর কথা—উপন্যাস দরফ খাঁ গাজী (১৯১৯) (ঐতিহাসিক সামাজিক), জোহরা (১৯১৭)(সামজিক), ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত উপন্যাস তারাবাঈ, নুরউদ্দীন, ফিরোজা বেগম, রায় ননদিনী (ঐতিহাসিক সবগুলিই) কাজী ইমাতুল হক (আবদুল্লাহ), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ, ডঃ মহম্মদ লুৎফর রহমান (বাসর উপহার, প্রীতি উপহার, রায়হান, সরলা প্রভৃতি) ও আবুল ফজল-এর (চৌচির সহাস্মিকা) প্রভৃতির কথা। এঁদের অনেকেই ছোট গল্প, প্রবন্ধও রচনা করেছেন। এদের অনেকের রচনায় কিন্তু প্রাচীন ভাবধারা তার জ্বাড়া নিয়ে উপস্থিত। অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অনুকরণ প্রবণতা। জীবনের বহু বিচিত্র কলরব তেমনভাবে উপস্থিত হয়নি। দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির কাছাকাছি অনেকেই ঐ যুগে যেতে পারেননি, তেমন পরিচিতি অনেকে লাভ করতে পারেননি—কথাসাহিত্যের অঙ্গনে।

স্বাধীনতার পরে তাঁদের পূর্ববর্তী ভাবধারাকে কাটিয়ে উঠতে অবশ্যই কিছু সময় লাগল। নানা সমস্যা জর্জরিত ছিল দেশ। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো দীনতা প্রকটিতই ছিল। অভাব ছিল অভিজ্ঞতার। হয়ত অভাব ছিল সৃষ্টিশালী প্রতিভারও।

কিন্তু একটি জাতির জন্মলগ্নে প্রতিভারও জন্ম হয়। নতুন নতুন মানুষ এগিয়ে এলেন সাহিত্যের এই শাখায় আশার আলোকবর্তিকা হাতে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। সমসাময়িক গতিমুখর বহু বিচিত্র দ্বন্দ্বসমাকুল সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার নানান বর্ণালীতে দীপ্যমান জীবনতারা ছায়া ফেলতে লাগল পূর্ব বাঙলার সৃষ্টিধর্মী কথাসাহিত্যে।

এই পর্যায়ে আমরা উল্লেখ করতে পারি সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের "লাল সালু" কিম্বা আবুইসাহার "সূর্য দীঘল বাড়ী" উপন্যাসদ্বয়।

পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, যে নতুন পরিবেশ গড়ে উঠেছে, যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে সেখানকার জনমানসে, তার গতি-প্রবাহ উপন্যাসের ধমনীতে হাত দিলে অনুভব করা যায়। সমাজজীবন সম্পর্কিত, ঐতিহাসিক পটভূমি অবলম্বিত, মনস্তত্ত্ব ও যৌনচেতনাসম্পন্ন উপন্যাসগুলিতে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আভাস সূচিত। আমাদের আলোচনার এই পরিসর সংক্ষিপ্ত। শুধু একটি রূপরেখা দেওয়াই সম্ভব।

আঞ্চলিক জীবনধারার উপর কয়েকটি সার্থক উপন্যাস—আলাউদ্দীন আলআজাদ-এর কর্ণফুলী (১৯৬২), তারা হোসেনের মহুয়ার দেশে (১৯৬৬), বদরুদ্দীন আহমদ-এর অরণ্য মিথুন (১৯৬৩), বদরুন্নেসা আবদুল্লাহর কাজলদিঘীর উপকথা (১৯৬২), আলাউদ্দীন খান-এর অববাহিকার উপকথা (১৯৬৫), কাজী আকসারউদ্দীন-এর চর ভাঙ্গা চর, সামসুল হকের নদীর নাম তিস্তা (১৯৬৬), রাবেয়া খাতুন-এর মধুমতী, আবুল কালমের কাশবনের কন্যা (১৯৫৪), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), শহীদুল্লা কায়সারের সারেং বৌ প্রভৃতি।

আঞ্চলিক জীবনধারার, গ্রামের চাষীর দুঃখ-যন্ত্রণা, দৈন্য-বেদনা, শোষণ-যন্ত্রণা, ধীবর, বেদে, সারেং প্রভৃতির জীবনালেখ্য এগুলোর মধ্যে শিল্পীর তুলিকায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

নগর জীবনের পটভূমিকা, সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, ঘাত প্রতিঘাত, অন্যায়, অবিচার, কলঙ্ক কালিমা নিয়ে লেখা সরদার জয়েন উদ্দীনের 'পান্নামোতি' (১৯৬৪), শওকত ওসমানের 'জননী', আবদুল গাফফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান', রশীদ করিমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৫৬) ও প্রসন্ন পাষাণ, আবু রশীদের 'সামনে নতুন দিন' ও 'ডোবা হল দিঘী' (১৯৬১), 'নোঙর' (১৯৭০) আতাহার আহমদের 'উন্মোচন', 'সূর্যের নিচে', ও 'পিপাসা', শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ', আনিস চৌধুরীর 'সরোবর', ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে' ও মীর আবুল হোসেনের 'বিপনী মন' প্রভৃতি।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষপীড়িত পটভূমিকায় 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), আলাউদ্দীন আল আজাদ ও শহীদুল্লা কায়সারের অন্তস্বাদের উপন্যাস গতানুগতিক জীবন ধারা থেকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা সম্বলিত 'সংশপ্তক'ও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের উপন্যাস 'বিশ শতকের মেয়ে' বিশেষভাবে আলোচনা করার দাবি রাখে। নগর জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনা, ক্ষত-বিক্ষত মন ও মানস অনবদ্য রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, আধুনিক উপন্যাসের ধারায় এটি একটি অনন্য সংযোজন, ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবন, বাস্তব অনুভূতি, মানুষের মনের কামনা-বাসনা আকাঙ্ক্ষা ও এষণা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সমাজ জীবনের সমাজচেতনা সংযুক্ত হয়ে নতুন রসধারা প্রবাহিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এইরকম কয়েকটি উপন্যাস সত্যেন সেন-এর 'অভিশপ্ত নগরী', আবুজাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান', 'পূর্বদেশে', 'মস্তান','গড়' প্রভৃতি। সরদার জয়েন উদ্দীনের 'নীলরঙ রক্ত' ও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

মনস্তত্ব ও যৌনচেতনা সম্পৃক্ত কয়েকটি উপন্যাস—রাজিয়া খানের বটতলার উপন্যাস, আহসান হাবিবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৫৮), সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো', সৈয়দ শামসুল হকের 'এক মহিলার ছবি', আলাউদ্দীন আল আজাদের 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র', 'শীতের শেষ রাত' ও 'বসন্তের প্রথম দিন,' ফজল শাহাবুদ্দীনের 'দিক চিহ্নহীন' প্রভৃতি।

মানব মনের জটিল ধারা, চিন্তা প্রভাব, পরিণতি এগুলিতে আলোচনা বা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপন্যাসের এই ঐতিহ্যের পথ অনুসরণ করেই ওদেশের ছোট গল্পকার ওবায়দুল হক, সরদার জয়েনউদ্দীন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবদুল গণি হাজারী, সৈয়দ-সামসুল হক, শহীদ সাবের, শওকত আলী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শাহেদ আলী, জহির রায়হান, হাসান আজিজুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, রাদিয়া মাহবুব, রশীদ হায়দার, আখতারুজ্জামান, রাবেয়া খাতুন, আহমদ ছফা, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত ওসমান, রাজিয়া খান, রশীদ হায়দার প্রমুখ নতুন নতুন পথে পদচারণা করে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে, নবনব আঙ্গিকে জীবন রসে জারিত সৃষ্টিধর্মী প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন। এঁদের অনেকেই অতি জটিল আধুনিক জীবনের জট খুলে ঢেউ মাপছেন জীবন দরিয়ার, প্রগতিশীল চিন্তাধারা অনেকেরই লেখনীতে, গতি সম্পন্ন, সুস্থ জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই।

আর একটি সৃজনীশীল ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গের আধুনিক নাটক। এদিক দিয়েও, ওদেশের নাটকের পটভূমিকায়, সামাজিক নাটকেরই সৃষ্টি হয়েছে বেশি। অতীতকাল ও মানস, তার প্রভাব প্রতিপত্তি, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তার বহমানতা- তার বর্জনীয় ও গ্রহণীয় অংশ, সমকালীন সমাজ, তার চেতনা. আশা-আকাঙ্ক্ষা, মানুষের দ্বন্দ্ব অভিঘাতমূলক মন, জটিলতা, সংগ্রামচেতনা রোম্যান্টিকতার আশ্রয় ত্যাগ করে বাস্তবমুখীনতা, এগুলো হল গুণগত দিক। আঙ্গিকে, সংলাপ রীতিতে, পরিবেশন পদ্ধতিতে, দৃশ্যপট উপস্থাপনায়, গতিতে, রস সঞ্চারে, ভাবাবহ সৃষ্টিতে, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে নাট্যকারগণ অগ্রসর হয়েছেন এবং বলা বাহুল্য অনেকাংশেই সাফল্য অর্জন করেছেন। যুগান্তরের চিহ্ন এক্ষেত্রেও বিদ্যমান। নাট্যকার হিসেবে ইব্রাহীম খাঁ, নাটককাফেলা, (সামাজিক) ঋণ পরিশোধ (সামাজিক) কামালপাশা, আনোয়ার পাশা প্রভৃতি আকবর উদ্দীন (আজাদ পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় সমাজ জীবন সম্পর্কিত সমস্যা রূপায়ণ), নাদির শাহ, মুজাহিদ, সিন্ধু বিজয় প্রভৃতি। নুরুল মোমেন (নেমেসিস (১৯৫৮), রূপান্তর (১৯৫৯), নয়া খান্দান (১৯৬২), আলোছায়া (১৯৬২), যদি এমন হতো (১৯৬০), শতকরা আশী (১৯৬৯), আইনের অন্তরালে (১৯৬৭) প্রভৃতি। মুনীর চৌধুরী (কবর, দণ্ডকারণ্য, চিঠি (১৯৬৬), রক্তাক্ত প্রান্তর (১৩৬৮), পলাশী ব্যারাক প্রভৃতি, আসাকার ইবনে শাইখ (তিতুমীর অগ্নিগিরি (১৯৫৯), রক্তপথ, বিরোধ, পদক্ষেপ, বিদ্রোহী পদ্মা, প্রতীক্ষা, অনুবর্তন, এপার ওপার, অনেক তারার হাতছানি প্রভৃতি। শওকত ওসমান (আমলার মামলা, তস্কর ও লস্কর, কাঁকর মণি, এতিম খানা, রাজাদের কবি মলিয়েরের পাঁচটি নাটক প্রভৃতি। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ওহিপীর ও তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৪), সিকান্দার আবুজাফর শকুন্তলা উপাখ্যান সিরাজদ্দৌলা (১৩৭২), আলাউদ্দীন আল আজাদ (ইহুদীর মেয়ে, মায়াবী প্রহর, মরক্কোর যাদুকর) আনিস চৌধুরী (মানচিত্র, এ্যালবাম) কবীর চৌধুরী (আহ্বান, সম্রাট জোনস, শত্রু (১৯৬৩), অচেনা (১৯৬৯), অন্যলেখন (১৯৬৯), হেক্টর অনুবাদ নাটক) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর একজন মহিলা নাট্যকার, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম এঁর নাটক দুয়ে দুয়ে চার, নব মেঘদূত, মনোনীতা প্রভৃতি। এগুলো পূর্ববঙ্গের অধুনা পারিবারিক জীবনের নানা ছবি, নানাকথা, সুখ-দুঃখের নানা কাহিনী বিচিত্র বর্ণালীতে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সহজেই মানুষের মনকে নাড়া দেয়।

কাব্য নাটকের ক্ষেত্রে ডঃ এনামুল হকের 'উত্তরণের দেশে,' (১৯৬৭), একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। সংগ্রাম মুখর চিত্র ফুটে উঠেছে, ভাষা আন্দোলনের

পরিপ্রেক্ষিতে এই ছোট্ট কাব্য নাটকটি বিশেষভাবে স্মর্তব্য। এছাড়া এঁর হাজার তারের বীণা (১৯৬৮), রাজপথ জনপথ (১৯৬৯), অস্ত্র হাতে তুলে নাও (১৯৭১) নৃত্য নাট্যগুলিও খুবই উচ্চস্তরের।

কথাসাহিত্য এবং নাটক প্রসঙ্গে এই আলোচনা স্বভাবতই পূর্ণাঙ্গ নয়, এ-বিষয় নিয়ে গবেষণার বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। আগামী কোন গবেষক নতুন আলোক পাত করবেন, পূর্ববঙ্গের কথা সাহিত্যের বৈচিত্র্য তুলে ধরবেন।

আমাদের বক্তব্য, যে-যুগে এসেছে জাগরণ, সাংস্কৃতিক জোয়ার, সে-যুগে বা সেকালে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই সে জোয়ার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্য যখন কোন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে, তখন তার সব শাখাতেই অনুরণন জাগে, তাই তার প্রতি শাখার মধ্যে পারস্পরিক ভাব সম্পর্ক খুজে পাওয়া কঠিন হয় না, যেমন সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি রাজনৈতিক আন্দোলন, জীবন যৌবন প্রতিবিম্বিত কবিতায়, তেমনি গল্প উপন্যাস নাটকে।

অনেক কবি নাটক, গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে সাফল্যজনকভাবে পদচারণ করেছেন। আলাউদ্দীন আল-আজাদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, আবুল ফজল, শহীদুল্লা কায়সার প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যেতে পারে। এতে তাদের প্রতিভাই সূচিত হয়। কবিতা গল্প উপন্যাস এমন কি প্রবন্ধের পরিসরে এঁরা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উগ্র জাতীয়তাবোধ অবশ্যই আছে। এক্ষেত্রে একে নষ্ট্যালজিয়া বলতে আপত্তি নেই। কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঙ্গে এই উগ্র জাতীয়তাবোধ সম্পৃক্ত ইতিহাস থেকে পৃথক করে তাকে দেখতে পাওয়া পারম্পর্যবিহীন ঘটনা হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে উগ্র যৌনতাবোধ ও বিকারগ্রস্ততার শিকার হয়েছেন এখানকার বহু নাম করা সাহিত্যিক কবি। ওদেশে এমনটি দেখা যায় না তেমন। কবিতার ক্ষেত্রে রোম্যান্টিসিজমের কিছু আধিক্য হয়ত রয়েছে, কিন্তু বেলেল্লাপনা, হাংরি জেনারেশন তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি তার জঘন্যরূপ নিয়ে। অন্ততঃ আমরা যে কালের কথা বলছি, সেই কালে।

আরও একটা কথা মনে হয়েছে। এদেশে আমরা এখনও ঐতিহ্য ভাঙিয়ে খাচ্ছি যেন। ওখানে জাড্য কেটে গেছে। নতুন আলোর বন্যা এসেছে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। নতুন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। পুরাতনকে বর্জন করেছেন ওরা, তবে পুরোপুরি নয়—যতটুকু গ্রহণীয়—ততটুকু রেখেছেন। নতুন জীবন নতুন মননে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন ওদেশের জনতা, ওদেশের সাহিত্যিকবৃন্দ। নতুন সৃষ্টির

উন্মাদনায় মুখর, আশা উদ্দীপনা আনন্দ আবেগপূর্ণ। জাতির সম্মিলিত জীবন সাধনা, তপশ্চর্যা, সঞ্জীবন, উজ্জীবন, উদ্বোধন। পূর্ববঙ্গের এই কালের সাহিত্যের বুকে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায় দ্রুততর "লাপডুপ···লাপডুপ লাপডুপ ধ্বনি · যেন সে ছুটে চলেছে, তার একটা নির্দিষ্ট পথ আছে, আছে একটা গন্তব্যস্থান। তার চোখের সামনে ইতিহাসের চিত্রপট প্রসারিত। তার মানস দিগন্তে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সমারোহ। হঠাৎ জাগার, আত্মআবিষ্কারের দ্যুতি দীপ্তি। মহিমময় উপলব্ধি। যবনিকা তখন থেকেই ঝড়ে ঢেউ-এ কম্পমান। এই কালের সাহিত্যের হৃদয়ে যেন তখন পর্যন্ত অনাগত "বাঙ্‌লাদেশ" তার ভবিষ্যৎ জীবন বেদ নিয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত ও গ্রথিত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ এই দীর্ঘ তেইশ বছর সাহিত্যের মাপকাঠিতে হয়ত কিছুই নয়। কিন্তু বাঙ্‌লা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবার পর দুই বঙ্গের ঐ সময়ের সাহিত্যধারার একটি তুলনামূলক আলোচনা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আলোচ্যকালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কাব্যধারার মধ্যে মিলও যেমন আছে, তেমনই পার্থক্যও সহজ দৃষ্টিগোচর।

আবহমানকালের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ধারাকে উভয় বঙ্গই স্বীকার করে নিয়েছে অথবা ঐ ধারা থেকে প্রাণরস ও পুষ্টি আহরণ করেছে। বৈষ্ণব কবিতা থেকে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, মধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র উভয় বঙ্গের সাহিত্যাকাশেই দিঙ্‌নির্দেশক জ্যোতিষ্ক বিশেষ।

একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এ রকমটি নাও হতে পারত। কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছেদ টানারই ষড়যন্ত্র চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমকে বিসর্জন দিয়ে কায়কোবাদ আলাওলকে প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন হচ্ছিল—কোন কোন বুদ্ধিজীবী বুঝেছিলেনও এরকম ঐ পথে পদচারণাও আরম্ভ করেছিলেন, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে সাহিত্যের সত্তাকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন।

বেশিদূর এরকম এগুলে ওপার বাঙ্‌লায় অন্যরকম বাঙ্‌লা ভাষার জন্ম নিতো। সেই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে ওপার বাঙ্‌লার বিবেকবান কবিসাহিত্যিকবৃন্দ আমাদের রক্ষা করেছেন।

এতে বাঙ্‌লা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও একটি মিল এইজন্য দেখা যায়, যে অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা চলেছিল, কে কত রকমভাবে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন, ঐতিহ্য বিসর্জন দিয়ে নয়, ঐতিহ্য সম্পৃক্ত হয়ে।

এক বঙ্গের কবি সাহিত্যিক অপর বঙ্গের কবি সাহিত্যিক এবং সাহিত্যকীর্তির প্রতি অপরিসীম নাড়ীর টান অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাই প্রাণাপেক্ষা

ভালবেসেছেন ওপার বাঙ্‌লার সাহিত্যিকরা—যদিও তাঁর নবমূল্যায়ন করতেও সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা—কতটুকু গ্রহণ করবেন, কতটুকুই বা বর্জনীয় এ-বিষয়ে চুলচেরা বিচার বিতর্কে পশ্চিমবঙ্গের থেকেও তারা নির্ভীক এবং সোচ্চার—রবীন্দ্রনাথের উপর শ্রদ্ধা ও তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেই।[১]

ভাষার অগ্রগতির প্রশ্নেও উভয় বঙ্গেই মোটামুটি একই রকম মতামত প্রকাশ করেছেন। বানানরীতির কোন নতুন পন্থা কেউ কেউ অনুসরণ করতে গিয়ে সফলকাম হননি। সেইরকম, কবিরা নিজেরাই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন অহেতুক আরবী ফার্সী অথবা অন্য বিদেশী শব্দ ব্যবহারের বিপক্ষে।

মিল আরেকটি জায়গায় বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

আধুনিক কবিতা একটি গোষ্ঠীর হয়ে পড়েছে যেন, সর্বজনীন নয়। পরিবেশ গ্রামীণ, তাহলেও শহর জীবনই সেখানে অধিকাংশ কবির কবিতাতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে গ্রাম যেন সুপ্ত, যেন বা অবলুপ্তির পথে, কষ্ট করে তাকে খুঁজে পেতে হয় সেদেশের কবিতায়। পশ্চিমবঙ্গেও একই দশা। সভ্যতা নগরমুখীন বলেই সমসাময়িক কবিতা আন্দোলনেও তার অবশ্যম্ভাবী ছায়াপাত হয়েছে।

এছাড়া সাদৃশ্য রয়েছে কবিতার আকৃতিতে এবং কলাকৃতিতে। রূপকল্প ব্যবহারে, অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগে, বাচ্যার্থ ও বাঙ্গার্থে কবিতাকে স্বাদু ও সুন্দর করে তুলতে যত্নবান হয়েছেন দুদেশের কবিই। যদিও চিত্ররূপময় দেশ পূর্ববঙ্গ, হেঁয়ালী কম, ততটা দুর্বোধ্য নয়।

ওপার বাঙ্‌লায় স্বাধীন হবার পর কাব্যে সাম্প্রদায়িকতাকে স্থান দিয়েছিলেন অনেক কবি। কাব্য মারফৎ ধর্মপ্রচারেও ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ শক্তিশালী কবি। তাঁদের কবি প্রতিভার অপচয়ই হয়েছে এভাবে। এ বাঙ্‌লায় অবশ্য এমন নিদর্শন মিলবে না। ধর্ম নিয়ে আধুনিক কবিরা মাথা ঘামাননি—সাম্প্রদায়িকতাও তাঁদের কবিতার মধ্যে ঠাঁই পায়নি।

এক্ষেত্রে এ বাঙ্‌লার কবিরা অবশ্যই প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। ওপারের নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি ও পাকিস্তানী ভ্রান্ত প্রচারের শিকারই হয়েছিলেন কবিরা। তাঁদের প্রতিভা যদি উপযুক্ত পথ পেতো, তাহলে পূর্ব বাঙলার কাব্যসাহিত্যের দিগঙ্গন আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারত।

পুঁথি সাহিত্য নিয়ে ওদেশের অনেক কবি মাথা ঘামিয়েছেন, পুনর্জাগরণের স্বপ্ন

১. মাহফুজ উল্লাহ—বাঙ্‌লাদেশের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ধারা : বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, বসন্ত, (১৩৭৮), পৃ. ৮৬

লেখেছেন, পুঁথি সাহিত্যের নতুন ফর্মে। বলা বাহুল্য এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থ যে হবে, তা তাঁরা জানতেন।

প্রকৃতিগত দিক দিয়ে আর সব তফাৎও বড় কম নয়। প্রথমতঃ এদেশের কবিতা বড়ই হেঁয়ালীর মত, ভয়ানক দুর্বোধ্য, অনেক সময় এক আধুনিক কবি অন্য আধুনিক কবির বিশেষ করে অন্য গোষ্ঠীর কবিতা উপলব্ধি করতে বা মর্মোদ্ধার করে উঠতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের তাবড় তাবড় আধুনিক কবিরা বলেই থাকেন যে, আধুনিক কবিতা সকলের জন্য নাকি নয়। সেটা বুঝতে অন্য ধরনের মেজাজ, ব্যক্তিত্ব, বোধ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ইত্যাদির দরকার হয়। অর্থাৎ এককথায় আধুনিক কবিতা নয় সর্বজনীন।

ওপার বাঙ্‌লার কবিতার ক্ষেত্রে এমন অপবাদ বড় একটা দেওয়া যায় না। সেখানে সব থেকে দুর্বোধ্য কবির কবিতার মানে করা যায়, বোঝা খুব একটা কঠিন হয় না। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতার একটা সবজনীন আবেদন রয়েছে, এবং এইখানেই পূববঙ্গের কাব্যধারায় প্রাণস্পন্দন। কবি ও কবিতা তাই সেখানে প্রিয়তর, কবি এবং কবিতাকে যথেষ্ট সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে।

বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব উভয়বঙ্গের কবি সমাজের উপর পড়েছে। কিন্তু আমরা এ বঙ্গে সাঙ্গীকরণ খুব একটা করে নিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। অথচ প্রভাবটা এ বঙ্গের কবিদের উপরই বেশি-- এঁদের পাণ্ডিত্যও বেশিরকম। উদাহরণ স্বরূপ বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণুদের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু কাব্যধারায় বিদেশী সাহিত্যকে সাঙ্গীকরণ করতে, দেশের জলবাতাসের মানুষ ও সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে খুব কি একটা পেরেছেন?

ওপার বাঙলার কবিদের ক্ষেত্রেও বিদেশী প্রভাব কার্যকর—বলা যেতে পারে আলী আহসান ও শামসুর রহমানের কথা, কিন্তু চমৎকারভাবে তাঁরা আপন অধিকার নিয়ে দাঁড়িয়ে। এক্ষেত্রেও তাঁরা কবি প্রতিভার বিচারে বুদ্ধদেব এবং বিষ্ণুদের সমকক্ষ নাও যদি হতে পারেন বলে কোন সমালোচক মনে করেন, তাহলেও তিনি নিশ্চয়ই এ ছাড়পত্রও ও বঙ্গের কবিদ্বয়কে দেবেন যে, তাঁরা সাঙ্গীকরণে ওস্তাদী দেখিয়েছেন অনেক বেশি, তাঁদের কবিতা পড়লে বিদেশী কবিতা পড়ছি বলে প্রতি অক্ষরে হোঁচট খেতে খেতে অগ্রসর হতে হয় না। পাণ্ডিত্যকে তাঁরা দাবিয়ে রেখেছেন বা বিসর্জন দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে।

দেশ বিভাগ হবার পর এপার বাঙ্‌লার কাব্যসাহিত্যে খুব কি একটা জোয়ার এসেছে? সেই ত্রিশের দশকই প্রবাহিত হয়ে চলেছে—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব—

সুধীন্দ্র—জীবনানন্দ—বিষ্ণু দে—অজিত দত্ত—এঁদেরই পথানুসরণ বা অন্ধ অনুসরণ এদেশের সাহিত্যে।

ওখানে কিন্তু এলো জোয়ার, হঠাৎ 'আলোর ঝলকানি'। স্বাধীনতার আস্বাদ এদেশের সংস্কৃতিকে নিজের মতো গড়ে তোলার আন্তর প্রেরণা, তার জন্য প্রাণপণ উচ্ছ্বাস উদ্দামতা, জীবন যৌবন চাঞ্চল্য, এতটা এপার বাঙ্‌লার কাব্যসাহিত্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে অনুপস্থিত। কারণ আমরা পুরোনো ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি—চর্বিত চবন করে চলেছি। ওঁদের ক্ষেত্রে সেরকমটি হবার উপায় ছিল না।

প্রথমতঃ, এলো আঘাত, সংশয়, দোলা। সেটা কখনই সম্পূর্ণভাবে কাটেনি। তাই নিয়েই এগুতে হয়েছে—নতুনভাবে বাঙ্‌লাসাহিত্যের এবং কাব্যধারার মূল্যায়ন করেছেন তাঁরা—নতুন পথের অন্বেষণে অনেকে অনেক দিকে পদচারণা করেছেন, নতুন কিছু সৃষ্টির আশায় উন্মুখ হয়েছেন কবিরা—জাতিও যেন তার আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছে। কবিকৃতিও সক্রিয়, উদ্দীপ্ত জীবন্ত। প্রাণপ্রাচুর্য আছে বলে মনে হয়। মিনমিনে পানসে নয়।

এবং সব কবিরা যেন একটি জায়গায় একাট্টা—২১শে ফেব্রুয়ারী। ভাষার ইতিহাসে যেকোন দেশে যেকোন কালে এমনটি অনন্য। এরকম কোন স্বদেশ সংক্রান্ত পুণ্য তিথি পশ্চিমবঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে নেই। এখানে তো হাঁড়ির হাল। কবি কবি ঠাই ঠাই। হয়ত ওদেশেও কিছুটা তাই-হ। তবু এক জায়গায় ওরা এক এবং তা হল ২১শে ফেব্রুয়ারী - তাদের অগ্নি পরীক্ষা, তাঁদের হৃদয়, তাঁদের বিবেক। পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক কাব্যধারা বহুমুখী, কোনটাই পুষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। বিষ্ণুদের সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বেশিদূর এগিয়ে গিয়েছে বলে মনে হয় না। কবি সমাজে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়এখন কবিতায়সমাজবাদ ছেড়ে সমাজবাদের খিস্তি আওড়াতে পিছপা হন না, তাঁর শিষ্যদেরও এবম্বিধ দশা। সুকান্তকে নানা-মহল থেকে নানাধরনের পাঁচমিশালী প্রচার করা হচ্ছে, তাঁর আসল অবস্থান কুহেলিকাচ্ছন্ন করে রাখার চেষ্টার অন্ত নেই। নজরুল সম্পর্কেও এ অভিযোগ করা যেতে পারে। আকৃতিগত এবং প্রকৃতিগত বিচারে আকৃতিগত ভাবধারাই প্রাধান্য পাচ্ছে অনেক সময়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতার চর্চা আরও করলে খুশি হতাম আমরা, —তিনি সঠিক অর্থে মুটে মজুরের কবি, বুদ্ধদেব বসু দেহবাদী--যৌনতাপুষ্ট তাঁর রচনা—ভাবেন ছাড়িয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু রবীন্দ্রবলয়েই তাঁর অধিষ্ঠান এবং শেষাঙ্কে রবীন্দ্রানুসারীই রয়ে গেছেন তিনি জানিতভাবে অথবা অজানিতভাবে।[১]

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন।

জীবনানন্দ উজ্জ্বল এবং সত্যই জীবন্ত—যদিও তিনি অনেকখানি 'মর্বিড'—তাহলেও বাঙ্‌লার মুখ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কবিতায়—কিন্তু তাঁর শিষ্য অগণন নয় বরং লুপ্ত প্রায়—এ বাঙ্‌লায়, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিগতভাবেও।

অধুনা কবিতার অঙ্গনে যাঁরা পদচারণা করছেন, তাঁদের মধ্যে হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস, মনীশ ঘটক, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বনফুল, দূর্গাদাস সরকার প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। মননশীল এঁদের রচনাবলী। এঁরা এদেশের কাব্যকানন সরব ও সরস করে রেখেছেন। আধুনিক কাব্য আন্দোলনে এঁদেরও অবদান রয়েছে, যা সমীক্ষা ও গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এঁরা বিদগ্ধ, কবিতা সম্পর্কে বিলক্ষণ সজাগও সংবেদনশীল, সহৃদয়।

অতি আধুনিক কবিদের বৈশিষ্ট্য তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বলার মতো করে নজরে পড়ে না। বামপন্থী কবি হিসেবে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাদাস সরকার স্পষ্ট কথা বলেন, তাঁদের কবিতা শুদ্ধ, সুন্দর, স্বচ্ছ, দৃপ্ত, কিন্তু প্রচার তত নেই। কবিতার বিজ্ঞানচেতনা কিছুটা দেখতে পাওয়া যায় অমিয়কুমার হাটির কবিতায়। তবে লেখা বের হয় খুবই কম। হিমালয় নিয়ে নানাভাবে নানা ঢঙের কবিতা লেখা আর একটা বৈশিষ্ট্য উপরোক্ত কবির—সম্ভবতঃ বাঙ্‌লা কাব্যে এ ভাবধারাটাও নতুনত্বের দাবী করতে পারে। শক্তিশালী কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তবে, বড় বেশি দেহবাদী—এঁরা লিরিকের রাজ্যেই আত্মনির্বাসিত। কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, সনাতন কবিয়াল, প্রমুখ সমাজবাদী কবি।

যা বলা হয়েছে, এপার বাঙ্‌লার আধুনিক কবিতার ধারা বহুমুখী এবং কোনটাই পুষ্টিলাভ করেনি ; ওপার বাঙ্‌লার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু মনে হয়, সকলকার কবিতার একটি সাধারণ পটভূমি রয়েছে, এবং কবিতার ধারা যেন মিলেছে একটি জায়গায়—সেটি সংগ্রামশীলতা। আমাদের এ মূল্যায়ন যে একদম সঠিক এবং তাবৎ পূর্ববঙ্গের কবির কবিতাই যে এর অন্তর্ভুক্ত, এমন দাবী আমরা করছি না, কিন্তু সাধারণভাবে এটাই দৃষ্টিগোচর হয়।

ওপার বাঙ্‌লার অধিকাংশ আধুনিক কবির কবিতায় যৌনতা ও অশ্লীলতার প্রাধান্য নেই।

কবিগোষ্ঠী ওপার বাঙ্‌লায়ও আছে। বলা যেতে পারে 'হ্যাড জেনারেশন' গোষ্ঠীর কথা—যাঁদের ঘোষণা—"যারা সাহিত্যে অনিষ্ঠ প্রেমিক, যাঁরা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যাঁরা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী, যাঁরা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত ; যাঁরা পঙ্গু, অহঙ্কারী, যৌনতাপৃষ্ঠ, কণ্ঠস্পৃষ্ট তাঁদেরই পত্রিকা।

বক্তব্যটি পরস্পর বিরোধী। এইরকম আরেকটি গোষ্ঠী 'না'। এঁদেরও আছে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এপারেও 'হাংরি জেনারেশনের' উন্মার্গগামিতা প্রত্যক্ষ করেছি—হরেক হুজুগ সাহিত্যের অঙ্গনে লেগেই আছে।

কিন্তু গোষ্ঠীতন্ত্রের মারপ্যাচ এদেশে অন্য জায়গার—এবং এটা অনেকটা একচেটিয়া ব্যবসায় গোছের। প্রচার, নাম মাহাত্ম্য খুবই অল্প সময়ে অল্প আয়াসে সম্ভব এবং যুগটা কবিতা ও কবিদের নিয়ে এরকমভাবেই এগুচ্ছে। তাই আশা যতটা, তার থেকেও বেশি আশঙ্কায় এখানকার সাহিত্য রসিকরা কোনঠাসা প্রায়।

রাজনৈতিক বক্তব্য সাহিত্যে উপস্থিত করেছেন দু'বঙ্গের কবিরাই। সেক্ষেত্রে ওপার বাঙ্‌লার কবিদের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাঁরা কবিতার আগুন জ্বালিয়েছেন, কবিতা তাঁদের যুদ্ধের হাতিয়ার হয়েছে। তাঁরা মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছেন। এপার বাঙ্‌লায় এমনটি তো হয়নি, হবার কথাও অবশ্য নয়। অধিকাংশ বড় বড় কবিই এখন যথেষ্ট বিত্তবান; যাঁরা বিপ্লবের কথা বলেন, এঁদের মধ্যেও কে কতটা আগমার্কা তা বিচার সাপেক্ষ। বস্তুতঃ এ বাঙ্‌লায় রাজনীতি ও কবিতার মিশ্রণ খুব কম কবির ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য ব্যতিক্রম বিষ্ণু দে, দুর্গাদাস সরকার, সনাতন কবিয়াল, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কবিতা ইস্তাহারই শুধু নয়, কবিতাও।

এই আলোচনা থেকে সংক্ষেপে এই সারটুকুই সঙ্কলন করা যায় যে, পূব এবং পশ্চিমবঙ্গের কাব্য ধারা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছুই নিতে এবং দিতে পারে। দু'টি প্রাতিবেশী রাষ্ট্রের একই ভাষা। একই বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই আদান-প্রদান আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও ঐতিহাসিক সত্য—যত তাড়াতাড়ি আমরা এই দেওয়া-নেওয়া মেনে নেবো, তত তাড়াতাড়িই আমাদের উভয় দেশের সাহিত্য বিকশিত হয়ে উঠবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অমিয়কুমার হাটি—(ক) পূর্ববঙ্গে : সংস্কৃতি ও কবিমানস, সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা—৫২ ; ১৯শে জুন, (১৯৬৯)।

(খ) পূর্ববঙ্গের কবি, সিকান্দার আবু জাফর, সাপ্তাহিক বসুমতী, (সংখ্যা—৭৪, (১৯৬৮)।

২. আনোয়ারুলকরীম—বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক (১৯৬৯) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৩ আজহার ইসলাম—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ) প্রথম সংস্করণ, কার্তিক (১৩৭৬) আইডিয়াল লাইব্রেরী, ২।৩ বাঙলা বাজার, ঢাকা—১

৪. আবদুল কাসেম ফজলুল হক—কালের যাত্রার ধ্বনি (৭৩) (রচনাকাল ১৯৬৭—৭২), খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা-১

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক সাহিত্য (১৯৫৭) কলিকাতা।

৬. কবীর চৌধুরী সম্পাদিত—একুশের সঙ্কলন (১৯৭১) বাঙলা একাডেমী ঢাকা।

৭. নির্মলেন্দু ভৌমিক—বউ কথা কউ (প্রবন্ধ)শারদীয়া সাহিত্য সংলাপ (১৯৭৪) গভঃ হাউসিং ষ্টেট, কলি—৩৯

৮. দুর্গাদাস সরকার ও সনাতন কবিয়াল সম্পাদিত—গ্রাম থেকে সংগ্রাম (১৯৭১), নবজাতক প্রকাশন, এ ৬৪ কলেজস্ট্রীট। কলিকাতা—১২

৯. বদরুদ্দীন ওমর—পূর্ব বাঙলার সংস্কৃতির সঙ্কট। প্রথম প্রকাশ, ১০ই জুন (১৯৭১), নবজাতক প্রকাশন, ৬ এটনী বাগান লেন। কলিকাতা—৯।

১০. বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত—আধুনিক কাব্য সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, কার্তিক (১৩৭০),বর্ধমান হাউস। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা

১১. মহম্মদ মণিরুজ্জামান—অনির্বাণ। প্রথম প্রকাশ ৬ই সেপ্টেম্বর, (১৯৬৮ রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ১০ নর্থ ব্রুকহল রোড্। ঢাকা—

১২. মযহারুল ইসলাম—ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন পাঠন (১৯৮৭) বাঙলা একাডেমী। ঢাকা।

১৩. মুজিবর রহমান খাঁ—সাহিত্যের সীমানা (১৯৬৭), বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

১৪. মোতাহের হোসেন চৌধুরী—সংস্কৃতি কথা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন (১৩৬৫, বাঙলা একাডেমী বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

১৫. মনসুর মুসা সম্পাদিত—একুশের সঙ্কলন 'বাঙলা ভাষা' (১৩৭০) খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৬৭ প্যারী দাস রোড। ঢাকা—১

১৬. মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন কাসেম পুরী—লোকসাহিত্যে ছড়া, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ। (১৩৬৯), আমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা—১

১৭. সরদার ফজলুল করিম—সম্পাদিত—আমাদের সাহিত্য (১৮-২৪ অক্টোবর : ১৯৬৮) বাঙ্‌লা একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারের পর্যালোচনা। প্রথম প্রকাশ—কার্তিক (১৩৭৬)। বাঙ্‌লা একডেমী, ঢাকা।

১৮. সনাতন কবিয়াল—হো চি মিন সাহিত্যের আলোকে, মাসিক বাঙ্‌লাদেশ, দীপাবলী সংখ্যা, (১৯৭৪)সাল।

১৯. সুকুমার সেন—বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা।

২০. সৈয়দ আলী আহসান (ক) একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬১), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

(খ) আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতা। শব্দের অনুষঙ্গে (১৩৭৭) আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

২১. হাবীবুর রহমান—উপাত্ত (১৯৬২), বাবুল পাবলিকেসন, ঢাকা।

২২. হাসান মুরশিদ—বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমিকা। (ভাদ্র—১৩৭৮) ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড., কলি—৭

২৩ হাসান হাফিজুর রহমান—সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭৩) বাঙলী একাডেমী : ঢাকা।

২৪. হাসান জামান—সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য (১৩৭৪) বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা।

২৫. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত—আধুনিক কবিতা। প্রথম প্রকাশ, মাঘ (১৩৭৭)। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা।

চার

পূর্ববঙ্গের (বাঙ্‌লাদেশের) কবি ও কবিতা

১৯৪১-১৯৭১-এর কবি ও কবিতার সমালোচনা :

প্রধান ও অপ্রধান কবি ও মহিলা কবিগণ।

জীবন যৌবন ও জাগরণের বন্যায় উন্মুখর পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলনের পটভূমি প্রেক্ষাপট, আয়োজন, আলোড়ন, অগ্রগতি, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে রূপরেখা অঙ্কিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। ইতিহাসের ধারায়

পূর্ববঙ্গের কাব্যের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংগ্রামী গণ-মানসের সঙ্গে কবি ও কবিতার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

সমগ্রভাবে যখন বিচার-বিশ্লেষণ করি, বিভিন্ন কবির বিচিত্র সৃষ্টি-ধর্মী কবিতার দিকে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুমন নিয়ে তাকাই, তখন দেখি জাতির প্রয়োজনে কবিরা এক হয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেখানে সংগ্রামের ভূমিতে একজনের কবিতা থেকে আর একজনের কবিতাকে পৃথক করে চেনা যায় না, বা চেনা গেলেও তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রশ্ন তুলি না। সবার সব কবিতাই তখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত। বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন জনে চেষ্টা করেছেন জাতির ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলতে। তাই কবিতা সেখানে জাতীয় কবিতার মর্যাদায় ভূষিত হতে পেরেছে। কে ছোট কবি, কে বা বড় এ বিচার তখন বড় হয়ে ওঠেনা কখনই। যে যাঁর সাধ্যমত দিয়েছেন জাতিকে আত্মস্থ হতে, স্বস্থ হতে, সুস্থ হতে, উজ্জীবিত হতে, জীবনের যৌবনের রঙ্গে যোগ দিতে ডেকেছেন যে যার ধরণে : এসো জাগো ওঠো, এক হও, দেশ মাতৃকার বন্ধন দশা, তার দুর্দশা দুঃখ-বেদনা দূর কর—মানুষের মত মাথা তুলে দাঁড়াও ছিনিয়ে আনো জয়মাল্য।

পূর্ববঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে জাতির সংগ্রামী চেতনায় তাঁদের এ সামগ্রিক অবদান বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

১৯৪৭ সালের আগে পূর্ব বাঙ্‌লা এবং পশ্চিম বাঙ্‌লার মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কোনরকম বিরোধ বিন্দুমাত্র ছিল না। হিন্দু মুসলমানের মিলিত জীবন ধারা ছিল সে সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুফলের জন্য, তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, তাদের শাসন যাতে অপ্রতিহত গতিতে চলে, সেইজন্য তারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ, দাঙ্গা, মতান্তর, মনান্তর জিইয়ে রাখতে চেয়েছিল। তারাই মুসলীম লীগ তোষণ নীতি অবলম্বন করেছিল, তারাই দেশকে দুখণ্ড করে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যাতে চিরস্থায়ী হয়, সুস্থ মানবিকতা বোধ যাতে প্রতিফলিত না হয়, তার সুদূর প্রসারী চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল, পঙ্কিল অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চেয়েছিল এই বিংশ শতাব্দীতে ধর্মের বিষ খাইয়ে। আজও আমাদের উভয় দেশের অঙ্গে সেই বিষের জ্বালা, সেই বিষের প্রতিক্রিয়া, ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত শুধু আমাদের দেহ নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাবার পর বাঙ্‌লা দু-টুকরো হয়ে গেল। সকল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সংস্কৃতির যে স্বপ্ন দু'শো বছরেরও আগে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা দেখেছিলেন তাতে মস্তবড় আঘাত এল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা আমরা ভুলে গেলাম। ইতিহাস লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইল।

এতবড় কালিমালিপ্ত দিন বোধহয় আর আসেনি। আধুনিক যুগে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ! দু'দিন আগে যারা ভাই ভাই ছিলাম, তারা ঠাঁই ঠাঁই হয়ে গেলাম। এ ওদিকে ঘর বাড়ী ছেড়ে ছিটকে পড়লাম।

তবুও জীবন ধারা অব্যাহত থাকতে পারত—থাকতে পারত সাংস্কৃতিক ভাব সাযুজ্য।

কিন্তু আধুনিক যুগে তা হবার নয়। পূর্ববঙ্গের শাসকদের তথা পাকিস্তানী শাসকদের বিশেষ করে মনে হল, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান যদি বন্ধ না করা যায়, তাহলে দ্বিজাতিতত্ত্বের থিওরি কাজে আসবে না। তাছাড়া সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা বজায় থাকলে রাজনীতির দেওয়াল ভেঙ্গে পড়বে। একটা বানের জল আসবে কোন দিক দিয়ে সেটাই তাদের ঠিকমত ধারণা ছিল না।

তাহলেও সব রকম প্রাচীর দিতে প্রস্তুত হল তারা, দেরী করল না একটুও ভেতর থেকে তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতিকে কিভাবে খর্ব করা যায়, তার চেষ্টা সুরু হল, সেকথা আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে।

কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হল পশ্চিম বাঙ্‌লার বইপত্র-কাগজ সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতির উপর। যে কোন জাতির পক্ষে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ কলঙ্ক বিশেষ।

কিন্তু কালের বিধাতা মুখ লুকিয়ে বোধহয় হাসছিলেন। বিপদ এলো অন্য পথে। ভেতর থেকেই, বিষ প্রয়োগে মাতৃভাষাকে জর্জর করা, ব্যাধিগ্রস্ত করা, মেরে ফেলার চেষ্টা করা হল—সে বিষ মূলতঃ সাম্প্রদায়িক বিষ। নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর নাম করে নতুন আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম করে যার খড়্গ নেমে এলো—কিন্তু প্রাণস্পন্দন দীপ্ত একটি ভাষাকে শুদ্ধ করতে পারল না—হল হিতে বিপরীত, নতুন একটি চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সেখানকার গণ-মানস, বুদ্ধিজীবীদের হৃদয়াকাশ।

তবুও সৃষ্টি হল একটি অসহ অবস্থার। পশ্চিম বাঙ্‌লার জনসাধারণও বঞ্চিত হল ওখানকার সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে। সীমান্ত বন্ধ হলে যা হয়। পশ্চিম বাঙ্‌লার কোন লেখা—পত্র-পত্রিকা, বই তা যে ধরনেরই, যে রকমই হোক না কেন নিষিদ্ধ হল তার প্রবেশ পূর্ববঙ্গে। সীমান্ত পার হয়ে পূর্ববঙ্গের অনুরূপ বইপত্রও বিশেষভাবে পৌঁছুতে পারল না।

জনসাধারণের কাছে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ চক্রান্ত সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষকে জীবনের আসল দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত না করাবার জন্যেই সুপরিকল্পিত এই অনাচার। জোর করে একটা হঠাৎ বানানো ধর্ম-ভিত্তিক খিচুড়ি সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা। অথচ অন্য সবদিক দিয়ে তাকে মারার ষড়যন্ত্র।

অর্থাৎ মানুষ না পেলো পেট ভরে খেতে, ভাল পরতে, না পেলো শিক্ষার সুযোগ, না থাকলো রোগ মহামারীতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত, না পেলো তার মনের দিগন্ত বিকাশের সুযোগ। খাওয়া পরার সঙ্গে সংস্কৃতিও কেড়ে নিতে চাইল হৃদয়হীন দস্যুরা।

আপাতদৃষ্টিতে উপর উপর ছেদ পড়ল তাই। কেউ আমরা কাউকে ভুলে থাকতে পারলাম না। বস্তুতঃ শাসকগোষ্ঠীই ভুলে থাকতে দিল না। তাদের সংস্কৃতি হত্যালীলার বিচিত্র অত্যাচারের মাধ্যমে বরং বেশী রকমই মনে করিয়ে দিল আমাদের কর্তব্য।

আর, অসহনীয় অবমাননের এই সময়ে, এই নঙর্থক অস্তিত্বের দিনে অস্তিত্ব বজায় রাখবার তাগিদে পূর্ববঙ্গের লাভ হল ষোল আনা।

বস্তুতঃ পূর্বতন সাংস্কৃতিক যোগসূত্র থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল পূর্ববঙ্গ সাময়িকভাবে। এলো একটি প্রচণ্ড শূন্যতা, সাহিত্যের সর্ববিধ ক্ষেত্রে। এতদিন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে আলাদাভাবে কোন কবি বা সাহিত্যিক গড়ে ওঠেনি, সেই সেই দেশের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে। কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন গোটা বাঙালী সমাজের। যেমন পেয়েছি প্রেমেন্দ্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তেমনি সমাদরে স্মরণ করেছি জসীমউদ্দীন বা গোলাম মোস্তাফাকে। এঁরা ছিলেন আমাদের সকলেরই—বাঙালীরই সাহিত্যিক।

রাজনৈতিক ভাগাভাগির সঙ্গে দিন বদলে গেল। সাহিত্যেও মেনে নিলাম যেন সেই বিভাগকে। জসীমউদ্দীন পশ্চিমবঙ্গের মানস বিচরণ ক্ষেত্র থেকে সরে গেলেন। গোলাম মোস্তাফা আরও দূরে। আহসান হাবীব, সৈয়দ আলী আহসান, শামসুর রহমান প্রমুখ কবিদের আমরা ধরেই নিলাম পূর্ববঙ্গের কবি হিসেবে। যদিও এঁদের অনেকেই কবিতা বিভাগ পূর্ব বাঙলায় আমাদের নজরে এসেছিল।

যাই হোক যে শূন্যতা সৃষ্টি হল, সেটা পূর্ণ করতে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজই এগিয়ে এলেন বেশিরকমভাবে, নিজেদের সাধনায় সারস্বত মন্দিরে আরতি চলল—গড়ে উঠলো ক্রমে এক কবি গোষ্ঠী—নতুন ভাব ধারার বাহক—পূর্ববঙ্গের মাটির সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ তাদের জীবন—সেখানকার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার অপরূপ প্রতিফলন তাঁদের কাব্য সাহিত্যে—পূর্ববঙ্গের জনমানসের ভাষা ব্যক্ত করতে চাইলেন নতুনভাবে।

পার্থক্য স্বভাবতই স্মরণীয়। একদিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের এটি প্রচণ্ড লাভ। এই কবিগোষ্ঠীর সৃষ্টি নাও হতে পারত যদি দেশ ভাগ না হত। মুসলমান সমাজে আলোড়ন এসেছিল একটা, নাড়া খেয়েছিল সে সমাজ—।

বিশ্লেষণের ফলে এই দেখতে পাই, মুসলিম সমাজ সেখানে মাত্র ধর্ম অবলম্বন করে থাকতে চায়নি। অস্বীকার করেছে খণ্ডিত সংস্কৃতিকে। অস্বীকার করেছে দাসত্বের জোয়ালকে। যে জীবন বাঙ্‌লার মাটি জল আকাশের সঙ্গে সমৃদ্ধ, সেই জীবন অবলম্বন করে বিকশিত হতে চেয়েছে তারা।

এইখানে তাঁদের জয়। এইখানে তাঁদের যৌবনের সফল বিকাশ। মাঝখানে তারা থেমে থাকেনি। ইতিহাসের চাকা উল্টোদিকে ঘোরাতে চায়নি। হাল ধরেছে শক্ত হাতে।

এবং তাঁরা তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। সে সংস্কৃতি অতীতকে অস্বীকার করে নয়। বাঙালীয়ানা ভুলে নয়। তারা শতকরা একশো ভাগের বেশী বাঙালী। বাঙ্‌লা ভাষাকে এত বেশী বুকের রক্ত ঢেলে ভালবাসতে ওদের থেকে আর কে বেশী পেরেছে ?

বাঙ্‌লা ভাষাকে এত ভালবাসা ১৯৪৭-এর আগে কখনই দেখা যায়নি। বরং তখন মনে করা হত হিন্দু সংস্কৃতির তল্পি বাহক হয়ে যাচ্ছেন কোন বিখ্যাত মুসলিম কবি। নজরুলকে অস্বীকার করা হত—অথবা তাকে গালাগাল দেওয়া হত। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও এই অপচেষ্টা সমানে চলেছিল। ১৯৫০ সালেও গোলাম মোস্তাফা একটি প্রবন্ধে সমালোচনা করেছিলেন নজরুলের সমন্বয়ধর্মী মনোভাবের। তার মতামত ছিল এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে সমগ্র নজরুলকে কোনরকমে গ্রহণ করা যেতে পারে না। তাঁর রচনায় অনেক সময় ইসলামধর্মবিরোধী মনোভাব প্রকটিত হয়েছে এ অজুহাত দেখিয়ে নজরুল সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১]

কিন্তু আমরা দেখেছি এসব আঘাত প্রত্যাঘাত হয়ে শাসকদের ও তার দালালদের কপালেই বেজেছে, তাদেরই চূড়ান্ত আঘাত করেছে পূর্ববঙ্গের বাঙালী মুসলমান সমাজ এগিয়ে গেছে, ধর্মান্ধতার নিগড় ভেঙে ফেলেছে, একটা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে উঠেছে।

পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ভাবরাজ্যে এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের গুরুত্ব অনেকখানি। এ সেখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব উপলব্ধি। যে উপলব্ধি ১৯৪৭ সালের আগে তাঁদের মধ্যে ততটা জেগে ওঠেনি। এটাও বিশ্লেষণ করে আশ্চর্য হতে হয় যে, ধর্মান্ধ রাষ্ট্রের জঠরেই ধর্মের নিগড় ভাঙার চেষ্টা চলছে।

তাহলে দুটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পূর্ববঙ্গে নতুন সৃষ্টি কবিগোষ্ঠী এবং তাঁদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। এঁরা প্রায় সবাই বেরিয়ে এসেছেন নিম্নমধ্যবিত্ত,

১. হাসান মুর্শিদ, বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি। পৃ. ৩৬।

মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্তের স্তর থেকে। কেউ কেউ এসেছেন সমাজের আরও সব শাখা থেকে, কৃষক মজদুরের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-বঞ্চনার সঙ্গে যেমন পরিচিত এঁরা, তেমনি সমাজের বৃহত্তর ভাবমানস সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাঁদের সামনে এক নতুন দায়িত্ব।

বাঙলা কাব্যে এঁদের সংযোজনে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এঁদের কাব্য, কাব্যের সৌন্দর্য-সুষমা কলাকৃতি সম্পর্কে আমরা এ বঙ্গে বিশেষ অবহিত নই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল, পত্র-পত্রিকার লেনদেন নিয়মিত ছিল না। সাহিত্য সমাজের একদল উন্নাসিক বোদ্ধা চোখ ও মন ঘুরিয়ে ছিলেন একথাও সত্য। বিভিন্ন প্রবন্ধকার বিভিন্ন সময় কিছু আলোচনা করেছেন। রেডিওতে এদেশে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দর বিশ্লেষণ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তবু একথা ঠিকই যতটুকু তাঁদের দিকে চোখ মেলে দেখবার দরকার ছিল, যতটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করার যোগ্যতা তাঁরা অর্জন করেছিলেন, ততটুকু মর্যাদা আমরা দিইনি। সাহিত্যের দরবারে পূর্ববঙ্গের কবিতার মূল্যায়ন এদেশে সম্পূর্ণ নয়। আলোচনা কখনই ব্যাপক ও গভীর হয়নি। এই প্রসঙ্গে দু-একটি সংস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁরা প্রশংসনীয় উদ্যম গ্রহণ করেছিলেন। সাপ্তাহিক বসুমতীতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন লেখকের লেখা বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দেহাত[১] পত্রিকাটির কথাও স্মরণীয়। স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটিতে কিছু রচনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আভাতিতে[২] ২৫ বছরের পূর্ববঙ্গের কবিতার অগ্রগতি সম্পর্কে অমিয়কুমার হাটির রচনাও উল্লেখ করা যেতে পারে। নির্ণয়[৩]-এ লেখক প্রাথমিকভাবে আলোচনা করেছেন পূর্ববঙ্গের কবিকৃতি সম্পর্কে।

এসব আলোচনা, সমালোচনা, প্রবন্ধ বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। প্রচেষ্টাগুলি সাধুবাদ পাবার যোগ্য, তবু প্রয়োজনের বিবেচনা করলে আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

পূর্ববঙ্গের কাব্যধারার সমষ্টিগত আলোচনা আমরা করেছি। রাজনৈতিক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এইবার এই অধ্যায়ে প্রধান কবি ও প্রধান মহিলা কবিদের কবিতা ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

১. দেহাত—পূর্ব বাঙলার কয়জন কবি—রথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২. আভাতি—৩য় সঙ্কলন, (১ জুন, ১৯৬৯)। পৃ. ১১

৩. নির্ণয়—মধুসূদন চক্রবর্তী (১৯৭১)

আমরা বারবার বলতে চেয়েছি। যুগ প্রয়োজনই পূর্ববঙ্গে কবিতার বিকাশ ঘটেছে, কবিতায় বিপ্লব এসেছে। রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে তা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তাই প্রধান কবি বা অপ্রধান কবি এইভাবে ভাগ করার বিরোধী আমরা। কবিতা সেখানে জাতির প্রয়োজন সাধনে সৃষ্টি হয়েছে। আরও, কবিতা-কবিতাই। কবির মধ্যে পুরুষ ও মহিলা এইরকম শ্রেণী বিভাগেরও কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা স্বীকার করি না। কেউ ছোট কবি বা বড় কবি নন—কেউ মহিলা কবি বা কেউ পুরুষ কবি নন। কবির জাত একটাই—কবি কবিই। এই মূল ভিত্তি-ভূমির উপর দাঁড়িয়েই পূর্ববঙ্গের কবিতার রূপরেখা প্রত্যক্ষ করেছি তৃতীয় অধ্যায়ে।

তবুও আবহমান কালের সমালোচনার ধারা আমাদের সাহিত্য সমাজে আজও প্রবাহিত ও প্রচলিত। কে বড় কবি, কে ছোট এর চুলচেরা বিচার করার দিকে বড় ঝোঁক তার!

সেই হিসেবে বলা বাহুল্য আমরা বড় কবি ছোট কবির শ্রেণী বিভাগ করবো না। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকজন প্রতিনিধি স্থানীয় কবিকে আমরা বেছে নেব। তাঁদের কবিতা, কাব্য ও কবিকৃতির যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করব।

এ ক্ষেত্রেও সমস্যা অনেক। প্রথমতঃ, বই জোগাড় করা। সব কবির সব বই হাতের কাছে পাওয়া যেমন সম্ভব নয়, কোন কোন কবির কবিতার বই তেমনি প্রকাশিত হয়নি আজ পর্যন্ত, তাঁদের সবার কবিতা সংগ্রহ করা আরও দুরূহ।

কবিতা সমালোচনার ক্ষেত্রে কাঠামোতে পুরোপুরি প্রচলিত পদ্ধতিও গ্রহণ করবো না আমরা। জীবন ও জাগরণের সঙ্গে সংগতি রেখে সমাজ ও সংস্কৃতির মঙ্গলজনক পরিপূরক হিসেবেই কবিতা আমাদের সমালোচনার আওতায় আসবে। অবশ্য বাঙ্‌লা সাহিত্যের দিগন্ত কীভাবে বিভিন্ন কবির কবিতার মধ্যে দিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে, সেটা দেখাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

প্রধান ও অপ্রধান কবি বলে আমরা একথাই বোঝাতে চেয়েছি, পূর্ববঙ্গের কাব্যাঙ্গনে প্রধান কবিরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের সার্থক নেতৃত্ব অনুসরণ করে অন্যান্যরা এগিয়ে এসেছেন। প্রধানদের অনেকের নাম ও কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত—অপ্রধান কবিদের নাম ও কবিতার সঙ্গে সবে পরিচয় হয়েছে। সাহিত্যের নির্দিষ্ট মানদণ্ডে আবেগ, বুদ্ধিবৃত্তি, বৈশিষ্ট্যের বিচারে কারুর কারুর কবিতা ও কাব্য-কৃতির দিকে বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হই। কারুর কারুর দিকে কম। আমাদের বিবেচনায় তথাকথিত কোন অপ্রধান কবি নিশ্চয়ই অন্য কোন সমালোচকের কাছে

প্রধান কবির মর্যাদায় ভূষিত হতে পারেন এবং এর উল্টোটাও ঘটতে পারে—কোন প্রধান কবি অপ্রধানের দলে পড়তে পারেন। তাই আবারও বলতে চাই এই শ্রেণী বিভাগ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক, সম্পূর্ণ কৃত্রিম। এক হিসেবে বিতর্কমূলক। আমরা প্রবীন ও নবীন কবির মধ্যেও কোন সীমারেখা টানার পক্ষপাতী নই। বহু সঙ্কোচ নিয়েই পর পর এই দুটি অধ্যায় সাজিয়েছি।

॥ ১ ॥ কবি জসীমউদ্দীন সেকাল ও একালের প্রাচীন ও আধুনিক ভাবধারার সেতুবন্ধ। শুধু তাই নয়, এপার ওপার উভয় বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী পল্লী জীবনের আলেখ্যঅঙ্কনকারী কুশলী কবি। পুরানো ভাবধারায় অভিসিঞ্চিত হলেও একালের যৌবন ও জীবন তাঁর রক্তে যেমন দোলা জাগিয়েছে তেমনি লেখাতেও ছাপ ফেলেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনাতেও তিনি বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন একদা, আয়ুবশাহীর শেষ যুগে। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে সেখানকার মানুষের, সংগ্রামী মানুষের উল্লেখ করে গেছেন বার বার।

তিনি সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর কাব্যধারায় তাঁর শিষ্য হয়ে এখনো পর্যন্ত আর কারও আবির্ভাব আমাদের নজরে পড়ে না। -

"সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দুই বাঙলার সীমান্ত মানি না। দেশের, মনের, ধর্মের, হৃদয়ের সমস্ত সীমান্ত অতিক্রম করে প্রাণের সাহিত্য সকল মানুষের একান্ত আপনার হয়" বলেছেন কবি জসীমউদ্দীন, তাঁর বক্তৃতায় সেই সময়ে। পূর্ব বাঙলা থেকে কয়েকদিনের জন্য এসেছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রীতি, সম্বর্ধনা ও শ্রদ্ধা পেয়ে। কবি জীবন ও জাতির প্রতীক। জসীমউদ্দীন মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর প্রতীক।

গ্রামবাঙলার রূপকল্প—যাঁর কাব্যে অপরূপ রূপ নিয়েছে সেই জসীমউদ্দীনকে বাঙলার কাব্যজগৎ কোনদিন ভুলতে পারবে না। কত সুন্দরভাবে তিনি বলেছিলেন এক জনসভায়—"পূর্ববঙ্গ থেকে মেঘনা, পদ্মা, ধলেশ্বরীর তীরের ভালবাসার সুর ও কথার প্রতীক হিসেবে এখানে এসেছি। এসেছি বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে ভায়ে ভায়ে কিছু দেওয়া নেওয়া করে নিতে।"

সমগ্র বাঙলাদেশে লোকগীতি ও লোকশিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যে কজন আছেন, কবি জসীমউদ্দীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। গ্রামকে, গ্রামের মানুষকে তিনি চেনেন, জানেন বোঝেন। আশুতোষ মিউজিয়াম ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকশিল্প সংগ্রহালয়। এখানকার সামগ্রীসমূহ যেমন কাঁথা, পুতুল ইত্যাদি

জসীমউদ্দীনই সংগ্রহ করেছেন প্রথম দিকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি ভোগ করেছেন ১৯৩১-৩৭ সন অব্দি, ৫০ টাকা মাসিক বৃত্তি। সঙ্গে ছিল সাইকেল। সেই সাইকেলে চিঁড়ে, মুড়ি বেঁধে ঘুরেছেন গ্রামে গ্রামে—পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে। মৈমনসিংগীতিকা সংগ্রহ করেছেন দরদ ও মমতা দিয়ে। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর গুরু ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন ও অবন ঠাকুর। গ্রাম-বাঙ্‌লার অপরূপ যে সব সম্পদ উদ্ধার করেছেন, পথিকৃৎ হয়েছেন, তার জন্য বাঙালীর উচিত চিরকাল তাঁকে মনে রাখা। সেইকালে এমন অনলস পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা চালিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়কে সুধীজন সমক্ষে নিয়ে এসেছেন, এটি কম কৃতিত্বের কথা নয়।

মধুর, স্নিগ্ধ, সুন্দর, সহজ, স্বচ্ছন্দভাবে গ্রাম-বাঙ্‌লা তাঁর কাব্যে কবিতায় প্রতিবিম্বিত বলে তাঁকে অত্যন্ত আপনার কবি বলে মনে হয়। বলেছেন তিনি প্রাণের কথা, হৃদয়ের কথা। মন কেঁদে ওঠে, যখন গান শুনি "প্রাণ কোকিলারে, আমায় এত রাতে ক্যানে ডাক দিলি"? কাকে ঘর বাঁধতে, কেনই বা ঘর বাঁধতে উপদেশ দিয়েছেন কবি—

"ওই চরে বাঁধি ঘর
ফুলের বিছানা পাতিও বন্ধু,
উড়াল বালুর চর" (উড়াল বালুর চর)।

অথবা, কী বিরহ, কী কান্না, কী বিষাদমগ্ন একটি পংক্তি—

"আর একদিন আসিও বন্ধু"—

আমাদের চিরন্তন অপরূপ রূপময় শ্যাম সবুজ সুন্দর চিরনবীন বাঙ্‌লাদেশকে যদি খুঁজতে চাই, জসীমউদ্দীনের কাব্যসম্ভারের মধ্যে তাহলে অবশ্যই ডুব দিতে হবে। ফুলবন, ধানের শীষ, টিয়া প্রভৃতি পাখী, দূর্বাবন, লাউয়ের পাতা, লাউয়ের ডগা ইত্যাদি, বট বিরিক্ষি, বেণুবন, তেপান্তরের মন কেমন করা মাঠ আর কোথায় কার কাব্যে এত মোহনসুন্দর মনোমুগ্ধকর রূপ ও অপরূপ পরিবেশ নিয়ে মনের মধ্যে ছাপ রেখে যেতে পেরেছে? আমাদের পথে প্রান্তরে দেখা অন্ত্যজ অচেনা বেদে-বেদেনীর প্রেম-বিরহ মিলনের কাহিনী উপহার দিয়েছেন। রূপকথার রাজ্য অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে আমাদের চোখে ভাসে, মধুমালাকে প্রত্যক্ষ করি। নকসীকাঁথার মাঠ ও সোজন বাজদিয়ার ঘাট হাতছানি দেয় যেন, কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না।

১৯০৩ সালে ফরিদপুর জেলায় তাম্বুলখানা গ্রামে জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। এককালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। পরে পূর্ব পাকিস্তান

সরকারের প্রচার বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হন। অবসর গ্রহণের পর (১৯৬২ ; প্রতিনিধি সূত্রে আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে য়ুরোপ, আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেছেন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নামে ঢাকায় রাস্তার নামকরণও হয়েছে। পূর্ববঙ্গের জ্যেষ্ঠ কবিতো তিনি বটেনই, পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যেও তিনি বর্ষীয়ান। উল্লেখ্য কাব্যগ্রন্থ—নকসীকাঁথার মাঠ, সোজন বাজদিয়ার ঘাট, ধানক্ষেত, মাটির কান্না, বালুচর, সাকিনা, রাখালী, রূপবতী। একপয়সার বাঁশী ও হাসু শিশুপাঠ্য কাব্যগ্রন্থ। মধুমালা, বেদের মেয়ে নাট্যগ্রন্থ। বেশ কিছু আগেই জেমস মিলফোর্ড কর্তৃক নকসীকাঁথার মাঠ গ্রন্থটি "The field of embroidered quilt" এই নামে অনূদিত হয়েছে। রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে "মাটির কান্না"।

"নকসীকাঁথার মাঠ" বহু আলোচিত কাব্যগ্রন্থ। দিগন্ত প্রসারিত মাঠের দুই প্রান্তে দুটি গ্রাম। বিবাদ, মিলন লেগেই আছে। দুই গ্রামের নায়ক-নায়িকা কুমারী সাজু ও সুপুরুষ রূপা এদের পূর্বরাগ, মিলন, মিলিত সংসারের উজ্জ্বল রূপ গ্রাম-বাঙ্‌লার পটভূমিকায় সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। দুই গ্রামের মধ্যে বাধলো বিরোধ। পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গৃহত্যাগ করতে হল রূপাকে। রূপার জন্য সাজুর আক্ষেপ, পীড়া ও অবশেষে মৃত্যুতে বিষাদখিন্ন ট্র্যাজেডিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি।

পূর্ব বাঙ্‌লার সুধী সমালোচক জসীমউদ্দীন সম্পর্কে বলেছেন "জসীম সম্পূর্ণ নূতন কাব্য চেতনার পোষকতা করে বাঙ্‌লা কাব্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন .... বাঙ্‌লার শালীন কাব্যধারার সঙ্গে নজরুলের একটি সম্পর্ক আছে, কিন্তু জসীমের সম্পর্ক মূলতঃ চণ্ডীমঙ্গল, মৈমনসিং গীতিকা এবং গ্রামের অজস্র কাব্য গীতিকার সঙ্গে। গ্রাম্যজীবন এবং গ্রাম্য পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান জুগিয়েছে এবং তাঁর কলাকৌশলের মধ্যেও গ্রাম্য আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি। কিন্তু তাই বলে তিনি সম্পূর্ণভাবে গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ উপমারূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং কাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন। বাঙ্‌লা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করলেন 'কবর' কবিতাটি নিয়ে। এতে আমরা অতর্কিতে একটা নতুন বেদনার সুর শুনতে পেলাম। অসাধারণ হৃদয়াবেগ বা বলিষ্ঠ কোন জীবনদর্শন নেই, অথচ সাধারণ জীবনের তুচ্ছ বেদনা যে এত মর্মান্তিক হতে পারে, তার পরিচয় আমরা আগে কখনও পাইনি। বিশিষ্টতা সহজ সতেজ উপমা ব্যবহার ও গ্রাম্য প্রকৃতির অনায়াস সহজতা ফুটিয়ে তোলা...অবশ্য 'মাটির কান্নায়' জসীমের সত্যিকার সুর শুনতে পাইনে। এখানে কবি নাগরিক জীবনের চাঞ্চল্য দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত।...

'নকসীকাঁথার মাঠ'এ কেন্দ্রীয় আবেগ আছে, যার প্রস্তুতি, আবর্তন এবং বিকাশ কাহিনীকে একটি স্বতন্ত্র ঐক্যতত্ত্ব (Unity) দান করেছে ··· । আধুনিক উপন্যাসের রীতি প্রকৃতি অনুসারে প্রেমের পূর্বরাগ সংরাগ মিলন ও বিরহকে যুক্তিসহ করেছে ।"

জসীমউদ্দীন তাঁর কাব্যে গ্রাম-বাঙ্‌লাকে ধরে রেখেছেন, রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এই সঙ্গে এও স্মরণ করতে হবে যে, তিনি আধুনিক কবি নন। যুগ ও জীবনের যন্ত্রণা নেই তাঁর কাব্যে। জীবনদর্শনের মধ্যে কেমন একটা অতীতমুখীনতা বিদ্যমান। কলকাতার সম্বর্ধনা সভায় কবিওয়ালাদের গুণকীর্তন করেছেন, কিন্তু পূর্ব বাঙ্‌লার আধুনিক কবিদের সম্পর্কে কোন কথা বলেননি। বরং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য কেমন হচ্ছে, সে বলতে পারবে ওখানকার তরুণ কোন কবি বা লেখক। বলেছেন, আমরা হলাম গে বুড়ো। আমরা ওদেরটা পড়ে বুঝিনা কিছুই। ওরাও আমাদেরটা পড়ে না। আমাদের একঘরে করে রাখছে। পূর্ববঙ্গের কোন কবির কবিতায় তাঁর প্রভাব দুর্লক্ষ্য। আশাকরি, তাঁর কথা, অন্তরের কথা নয়। শক্তিশালী আধুনিক কবিরা পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তাঁর আশীর্বাদই সেই কবিকুলের কাম্য।

আরও কাম্য তাঁর কাব্যে গ্রামবাঙ্‌লার আধুনিক জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতিফলন। রূপকথার রাজ্য থেকে মাটির রাজ্যের অমৃতলোকে তাঁর উত্তরণ যদি দেখতে পেতাম তাহলে কালজয়ী শিল্পী হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইতেন।

রাজনীতি থেকে এই কবি দূরেই থাকতে চেয়েছেন। তবু বাঙ্‌লা বানান সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলেছেন, "সম্প্রতি বাঙ্‌লা লইয়া দেশে কথা কাটাকাটি হইতেছে। উ-কার ঊ-কার এবং দুই ন ণ ও তিনটি শ ষ স-এর অত্যাচারে সারা জীবন আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। সে জন্য দুই বৎসর আগে আমার 'বালুচর গ্রন্থে' আমি শুধু মাত্র উ-কার, ই-কার ব্যবহার করিয়াছি। যাঁহারা এইভাবে বানান সংস্কার করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত কতকটা আমি একমত। কিন্তু আমরা পূর্ব-পাকিস্তানী জনসাধারণ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হরফ ও বানান সংস্কার মানিয়া লই, তবে আমাদের বংশধরদিগের এক চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যদি কোন বানান সংস্কার করিতেই হয়, বাঙ্‌লা ভাষার সকল সাহিত্য সে ধারা যদি তাহা করেন তাহা হইলে পূর্বসূরীদের গ্রন্থাবলীসহ সকল সাহিত্য প্রয়াস নতুন বাঙ্‌লা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিবে। কিন্তু একক পূর্বপাকিস্তান যদি ধীরে ধীরে নিজেদের বানান পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমাদের চক্ষু

উৎপাটনেরই সামিল হইবে। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বানান সংস্কার হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তের সৃষ্টি হইয়া দেশের শাসক বর্গের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রদর্শিত হইবে।”

২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও স্বভাবতই এই কবি নীরব থাকতে পারেননি—শহীদের উদ্দেশ্যে একুশের গান গেয়েছেন,

হবে জয় হবে জয় তোমাদের হবে জয়
তোমাদের খুনে রঙীন হইয়া জনমিবে বরাভয়।
রাজ ভয় আর রাজ কারাগার
যুগে যুগে যার খুলে দিল দ্বার
ফাঁসির মঞ্চ ঘোষিল যাহার অমরতা অক্ষয়।
অস্ত্র যাহারে ছেদন করেনি,
বহ্নি দহনে যে জন দহেনি,
সেই শাশ্বত প্রাণ প্রবাহিনী দিগন্তে মহা উদয়।
জবা কুসুমের দ্যুতি মনোরম
জাগিছে প্রভাত উজ্জ্বলতম
চরণে দলিত মহা নির্মম আঁধার লভিছে ক্ষয়।
ভয় নাই নাহি ভয়।[১]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কবি জসীমের একান্ত প্রার্থনা। মুসলমান-হিন্দু আমরা বাঙালী, আবহমান কালের কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাদের জীবনের গ্রন্থিকে এক সূত্রে গেঁথেছে। রবীন্দ্রনাথ যেমন, নজরুল যেমন, তেমনিই কবি জসীমউদ্দীন উভয় বঙ্গের কবি। তাঁকে আমরা ভাগ করেও নিতে চাই না। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কৃষ্টি সংস্কৃতির সামগ্রিক সেতু বন্ধনে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

॥ ২ ॥ কবিতা লেখার ব্যাপারে কবি সিকান্দার আবু জাফরের নিজস্ব বক্তব্য “আমি কবিতা লিখি অনায়াসে। যেমন সকলেরই ক্ষেত্রে জীবনের আশেপাশে অসংখ্য সুলভ দুর্লভ মুহূর্ত নানারূপে আবৃত হয়েছে আমার সামনে। আমি কোন কোন সময়ে সেইসব মুহূর্তের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করেছি সত্যের বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা। মুহূর্তের রৌদ্রে উদ্ভাসিত হয়েছি, মুহূর্তের বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি, মুহূর্তের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছি এবং সেই আমার কবিতা। সব মুহূর্তই সোজা হেঁটে আমার কাছে আসেনি। কেউ এসেছে ধারালো সুরের উপর দিয়ে সতর্ক পা ফেলে। তবু এসেছে এবং আমি তাকে তাই সুদুর্লভ জেনেছি।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ১৬

আর তার জন্যে আমার সমস্ত অস্তিত্ব অখণ্ড আলিঙ্গন হয়ে উঠেছে। হয়ত পক্ষপাতিত্বে আমি তখন বাঙ্ময় হয়েছি। তবু সেই আমার কবিতা এবং কাব্যবিচারের সর্ত উপেক্ষা করেও। রসানুভূতি আনন্দস্বভাবে গিয়ে পৌছুবে না জৈবিক ও সামাজিক বাসনার ক্ষেত্রে নেমে আসবে, স্পষ্ট কাব্য নন্দনতত্ত্বের অভিজ্ঞতা প্রসূত না উচ্চতর পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত জ্ঞানাশ্রয়ী হবে. নন্দনতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান সম্মত হবে না দর্শনানুগ হবে ? Metaphysical, Hedonistic, Moral, Intellectual, Expressionistic, Phychological, কোন সূত্রে তা নির্ণীত হবে—আমার আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের মুখোমুখি বসে এসব গবেষণা করিনি" ।[১]

কবির উপরোক্ত কৈফিয়ৎ মনে রেখেও বলা যায়, যখন এই কবির কবিতা পড়ি, সর্বাগ্রে দেখি, কবিতা তাঁর প্রাণ বিন্দু থেকে স্বতোৎসারিত। প্রচলিত অর্থে যাকে আমরা স্বভাব কবি বলি তাঁর থেকে অনেক উঁচু দরের কবি তিনি। অভিজাত রুচি, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তি, মার্জিত হৃদয়াবেগ, এই তিনের সংমিশ্রণে তাঁর কবিতাসমূহ অপরূপ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

আরো বড় কথা এই যে, সাধারণ জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এই কবি। সেই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, বেদনা নৈরাশ্য. সংগ্রাম সাধনার কথা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। নিজের পরিবেশ, পরিপার্শিকতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। যুগ এবং জীবন তার কবিতার আয়নায় আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত।

সিকান্দার আবু জাফরের জন্ম ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক। বিখ্যাত 'সমকাল' পত্রিকার তিনি সম্পাদক। পূর্ববঙ্গের কাব্য তথা সাহিত্য আন্দোলনে সমকালের যুগোপযোগী জীবন্ত ও জাগ্রত ভূমিকা ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমকালের বিশেষ কবিতা সংখ্যা (১৯৬৪) এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কবিতা সংখ্যায় মোট পঁয়ষট্টি জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছিল। প্রতিনিধি স্থানীয় নবীন, প্রবীন সবরকম কবির কবিতাই স্থান লাভ করেছিল। পূর্ববঙ্গের প্রায় সব কবিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সিকান্দার আবু জাফর একটি অতি দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী সমধিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একই সঙ্গে তাঁর তিনখণ্ড কাব্য পুস্তক প্রকাশিত হয়: (ক) 'প্রসন্ন প্রহর', (খ) 'তিমিরান্তিক' ও (গ) 'বৈরী বৃষ্টিতে' ১৩৭৪

১. সিকান্দার আবু জাফর এর সমস্ত উদ্ধৃতি অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে নেওয়া হয়েছে সাপ্তাহিক বসুমতী। নবম সংখ্যা, ২১শে আগষ্ট. (১৯৬৯) থেকে, সং পৃ. ৫৫১ -৫৫৪।

সালে প্রকাশিত হয়েছে 'কবিতা ১৩৭২'। প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে যথাক্রমে ২৯ ও ৩৪টি কবিতা আছে। রচনা কাল ১৩৪৬ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। কালের দিক থেকে বিচার করলে দুই দশকেরও আগের লেখা এই কবিতাগুলি। অবশ্য সঙ্কলিত হয়েছে বলে একত্রে পেয়েছি। প্রথম গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল দেশ ভাগের আগে। দেশ অবিভক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে অন্য দেশের কবি বলে তাঁর পরিচয় দিতে হত না। কবি কবিতার মালাতেই সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনা করেছেন। কবিতা বা সাহিত্যের সার্থকতাই তো এই। দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান দূর হয়ে যায়।

সিকান্দার আবু জাফর তাঁর কবিতায় একালের জীবনচেতনার বলিষ্ঠ রূপদান করেছেন। ভাবাবেগ দ্বারা তাঁর কবিতা চালিত হয়নি। সাম্প্রতিক জীবন ধারার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ তার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।

এক আদর্শ সুন্দর জগৎ কবির চিত্তলোক জুড়ে ছিল। কিন্তু কি হয়েছে? অতীত যুগের ঝলোমলো দিনগুলি তাঁকে আজ চাপা দিয়ে রাখতে হয় 'বেদনার শিলা তলে'—

মারণ মন্ত্র মুখর কই বোমারু বিমানগুলি
সেদিন আকাশে হয়নি হাজার তারা।
সেদিন ছিল না জীবন ধাত্রী ধরা
নির্মম এতখানি।
মানুষের ছিল বুক ভরা প্রীতি প্রেম।

(ফাল্গুন হত গান)

'এপার ওপার' কবিতায় লিখেছেন—

উত্তরণ অন্য এক' মানুষের দেশে।
সেদেশের যত নরনারী।
অনাস্বাদ সৌহার্দের ইঙ্গিত প্রসারি
বিস্মিত আমার কণ্ঠে মালা দিল এসে
যত হর্ষে, যত গর্বে, হয়ত বা তার চেয়ে বেশি ভালবেসে।

অথবা কবির 'দুই-ধারা' কবিতায়—

অবারিত স্নেহাঞ্চল ভরে
যেথানে নিস্তব্ধ দিনে সূর্যের সুবর্ণ পড়ে ঝরে।
যেথানে প্রশান্ত রাতে শঙ্কাহীন তারকারা চলে
আকাশের ছায়া পথ তলে।

যেখানে বন্ধন নেই, নেই কোন পাষাণ শৃঙ্খল
শুধু মুক্তি, শুধু গান, উদ্দাম চঞ্চল।
যেখানে প্রাচীর নেই, আছে শুধু আমন্ত্রণ নীরবে ছড়ানো,
যেখানে আঘাত নেই, আছে শুধু তৃণে তৃণে মমতা জড়ানো।
সেই মন, সে আমার সুন্দরের পুণ্য তীর্থভূমি।

(দুই ধারা : প্রসন্ন প্রহর)

বাস্তব জগতের সঙ্গে কবির সেই সুন্দরের পুণ্য তীর্থভূমির মিল নেই কিন্তু। এ নিছক রোম্যান্টিক ভাব প্রবণতা। কিন্তু কবি সিকান্দার আবু জাফরের মানসিক চেতনা এখানেই থেমে থাকেনি। বাস্তব ধূলি মলিন জগতে দেখছেন।

"ভেঙে ভেঙে গেছে যত স্বপ্নের ধূসর শৈলতন্ত্র।"

(গোধূলির কবিতা)

হয়ত তাঁর সেই স্বপ্নের জগৎ থেকে মানুষ অনেক নীচে নেমে এসেছে, তার সমস্ত সুকুমার বৃত্তি, যেমন বুক ভরা প্রেম, প্রীতি, অনাস্বাদ সৌহার্দ্য, ভালবাসা, গান, মমতা, মুক্তি এইসব থেকেই দূরে ক্রমশঃ আরো দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। 'ঈদের দিন' কবিতায় এই পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যেও কবি দেখেন—

খুশির সওদা নিয়ে তবু দেখি সুচতুর দরাদরি
প্রথার গর্বে প্রাণ থেকে প্রাণে বহু ব্যবধান টানি।

কী সাংঘাতিক দিন এখন, অনুভব করছেন, মানুষের সমাজে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবার ন্যূনতম মৌলিক স্বত্ব জুটছে না এখন, চারিদিকে ভয়ঙ্কর আকাল, ক্ষুধা, পরনের কাপড়ও জোটে না ঠিকমত। সহজ ভাষায় একালের সমাজের নিপীড়ন বঞ্চনার চিত্র—

কোন মতে প্রাণটাকে রাখবার
প্রত্যহ নুন মাখা পান্তা,
দেহের তুচ্ছ লাজ ঢাকবার
একটুকু আবরণ কন্থা
অদৃষ্ট নাইবা যদি জুটলো
পশুর সামান্য কিছু উর্ধ্বে
মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবার
ন্যূনতম মৌলিক স্বত্ব
নাই যদি জোটে নাই জুটলো
অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবেই। (আকাল)

স্পষ্টতই কিন্তু কবি অদৃষ্টবাদী নন। এইভাবে দারুণ শ্লেষ নিক্ষেপ করেছেন অদৃষ্টের উদ্দেশে।

অন্যত্র কবির কলমে অঙ্কিত হয়েছে বিষাক্ত জীবন, গলিত সমাজ চিত্র, পাশব লাঞ্ছনার কাহিনী—

দেখেছি সে শর্ববীর আরণ্য আঁধারে
সম্ভ্রমের বিনিময়ে স্বর্ণ সান্ত্বনা।
বিপণির পণ্যসম নর্ম কারাগারে
বধূ ভগ্নী জননীর পাশব লাঞ্ছনা।
ক্ষুধাহীন যৌবনের ঘৃণিত আশ্লেষে
ভেঙ্গে গেছে কুমারীর মর্যাদার বাঁধ
মিটেছে সে নিশীথের নগ্ন পরিবেশে
অনিবার্য কুকুরের শোণিতের সাধ।

(সেই রাত্রি)

কবি কি এইসব অনাচার, অবিচার, অসাম্য চুপ করে মেনে নেবেন? কবিচিত্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তিনি স্থির থাকতে পারেননি। অদৃষ্টকে মেনে নিতে পারেননি। কবি বিশ্বাস করেন, এই মানবাত্মার অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, দুর্দশা চিরদিন চলতে পারে না, হতভাগ্য মানুষদের জীবন ইতিহাসে শুভদিন সমাসন্ন—

সকল পাপের শেষ হবে সমারোহে
অবমন্তা ঋণমুক্ত হবে অপমানে।
নিশান্তের স্বপ্ন আঁকা স্বর্ণ সম্মোহে
নূতন দিনের সূর্য সম্ভাষণ আনে

(এ দিনের পাখা)

শ্রেণীদ্বন্দ্বের আভাষ মেলে তাঁর কবিতায়। শুধুই কজনই কি এ-মাটিতে ভাগ বসাবে? আর সবাই চিরজীবনের চিরঅভাজন থাকবে? 'দাদু' কবিতাটিতে কবির এই সংশয় ব্যক্ত হয়েছে। কবি মুক্তি চেয়েছেন এই দ্বন্দ্ব থেকে—স্বভাবতই এই আশা তাঁর অন্তরে, সবার জন্যই সুষ্ঠুভাবে বাঁচার জন্যে এই পৃথিবী, এ কারুর একক সম্পত্তি হতে পারে না—

এ মাটির ভাগী শুধুই কজন!
বাকী শত কোটি মানব পুত্র চির জীবনের চির অভাজন?

মানসিকতার অর্থ বিহীন দ্বন্দ্বের থেকে আমাকে বাঁচাও
আমাকে বাঁচাও, সংশয় থেকে মুক্তি দাও
না হয় আমাকে মৃত্যু দাও।

(দাহ)

কবি মানুষের মিছিল থেকে, ভিড়, কোলাহল থেকে, জনতার অচ্ছেদ্য শিকল থেকে দূরে থাকতে চান না। কেমন এক নির্মম আক্রোশ অনুভব করেন। শুধু দাহ, শুধু আর্তনাদ। মৃত শিল্প হৃদয়ের একান্ত দীনতা দেখছেন কবি। কোথায় মুক্তি? মুক্তি কি নেই?

এই ভিড় এই কোলাহল
অবিশ্রান্ত জনতার অচ্ছেদ্য শিকল
আমার চিন্তার ক্লান্ত অগণ্য নিমেষ
ঘিরে আছে নির্মম আক্রোশে।
মুক্তি নেই অরণ্যে ধূলিতে;
মুক্তি নেই আকাশে আকাশে।
শুধু দাহ, শুধু আর্তনাদ,
মৃত শিল্প হৃদয়ের একান্ত দীনতা,
মৃত্যু নেই—মুক্তি নেই তবু।

('মৃত্যু নেই' : "প্রসন্ন প্রহর")[১]

অসহায়তা সময় সময় কবির চেতনাকে গ্রাস করতে চায় যেন, জীবনের অসহায় সেই রূপ কিন্তু মৃত্যুর চেহে দুঃসহ মনে হয় কবির কাছে। জেগে ঘুমানোর এই প্রচেষ্টা কী প্রাণান্তকর।

মৃত্যুর চেয়ে দুঃসহ এই অসহায় বসে থাকা
সজাগ দু'চোখে অন্ধত্বের প্রতারণা মেলে রাখা।

('আমি অসহায়', : "কবিতা ১৩৭২")[২]

শুধু বেঁচে থাকা, তাই কি সব?—

শুধু বেঁচে থাকি
দিন রাত্রি এবং দিন থেকে রাত্রি।
নিজেকে ভিজিয়ে নিই—
প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতার বৈরী বৃষ্টিতে।

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. তেতাল্লিশ
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. চুয়াল্লিশ

তবু দিন থেকে রাত্রির পথে
রাত্রি থেকে দিনের অন্বেষা কিছু নেই।

('নিথর' : "বৈরী বৃষ্টিতে")[১]

কবির এই আত্মসমালোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বসে বেঁচে স্থির-স্থবির হয়ে থাকা, জীবনের বৃথা অপচয়। মনুষ্যত্বের অবমাননা।

তাই শেষ পর্যন্ত কবি জীবনের পরাজয়কে মেনে নেননি। অদৃষ্টবাদের দ্বারা চালিত হননি।

হতাশা নয়, নৈরাশ্য নয়, আত্মসমর্পণ কদাপি নয়। জীবন সংগ্রামের অঙ্গ। সারা জীবন সংগ্রাম চলবে, সেই সংগ্রামের পরিণতি যে কী হবে, কারা যে জিতবে, কারা যে হারবে, সে সম্পর্কেও তার কোন সন্দেহ নেই···

মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা ত' অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেত্রে তবুত' ভোরের বীজ বুনছি।
আমাদের বিক্ষত চিত্তে

জীবনে জীবনে অস্তিত্বে
কাল নাগ-ঘনা উৎক্ষিপ্ত
বার বার হলাহল মাথছি,
তবু ত' ক্লান্তি হীন যত্নে
প্রাণের পিপাসাটুকু স্বপ্নে
প্রতিটি দ্বন্দ্বে মেলে রাখছি

('সংগ্রাম চলবেই' : "কবিতা ১৩৭২")[২]

মৃত্যুকে ভর্ৎসনা করে জীবনে জীবনে অস্তিত্বের স্বাদ সাপের বিষ মেখেও ক্লান্তি-হীন যত্নে প্রাণের পিপাসা স্বপ্নে মেলে রাখা —এই তো জীবন সংগ্রামের ইতিহাস!

কবি অস্তিত্ববাদী। নাস্তিতে তাঁর আস্থা নেই। যে সুন্দর জীবন তিনি দেখছেন, তাকে যারা ভয়ঙ্কর দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তুলছে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্ষমাহীন।

মানুষ কবিতায় তাঁর বক্তব্য—

দুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে
সীমাহীন দিগন্তের তীরে···দুর্গমের যাত্রাকালে

(মানুষ চলেছে দিগ্বিজয়ে)

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. চুয়াল্লিশ

২. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁয়তাল্লিশ

মানুষের দুর্জয় সঙ্কল্প কোন পীড়নের কাছেই মাথা নত করবে না আর—

বুক থেকে দেহ থেকে
খুলে নাও হাড় গুলো
ঘাড় ভেঙে আরো নাও রক্ত
রক্ত-হাড়ের স্বাদে তোমাদের জিহ্বা
তার সাথে সবটুকু কলজে
পাথরের মত হবে শক্ত।

(নিষ্কর্ষ)

কবি ভাবছেন হিসেব নিকাশ নেবার দিনটির কথা—

হিসাব নেবার দিন এখনো আসেনি
তাই আরো সহ্য করে যাবো
কারণ নিশ্চিত জানি একদিন
সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হবে।

(তেরশো ষাট)

কবির বড় সুন্দর একটি কবিতা 'ভূমিকা'। এই কবিতায় দেখাচ্ছেন কী ভাবে ধুলো মাটি কাদা লেপা, আবর্জনা ঘাটা ক্লান্ত ম্লান শীর্ণ ভীরু—দুটি হাত। সাধারণ দুটি হাত একদিন রাক্ষস-নিধন করে—

'একদিন
রাক্ষসের আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত যখন
মানুষের মৃত্তিকা
তীক্ষ্ণ ধার মারণাস্ত্র সহসা নৃশংস হল
এই দুটি সাধারণ হাতে
এ হাত ঘাতক হয়ে মেনে নিল
জীবনের অনিবার্য দাবি।

এই কবি আশাবাদী। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে, তার প্রগতিতে বিশ্বাসী। তিনি অসঙ্কোচে জীবনের জয়গান গেয়েছেন তাঁর অধিকাংশ কবিতাতেই, তাই তাঁর বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই বিশিষ্ট ভঙ্গীমায়। অন্তরের তীব্রতম আলোর জন্য তাঁর অমেয় আকাঙ্ক্ষা

রুদ্ধ দ্বার হৃদয়ের কাছে
অনুনয় করি বার বার
আলো চাই আরো আলো
অন্তরের তীব্রতম আলো

(আলো চাই)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী ভূমিকা নিয়েছেন তিনি, গুণ্ডা লেলিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যারা বাঁধায়, মানুষের ধর্মকে যারা অস্বীকার পদদলিত করে তাদের বিরুদ্ধে একটি সুন্দর কবিতা—

"শিকারী তোমার কুকুর গুলো রোখো
জঙ্গলে আজ জন্তুরা চিন্তিত
কুকুরের দাঁতে ক্ষত বিক্ষত
হৃদয় চেতনা সাধ
ভাগাড়ে যখন শকুন ভক্ষ্য
একাকার শব দেহ
তখনি মানুষ ছেড়েছে নগর গ্রাম
জঙ্গল তবু ভাগাড়ের চেয়ে ভালো
শিকারী তা হলে কুকুর গুলোকে রোখো
অনন্ত বোঝা পশুদের দুর্দাশা।

(কুকুর গুলোকে)

সাংস্কৃতিক প্রবহমনতা অক্ষুণ্ণ রাখা তাঁর কাব্যধারার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই কবির কবিতায় হাজার বছরের বাঙলার রাধার কবি মানসী হিসেবে উপস্থিতি অথবা একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে জালিয়ানওয়ালাবাগ, পলাশী ও উধুয়ানালার স্মৃতি অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতি ঋণ স্বীকার আমাদের উত্তর বঙ্গের সাংস্কৃতিক সাযুজ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

১. এতদিনে রাধা এলে!
অনেক রাতের নির্জন মদে প্রমত্ত চাঁদ
এড়িয়ে সুকৌশলে……
বাধা পার হয়ে বহু স্বপ্নের রাধা
রাধা হয়ে তবে এতদিন পরে এলে

(অবহেলায় রাধা)

২. এই স্মৃতি স্তম্ভের পরিচয় পেয়েছি—
ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগে
পলাশীর প্রান্তরে
উধুয়ানালায়
আজাদীর জন্য যারা রক্ত দিয়ে গেছে
তাদের স্মৃতি স্তম্ভ
শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি

(একুশে ফেব্রুয়ারী।)

৩. সমস্ত শব্দের নদী ধেয়ে
তোমার সুরের ঢেউ আর আমার প্রাণের কূল থেকে
অনুভূতি থেকে
তোমারি ভাষায় তার প্রতিধ্বনি শুনে
আমি শুধু অপমান ম্লান।
বার বার মৃত্যু মেনে নেয়া
অপৌরুষ জানি
তবু তো পারিনি
হাজার মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচাতে

(রবীন্দ্রনাথ)

পূর্ববঙ্গের সমকালীন কবিদের মধ্যে কবি সিকান্দার আবু জাফর আমাদের বিবেচনায় একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। তিনি সম্পূর্ণরূপে সমাজ সচেতন কবি, সংগ্রামী চেতনা সমন্বিত তাঁর কবিতা। জীবন এবং জাগরণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। সাধারণ মানুষের জ্বালা-যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন। যুগ তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত, তাঁর কবিতা মানুষের মর্মমূলে সহজ প্রবেশাধিকার পায়, তার চেতনায় নাড়া দেয়, তাকে উদ্বোধিত করে, প্রেরণা জোগায়।

॥ ৩ ॥ ফররুখ আহমদ পূর্ববঙ্গের একজন শক্তিশালী বিশিষ্ট বহু আলোচিত কবি। যশোর জেলার এই কবি ত্রিশের দশক থেকেই বেশ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ১৯৪৪ সালে। পাকিস্তান আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী। ১৯৬০ সালে বাঙলা একাডেমী কর্তৃক কবি হিসেবে তিনি পুরস্কৃতও হন।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যরাজির মধ্যে সাত সাগরের মাঝি (১৯৫২) ও সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২) খণ্ড কবিতা সঙ্কলন। নৌফেল ও হাতেম একটি কাব্যনাট্য। মুহূর্তের কবিতা কবির সনেট সঙ্কলন। হাতেম তায়ী কাহিনী কাব্য, প্রকাশকাল (১৩৭৩)। শিশুদের কবিতার তিনটি বই পাখীর বাসা (১৯৬৫), হরফের ছড়া (১৯৬৮) ও ছড়ার আসর (১৩৭৭)। কবিতার রাজ্যে এই সঞ্চরণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তাঁর অনুবাদ কর্ম, ইকবালের বহু উৎকৃষ্ট কবিতার অনুবাদে যেমন উঁচুদরের শিল্প ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তেমনই সুন্দর রসগ্রাহিতারও পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া আলোচ্য কবি কোরাণের বিভিন্ন অংশের পদ্যানুবাদেও বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্য রচনার সংখ্যা একান্তই বিরল। 'রাজা রাজড়া' সামাজিক ব্যঙ্গমূলক প্রহসন, শিশুদের জন্য গদ্যে লেখা গল্পের বই "রূপকথা"।

ফররুখ আহমদ পূর্ববঙ্গের সাহিত্যাঙ্গনে একটি অদ্ভুত স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্নধারার কবি,

যিনি তাঁর স্বক্ষেত্রে একক পদচারণা করেছেন একান্ত নিঃসঙ্গভাবে। মুসলিম ঐতিহ্য, অতীতের মুসলিম জাগরণের কল্লোলময় দিনগুলি, আরব ইরাণের স্বপ্ন বৈভবে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বাঙলার জলবায়ুতে লালিত হয়েও তাঁর এই অতীত স্বপ্নচারণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর প্রায় সমস্ত কাব্যে কবিতায় একই সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বক্তা বা চরিত্রের মাধ্যমে, বিভিন্ন পরিবেশে। হজরত মুহম্মদ যে চেতনা এনেছিলেন, রেনেসাঁসের সূচনা করেছিলেন মানবাত্মার যে উদ্বোধন তিনি করে গেছেন, যে উজ্জ্বল আদর্শ রচনা করে গেছেন, ত্যাগ, প্রেম, সত্যের যে অম্লান দ্যুতি রেখে গেছেন পৃথিবীতে, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে আরবে ইরাণে যে অভূতপূর্ব প্রাণবন্যার জোয়ার আসে, সে সমস্তই কবির স্বপ্ন পরিমণ্ডল ঘিরে বিরাজ করছে। সেই বিশাল ঐতিহ্যানুসারী কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর ধারণা, মুসলমানদের মধ্যে এখন নেই সেই গরিমা, সেই দীপ্তি, সেই সমাজ ভাবনা, সেই উদ্বুদ্ধ চিন্তা, দীপ্তি, দাহ, সেই জাগরণ, জীবনের সেই প্রবাহ। কবি অতীত ঐতিহ্যের পুনরুত্থান চান, হজরত মুহম্মদ বর্ণিত মুনিম বা মহান মানব, আদর্শ মানব সৃষ্টি হোক, মুসলমান আবার জেগে উঠুক, বিশ্বদরবারে তার উপযুক্ত আসন লাভ করুক, অতীতের ভাবধারা অবলম্বন করে এগিয়ে যাক, জড়বাদী, সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটুক, মুসলমান ধর্মের জয়গান ঘোষিত হোক, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর আজীবনের কবিতা ও শিল্প সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত।

স্পষ্টতঃই তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের আবেষ্টনীর মধ্যে সজ্ঞানেই অসহায়ভাবে বন্দী! তাঁর আদর্শ রূপায়ণ করতে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনরকম চেষ্টা থেকে তিনি বিরত হননি। মুসলমান, নবী, সাধক, মহাপুরুষ, জননেতা, ত্যাগী, বীর, উদার পুরুষদের জয়গান গেয়েছেন, তাঁদের অমর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন সমগ্র মুসলমান সমাজকে, অতীতের রূপকথার, আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে থেকে বীর চরিত্র বেছে নিয়েছেন, পুঁথির জগতে প্রত্যাবর্তন করে তার থেকে গল্প সংগ্রহ করে কাব্যকাহিনী সাজিয়েছেন সে কাহিনীর নায়ক অনেক সময় যাদুর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

এইভাবে, তাঁর অতীতমুখীনতা আর কাটতে চায়নি। এবং এই অতীত-মুখীনতা সুদূর আরব ইরাণের স্মৃতিচারণ। এমন কি, নদীর দেশ বাঙলাদেশের কথা ভাবতে গিয়েও কবি বলেন,

'এই মাটিতে মিশে আছে আরবের সেই মাটি'[১]

এবং 'একটি অদৃশ্য নদী বয়ে যায় মদীনা অবধি'।[২]

১, ২. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, (১৯৬৯) কবি ফররুখ আহমদ ৮৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪, পৃ. ১০৯।

মরুভূমি, সাগর, মরুস্থান, বাদশাহ এবং শাহজাদী, ঝরোকা প্রভৃতি আরব ইরাণ তাঁর সাংস্কৃতিক জগতের কেন্দ্রভূমি। নজরুলের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, ফররুখ পুনর্জাগরণের কবি, আর নজরুল চেয়েছিলেন নব জাগরণ। মানবতার যে বিশাল অঙ্গনে নজরুলের পদচারণা, সেক্ষেত্রে ফররুখ একান্তই সঙ্কুচিত, একমুখো, একটি আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ বা সীমিত, ক্ষুদ্র, অপরিসর।

অতীতের স্মৃতিচারণ অনেকেই করে থাকেন। কবি অতীত মন্থনও করেন। অতীতের ভাণ্ডারের নানা মণিরত্ন আহরণ করেন, অতীতের জীবনধারা থেকে রস সংগ্রহ করেন, যোগাড় করেন অভিজ্ঞতা, যা তাঁকে ভবিষ্যতে চলতে পথ দেখায়। অর্থাৎ অতীত বর্তমানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অতীত কখনই বড় হয়ে ওঠে না, সবটুকু হয়ে যায় না। ফররুখ আহমদের চরমতম ব্যর্থতা এইখানেই। অতীত স্বপ্নেই মশগুল হয়ে রয়েছেন তিনি। বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনায় তার আগ্রহ তেমন, ততটা নেই। স্মৃতিচারণ করেই, উদ্বোধনের আহ্বান জানিয়েই তিনি খুশি, তাঁর কাজ সাঙ্গ মনে করেন। অতীত ঐতিহ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাও যদি করতে হয়, কী ভাবে তা কার্যকর করা যাবে, সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট পথনির্দেশও সেখানে অনুপস্থিত।

পৃথিবী সাংঘাতিকভাবে বদলে গেছে। জীবন এখন যন্ত্রণায় মথিত হচ্ছে। সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তে। মানুষ বর্তমান ছাড়া ভাবতেই পারছে না। প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত। নানা হতাশা বেদনা ব্যর্থতা যেমন এক দিকের পাল্লায়, অন্য দিকে তেমনই কুশাসন, বঞ্চনা, শোষণ। জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে দিনদিন জীবনের গ্রন্থি। ফররুখের কবিতায় সাদামাটা জীবন তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা-নৈরাশ্য, তার দৈনন্দিন ধুলিমলিন বেশ, তার আলো-অন্ধকার প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। জীবনের এই জটিলতা থেকে ফররুখ বহুদূরে। আপন আদর্শ জগতেই তিনি বিচরণ-শীল। রোম্যান্টিক ভাবমানস তাঁর। স্বপ্নে বারবার পাড়ি দেন আদর্শের জগতে। 'কিন্তু, সেখানে পারিপার্শ্বিকতা ও সাম্প্রতিক জীবন নেই। জীবনের উদ্ভিদ্যমানতা (Evolving lite) নেই বলে আধুনিক কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বিশ্লেষণ-ধর্মিতাও নেই।... ফররুখ আহমদ মুসলিম পুনর্জাগরণের আদর্শে বিশ্বাসী, তাঁর কাব্যে ঐতিহ্য ও আদর্শের পারম্পর্য কী তা সহজেই বোধগম্য এবং কোন প্রেক্ষিতে এই সমন্বিত উদ্বোধন তাও সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তাতে ঐতিহ্যের স্বপ্ন ততখানি উজ্জ্বল নয়। ফলে, আদর্শের অপরিহার্যতাবোধ আবেদনও সেখানে পরোক্ষ। বিশেষতঃ জীবন ধারণার সঙ্গে আদর্শের যোগ স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রতীক ও রূপক দ্যোতনার মাধ্যমে। তাই ফররুখ আহমদের ঐতিহ্য ব্যবহার জীবন রসে নয়, প্রতীক

রসে সিক্তিত।"[১] সিন্দবাদ একটি প্রতীক, তাজা নতুন জীবনের, অগ্রগতির, স্বপ্নের জগতে তাই সিন্দবাদের সঙ্গে পাড়ি জমান তিনি—

কেটেছে রঙীন মখমল দিন নতুন সফর আজ
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক,
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দবাদ ![২]

তাঁর আর একটি ভয়াবহ প্রচেষ্টা, পুঁথির ভাষাকে কবিতার অনেক সময় সজ্ঞানে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন, যাতে কবিতা বেশিরকম দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, সাবলীল সৌন্দর্য হারিয়েছে, অনর্থক আরবী ফারসী ভাষা প্রয়োগ করেছেন, বেশির ভাগ সময়েই তা সুপ্রযুক্ত হয়নি। বাঙলা ভাষা অনেক অনেক উদার। অনেকটা ইংরাজিরই মত। সে সহজেই বহু বিদেশী ভাষার বহু শব্দ আত্মস্থ করে নিয়েছে। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে জোর করে যখন কোন কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় তার গায়ে, যত সামান্য প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন তার জন্য সেটা অত্যন্ত গর্হিত। এতে ভাষার গতি ব্যাহত হয়, ভাষা দুর্বল হয়, তার জীবনী শক্তি ফিকে করা হয়। তাঁর কবিতাংশ থেকে এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, এদেশের সাধারণ পাঠক তার কবিতার মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন, যেমন—

১. কে শুনেছে এই ত্যাগ, মর্দমীর কথা ? প্রবৃত্তির
উর্ধ্বে জানি ফেরেশ তারা-নূরানী লেবাস ; কিন্তু ধূলি
মলিন লেবাস যার সেই লুব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি,
ভ্রাতৃরক্তে প্রতিদিন বাড়ায় মুনাফা !

(নৌফেল ও হাতেম)[৩]

২. মুসাফির ! দূরদেশী খোশ আমদেদ জানাই তোমাকে।
একরার করে যে পুরা সাথাওতি করে যে জাহানে,
সঠিক জবান যার, তায়ী-পুত্র—সে দারাজ দিল

১. হাসান হাফিজুর রহমান, (১৯৭৩) আধুনিক কবি ও কবিতা বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৩১
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. সাতাশ
৩. নৌফেল ও হাতেম ; কাব্যনাট্য, ঢাকা, পাকিস্তান লেখক সংঘ, (১৯৬১)।

হাতেমের দেশ থেকে এসে যদি ; দোস্তের ডেরার
দাওয়াতে কবুল করো ।

(নৌফেল ও হাতেম)

৩. খোদ পরস্ত্রীর পঙ্কে সমাচ্ছন্ন যে হয়েছে, তার
কখনো নিষ্কৃতি নাই, দেয় তাকে মন্ত্রণা খান্নাস
চালায় ধ্বংসের পথে মরদুদ শয়তান ; যতদিন
না করে সে খোদ কুশী নিজের খঞ্জরে ।

(নৌফেল ও হাতেম)

৪. তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার,—
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জিন ও ইনসান—আশরাফুল
মখলুকাত দু'জাহানে, অথবা পারেন্দা প্রাণীকুল
শূন্যস্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে

(হাতেমতায়ী)[১]

৫. দেখিল হাতেমতায়ী, বসে আছে বিরান দেশের
বাদ্‌শা পেরে শান হালে—আবরের ছায়া ঘেরা যেন
আফতাব । গমগীন রয়েছে শাহা নতমুখে চেয়ে ।

(হাতেমতায়ী)

৬. দরিয়ার মাঝি ! তোমার ওজুদে পাথর গলানো থাক,
পাথার পারানো কুঅত তোমারে দিয়াছে আল্লা পাক ।

(বা'র দরিয়ায়)

৭. দজলার পাশে খিমার দুয়ারে হাসিন জওয়ানি নিয়ে
যেখানে আমার জীবনের খা'ব মন ছুটেছিল সেথা,
কাফেলার বাঁশী বয়ে এনেছিল জহরের মত ব্যথা !

(দরিয়ায় শেষ রাত্রি)

৮. যে মুহূর্তে সেই সুর্মা তুলে দিল দুচোখে আমার
কুল মখলুক যেন মুছে গেল মৃত্যুর আঁধারে,
মুছে গেল তামাম আলম, নিভে গেল আফতাব ;

১ হাতেমতায়ী, ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী (১৩৭৩)।

তুনিয়া রওসান। মওতের আলামত মনে হল
সুর্মার আতশী দাহ।[১]

অথচ ফররুখ একজন জাতশিল্পী। ছন্দমাত্রা ধ্বনি জ্ঞান তার সহজাত। আশ্চর্য সুন্দর দক্ষ সাবলীল তাঁর শব্দ চয়ন। প্রকাশভঙ্গী অনন্য। মণিমুক্তার মত ছড়ানো নানা চিত্রকল্প তাঁর কবিতায়। নানা অলঙ্কার ভূষিত। তিনি শক্তিমান কবি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তার প্রমাণ মেলে, যখন সুপ্রযুক্ত আরবি ফারসি উর্দু ব্যবহৃত হতে দেখি তাঁর কবিতায়—

১. ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালির বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ।[২]

২. কি লাভ আমার সে কথা শুধাও কেন ?
খোদার বান্দা মানুষের যদি হয় কোন খিদমৎ
জানবো আমার বুলন্দ নসীব, রওশন কিসমৎ ;

(হাতেমতায়ী)[৩]

ফররুখ আহমদের জন্ম যেহেতু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে, টগবগে ফুটন্ত ধাবমান মুহূর্তগুলির মধ্যে দিয়ে যেহেতু তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়, সেহেতু তিনি একান্তভাবে অতীতচারী হলেও মাঝে মাঝে এ জীবন এ জগৎ এই বাস্তব পৃথিবী তাঁর চেতনায় দোলা দেয়। দ্বন্দ্ব একটুখানি আছেই, থাকতেই হবে। বিশেষ করে এই জড় জগৎ তার নোংরামী, নীচতা, ঘৃণা, অবিশ্বাস, সন্দেহ থেকে দূরে থাকতে চান বলে, এ সব বাদ দিয়ে সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দিদৃক্ষা আছে বলেই তাঁকে কখনো সখনো তার চারপাশে তাকাতে হয়। তখন তিনি কী দেখেন ? সে দৃষ্টি বড় আশ্চর্য, তখন কিন্তু অদ্ভুত সজীব প্রাণবন্ত সংবেদনশীল মনে হয় তাঁকে—

পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।...
স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা—
এ পাশবিকতা,

১. 'কবি ফররুখ আহমদ পৃ. ২৮৭
২. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৮৭
৩. কবি ফররুখ আহমদ, পৃ. ২৮৮

শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী ;
রাত্রির আকাশ।
এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে করে পরিহাস ?
কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে করে পরিহাস ?

(লাশ)[১]

অথবা,

আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, নারী হ'ল লুন্ঠিতা গণিকা,
অনেক মঞ্জিল দূরে পড়ে আছে মানুষের ঘাটি,
এখানে প্রেতের বহির্বাটি,
এখানে আবর্তে পথ হারা
চলিতেছে যারা
তাদের দিয়েছে ডাক জড়তার ক্রূর আজদাহা;
শতকের সভ্যতায় এরা আজ হ'ল তাই অন্ধ, গুমরাহা।

(আউলাদ)[২]

লক্ষণীয়, জড় সভ্যতাকে তিনি দায়ী করেছেন, এবং অতীতের মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণ হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে, এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর ব্যর্থতা, জীবন জগৎ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে, সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, নিজের কল্পলোকে আশ্রয় নিচ্ছেন। কখনো বা কোন সমাধানে আসতে না পেরে নির্বাক হয়ে হৃদয় স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে, বোবা হয়ে থাকছে বেদনায়—

আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিমরাতে,
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফেরেনা বাসাতে
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।

এই বিশুদ্ধ পলায়নপরতা, বাস্তবতাবিমুখতা আমাদের কাছে বিশেষ বেদনাদায়ক।

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২০২
২. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৩২ ২৩৩

এই অবসরে, কবি ইকবালের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা অসমীচীন হবে না। কবি ইকবাল অনেক পরিণত মনের কবি। অতীতের স্বপ্ন তিনিও দেখেছেন, ঐতিহ্যের অনুষ্ঠান তিনিও করেছেন, রোম্যান্টিক ভাবাবেগে তিনিও আপ্লুত হয়েছেন। কিন্তু মূলতঃ তিনি ছিলেন দার্শনিক। অতীত ইতিহাস থেকে জীবনরস আহরণ করে তিনি তাকে বর্তমানের সঙ্গে যোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবকে তিনি একেবারে বিদায় দিতে পারেননি। দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে কবি ইকবালের কবিতায়। তত্ত্ব ভাবনায় তিনি ভাস্বর হয়েছেন। সেই পথে বর্তমানকে অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, সমঝোতা এসেছে, আদর্শ জীবনের পথ অনুসরণের মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্মের সার্থকতা খোঁজার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন। বস্তুতঃ ইকবাল জাত দার্শনিক। তা সত্ত্বেও সত্যিকার কবির মতই ক্ষণে ক্ষণে তাঁর স্বপ্নাচ্ছন্নতা কেটে গেছে, মাটি মানুষ নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতায়। এমনটি কখনো হতে পারেনি ফররুখের কাব্যে। এই অপরূপ পৃথিবীর সাধারণ জীবনের কাব্য কাহিনী তাঁর কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

ফররুখ আহমদ বাঙ্‌লা কবিতার আর একটি ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন এবং যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর সনেটসমূহ। কবিতার অপরূপ কলাকৃতি—সনেটের মধ্যে দিয়ে যতটা স্ফূর্তি লাভ করে, অন্য কোনভাবে বোধহয় আর তা হয় না। কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পেতে হলে তার সনেটগুলির বিশ্লেষণ বিচার করতেই হয়। কাব্য ভাবনা, প্রকৃতির বর্ণনা প্রেম ও যৌবনের জয়গান, স্বদেশ চিন্তা, অতীত ঐতিহ্য মুখীনতা, যুগ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র সনেটের সমাবেশ ঘটেছে "মুহূর্তের কবিতা" কাব্য-গ্রন্থটিতে। এক হিসেবে এটিকে কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ বলা যেতে পারে। যদিও ইসলামের ধর্ম ও আদর্শ, তার পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা রোম্যান্টিক কবি মনের অতীতের মোহময় স্বপ্ন স্মৃতি বিভোরতা বিদ্যমান, তাহলেও বাস্তবের মুখোমুখি অনিবার্যভাবে হতে হয়েছে কখনো সখনো, বর্তমানের পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন কয়েকবার। হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ আছে, বেদনার অনুরণন অনুভব করতে পারি, জীবনের অঙ্গনে ফিরে তাকিয়েছেন যেন! কবিতা সম্পর্কে কবির বক্তব্য—

যে কবিতা মিশে আছে পৃথিবীর অরণ্যে পাহাড়ে
যে কবিতা অর্ধস্ফুট গোলাবের পাত্রে সংগোপনে
সুরভি প্রশ্বাস আর বিগত রাত্রির অশ্রুধারে,

শিশিরে, প্রকাশ যার নিজেরে হারায়ে বারে বারে
কাঁদিয়াছে বহুবর্ষ অন্ধকার মাটির বন্ধনে।[১]

(দুর্লভ মুহূর্ত)

অন্ধকার মাটির বন্ধনে কেঁদে কবিতা মুক্তি স্বপ্ন দেখে, দুর্লভ জন্মের আশ্চর্য ইঙ্গিতময় রূপের আভাস দেয়! 'কবিতার প্রতি' সনেটটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য—কবিতাকে আহ্বান করেছেন সমস্যাকীর্ণ এ জগতে কাব্য ভাবনার ক্ষেত্রে কেমন সুন্দরভাবে মাটির কাছাকাছি নেমে আসতে চেয়েছেন! প্রকৃতির নানা চিত্রের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু এসব বিভিন্ন কবিতায় আবার তাঁর অতীত মুখীনতা ধরা পড়ে। রোম্যান্টিক ভাব কল্পনা বেশি প্রভাব বিস্তার করে। প্রেম ও যৌবন জয়গানে ফররুখ কিন্তু ঘৃণ্য লালসা, ইতরতা এ সব থেকে চিরদিনই মুক্ত, সুন্দর স্বচ্ছ একনিষ্ঠ প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন তিনি, একটা বিষণ্ণ বেদনার সুর লক্ষ্য করা যায়, যেন প্রেমিকাকে পাওয়া যায়নি, অঘ্রানের হিম ভেজা রাতে 'কাক জোছনার সাদা কাফিনে শরীর ঢেকে' এক অতি শ্রান্ত মুসাফির আমন ধানের মাঠে, মধুমতী নদীর বাঁকে বাঁকে প্রিয়াকে খুঁজে ফেরেন। প্রেমের জন্য সত্যনিষ্ঠ, কঠোর তপস্যা চলছে।

এইসব সনেটের মধ্যে স্বদেশের অপরূপ ঐশ্বর্যের রূপসুধা ধরা পড়েছে, কিন্তু কবির যেই ঐতিহ্য চেতনা ফিরে এসেছে, সেই বর্তমানের সঙ্গে সাযুজ্য হারিয়েছেন, মক্কা মদিনার পথে, খেজুর গাছ ছাওয়া মরুভূমিতে বিচরণ শুরু করেছেন।

কবির স্বপ্ন ভঙ্গও হয়, বেদনাবিদ্ধ হয়ে পড়েন তিনি, সনেটে তার সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করি—

তবু এক অন্ধকার জেগে আছে দুচোখে আমার,
সে আঁধার কত কালো, কত গাঢ়, তুমি তা জানো না,
(জটিল চিন্তার মত সে আঁধার তিক্ত বেদনায়
যার হৃদয়ের তিক্ত মনে এঁকে দেয় মরণ যন্ত্রণা)
মৃত্যু কি বিস্মৃতি আনে? এ জীবন দেয়কি সান্ত্বনা
পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে, সংশয়িত দিন কাটে যার?[২]

(রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে)

১. কবি ফররুখ আহমদ, পৃ. ১৯৩
২. কবি ফররুখ আহমদ, পৃ. ২১৩

কবি অবশ্য নতুন কিছু বলতে পারছেন না, যান্ত্রিকভাবে মানুষ জন্মের লগ্ন থেকে চলেছে মৃত্যুর পথে সাবলীল গতিতে —

নিপুণ যন্ত্রের মত জন্মের প্রথম ক্ষণ থেকে
চলেছে মৃত্যুর পথে সাবলীল গতি।[১]

(যান্ত্রিক)

'ভোরের গান', 'একটি সূর্যোদয়', 'স্বর্ণ ঈগল', 'অশেষ', 'প্রত্যয়' প্রভৃতি সনেটের মধ্যে দিয়ে কবি সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা চোখে সামনের দিকে দেখেছেন। 'স্বর্ণ ঈগল' একটি সুন্দর কবিতা। এটি রূপক কবিতা, ইসলামের প্রগতিশীল জীবন এই কবিতাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

রোম্যান্টিকতার আবেগ সমৃদ্ধ তাঁর সনেট। অনেক ক্ষেত্রে গীতিময়তা লক্ষণীয়। 'দুধে ধোওয়া সাদা কলমী লতার মত কোমল কোন কৃষাণ কন্যার কালোরূপ', 'কান্নার সমুদ্র এক রেখে যায় সুরে ও সঙ্গীতে', 'আনন্দ বিষাদে ঘেরা এ জীবনজয়ে পরাজয়ে। বিগত রাত্রির সেই পানপাত্রে করে রসাস্বাদ।' 'তোমাকে মর্যাদা দিয়ে পাই আমি পাথেয় আমার, 'সুসম্পূর্ণ রূপ পায় গান মুহূর্তের' প্রভৃতি পংক্তি অন্তরে নাড়া দেয়, তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি আদায় করিয়ে নিয়ে ছাড়ে।

শিশু কবিতা রচনাতেও তিনি সচেষ্ট। কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে শিশুদের উপযোগী করে কবিতা রচনা করেছেন, যেমন, 'পাখির বাসা' কাব্যগ্রন্থে নানান পাখীর বাসার সঙ্গে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু শিশুদের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর ঐতিহ্য সচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কাজে কাজেই উপদেশ বর্ষিত হয়েছে বেশি, "মজার ব্যাপার" পর্যায়ে কবিতা রচনা করতে গিয়েও মজার কিছু তাই খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে, শিশুদের জন্য লেখা, শিশুরা পাঠ করে জ্ঞানলাভ করুক না করুক, মজা কিন্তু পায় না। এক্ষেত্রে তাই তাঁর লেখা তেমন শিশুদের আকৃষ্ট করেনি, এবং তাঁর প্রতিভার বিকাশ তেমন হয়নি, স্ফূর্তিলাভ করেনি। এক্ষেত্রেও তিনি ও তাঁর কবিতা অনেকটা প্রক্ষিপ্ত।

পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক এবং রেডিওর সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে বহু গান লিখেছেন দেশাত্মবোধক, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ। এরকম একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে—

[১] কবি ফররুখ আহমদ, পৃ ২১২

আল্লাহর দেওয়া বিশ্ব বিধান
ইসলামী শরিয়ত
সে বিধান মোরা গড়িয়া তুলিব
এই পাক হুকমত ॥
তৌহিদে রাখি দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা সৃজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস দুনিয়ার বুকে
দেখাবো নতুন পথ ॥
সারা মুসলিম দুনিয়াকে বেঁধে
একতার জিনজিরে
ফিরায়ে আনিব হারানো সুদিন
নয়া জমানার তীরে ॥
আলী, ওসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব মোরা ফের আবুবকরের
সত্য সে খিলাফত ॥

(তারানা—ই-পাকিস্তান)[১]

বলা যেতে পারে, গানটির মধ্যেই তাঁর সমস্ত কাব্য ভাবনা বিধৃত আছে। কাব্যের চেয়ে এই কবির কাছে কর্মপন্থ'টাই বড় মনে হয়েছিল, কবিতাতে তার স্পষ্ট উল্লেখও তিনি করেছেন—

"কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী, পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ ; ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ,
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার স্বার্থে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেমতায়ীর ॥

(নৌফেল ও হাতেম)[২]

ট্র্যাজেডি এই যে, কবি হয়েও তিনি বলছেন অন্তকথা, কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়—ইত্যাদি। মানুষ, যে স্বার্থত্যাগী, কর্মী, সেবাব্রতী, সেইতো নিজেই অনবদ্য

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৩৬
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. ২৩৭

কবিতা, সেইতো আশ্চর্য সুন্দর উদার নম্র কমনীয় রমনীয় দৃঢ় জীবন্ত কবিতা সৃষ্টি করে।

ফররুখ আহমদ একটি স্বপ্ন এবং আদর্শের ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে যেতে যেতে আপন কবি সত্তার বিসর্জন দিয়েছেন এইভাবেই, এইভাবেই তাঁর মধ্যে যে আশ্চর্য সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে ছিল, তার থেকে মহীরুহ হতে পারল না, অপূর্ব শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি কবিতার অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে একান্ত পদচারণা করে গেলেন, যার শাশ্বত মূল্য খুব বেশি একটা ভবিষ্যতের বাঙলার মাটিতে থাকবে বলে মনে হয় না, দেশকে এবং জাতিকে যতটুকু দেবার ছিল, সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যে ভাবে তিনি রূপে রসে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারতেন, তাঁর একদেশদর্শিতার জন্য ইচ্ছা করেই, কৃপণতা করেই ততটা দিতে পারলেন না, সে রূপরস থেকে বঞ্চিত হল। প্রতিভার এমন স্বেচ্ছাকৃত অবদমন, একে অপমৃত্যুই বলব, একালে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। যে সামর্থ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাতে পূর্ববঙ্গের তথা সারা বাঙলা সাহিত্যাকাশে চিরস্মরণীয় উজ্জ্বল দীপ্তিতে দীপ্যমান হতে পারতেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি দূরদ্বীপে নির্বাসন নিয়েছেন, ইতিহাসের একটি অনিবার্য পরিণতির ক্রীড়নক হিসেবে অবশ্যই পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কথা থাকবে; কিন্তু যে অপরূপ অনন্যসাধারণ মর্যাদা তিনি পেতে পারতেন, সে আসন তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

॥ ৪ ॥ 'রাত্রিশেষ' (১৯৪৭), 'ছায়াহরিণ' (১৯৬২) এবং 'সারাদুপুর' (১৯৬৪) কাব্যগ্রন্থত্রয়ের কবি আহসান হাবীব পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলনের একজন উল্লেখযোগ্য অংশীদার। স্বাদু, সুন্দর তাঁর কবিতা, বক্তব্য বিষয় বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, অনর্থক বাগাড়ম্বর নেই, জটিলতা তেমন পছন্দ করেন না, অথচ তাঁর কবিতা সহজেই গীতিধর্মীর মর্যাদা লাভ করে, আবৃত্তি করতেও ভাল লাগে।

আহসান হাবীব পরিশীলিত মনের অধিকারী। মৃদুভাষী। কখনও উচ্চকণ্ঠ নন, কখনও দ্রুত সঞ্চরণ নেই, ধীর, শান্ত, নম্র কিন্তু উদাত্ত।

জীবনকে, তার সংগ্রামকে, তার বিচিত্র রূপকে জেনেছেন, চিনেছেন, প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এইদিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমাজ সম্পৃক্ত, মানুষ, মাটি, মন থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেননি। যুগ, জীবন ও দেশের সঙ্কটের চিত্র তাঁর বহু কবিতায়। ত্রিশের কবিদের মতই দ্বন্দ্বজর্জর, ক্ষুব্ধ, ত্রস্ত, বিদীর্ণ, বিক্ষত তাঁর হৃদয়, তিনি দেখেন বন্ধ্যা মাটি, ঝরা পালকের ভগ্নস্তূপের বালুচর; বিশ্বাসঘাতক মৃত্তিকা, ক্রূর হাসি,—

১. দিনগুলি মোর বিকলপক্ষ পাখির মতো
বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান।

(দিনগুলি)[১]

২. ঝরা পালকের ভগ্নস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়
তবু বার বার সবুজ পাতার স্বপ্নরা করে ভীড়।

(এই-মন-এ-মৃত্তিকা)[২]

৩. এখানে তোমার ছাওনি ফেলো না আজকে এটা বালুর চর
চারদিকে এর কৌটিল্যের কণ্টকময় বন ধূসর।

(ঐ)[৩]

৪. অতঃপর সচকিত আকস্মিক বিমূঢ় বিরতি
নিরাতঙ্ক পদতলে এ-মৃত্তিকা বিশ্বাসঘাতক।

(দীপান্তর)[৪]

৫ লাল মাটি, কালো পিচ, সাদা নীল বালের বুকে,
ক্রূর হাসি ফেটে পড়ে—পরাক্রান্ত যুগের নিষাদ।

(দীপান্তর)[৫]

কবির মনে যন্ত্রণাবোধ আছে, কিন্তু জীবনের রঙ্গ দেখলেও, জানলেও, চিনলেও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারেননি—কেমন দূর দ্বীপবাসী রয়ে গেছেন নিজেই, এ যেন সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে বেদনার, বিভ্রান্তির, বিক্ষুব্ধির ঢেউ-এর ওঠানামা দেখছেন। তাতে অবগাহন করবার কোন বাসনা, সাধ অথবা সামর্থ্য তিনি অর্জন করতে পারেননি ঐ তরঙ্গ লহরীকে। তাঁর 'নির্বিকার নিরুত্তাপ মন', অথবা 'অলস মন' ঘুমঘুম চোখের মত চাইছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে পৃথিবীকে, অথচ নেই অনাবশ্যক প্রখরতা।

এরই জন্য, নির্দিষ্ট কোন পথে অগ্রসর হতে পারছেন না বলে, কখনও বা নিরাশা পীড়িত কবির হতাশ রুদ্ধস্বর—

প্রত্যয়ের দিন নাই, প্রতিশ্রুতি বিদ্রূপ-বিক্ষত
আশা ও আশ্বাস নাই, প্রেম হেথা স্বভাব-বণিক ;

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৪৪
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. তেইশ
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. তেইশ
৪. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. তেইশ
৫. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৪৫

নির্মাংস অস্থির পাশে ভিড় করি কুকুরের মত,
দীর্ঘদিন বাঁচি মোরা, জীবনেরে নিত্য দিয়া ধিক।

(দ্বীপান্তর)[১]

প্রত্যয়, প্রতিশ্রুতি, আশা-আশ্বাস, প্রেম অদৃশ্যমান। তবু ক্লান্তিকর বাঁচা কুকুরের মতো, নির্মাংস হাড় চাটার লোভে! কত সাংঘাতিক সত্য পরিবেদন—বর্তমান সভ্যতার কত নিপুণ বিশ্লেষণ।

কিন্তু আহসান হাবীব এখানেই শেষ—এর পরের বক্তব্য তাঁর ঝাপসা, বিমূর্ত, ধারণানির্ভর। জীবনের গভীরতর কোন প্রশ্ন আর জাগে না, তার উত্তরের জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সে সাধনাও কবির খুব অল্প কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায়।

এইখানেই আহসান হাবীব স্থবির হয়ে পড়েছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক উত্তাল তরঙ্গে ছড়িয়ে যেতে, ভেসে যেতে একাত্ম হতে পারেননি। তাই উত্তরণের যে পথ তিনি খুঁজছেন, তা' একান্ত বক্তব্যনির্ভর, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও এষণা—

রাতের পাহাড় থেকে
খসে যাওয়া পাথরের মত
অন্ধকার ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে।
দু'হাতে সরিয়ে তাকে নির্বিকার নিরুত্তাপ মন
এগোলো।

রেড রোডের বুক থেকে,
এগিয়ে যাবে কেল্লার মাঠ পেরিয়ে
তারপর আরো এগোবে।
গঙ্গার গভীর জলে ঘুচাব কি তার লজ্জা!
অথবা ঘাটে বাঁধা অনেক দূরের জাহাজ,
যারা পার করে দেয় পলাতক অন্ধকারকে
নিরাপত্তার পাল তুলে। .....
বন্যা আসবে রেড রোডের প্রান্তে
কেননা
এদিকে আবার জাগবে নতুন সূর্য![২]

১. আধুনিক কবি ও কবিতা পৃ. ২৪৫
২. রেড রোডে রাত্রিশেষ।

সূর্য জাগবে কিনা সত্যি সত্যিই তার বিস্ময় বোধকতাই কবির মন অধিকার করে রয়েছে। এটি 'রাত্রিশেষ' কাজেই, শেষ কবিতা। রাত্রিশেষের কবিতাগুলি যদিও তিনি প্রহর, প্রান্তিক, প্রতিভাস এবং পদক্ষেপ এই চার পর্যায়ে ভাগ করে সাজিয়েছেন, তাহলেও কোন পারম্পর্যবোধ জেগে ওঠেনি, শেষ পর্যন্ত সত্যিই অন্ধকার দূর হবে কিনা একটা সংশয়ই থেকে গেছে।

'ছায়া হরিণ' কাব্যগ্রন্থে নতুন আঙ্গিক, ভাববিন্যাস প্রভৃতিতে যদিও তিনি সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, কিন্তু নির্লিপ্ত চেতনা থেকে খুব বেশী মুক্তি পেতে পারেননি। কাজেই ১৫ বছর পরেও একই সুর তাঁর কবিতায়—

রাত্রিশেষ!
কুয়াশার ক্লান্ত মুখ শীতের সকাল—
পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল।
শিশির সম্রত ঘাসে মুখ রেখে শেষের কান্নায়
দু'চোখ ঝরেছে কার,
　　পরিচিত পাখিদের পায়—
চিহ্ন তার মোছেনি এখনো
　　আছে এখনো উজ্জ্বল।
কান্নার মাধুরীটুকু ঘাসে ঘাসে করে টলোমল।
মলিন চাঁদের টিপ আকাশের পাণ্ডুর কপালে।
প্রাত্যহিক পৃথিবীর পরিচিত সাত ডিঙার পালে
হাওয়া নেই!

এখন হৃদয়ে বার বার
নির্জন দ্বীপের সেই অপরূপ রাজ দুহিতার
প্রথম প্রেমের সুর ঢেউ তোলে।

(শীতের সকাল)[১]

রাত্রিশেষের ইচ্ছা, সোনালী প্রভাতের স্বপ্ন কবির শিরায় ও ধমনীতে প্রবহমান। কিন্তু এখানে অনেকটা রোম্যান্টিক ভাব মানসের পরিচয়, প্রেমের পরিবেশ গড়ে নিয়েছেন।

সেই প্রেম ও ব্যর্থ দিনযাপনে, অন্ধকারে চোখের আলো হরণ করেছে, তবু নতুন করে ঝড়ের আকাশে তাকাবার কথা বলছেন কবি—

১. ছায়া হরিণ (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ)

আজো মনে পড়ে সেই চাঁদ সেই মুগ্ধ নয়ন
তোমার তনুর চন্দ্রিমালোকে সে-অবগাহন।
স্মৃতির তীর্থে আজো সেই চাঁদ আসে আর যায়,
ভাবতে পারিনি এখানে এ বেশে দেখবো তোমায়।
নির্জন রাত মেঘলা আকাশ ঝড়ের হাওয়ায়
পৃথিবী কাঁপছে ; ভয়ে থমথমে চোখের চাওয়ায়
এ কোন ব্যর্থ দিনযাপনের দুঃসহতার
ইতিহাস আজ লিখছো এখানে ; এ অন্ধকার
তখন তোমার চোখের সে আলো করেছে হরণ।
কোন্ পাপে বলো এ নির্বাসন করেছো বরণ।
এলোমেলো চোখ শীর্ণ দু'চোখ জীর্ণ শরীর
কোথায় কখন দুঃসহ ক্ষুধা পিপাসার তীর
হেনেছে তোমায়, হয়ত জানো না, তবু একবার
আজকে ঝড়ের আকাশে তাকাও। আজকে আবার
এড়িয়ে লজ্জা ভাবনা এবং ভয়ের বাঁধকে,
সন্ধান করো আদিক লায়লা রাতের চাঁদকে।

(একটি মহৎ কবিতার খসড়া)[১]

এই রকমই উত্তরণের বাসনা, মুখোস খুলে নিজেকে অনগ্ন করে সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা করার, ঘৃণ্য ভণ্ডামীর জাল ছিন্ন করার আপ্রাণ প্রয়াস (?) কবির, এবং এটিও প্রেমের কবিতার আধারে —

এ মুখোস খুলে যাক
নিজেকে অনগ্ন করে
সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা করার
আপ্রাণ প্রয়াস আর
এই ঘৃণ্য ভণ্ডামীর জাল
ছিন্ন হোক।
আমাকে আড়াল করো।
আভরণ-মুক্ত হয়ে তুমি এসো,

১. ছায়া হরিণ (১৩৬৯)

তোমার সহজ অবয়বে,
ধরা দাও সহস্র দৃষ্টির আলোয়।

(নায়ককে)[১]

কিন্তু বাস্তবে আভরণ মুক্ত হয়ে আসা, মুখোস খোলা, ঘৃণ্য ভণ্ডামীর জাল ছেঁড়া, সহজ অবয়বে আসা এতই কি সোজা ?

বস্তুতঃ কবির অন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত, বিব্রত। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব উত্তরণের জটিল সংগ্রামদীপ্ত পথে হাঁটতে তাঁর অনীহা। দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে তিনি অপারগ।

কতকগুলি কবিতা, যেমন কাশ্মীরী মেয়েটি, সৈনিক, রেনকোট, ধন্যবাদ, হক নাম ভরসা, জহি জঙ্গ নামা প্রভৃতিতে তিনি গল্প ও ব্যঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন। এতে তিনি যেন উভয়রক্ষা করতে চেয়েছেন। অনিবার্য সত্য তির্যক ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন, যেন দায় শোধ করেছেন এবং ভীড়ের হুজুগ থেকেও বেঁচেছেন, নিজের গণ্ডীর বাইরে আসার পরিশ্রমটুকুও বর্জন করতে পেরেছেন, এইভাবে স্বস্তি পেয়েছেন।

"সারা দুপুর কবিতা" কবিতাগ্রন্থেও এই একই চেতনার, একই ভাবনা-কামনার অভিব্যক্তি, নিরাশা থেকে মুক্তি ব্যাকুলতার আকাঙ্ক্ষা, প্রেমকে ঘিরে—

এবার থেকে
তোমার জন্যে কথা আমার দিনের আলোর
তপস্যাতে
ঝরবে পথে।
গড়বে নতুন দিনের বাসা
মহৎ প্রেমে।
আমি তখন রই বা না রই
তুমি তখন
মুক্ত দিনের আলোর রাজ্যে রাণী হ'য়ো।

(তোমার জন্য)[২]

কিন্তু আজকের কবির দায়িত্ব বড় সাংঘাতিক, এক কথায় অসাধারণ। বড় দুঃখের বিষয়, আহসান হাবীব সমাজ সচেতন কবি হয়েও, সমাজ সম্পৃক্ত হয়েও স্বেচ্ছায় দূরে রয়ে গেলেন। কচিৎ কখনো এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা কবির অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছেন—যেমন,—

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৫০
২. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৮৩

১. তোমার আমার দিন ফুরায়েছে যুগটাই নাকি বৈপ্লবিক
গানের পাখিরা নাম সই করে নিচে লিখে দেয় রাজনীতিক।
থাকতে কি চাও নির্বিরোধ—
রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।

নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক,
আরক্তগান এইখানে শেষ, আজকে আহত সুরের পিক।
আমাদের দিন মৃত্যু-তুহিন দীর্ঘায়ু হবে শোন বিধান
শান্তি হরণ এ মৃৎ-পিপাসা চিরদিন রবে বিদ্যমান।
জঠরের জ্বালা চিরন্তন
চির ক্লেদাক্ত এই জীবন—
যুগ নিষাদের কপিশ নয়ন হানবে সেখানে দৃষ্টিবাণ।
আজকের দিনে এই ত কবিতা, গানের পাখির এই ত গান।

(আজকের কবিতা)[১]

২. এবার এলাম
হাজার জনতা যেথা নিত্য দেয় দাম
পীত রক্তে জীবনের, সেই রাজ পথে।
আজ হতে
দুর্বহ পাপের বোঝা দিনে দিনে লঘু করিবার
প্রতিজ্ঞা আমার!

(স্বাক্ষর)[২]

লক্ষণীয়, কবির ধারণা এখানেও সম্যক্ সংগঠিত নয়, 'নাকি' শব্দটিই তার প্রমাণ।

কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক থাকলে, মানস প্রবণতায় জাড্য থাকলে, জীবনের গহন অন্ধকারের সঙ্গে সাহসী পদক্ষেপে সংগ্রাম ঘোষণা না করলে কবির ইচ্ছার কুসুম কোনদিন মুকুলিত হয়ে উঠবে না—তার যন্ত্রণা কখনো বিক্ষোভের, বিদ্রোহের রূপ নেবে না; এ যুগের কবিতার প্রথম এবং প্রধান মৌল সর্ত পূর্ণ হবে না।

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৪৬-৪৭
২. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৪৮

॥ ৫ ॥ আলাউদ্দীন আল আজাদ পূর্ব বাঙ্‌লার একজন উচ্চকণ্ঠ, বলিষ্ঠ, নির্ভীক, প্রত্যয়বান, স্বাধীনচেতা, দৃপ্ত কবি, জীবনের মিছিলে যিনি অবলীলায় যোগ দিয়েছেন, সংগ্রামের শরিক হয়েছেন, যুগ ও যৌবনের দাবিকে তুলে ধরেছেন।

অথচ, আশ্চর্য, তিনি কিন্তু পূর্ব বাঙ্‌লার বহু আলোচিত কবি নন। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত—তিনি নিপুণ কথাসাহিত্যিকও। আলো ও অন্ধকারকে দেখেছেন, চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, মানুষের শোষণ বঞ্চনার স্বরূপ জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, গভীর অভিজ্ঞতা সঞ্জাত তাঁর কবিতাবলী, এবং সর্বত্র সংগ্রামী মনোভাব ছড়িয়ে রয়েছে। হেরে যাওয়া, পিছিয়ে পড়া, পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী, মানুষের সভ্যতার উত্তরণে বিশ্বাসী কবি।

তাঁর কবিতার বই 'মানচিত্র' (১৩৬৮) 'ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ' (১৯৬২) ও 'সূর্য জ্বালার সোপান' (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), এ ছাড়া তাঁর আর দু'খানি নতুন কবিতার বই 'লেলিহান পাণ্ডুলিপি' ও 'নিখোঁজ সনেটগুচ্ছ'।

আলাউদ্দীন আল আজাদ নিপুণ শিল্পী, শক্তিশালী কবি। তাঁর কাব্যে যথেষ্ট ধার আছে। বর্ণময়। চিত্রদীপ্ত। ছন্দ ও ভাবের দোলা যেমন অনুভব করি, তেমনি উদ্বুদ্ধ হই মানসিক চেতনায়। জীবনের জাড্য দূরে ফেলে রেখে উঠে বসি। তাঁর কবিতা মানুষকে ভাবতে শেখায়।

কেমন সাবলীল ভঙ্গীমায় যুগচিত্র এঁকেছেন—

১. যেখানে মাতালের অট্টহাস্য
শিশুর চীৎকার
অক্ষম মাতার
বিলাপের সুর
আর টিমটিমে
লালচে আলোর নীচে লোমচর্ম রূপজীবিনির সকরুণ ঠাট
ক্ষুধা ও আশার বৈঠক……
(জন্মমুহূর্ত)[১]

২. অলীক অলকা চেয়োনা আজকে। একখানা রুটি, শরাব, কুঁজো
আর রুবা'য়ের পুঁথি পারবে না স্বর্গ বানাতে মরুভূমিকে
কেননা তোমার প্রিয়তমা সাকি বিরহী একাকী অনেক দূরে।

১. আলাউদ্দীন আল আজাদ, মানচিত্র (১৩৬৮), ৭৪ কয়াশগঞ্জ, ঢাকা-১, পৃ. ৩১

তাহলে অশ্ব ছোটাও সুতনু শাদা রোমে হানো কড়া চাবুক
পঞ্চশরেরা ঝরে পড়ে যাক, হাতে শুধু থাক তীর-ধনুক,
দিক দিগন্ত সীমান্ত-ভাঙা বাসনায় থরো থরো কাঁপুক ॥

(স্বগত)[১]

৩. বিজন গলির বস্তিতে আমি রাত্রি জাগি
আর জাগে ঐ বেতাল গন্ধ আবর্জনা

... ...

জীবনে আজকে সকল ছন্দ ছিন্নভিন্ন
বুকের বাসরে হত বাসনারা রক্তগঙ্গা···

(জনান্তিক)[২]

৪. একি যাদু দেখলাম, হায় একি ভেল্কি
দুদিনেই গুদামের বুকগুলা হাল্কা :
রাস্তার আশে পাশে নামে কালো রাত্রি
বস্তারা সেই ফাঁকে কোথা করে যাত্রা
মোদের হাতের চটের থলি
খালি থাকতেই পায় আরাম :
আরাম দিলেন উজিরসাহেব
বেঁচে থাকুক তাহার নাম ॥

(ইকড়ি মিকড়ি)[৩]

৫. কি নবাবজাদী ! কাউনের জাউ
খাবেনা কিছুতে, আর কথা না যেন
বিষের ছুরি :
বলে কিনা ভাতের যোগান দিতে পার না
শাদি করতে শরম করে না ? হুঁ, এ আবার মরদ !
হুঁ হুঁ হুঁ
মরদ নই ? দেখ তবে—,
হাতের কাছে ডাণ্ডা ছিল
এক বাড়িতেই
ঠাণ্ডা !

(দুই আফসোস)[৪]

১. আলাউদ্দীন আলআজাদ, মানচিত্র (১৩৬৮), পৃ, ৫১
২. ঐ পৃ. ৬০—৬১
৩. ঐ পৃ. ৬৮—৬৬
৪. ঐ ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৩৭২) পৃ. ২৯

৬. লম্পট নদীর কাছে বসে বসে খড়ের আগুনে বিড়ি ফুঁকি, জুয়া জুয়া জালিয়াৎ জুজু হাওয়ায় কাঁপানো সরীসৃপ মাথার ভেতরে এই এক জপ জুয়া জুয়া, নাছোড় ট্যাকের পয়সা ছক্কায় সঁপে করবো বাজিমাৎ! ক্রমে শেষ পরিশিষ্ট আলো, অগোছালো তমসারা তামাশায় দেয় হাততালি : এক গুণ্ডা তরুণী বেশ্যারে ধরে তুললো নৌকায়, ঝটতি চেপে জেব উঠে পড়ি, ঠকঠক ছুটছে তাড়ির গাড়ি, অদূরেই অনন্ত নগরী॥

(রাত্রি ও নগরী)[১]

৭. করোনা হে বন্ধু আফসোস
হয়তো এ কপালের দোষ
পাইনি কুবেরের প্রসাদ
জুড়ি গাড়ি বাগান প্রাসাদ
বিফল তোমার তদবির :
জাতের দরোজা
বন্ধ একে হয়ে যায় সোজা।
... ...
আমি চলেছি ধ্বংসের মুখে
ফিরবোনা আর
আমি চলেছি পতনে সুখে
ফিরবো না আর

(ফিরবো না আর)[২]

নষ্টামী, ভণ্ডামী, জালিয়াতী এসব অবক্ষয়ে কবির চেতনা 'বেদনা বিক্ষুব্ধ'। মানুষের সমাজ আজ শোষক ও শোষিতের দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে।

কোনরকম আপোষ নেই কবির মনে। 'মানচিত্র' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধতেই তিনি যাত্রার জন্য তৈরী—

নিজহাতে কিছু দিলে নাক ; তাই
বিনয়েরে দিই নির্বাসনেই

১. আলাউদ্দীন আল আজাদ, সূর্য জ্বালার সোপান (১৩৭২), মুক্তধারা, পৃ. ১৫
২. ঐ পৃ. ৬৩-৬৪

দস্যুর দলে লেখাই আমার নাম
জয় করে নেব তোমারে এবার
হয়েছি রাতের ঘোড় সওয়ার
পথের পরেই কাটবে সকল যাম।[১]

রাতশেষে ভোরের মন্দিরা শোনেন কবি—

নিয়মের রীতি এই রাতশেষে ভোরের মন্দিরা
পিশাচেরা গর্ত নেয় গান গায় গানের পাখিরা।

(নিয়মের রীতি)[২]

অপশাসনকে, বুলেটকে ভয় পাননা কবি—

'বুলেট শুধু
রক্ত ঝরাতে
পারে
প্রাণ অথবা
এমন কিছুই
নয়।
তুমি কি ভেবেছ
পেয়েছি ভয় ?
যখন তোমার
গুলিটি আমার
বুকে লাগলো ?
মোটেই নয়।
এক ঝলকা
রক্ত ঝরলো
শুধু
নিমেষে হলো
পৃথিবীর রঙ
ধু ধু।
প্রাণ সেতো নয়

১. মানচিত্র, পৃ. ১১
২. ঐ পৃ. ৬৭

ধূলির সম,
ঝরলোনা তাই ;
পলকে ছড়ালো
শত জনতায়
কী দুর্জয় !

(এপিটাফ)[১]

এই শত জনতার মধ্যে কবি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সংগ্রামী কবির 'হাড়' কবিতায় দেখি—

ঝরেছে সকল রক্ত। এখন কখানা হাড়ে
ঝকঝক করে তীব্র তীক্ষ্ণ বর্শা-ফলা :
নতুন দস্যু আসে যদি, দেশ দেবোনা তারে
ইস্পাত-হাড়ে গড়েছি বজ্র বহ্নি-জ্বালা ॥[২]

'স্বাধীনতা' কবিতাটির মধ্যে হঠাৎ শেষ হয়ে যাবার চমক আছে, এ হিসেবে শৈল্পিক মূল্য এটির অসাধারণ। 'এই স্বাধীনতা, স্বপ্নের মতো শুনেছি তোমার নাম !'

'চারাগাছ' কবিতাটিও অনবদ্য। সুকান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের কবি একঝুড়ি চারাগাছ দেখছেন, কচি সবুজ পাতা, সকালের চিকচিকে শিশির ভেজা .... আর—

তারা বাড়বে পলে পলে
বিন্দু-বিন্দু-অণু-অণু করে !
তারপর, একদিন ভোরের বেলায় ঘুম ভাঙলে
উঠে গিয়ে দেখবো এক সম্পন্ন বাগান।[৩]

স্বাধীনতার সংজ্ঞা আবার দেখতে পাই কবির অপূর্ব সুন্দর স্বাদু রসঘন একটি কাব্যনাট্য 'জুলায়খা'তে, ইউসুফের জবানবন্দীতে

—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিকট অন্য
সব অর্থহীন ; অর্থহীন বাঁচা জীবন যৌবন
অর্থহীন এ জগৎ, অর্থহীন প্রেম-অশ্রু জল।[৪]

১. মানচিত্র, পৃ. ৭৩
২. ঐ পৃ. ৭৫
৩. ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ, পৃ. ৩৬
৪. ঐ ঐ পৃ. ৫৫

দৃঢ় প্রত্যয়ে ব্যক্ত কবির প্রতিজ্ঞা—

তাই অন্ধ বন্যার ধারায় ফোয়ারার প্রায়
উঠেছি উপরে এক নিমেষেই পা'য়ের তলায়
খুঁজে পেতে চাই,
সূর্য জ্বালার সোপান ॥

(সূর্য জ্বালার সোপান)[১]

অদ্বিতীয় তমসা দেখেও কবির আশা, কবির স্বপ্ন—

.. যার প্রান্তে স্তরে স্তরে, উৎকীর্ণ প্রাচীন গাথায়
সূর্য জ্বালার সোপান, দুর্গম শৈলের
অতল পাতাল নিচে আবর্ত সঙ্কুল।

হে ঈগল ক্লান্ত হয়ো নাকো হে ঈগল
থাকো স্বপ্ন নিয়ে, আকাশের দুর্বিপাক
কেটে যাবে কখনো কখনো, অগণন তারা
ছায়াপথ দেখা দেবে, তখন উড়বে তুমি
নিচে বসুন্ধরা ভূমি আম্রকুঞ্জ বনরাজি নীলা।

(অদ্বিতীয় তমসায়)[২]

ঝড়কেও ভয় নেই আমাদের কবির—

ঝড়ের নিশানা দেখে বিপুল উল্লাসে মত্ত আমি হয়ে
আজব জাহাজী : দুরু দুরু বুকে চেয়ে আছি জানালার
ফাঁকে ঘাড় তুলে, কখন তীব্র বেগে মেঘের সম্ভার
চিড়ে যাবে, প্রলয়ের শিঙাধ্বনি বাজবে ঝঞ্ঝায় :
... ...
সেই পাণ্ডুলিপিগুলি বিস্ফোরক প্রায় অতি ভয়ংকর
তার অধ্যয়নে মহা অন্ধকার চাই, ঝড় চাই ঝড়।

(ঝড় ও পাণ্ডুলিপি)[৩]

প্রেমের কবিতাতেও আলাউদ্দীন আল আজাদ সিদ্ধহস্ত, দামাল, নির্ভীক, দৃপ্ত যৌবন সম্পন্ন, সাহসী, শঙ্কাহীন। প্রেমে কবির আকাঙ্ক্ষা কী? কামনা কী তাঁর?—

১. সূর্য জ্বালার সোপান, পৃ ১৯
২. সূর্য জ্বালার সোপান, পৃ. ৫০
৩. ঐ , পৃ. ৬৬—৬৭

তোমার প্রশস্তি রচি, সুতনুকা, সেতারের মতো সাড়া দাও, সাড়া দাও
কালের কোড়ক ছিঁড়ে তুমি জন্ম নাও :
একবার চেয়ে দেখ
পৃথিবীর সব রঙ ক্রমান্বয়ে হয়ে এল ফিকে
শ্যামলী, শ্যামল কর পৃথিবীকে ॥

(শ্যামলীর প্রতি)[১]

এ যুগে, মিছিলে দেখা হয় প্রেমিকের—

১. পাবোই ফিরে
ফিরে পাবোই
তোমার ঠিকানা
পাবো মিছিলে।

(শিলালিপি)[২]

অথবা,
মিছিলে নিশান নিয়ে দেখছেন প্রিয়ার প্রাণপ্রিয় হাসি—

তুমি
তোমার দেহের নরম কাঠামো ভেঙে তুমিও নেমে এসেছো।
রোদে ঝলমল আকাশ উতল, তোমার হাতের নিশান কাঁপে
তোমার মেদুর কপোল উজল নতুন রূপে
বেদনা সেথায় চোখের আড়াল দাঁড়ায় চুপে
মুখের সোনায় আগুন জ্বালায় বুকের তাপে ॥

(হাসি)[৩]

নানান বাধার মধ্যে দিয়ে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাবেন কবি, প্রেয়সীর সঙ্গে একই সংগ্রাম কঠিন পথে—

থাক সবি থাক, ধরেছি তোমার হাত
শুধু এই জানি
শুঁকে পাই কাছে মেদুর দেহের ঘ্রাণ

১. মানচিত্র, পৃ. ৪৭
২. মানচিত্র, পৃ. ৬৪
৩. ঐ পৃ. ৫৩

চুলের বিদিশা ছুঁয়ে যায় গলাকাঁধ
ঠোঁটে জমে গান।

(যাত্রা)[১]

যৌবনের নিশান উড়বে ঠিকই। বিশ্রুত বীরপুরুষকে সুন্দর হতে হবে, প্রিয়তমা সঙ্গিনী রমণী নির্ভয়ে হবে নব-জাতকের জননী—

নির্বাত মরা প্রান্তরে মিলাও হাত
শস্যের খামার আনবে সন্নিপাত।

(ওড়াও নিশান যৌবনের)[২]

আলাউদ্দীন আল আজাদ কুশলী কবি। বাণীর আলপনা রচনায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিদেশী শব্দ সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করেছেন, পড়লে হোঁচট খেতে হয় না। উদাহরণ—নটি, দুই আফসোস, জুলায়খা, রাত্রি ও নগরী প্রভৃতি কবিতা। তাঁর গ্যেটে, হেইনরিখ হাইনে, ষ্টোফান গেয়র্গ, হুগোফন হফমান্স থাল, অগষ্ট ষ্ট্রাম, রাইনর মারিয়া রিল্‌কে, গটফ্রিড বেন, গেয়গ ট্রাফ্‌ল, গেয়র্গ হাইম, বের্টল্ট ব্রেখট ও ইনগেবার্ন বাখম্যান এর অনুবাদ কবিতাগুলিও ভাষায় লালিত্যে, মূলভাব রক্ষায় ও স্বাদুতায় অনন্য

আজাদের সাধনা মহৎ কিছু, বিরাট কিছু, সুন্দর কিছু, আমাদের এই জগতে রেখে যাবার সাধনা, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে এগিয়ে দেবার সাধনা, সমস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দামামা তাঁর কাব্যে, দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যয়পূর্ণ। মৃত্যুও তাই কবিকে স্তব্ধ করতে, দমিয়ে রাখতে পারে না। মৃত্যু সুন্দরদীপ্ত, উজ্জ্বলদৃপ্ত, মহান গৌরবময় হয়ে ধরা দেয় কবির কাছে। একুশের অমর শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাঁর কবিতা বাঙলা ভাষার সংগ্রামের-ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে—

এ কোন মৃত্যু ? কেউকি দেখেছ মৃত্যু এমন
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমের দেয় কবিতার কাল ?
ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
.. দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম

১. সূর্য জ্বালার সোপান, পৃ. ১১
২. ঐ পৃ. ২৩

এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর॥

(স্মৃতিস্তম্ভ)[১]

॥ ৬ ॥ তালিম হোসেনের জন্ম রাজশাহী জেলার চাকরাইল গ্রামে। কৃষ্ণনগর থেকে B. A. পাশ করেন। তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত বিভাগ পূর্বোত্তর কাল থেকেই। মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক 'মাহেনও'এর সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন।

তিনি সক্রিয়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফররুখ আহমদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, ফররুখ যেখানে অতীতচারী হতে চেয়েছেন, চেয়েছেন ইসলামী পুনর্জাগরণ, সেখানে তুলনামূলকভাবে তালিম হোসেন একান্তভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের কবি। কবির নয়া জিন্দেগী অর্থাৎ বর্তমান হাল পাকিস্তান :

মনহুস দিন মুর্দারাতের
অভিশাপ-জরা-জীর্ণ খাব
টুটে ফুটে এসো, নতুন দিনের
নয়া জিন্দেগী-ইনকিলাব।
জাগাও উদয়-নভ-দিগন্তে
সুবে উম্মীদ পাকিস্তান।

(নয়া জিন্দেগী, দিশারী)[২]

তালিম হোসেনের কাব্যগ্রন্থ দুটি—'দিশারী' (১৯৫৬) ও 'শাহীন' (১৯৬২)। দিশারীতে আছে পুনর্জাগরণের সঙ্গীত প্রবাহ। কবি এখানে রূপ দিতে গিয়েছেন জাতীয়তাবোধের আদর্শ ও ভাবকল্পকে। ইসলামের অন্তর্নিহিত সত্য সম্পর্কে কবি বলেছেন—

যাহার জ্যোতিতে রোশনাই হলো মানুষের অন্তর
সেই মানবতা-দীপ জেলে করো উজালা আপন ঘর।
কেতাব হইতে শুধু 'ইসলাম' শব্দটি নিয়ো নাকো,

১. মানচিত্র, পৃ. ৭১—৭২
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ

মুসলিম তুমি কভু নও যদি অমানুষ হয়ে থাকো।

সবার উপরে আল্লারে জানে, মানুষেরে জানে ভাই ;
মানুষের হামদর্দীতে তার অদেয় কিছুই নাই।
মানুষ কোথাও সহিবে না কেহ অজ্ঞান অনাহার
এই ইসলাম এই তো ধর্ম নিয়োগ মানবতার।
এই সাম্যের এই শান্তির ওয়াদা আবার দানো
নতুন করিয়া মুসলিম হও, আবার ঈমান আনো।
(আবার ঈমান আনো : দিশারী)[১]

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, কবিতার কলাকৃতিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা ও পরিবেশনায় তালিম হোসেন একান্ত রকম নিষ্প্রভ। আজকাল কবিতার মধ্যে এরকম বিশুদ্ধ জ্ঞান বিতরণ কবির পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল। অথচ একই পথের পথিক হয়ে ফররুখ আহমদ কত উজ্জ্বল, কত স্বতন্ত্র।

তালিম হোসেন নতুন কিছু দিতে পারেননি তাঁর 'দিশারী' কাব্যগ্রন্থে।

সেদিক দিয়ে 'শাহীন' কাব্যে কিছুটা বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এতে সঙ্কলিত সাতটি সনেটে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এগুলোর উপাদান হিসেবে প্রকৃতি এবং প্রেমও গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তালিম বুঝি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি অথবা, কবিতার বিবেক যে পথে চালনা করতে চেয়েছে তালিমকে, তিনি তার নির্দেশ না মেনে আপন পুরাণো পথেই প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছেন, বলেছেন--

মাটি পাথর আর গাছপালা,
কাঁটাবন আর ফুলবন—
বন্ধুর—সমতল ভেদে
পথ খোঁজে নাকো মোর মন।
আমার জীবনী প্রাণ যাচে
তওহীদ ঝর্ণার কাছে :
তাই সে ধারার রেখা ধ'রে
আমি পথ চলি অনুখন,

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৯১-৯২

সেই সুধা নদী কূলে কূলে
খুঁজি জীবনের সবধন

(পটভূমি : দিশারী)[১]

দিশারী কাব্যগ্রন্থের এই সুরটি তাই লেগেই রয়েছে 'শাহীন' এ। কাজেই নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ এবং আত্মোপলব্ধিজাত শিল্পরসের পরিচয়ের রঙ বড় ফিকা বলেই মনে হয়। বৃথাই কবি দূর বিসর্পিত উন্মুক্ত কোন প্রান্তরে তাঁর শিল্প চেতনাকে সব সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে প্রসারের পথ খুঁজতে গিয়েছেন।

তালিম হোসেনের কবিতা এমন কিছু চমকপ্রদ বা দ্যুতিদীপ্তও নয়। সাদামাটা। তিনিও চেয়েছেন আরবী ফারসী বিদেশী ভাষা, পুঁথির ভাবাকে কবিতায় প্রয়োগ করতে—যাতে মোটেই সফলতা লাভ করতে পারেননি। কতকগুলো প্রথাবদ্ধ রূপক অত্যন্ত মামুলিভাবে ব্যবহার করেছেন, যেমন কাফেলা (বোঝাতে চেয়েছেন অগ্রসরমানতা), মরুভূমি (বোঝাতে চেয়েছেন দুস্তর যাত্রা) ইত্যাদি। এগুলো কবির পক্ষে দায়সারা গোছের ব্যাপার, মৌলিকতা ও উদ্ভাবন শক্তির অভাব এবং দীনতা।

॥ ৭ ॥ সানাউল হক রোম্যান্টিক মানসের কবি, চিত্রধর্মী তাঁর মেজাজ, কিন্তু রচনা ও প্রবণতার দিক থেকে বেশ কিছু ঢিলেঢালা, অসংলগ্নতা তাঁর সহজাত।

অথচ সানাউল হক একালের কবি, স্বভাবে ও সাজাত্যে যুগ ও জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থেকে পারেননি, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃশ্যাবলী চোখের সামনে যেমন দেখেছেন, এঁকেছেন কিন্তু নৈর্ব্যক্তিকভাবে নয়, তিনি কিছুটা তৎপর, উৎসুক, সক্রিয়। সমাজবাদী কাব্যধারা বলে যা আমরা অভিহিত করতে পারি, তারই সঙ্গে সানাউল হকের যোগ বিদ্যমান।

সানাউল হকের প্রকাশিত কবিতার বইগুলি; 'নদী ও মানুষের কবিতা' (১৩৬৩), 'সূর্য অন্যতর' (১৩৬৯), 'সম্ভবা অনন্যা' (১৩৬৯) ও 'বিচূর্ণ আর্শিতে'।

গীতি কবিতার যে মূর্চ্ছনা, আবেগ, এষণা, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির আনন্দ বিষাদ, হর্ষ বেদনা, সানাউল হকের কবিতায় তুলিকার আঁচড়ে তা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। দৃশ্যাবলী দেখায়, আঁকায় তাঁর কোন ক্লান্তি নেই। চিত্রের পর চিত্র এসেছে, ভেসেছে, রূপলাভ করেছে। এদিক দিয়ে কিছুটা বা জীবনানন্দের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করা যেতে পারে, যদিও জীবনানন্দ যতখানি সূক্ষ্ম, দক্ষ, সচেতন শিল্পধর্মী কবি, সানাউল হক ততখানি হতে পারেননি। কিন্তু পূর্ববঙ্গের নিসর্গচেতনা রোম্যান্টিক ভাবকল্পে বিধৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়, যার অভাব

আধুনিক কবিতা পৃ. ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ।

অন্য অনেক কবির কাব্যক্ষেত্রে একান্তভাবে দুর্লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সানাউল হককে পূর্ববঙ্গের কবিদের মধ্যে অনন্য বললেই হয়। সৈয়দ আলী আহসান অপরূপ সুর-ঝঙ্কারে, লিরিকে পূর্ববঙ্গের নিসর্গদৃশ্য বর্ণনা করেছেন, কিন্তু দুজনের মধ্যে মৌল তফাৎ এই যে, সৈয়দ আলি আহসান নৈর্ব্যক্তিক, আত্মকেন্দ্রিক, দূরদিগন্ত বিহারী, সমাজসম্পৃক্ত হবার দিকে কোন ঝোঁক নেই, শুধু কথার নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রকৃতিকে এঁকেছেন, জীবনের সঙ্গে তার কোন যোগসূত্র তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি কখনও। কাজেই সৈয়দ আলী আহসান অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এর বিপরীত কেন্দ্রবিন্দুর কবি সানাউল হক। তাঁর কাবতায় আছে নামতার ছড়া, ব্যাহত বেড়াল, ইঁদুরে আবেগ, হাভাতে গ্রামের ছবি, রাত্রির বেড়াল, কালো পেঁচার সারথি, হাড়ের আঁশের উপত্যকা, রোহিত, চিতল, খলসের নৃত্য দোলা শাড়ির ঝলকে, কাশফুল, গো বাথান, জেলেপাড়া বুড়ো কুজো বাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেশজ রীতি ও ঐতিহ্যের সাদামাটা আটপৌরে সহজ ব্যবহার সানাউল হককে একটি অন্যতর বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। তাঁর কবিতা পড়তে আমাদের ভাল লাগে, অখ্যাত গ্রামের ছোটখাট ছবি ভেসে উঠে মন উন্মন হয়, জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পাই, আমরা এক হিসেবে হারিয়ে যাই না আধুনিক সমাজ ও চিন্তাধারা হতে।

সানাউল হক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে, শব্দ যোজনায়, মিল যতি ব্যবহারে, ছন্দ প্রয়োগে মনোযোগী নন তেমন একটা। স্বেচ্ছাকৃত কিনা, কবির এ পদচারণা আধুনিক কাব্য জগতে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিনা, এখনো এ নিয়ে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কোন কোন সমালোচক তাঁর এবম্বিধ মানস প্রবণতা দেখে মন্তব্য করেছেন যে তিনি চারণধর্মী।[১] এই মন্তব্যের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমালোচক আরও বলতে চেয়েছেন যে আধুনিক কবিতা কথা বলবে কম, কিন্তু বোঝাবে বেশি, বিচ্ছুরণ-শীলতাই আধুনিক কবিতার আসল স্বভাব। আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বিশ্লেষণটি অত্যন্ত সত্য ও সুন্দর। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও সানাউল হকের অমনোযোগিতা, অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্যতা স্বীকার করে নিয়েও বলতে বাধা নেই যে তিনি একজন বড়দরের কবি, চিত্রশিল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত, নিপুণতা এক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত, সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর কাব্যধারা একটি সুন্দর, সহজ, সাবলীল আল্পনা এঁকে দিয়েছে, যার আবেদন রসপিপাসু মানুষের মনে আলোকিত আলোড়ন জাগাবে।

মানুষ ও প্রকৃতি প্রেমে আচ্ছন্ন সানাউল হকের কবিদৃষ্টি তাঁর উল্লিখিত সবগুলি

---

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৮৮

কাব্যের ভেতরেই ফল্গুধারার মত প্রবাহিত। এদিক দিয়ে চেতনাগত দিক থেকে তাঁর কোন বিবর্তন হয়নি, যদিও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ "সূর্য অন্যতর" এবং পরবর্তী গ্রন্থ 'বিচূর্ণ আর্শী'তে ভাব প্রকাশের অধিকতর দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

'নদী ও মানুষের' কবিতায় একালের কবিদের রোম্যান্টিক ভাবমানসে যে দ্বন্দ্ব, সানাউল হকেও তার আভাস স্পষ্ট। জীবনের সহজ স্বাভাবিক সরল রূপ আজ অদৃশ্য,—তেমন মানুষ কোথায়? নারীর হৃদয় নিয়ে যে বাঁচে?

তেমন মানুষ কোথাও কি আছে
হৃদয় নিয়ে বাঁচে?
প্রাণের প্রচুর ধারা
হেঁটে-হেঁটে অলিগলি এ পাড়া ও পাড়া
খুঁজে ফিরে অনলস চড়াই উৎরাই
কোথায় আগুন জ্বলে, কোথায় ভিটায় কার ছাই।
কোথায় মড়ক নামে শকুনীর উষর ডানায়,
পিপাসা কাতর কে সে তৃষ্ণার জলটুকু চায়।

(নদী ও মানুষের কাবা)[1]

পিপাসাকাতর তৃষ্ণার জলটুকু চাওয়াটাই আজকের দিনে স্বাভাবিক। মড়ক নামছে শকুনীর উষর ডানায়।

কিন্তু একটা জিনিস সানাউল হকের কাব্যগ্রন্থেও লক্ষ্য করার। তিনিও দ্বন্দ্বের সমস্যার সমাধানে আসতে চাননি বা সে চেষ্টাও করেননি। কোন বিশেষ কিছু, বড় কিছু চাননি। বলেছেন,

সামান্য মেয়ের মন আমার অন্বেষা।
মন আর ধান, কাঁঠাল পাতার ছায়া,
আলস্য জড়ানো কিছু পুঁথি পড়া নেশা
ভুর ভুর কদম্বের সুরভিত মায়া

(সম্ভবা অনন্যা)[2]

আলস্য জড়ানো পুঁথি পড়ার নেশা ও ভুর ভুর কদম্বের সুরভিত মায়া তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

'সূর্য অন্যতর' কাব্যগ্রন্থে আর একটি বৈশিষ্ট্য একটি নদীর প্রভাব, সে নদী

১. আধুনিক কবিতা পৃ. সাতচল্লিশ।
২. ঐ , পৃ. আটচল্লিশ

তিতাস, কবি চেতনার শিরা উপশিরায় এর প্রভাব, কখনো মনে হয় অচেনা, আবার কখনো সে নদী প্রেয়সীর রূপকল্পে অঙ্কিত—

১. একটি অনতি নদী যার দুই তীরে
দীঘল বনের ছায়া রূপসীর চোখের কাজল
হয়ে ঝরে। এই নদী আকাশীর চর ঘুরে ফিরে
এসে যেই থামে, মনে হয় যেন চেনা নয়।

(তিতাস—পূর্বরাগ)[১]

২. শীতল পাটির মত ঠিক আমাদের প্রিয়া নদী
রূপোলি কেশের গুচ্ছ সুচিক্কণ ঢেউ ঢেউ যার—
তনুপূর্ণা কতো ম্লান উন্মীলিত ভাঁজে ভাঁজে তার।
ডুব দাও গহীন বুকের স্বাদ পেতে চাও যদি।"

(তিতাস—পূর্বরাগ)[২]

এখানেই ঐ একটিই বক্তব্য, কবি নদীর শীতলপাটি শান্ত নিস্তরঙ্গ রূপই দেখেছেন, তিতাসের ঝড় ওঠা দেখেননি, আঁকেননি।

এই নদী যে তাঁর মর্মে বিধৃত, বিচূর্ণ আর্শীতেও তা' দেখা যায়, নদী সেখানেও কবির চেতনা সমাচ্ছন্ন করেছে :

আমি যেন নদী এক
আত্মলীন, ভাদ্রের সুভদ্র রূপ
অবারিত আবেগের
পূর্ণছবি : রূপোলি স্বরূপ

(নদী)[৩]

সম্ভব অনন্যায় কবি অকৃপণভাবে তাঁর তুলিকায় নানান দৃশ্যের অনুভববেদ্য আল্পনা এঁকেছেন। রোম্যান্টিক কবি চেয়েছেন দেশ ও বিদেশের ভৌগোলিক বিভাজন দূর হয়ে যাক, শান্তি ও মিলনের সুর ঝঙ্কৃত হোক—

.... পূর্ণগর্ভা মাধুরিমা
ছড়ায় সঙ্কেত—কিছু আগামীর সেকি ?
পৃথিবীরে আরো ভাল লাগে : তুমি ছিলে

---

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. আটচল্লিশ
২. ঐ পৃ. ঐ
৩. ঐ পৃ. ঊনপঞ্চাশ

আজো আছ—সভ্যতার অজস্র ফসলে
এক মুঠি শীষ, প্রকৃতি ছবির ভিড়ে
ভ্রূলতাবিন্যাসী। জানি প্রকাণ্ড নিখিলে
কত ক্ষুদ্র ক্ষীণ তুমি। কী শান্তি আঁচলে :
ভাল লাগা—বেঁচে থাকা আসে ফিরে ফিরে।

(সম্ভবা অনন্যা)[১]

'সূর্য অন্তর' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়, 'তিতাসের বিভিন্ন পর্যায়ে'র বর্ণনায় এবং 'সম্ভব অনন্যা' কাব্যগ্রন্থে কবির অজস্র চিত্রকল্পের কিছু আস্বাদ গ্রহণ করা যেতে পারে—

১. নকসী কাটা সরঙাই নাও তরতর নিয়ে যাত্রী দল
গ্রাম ছেড়ে গঞ্জঘাটে কবুতর যেন অবিকল।"

(কত নৌকা আহা : সূর্য অন্তর)[২]

২. যত নৌকা, তত পাল আহা! সাদা লাল বেগুনি গেরুয়া

(পাল বর্ণালী : সূর্য অন্তর)[৩]

তিতাসের 'সলিল সমাচার' হল—

২. অতল গহীন জল টলমল টলমল শিশির শীতল স্ফটিক কোমল
গেরুয়া ঘোলাটে জল বাতাবী সবুজ, কাশ সাদা,
মেঘকালো, আসমানী নীল।"

(সলিল সমাচার : সূর্য অন্তর)[৪]

৪. হাভাতে গ্রামের ছবি, তুমি তিথিব্রতা
বিদিশা ঘরের কান্না—কী নিই শপথ
দুর্ভাগা দুর্ভোগ কিছু ফিরে ফিরে পিছু পিছু।
মোহনায় শুনলাম আহ্বান ত্রিস্রোতা
কান্না বাষ্প ভরা : জেগে জেগে ঢুঁড়ি পথ
জ্যোতির্লক্ষ্মী আভা কারো পাইয়াছি কিছু।[৫]

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৯৯
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. আটচল্লিশ
৩. ঐ ঐ পৃ. আটচল্লিশ
৪ ঐ ঐ পৃ. আটচল্লিশ
৫ আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৮৫

৫. অন্ধকার : রাত্রির বেড়াল কালো
পেঁচার সারথী। অতঃপর যদি
ঘুমন্ত পৃথিবী, ফুরফুর পাখি,
এবং অম্বিষ্ট সুপর্ণা : হাড়ের আঁশের উপত্যকা
কে দেয় রাঙিয়ে বার্নিশে জেল্লায় —
সেকি সূর্য-রঙ-কারিগর,
চর চোর জুয়াখোর কি অসভ্য কুৎসিত—
অভিজিৎ একজন,
সেকি অন্যতর ভোরের প্রতীক ?[১]

দৃষ্টান্ত বাড়ালেই বাড়বে। সানাউল হকের কবিতা মনের তন্ত্রীতে কেমন একটা অজানা সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগায়। কবির কবিতা লেখার সার্থকতাই এইখানে।

সানাউল হক জীবনের দ্বন্দ্ব নিরসনের পথ খুঁজতে চাননি। কিন্তু তার এমন একটি কবিতার সন্ধান পেয়েছি, যেখানে মাটি মানুষ সংসার সমাজ সম্পর্কে তিনি যে দায়িত্বশীল, তারও যে কর্তব্য আছে, তিনিও যে এগিয়ে আসতে চান, সেই ভাব ব্যক্ত করেছেন। কবিতাটির নাম 'উচ্চস্বরে।' শান্ত নির্বিরোধ স্বভাবের মৃদুভাষী কবির জ্বালা—

একটি কবিতা লিখতে বলেছো :
মুদ্রা ছড়ানো আজকের দিনে
ছুঁড়ল ত বাণ হৃদয় লক্ষ্য
সহস্র মুদ্রা কবির মিলবে কি ?
যখন তূর্য, অলীক স্বপ্নে পশে না বক্ষে।

তাই কবির বক্তব্য—

তোমাকে দেবার নেইতো দিনার
খোঁপায় গোঁজার পারুল কোথায়,
হাড় ব্যবসায় মাঠে ঝলসায়
তোমার চরণে ছন্দ জাগানো
সহজ নয়, কবিতা জাগো মৃত্যুর প্রচ্ছায়।[২]

কবির চেতনায় নতুন কোন দিগন্ত কি উদ্ভাসিত হতে যাচ্ছে ? জীবনের স্বপ্ন

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ২৮৫-২৮৬
২. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৭৫-৭৬

দিদৃক্ষার সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের সম্মিলন হতে চলেছে কি? সেটি সম্ভব হলে হৃদয়বান সংবেদনশীল চিত্তের কবি সানাউল হক অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—বাঙ্‌লা কাব্য আন্দোলনে তার স্থান অনেক, অনেক উপরে করে নেবেন। আমরা কবি সানাউল হকের সেই উত্তরণ দেখতে উৎসুক।

॥ ৮ ॥ সৈয়দ আলী আহসান অভিজাত সংস্কৃতিসম্পন্ন বিদগ্ধমনা কবি, মনন ধর্মী, স্মৃতি-সঞ্চারী, নৈর্ব্যক্তিক, বিমূর্তমানস, ফলাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে নির্বিকার। পূর্ব-বঙ্গের কাব্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক বললে বাড়িয়ে বলা হবে না, যদিও এই ধারার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা ও বিতর্কের অবসর ও অবকাশ অবশ্যই আছে।

জন্ম যশোর জেলায় আলোকদিয়া গ্রামে। ১৯৪৭ সালের পর সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। পরে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা ভাষার অধ্যক্ষ হন। তিনি বাঙ্‌লা একাডেমীর পরিচালকের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যক্ষ।

সৈয়দ আলী আহসানের যাত্রারম্ভ 'চাহার দরবেশ'-এর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কবি অতি শীঘ্রই বুঝতে পেরেছেন পুঁথির কাব্যে তাঁর কবিমানস তৃপ্তি লাভ করতে পারে না, স্ফূর্ত হয়ে উঠবে না।

সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যে তার কবি প্রকৃতির দিক পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। একবার নয়, বারবার এটি দেখা গেছে। চাহার দরবেশে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে যার শুরু হয়েছিল, সেটা ছিন্ন করে 'অনেক আকাশ' এ অন্ত অন্বেষায় তাকে অধিষ্ট দেখি, কিন্তু সেখানেও কবি স্বস্তি, স্থিতি ও স্থায়িত্ব খুঁজে পেলেন না—এল 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' (১৩৬৯)। এখানে কবিমানস বিকাশের মহিমায় উজ্জ্বল, কিন্তু আবার এরপর 'সহসা সচকিত' তে (১৩৭৩) আবেগে অন্তর্মুখীন। তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'উচ্চারণ' (১৯৬৮) এ রবীন্দ্রনাথের লিপিকার মত গদ্যের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। উচ্চারণ একান্ত ব্যক্তি নির্ভর, তাঁর নিজস্ব অন্তর্লীন অনুভূতির প্রকাশ।

আধুনিক সমস্যা বিজড়িত নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত সঙ্কুল অস্থির বিপন্ন বিপর্যস্ত বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত সমাজ জীবনের সঙ্গে তাঁর কবিতার কোন মৌল যোগসূত্র রচিত হয়নি। প্রেম ও প্রকৃতি ঘিরে তাঁর উচ্ছ্বাস ও আবেগ একান্ত ব্যক্তি নির্ভর।

অভিজাত মানস প্রবণতার সাহায্যে আশ্চর্যভাবে যুগ সঙ্কটকে তিনি অতিক্রম করতে চেয়েছেন। নির্বিকল্প বিশুদ্ধ শিল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, 'শিল্পের জন্য শিল্প' তাঁর সম্পর্কে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কবি যেন দায়মুক্ত, কবিতার সমস্ত উপাদানই কবির ইচ্ছার অধীন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাঁর কাছে একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে নিজস্ব অধিকার নিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকতেই চেয়েছেন আলী আহসান। অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে

অবস্থিত হয়েই বড় স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছেন। একালের কবিতা কোন কবিকে এরকম মুক্তি দেয় না, দায় ও দায়িত্ব বোধে পীড়িত করে, কবিকে যন্ত্রণাকাতর করে তোলে। অথচ সৈয়দ আলী আহসান শক্তিমান কবি, পরিশীলিত, বুদ্ধি দীপ্ত। শিল্প সম্পর্কে সম্যক সচেতন।

'অনেক আকাশ' কাব্যগ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসান কবি হিসেবে স্বস্তি পাননি—অনেক প্রশ্ন, অনেক দায় এসে গেছে, আত্ম সমীক্ষার আয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে কবিতাগুলি একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি আবেগ ও বাধা নিষেধের দ্বন্দ্ব দায় সমাকীর্ণ। নিজের সৃষ্ট বাধা নিজেই অতিক্রম করতে পারছেন না। রক্তিম আবেগ, ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতি ও উত্তপ্ত চেতনা কবির—

যখন তোমার উপর আমার দেহভার অবনমিত হয়
তুমি শিহরিত হও আমাকে দেখে
তুমি একান্ত আমার
যেমন চক্ষু একান্ত ভাবে মুখ মণ্ডলের
তুমি মৃত্যুর পথে নেমে যাবে
আমার গান থাকবে তোমার ওষ্ঠে

(তোমাকে ধরা যায় না : অনেক আকাশ)[১]

ওই মৃত্যুর প্রতীকে সৈয়দ আলী আহসান কী বলতে চেয়েছেন? যৌন সম্ভোগকে কি তিনি চিরন্তন মৃত্যুর প্রতীকে দেখেছেন? অথবা ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ও উত্তপ্ত চেতনার পরিতৃপ্তি—মৃত্যুর প্রতীকে বর্ণনা করা হয়েছে, যে মৃত্যু জীবনের অপর নাম? কবি ইন্দ্রিয়-বিহ্বল অনেক ক্ষেত্রে (উন্মুখ দেহের প্রাণ, তোমার মৃত্যুর শেষে, নায়িকা, তোমার দেহের তীরে, প্যারিসের চিঠি প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ্য)। এখানেও যৌবনানুভূতিকে নৈতিকতার পোষণে প্রথাবদ্ধ দায়িত্বে পরিস্রুত করা হয়েছে। যৌন আনন্দকে অনাবিল করে তোলেননি কবি। কোথাও কোথাও এসেছে স্বসৃষ্ট নৈতিক বিধি বিধান, কোথাও বা আছে মনবিকলনগত জরায়ণের আতিশয্য। মোট কথা কবি স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত নন। কবি অনেকখানি যান্ত্রিক, জীবনের সাবলীল সুর কেটে গেছে, অনুপস্থিতই রয়ে গেছে।

অপর পক্ষে, অন্য দিগন্তে বিহার করে 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যে সৈয়দ আলী আহসান অপরূপ স্ফূর্তি লাভ করেছেন, নিজের পথ পেয়ে গেছেন, আশ্চর্য সজীব সুন্দর সাবলীল চিত্র অঙ্কন করেছেন স্বদেশের শ্যামলিমার। নিসর্গ চেতনা প্রেম ও প্রকৃতি ঘিরে আবর্তিত, ধ্বনি ও সুর মূর্চ্ছনায় অনবদ্য, উচ্চকিত, বলতে পারা যায়, 'অনেক আকাশ' এর জৈবিক আবেগ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যে প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে স্বস্তি পেয়েছে, প্রকৃতি ও প্রেমের স্বাদু মিলন ঘটেছে; দেহ থেকে হৃদয়ে, চেতনায় অনুভূতিতে কবির প্রেম প্রসারিত হয়েছে :

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. পঁয়ত্রিশ

যখন অনেক কথা বলা শেষ হ'ল
যখন সমুদ্র-স্বাদে সকালের রোদ গ'লে গেল
যখন তরঙ্গ দোলা একজন অশ্বারোহী যেন—
নীল আর সাদা সবুজের রঙ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রসারিত অতলান্ত ক্লান্তিহীন বিপুল উল্লাসে
হৃদয় নির্জন ক'রে এ মুহূর্তে আমার ডেকেছে
তখন তোমার চিন্তা সঙ্গীহীন পাখীরডানায়
সমুদ্রের জলে ভিজে অকস্মাৎ আমারে জাগালো।

(যখন অনেক কথা বলা শেষ হ'ল)[১]

'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থে আমার পূর্ববাঙলা শীর্ষক তিনটি কবিতা বহু আলোচিত। বিষয়, বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গীর সুন্দর সুষ্ঠু সংগত যোগাযোগ ঘটেছে। খণ্ড খণ্ড চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে রূপকল্প গড়ে তোলা হয়েছে, পূর্ব বাঙলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে, কবি দেশ সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ধারণা বিধৃত করেছেন, দেশের মাটি ও মানুষকে দেখেছেন, তারা যে ভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে, ভালবাসে সেই সম্পর্কে উপলব্ধি হয়েছে তাঁর, রস সম্পৃক্ত উজ্জ্বল, সচ্ছল প্রবাহে উৎসারিত কবিতাত্রয়।

'সহসা সকচিত' গ্রন্থে কবি আবার অন্তর্মুখী। একটা আবেগ সঞ্চরমান নাম-হীন কবিতাগুলির মধ্যে বেদনা, পরিতৃপ্তি, সংশয়, বিষাদ বিচিত্রবর্ণের সমারোহ কিন্তু এখানেও ব্যক্তি নির্ভর।

১. বক্ষে তোমার আশ্রয় পেয়ে
যখন সহসা ভূকম্পন
তখন কামনা উন্মুখ করে
কবিতা লেখার আকিঞ্চন।

(সহসা সচকিত —১)[২]

হৃদয়কে কভু নয়নে অথবা দেহে,
স্নায়ুভাবে কভু বিচলিত সত্তায়
উন্মুখ করে ভেবেছি কাউকে দেব
কিন্তু তখন সূর্যের তাপে হঠাৎ আশঙ্কায়
সব হৃদয় সচকিত হ'য়ে সহসা বিলীন হল।

সহসা সচকিত—১)[৩]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. সাঁইত্রিশ
২. ঐ ঐ
৩. ঐ ঐ

৩. তখন একটি কবিতা তো নয়,
যখন রক্তে আকুল বিনয়—
দেহের সূর্যে রাজ্য জয়ের
মহাকাব্যের একটি ধ্যান
(সহসা সচকিত—২৯)[১]

তাঁর অপর কাব্য উচ্চারণে গদ্য আঙ্গিকে রয়েছে নিজস্ব জীবন দর্শন, জীবন জিজ্ঞাসা। বলা বাহুল্য পাঠককে তাই উদ্দীপ্ত করতে পারে না। পাঠক শুধু কবির ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। এগুলো সঠিক কবিতাও হয়ে উঠেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য সব কবিতাই গদ্য ভঙ্গীতে নয়। যেখানে তা পরিহার করেছেন, সেখানেই কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সহসা সচকিত'র চাপ পড়েছে।

সমকালীন জীবনের কোন সমস্যা সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় নেই। 'উচ্চারণ' কাব্যগ্রন্থে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা—"আমার চিন্তায় বর্তমান বলে কোন বস্তু নেই" (উচ্চারণ-৭), কবি যে নিজস্ব ভাবরাজ্যে বিচরণশীল তা স্থান কাল নিরপেক্ষ।

সৈয়দ আলী আহসান শিল্প সমৃদ্ধ বিশেষ উঁচু দরের কবি বলেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট অভিযোগ, যুগজীবন ও জাতির সমস্যাকে বর্তমানের কোন কবির পক্ষেই কোন ভাবেই কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে নিমগ্ন থাকার মত সময় দূর হয়ে গেছে, প্রতিটি মুহূর্ত এখন সাংঘাতিক রকম দায়ী, মানুষ কবির কাছে আরো অনেক বেশি কিছু দাবী করে, কবির আসন তখনই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী হয়, যখন বিমূর্ত ভাবাবেগ পরিহার করে ধূলিমাটিতে নেমে আসেন কবি। রবীন্দ্রনাথ কম অভিজাত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল যেখানে মাটি ভেঙে চাষা চাষ করছে সেখানে নেমে আসার, কৃষাণের জীবনের সরিক হতে চেয়েছেন তিনি নানা দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হয়েছেন, নির্বিকল্প, নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেননি।

আর একটি ত্রুটি। সৈয়দ আলী আহসান শিল্প সম্পর্কে যদিও সজাগ, চিত্রকল্প পরিকল্পনা ও রচনায় যদিও সিদ্ধহস্ত, কবিতা লেখার হাত যদিও মিষ্টি, যদিও স্বাদু ও সহজ সাবলীল ভঙ্গী তাঁর, তাহলেও গদ্য ছন্দেই তিনি যেন বেশি স্ফূর্ত। আগেই বলেছি, 'অনেক আকাশ' এর কবিতা যান্ত্রিক, অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ কৌশলের দিক থেকেও। কবি উক্ত গ্রন্থে ছন্দ ও মিলের উপর নির্ভর করেছেন, কিন্তু তেমন স্ফূর্তি লাভ করতে পারেননি। অথচ 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থে গদ্য কবিতায় নতুন সুরের সন্ধান পাই, রূপকল্পের আল্পনা আঁকা আছে কবিতায়, স্বচ্ছন্দভাবে যা প্রবাহিত। আবার, যখন 'সহসা সচকিত' পড়ি, তখন মামুলী ছন্দমিল উপমান উৎপ্রেক্ষা রূপক প্রভৃতির সমাবেশ দেখি। কবিকৃতিতে ছন্দের অবয়বে নতুন কোন

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. উনচল্লিশ,

পথের বা দিগন্তের সন্ধান পাই না তাঁর কবিতায়। উচ্চারণ কাব্যে আবার বিশুদ্ধ গদ্যভঙ্গী এসেছে কবিতার বৈশিষ্ট্য সেখানে প্রায়শঃ অনুপস্থিত।

সৈয়দ আলী আহসান পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ত্রিশের দশক থেকে কবিতার অঙ্গনে পথ হেঁটেছেন। বহু অভিজ্ঞ কবি—দেশ ও বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অনেক কিছু আহরণ করে তাঁর কবিমানসকে পুষ্ট করেছেন। তিনি কি বিমূর্তলোকে গজদন্ত মিনারবাসী কবি হয়ে রইবেন? মূলতঃ প্রবহমান গদ্যছন্দেই তার কবিতার অবয়ব গড়ে উঠবে? আকৃতি ও প্রকৃতিগতভাবে তাঁর অন্য কোন দিগন্তে উত্তরণ কি সম্ভব নয়? সৃষ্টির সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের সঙ্গে মাটি ও মানুষের যোগ যখন থাকে তখনই সে সৃষ্টি স্পর্দ্ধাভরে চিরায়ত হয়ে ওঠে। কবিতা সম্পর্কে এক জায়গায় কবি বলেছেন—"কবিতা তো আমার খেলা নয়, আমার অবসরের আনন্দ নয়—কবিতা আমার বেদনা ও উপলব্ধির তারা।" তাঁর বেদনা ও উপলব্ধি সকলের বেদনা ও উপলব্ধি হয়ে উঠবে যখন, তখনই তাঁর কবিতা চরম সার্থকতা লাভ করবে।

॥ ৯ ॥ মহম্মদ মাহফুজউল্লাহ অপেক্ষাকৃত নবীন কবি (জন্ম ১৯৩৬)। কিন্তু যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পথ হাঁটছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জুলেখার মন' (১৯৫৯) প্রকাশের পর যদিও তাঁকে অভিহিত করা হয়েছিল রোম্যান্টিক মানসের কবি বলে তাহলেও শুধু রোম্যান্টিসিজম তাঁর কবিতায় স্থান পায়নি।

প্রেম ও প্রকৃতি তাঁর কাছে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, এই ভাবকল্পে কোন স্থানে জীবনানন্দের ছায়াপাত হয়েছে। একটি বিষণ্ণ বেদনার সুর তাঁর কবিতায় অনুরণিত। আকাশপ্রান্তে ঢাকাপড়া কার্তিকের চাঁদ, ফ্যাকাসে চাঁদ, পৃথিবীর অন্ধকার প্রভৃতি কবিতায় উল্লিখিত। অথচ স্বপ্নে তাঁর স্বপ্নবতী হেমন্তে স্নিগ্ধ সুষমায় একা আছে, সেখানে উজ্জ্বল সোনালী ভোর, সুনীল আকাশ!

মহম্মদ মাহফুজউল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত সঙ্কটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই প্রেমের অমর অভিষেক চেয়েছেন, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে ইউসুফ জুলায়খার অমর প্রেম কাহিনীর নায়িকাকে সে কারণেই সম্ভবতঃ তিনি নামকরণে ব্যবহার করেছেন।

'জুলেখার মন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আরণ্যসন্ধ্যা বাসুদেবপুরে' কবিতাটিতে লিরিকের সুর অনুভববেদ্য। খোয়া ওঠা পথ; বুনো সন্ধ্যার রহস্য, পাতার আড়ালে মৃদু শব্দের ঢিল, নীল পাহাড়ের ফাঁকে, সরোবরে উদাসী হাওয়ার স্বর, পদ্মের কলির আকাশের আলো চাওয়া, প্রভৃতির মধ্যে নিসর্গ চেতনার সুস্পষ্ট আভাস পাই, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই যে, নিসর্গ চেতনার সঙ্গেও একটি প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতাবোধ—

কেউ নেই, তবু মনে হয় আছে কা'রা,
এই অরণ্য সন্ধ্যায় পাই সাড়া।

(জুলেখার মন)[১]

১. আধুনিক কবিতা, ১৬২

শিকার কবিতাটিও উল্লেখ্য। শুধু রোম্যান্টিক ভাবমানসের অধিকারী যে তিনি নন—তার প্রমাণ মেলে। প্রাণের ভয়ে গুলির শব্দ শুনে সঙ্গিনী চিত্রিতা হরিণী সঙ্গীকে ছেড়ে খোঁজে নির্ভয় আশ্রয়ের জন্য দূরে পালাবার পথ! কত বাস্তব এ চিত্র! শিকারী যদি ব্যর্থ হয় তাহলেই সর্বনাশ, মৃত্যু সহযাত্রী পশুর মত তেড়ে আসে, কঠিন বিপাকে পড়ে শিকারী—

…এবং তিমিরে
হানা দেয় বর্বর উল্লাসে,
যখন বলিষ্ঠ-বাহু শিথিল নদীর মতো ধীর হয়ে আসে
ভুল হয় শিকারীর নিশানা, তখন
লোমশ জন্তুর থাবা তোলপাড় ক'রে আসে বন
উলঙ্গ নৃত্যের মতো
এবং হঠাৎ আক্রমণে
মাতাল হারায় প্রাণ, অরণ্য-গহনে বয়ে যায় এক রক্ত নদী
শিকারীর নিশানায় ভুল হয় যদি।
মৃত্যু সহযাত্রী আসে পশুর মতন তেড়ে, তাকে
অরণ্য কান্তারে ফেলে কঠিন বিপাকে।

(শিকার : জুলেখার মন)[১]

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে একা' এবং 'রক্তিম হৃদয়ে' তাঁর আরো উত্তরণ দেখি, নতুন দিগন্তে তাঁর পদচারণা প্রত্যক্ষ করি, সেখানে রোম্যান্টিসিজম একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে 'চৈতন্যের অগ্নিগিরির' উৎসমুখে তিনি যেন দাঁড়িয়ে, নির্ভয়ে প্রত্যক্ষ করছেন :—

ঈশানে-বিষাণে আর প্রলয় প্রতীকে নেমে আসা
সে অগ্নিগিরির রূপ সর্বগ্রাসী প্রচণ্ড ভয়াল—
স্বাক্ষরিত জনপদে চেতনার বহ্নি সর্বনাশা
দীপ্ত জাগরণ, জয়; স্তব্ধবাক দেখে মহাকাল!

এশিয়া, আফ্রিকা আর প্রতীচির প্রতি ঘরে ঘরে
চৈতন্যের অগ্নিগিরি বিস্ফোরণে দেখি ফেটে পড়ে !!

(চৈতন্যের অগ্নিগিরি : অন্ধকারে একা)[২]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৬৩-৬৩

২. ঐ পৃ. ১৬৪

এখানে কবির ঘোষণার কোন লুকোচুরি নেই, জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় দৃশ্যপট তাঁর মানসনেত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কবির মন যন্ত্রণাকাতর। 'গ্রহণে আক্রান্ত চাঁদ' (অন্ধকারে একা)। বিধ্বস্ত নগরী। এখন সম্পন্ন বাগানে কীটদষ্ট ফুলফল ছড়ানো ছিটানো সবখানে—

কে পারে পালাতে এই দুষ্টগ্রহ 'গ্রহণের' থেকে
স্বপ্ন-নগরীর ভয় নিত্য এসে আলিঙ্গনে বাঁধে
অপচ্ছায়া-সূত্রে ঘিরে-নিয়ে যায় গভীরে গহনে
চক্রব্যূহ চারিদিকে, জটিল জটলা নিয়ে মনে
একটি প্রার্থনা শুধু করুণ কান্নার মতো কাঁদে,
গ্রহণে-আক্রান্ত চাঁদ অনিঃশেষ অন্ধকার লেখে।

(গ্রহণে আক্রান্ত চাঁদ : অন্ধকারে একা)[১]

এই অপচ্ছায়া, চক্রব্যূহ জটিল জটলা, কান্না ; অনিঃশেষ অন্ধকার দেখছেন কবি। দেখছেন :—

প্রেমিক-হৃদয় নয়, আমাদের মেধাবী মনন
জ্বলে ক্ষিপ্র অহঙ্কারে বিশ শতকের মধ্যভাগে
নেতি ও নাস্তির ক্লান্ত কুণ্ডয়নে বিভ্রান্ত এ-মন
উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ ছেড়ে ক্লিন্ন অন্ধকারে জাগে।

(প্রেমিক হৃদয় নয় : রক্তিম হৃদয়)[২]

কিন্তু আশার কথা এই যে, অন্ধকার দেখলেও, নেতি ও নাস্তির ক্লান্ত কুণ্ডয়নে সাময়িক বিভ্রান্ত হলেও কবি আমাদের অস্তিবাদী—আশার সুর তাঁর কণ্ঠে—তিনি কামনা করেছেন আত্মার উত্তাপে অবসন্ন আলস্যের কাল কেটে যাবে :—

—অমন রৌদ্রের রঙ কোনদিন দেখিনি জীবনে
অমন কুয়াশা-ঘন সকালের সূর্য জানালায়
সুহৃদের মতো এসে স্পর্শ রেখে ছাদে, আলিশায়
জ্বলেনি প্রখর প্রেমে অন্ধকার বারান্দার কোনে।
চেতনার মণিবর্ণে প্রজ্জ্বলিত কুয়াশা-সকাল
দু'হাতে সরিয়ে নেয় জড়িমাকে বান্ধবের মতো,

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৬৫
২. ঐ পৃ. ১৬৫

অবগুণ্ঠনের নিচে হিম-স্নিগ্ধ সলজ্জ সম্নত
আত্মার উত্তাপে কাটে অবসন্ন আলস্যের কাল।

(অমন রৌদ্রের রঙ : রক্তিম হৃদয়)[১]

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ জীবন ও যন্ত্রণাকে জেনেছেন, যন্ত্রণা বিসর্জন দেবার জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় প্রতিষ্ঠার পথও তাঁর অজানা নয়। কবিতা রচনাতেও দক্ষ। বক্তব্যে স্পষ্ট। আন্তর্জাতিকতায় প্রসারিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী। তাই, অধুনা যে ভয় তাকে কাটিয়ে কবির বলিষ্ঠ আশা উচ্চকিত—

মৃত্যুর প্রহর স্তব্ধ, নবজন্ম উৎসব মুখর
নতুন তরঙ্গ যেন উন্মোচিত রক্তের ভিতর।

(অধুনা যে ভয়)[২]

॥ ১০ ॥ কবি আবুল হোসেনের জন্ম ১৯২২ সালে। দেশ বিভাগের আগে তিনি কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নববসন্তের' প্রকাশকাল ১৯৪০ সাল। কিন্তু এই কাব্যসঙ্কলনটি দুষ্প্রাপ্য। এর প্রায় ৩০ বছর পর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর "বিরল সংলাপ"। "বিরল সংলাপ" অবলম্বন করে তাঁর কবি প্রকৃতি উদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

আবুল হোসেনের কবিতায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, তিনি বেশি কথা বলেন না। পরিমিতি বোধ আছে তাঁর কবিতায়। অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে না কথার ভারে। অল্প কথার তুলিকায় আশ্চর্য নিপুণভাবে তিনি বৃহত্তর পূর্ণতর চিত্র অঙ্কনে অত্যন্ত পারদর্শী।

এবং আরও বড় কথা, স্পষ্ট, দৃপ্ত তাঁর কণ্ঠস্বর। কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। সোজা কথা বলতে অভ্যস্ত। ঋজু বাগধারা।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ দেওয়া যেতে পারে—

আমার দেশের লোক
অসহায় আর্ত দেশ।
উদ্বেলিত স্মৃতির নিমেষ :
জাগে শোক দুর্দম দরদ

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৬৬
২. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ ১০৩

দুর্নিবার প্রেম,
মুহূর্তেই পরাভূত যম
কাটে ভয়, চেতনা উদ্ভূত।[১]

কবিতায় পরিমিতি বোধ এবং স্পষ্টবাদিত্য খুব কম কবির পক্ষেই ইদানীংকালে সম্ভব হচ্ছে। কথার মার প্যাঁচে আসল কথাটা চাপা পড়ে থাকছে, পাঠক শ্রেণী বুঝতে পারছেন না কবির মনোগত অভিপ্রায়।

আবুল হোসেনের আরও একটি বিরলতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অতি সুন্দর চিত্রকল্প অঙ্কন করতে পারেন। আধুনিক উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা যে কোন কবির পক্ষে ঈর্ষণীয়—

১. ধারালো ছুরির নদী ফ্ল্যাটের আকাশ।
টিনের কারখানায় কাটা ভাঙা দিন
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছাদে গাছে ঘাসে।

অথবা, (ফাল্গুন ওগো ফাল্গুন)[২]

২. রাতের ফ্ল্যাটের থাবা, অফিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজ চোখ কখনো কখনো
গড়াগড়ি দেয়, আজও, (কিমাশ্চর্যম্‌)[৩]

উপমা ব্যবহারে আবুল হোসেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর উপমাগুলি পুরানো, মরচে ধরা, গতানুগতিক নয়, নয় রোম্যান্টিক কবিতার উপমার মত অস্পষ্ট। সেগুলো অধিকাংশ চয়িত হয়েছে আমাদের সাধারণ জীবন থেকে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে। অতি পরিচিত এসব উপমা ব্যবহারে কবি যেমন অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি তাঁর মুন্সীয়ানাও দেখিয়েছেন—

ঢাকার গর্তেভরা রাস্তায় ঠেলাগাড়ীতে
যেমন হড়হড় ক'রে গরুর গোশ্‌ত নিয়ে যায়
রঙচটা ষ্ট্রেচারে দুমড়ানো সাদা চাদরে মুড়ে
হাসপাতালের ট্রলি ডাক্তার নার্স আয়া আর

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫২৮
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. বত্রিশ
৩. ঐ পৃ. ঐ

ওয়ার্ডবয়দের ভীড় ঠেলে সরু করিডর দিয়ে
এঁকে বেঁকে নিয়ে গেলো তাকে।

(তার অপারেশনের পূর্বে)[১]

আবুল হোসেনের শিল্পরীতির আর একটা দিকও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেটা হল কথ্য-রীতির ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য। কথ্য ভাষার ব্যবহারে তাঁর মত সহজ নৈপুণ্য অনেক কবিই দেখাতে পারেননি। সমালোচক সঙ্গতভাবেই বলছেন, "মোটামুটিভাবে একথা বলা চলে যে আবুল হোসেনই মনে হয় বাঙ্‌লার কবিতার আধুনিক ঐতিহ্য সবচেয়ে বেশি আত্মস্থ করতে পেরেছেন।"[২]

আমরা সমালোচকের সঙ্গে একমত। কবিতার ভাষায় প্রাণ আসে, আবেগ আসে, কবিতা মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে যখন আটপৌরে বেশে তাকে দেখি, তাকে প্রিয়তর নিজের, একান্ত আপনার বলে মনে হয়। দূরত্ব, ভয় কেটে যায়। ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। কথা শুনি কবিতার। মনে হয় আমাদের মতই কবিতা সাধারণ। এবং সাধারণের মধ্যে থেকেই অসাধারণ দ্যুতিদীপ্তিতে সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আধুনিক কবিতার সার্থকতা এইখানেই। আধুনিক কবির কুশলতা পরীক্ষাও হয় এইভাবেই।

আবুল হোসেন সম্পর্কে একথা উল্লেখযোগ্য আরো এই কারণে যে, তিনি সাধারণ মানুষের কবি। শ্রেণীচেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ। তাঁর কবিতার মধ্যে একটি স্বচ্ছ সমাজসচেতন মন আমরা অতি সহজেই আবিষ্কার করতে পারি, মানুষের সভ্যতার উত্তরণে তিনি বিশ্বাসী, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা তাঁর কবিতার মুকুরে ছায়া ফেলে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি রূপ দিতে চেষ্টা করেন জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাকে, আগামী কালের গর্ভে যে বিজয় নিহিত, যে সংগ্রাম করে সেই বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে, তার কথা বলেন কবি আবুল হোসেন। যে পচাগলা দুষ্ট সমাজ ব্যবস্থার বলি আমরা তার সার্থক রূপচিত্র আঁকেন তিনি—তার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ফুটে ওঠে দুটি শ্রেণীর চরম বৈষম্য, তেমনি অনুভব করতে পারি প্রভু শ্রেণীর উপর তাঁর বিদ্বেষ—

স্বদেশী-বিদেশী প্রভুরা লালে লাল
ওদিকে মহান প্রভুর কপাল লোহিততর
তহবিল ঠাসা সোনায়

১. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, পৃ. একত্রিশ
২. ঐ ঐ

কারখানায় আসুরিক উৎপাদন :
অথচ ক্ষুধার্ত শ্রমিক
মাঠে মাঠে খামারে জাহাজে বোঝাই কৃষিপণ্য
তবু মুমূর্ষু দেশের লোক
এ আমলের সোনা-সূর্যাস্তের রশ্মিতে শেষ।[১]

কী জীবন নিয়ে কী ভাবে বেঁচে আছি আমরা? কী অর্থ হয় এই গতানুগতিকতার? মলিন আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন। চারিদিকে অন্তহীন আবিলতা। উঞ্ছবৃত্তি সম্বল না করলেই কি নয়?

মধ্যবিত্ত ঘা খাওয়া ঘা সওয়া জীবনের করুণ মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন আবুল হোসেন, কশাঘাতের মত আবার বিদ্রূপের জ্বালা মিশিয়েছেন তাতে! বন্ধ ঘরে যেন নিরুপায় কানামাছি খেলা। অন্ধের মত জীবনের ঘানি টানা প্রাণপণে! কোন আশা, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, ক্ষোভ, জ্বালা, যন্ত্রণাবিহীন অসম্ভব এক অস্তিত্ব যেন। কিন্তু সত্যিই কী তাই? মধ্যবিত্ত কী আগুনে, যে জ্বলে পুড়ছে? মধ্যবিত্ত জীবনের এই মর্মন্তুদ চিত্র অঙ্কনে আবুল হোসেন সিদ্ধহস্ত বলা যেতে পারে। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার! উদাহরণস্বরূপ একাধিক কবিতার উল্লেখ করছি—

১. আমরা কি বেঁচে আছি; এই কী জীবন?
বন্ধ ঘরে কানা মাছি এ জীবন নিরূপায় খেলা।
নির্মম আঘাতে ক্ষত বিক্ষত শরীর।
রক্ত যেন নীর।
ঝরে অবিরাম।
তারপর নিঃশেষিত মনে
একদা সালাম দুনিয়াকে।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে,
কে তুমি কেই বা তোমার,
তোমাকে কে মনে রাখে?

(শেষ মুক্তি)[২]

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৯৮-৯৯
২. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ১১৮

২. মাঝে মাঝে মনে হয়
একটু একটু করে এই প্রাণক্ষয়
না করলেই নয়।
দিনে দিনে তিলে তিলে ম'রে ম'রে এই বেঁচে থাকা
এর মানে কী!

(মধ্যবিত্ত)[১]

৩. শুধু প্রতিদিন বিরাম বিহীন
সকাল সন্ধ্যে অন্ধের মতো
জীবনের ঘানি প্রাণপণে টানি
বাইরে কোথায় কাদের পাড়ায়
লাগালো আগুন কৃষ্ণচূড়ায়,
নীল থেকে লাল হলো কিনা চীন
কে রাখে খবর তার অতশত।

(নায়ক)[২]

অথচ, জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে যেতে মধ্যবিত্ত কখনো সখনো ভাবেও এরকম—

বেঁচে আছি,
শিরায় শিরায়
এখনো দুরন্ত রক্ত নাচে,
ঝাঁঝরা বুকের নীচে হৃৎপিণ্ড আজো
ডুগডুগি বাজায়
এর চেয়ে কী আশ্চর্য আছে!

(কিমাশ্চর্যম্)[৩]

এইখানেই বলব, কবি আবুল হোসেনের সার্থকতা। সত্যসত্যই তিনি শ্রেণী সংগ্রামের কবি, তাঁর কবিতায় শেষ অবধি আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। মুক্তি চেয়েছেন, হতাশা, বিভ্রম দূর করার সাধনায় তিনি এগিয়ে চলেছেন, যদিও জানেন মধ্যবিত্তের—

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. তেত্রিশ
২. ঐ পৃ. ঐ
৩. ঐ পৃ. বত্রিশ

আশা নাই, ভাষা নাই
প্রতিবাদ করবার। নাই সর্বনাশা
বহ্নি বিদ্রোহীর।
আছে শুধু দাহ।

তবু পরক্ষণেই কবি বলে ওঠেন—

কেন এই নিষ্প্রাণ হতাশা,
একই অন্ধ বন্ধ কূপে ফিরে আসা বারবার।
জালছাড়া আর
হারাবার আছে কি এখনো,
আর কোন কিছু পিছু টান, আর কোন ভয়।
এবার হয়েছি নিঃসংশয়
মৃত্যুই মৃত্যুকে করে ক্ষয়।[১]

॥ ১১ ॥ খুব বড় কথা বলেছেন। আসলে মধ্যবিত্তের তো বলতে কিছুই নেই! বৃথাই তার নাম মধ্যবিত্ত। নিঃসংশয় হতে হবে তাকেও। মৃত্যু ক্ষয় করার জন্য মৃত্যুপণ করেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে।

সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম ১৯২৪) খুব বেশী কবিতা লেখেননি, কবিতার বইও বেশি প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তবুও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখেন। কবিতা প্রসঙ্গে তিনি যা বলছেন, তা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কবিতা এমন জিনিস, যার মধ্যে "কবি তাঁর উপলব্ধির গণ্ডীকে বিস্তৃত করেন এবং নিজেও সামাজিক জীব হিসাবে উপলব্ধি অর্জনের প্রয়াস পান"।

কবির দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর এ বক্তব্য যথার্থ। কবিতা লেখার মধ্যেই যে তাঁর কর্তব্যবোধ শেষ হয়ে যায় না, তাঁকেও যোগ্য হতে হয়, সামাজিক পরিবেশে তাঁর দায় ভাগ বণ্টন করে নিতে হয়, এ উপলব্ধি আধুনিক অনেক কবির মধ্যে উপস্থিত দেখি না।

কবির প্রকাশিত পুস্তক 'চৈত্র যখন' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)। এছাড়া সমকাল, কবিতা সংখ্যা, পরিক্রম প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা আমাদের নজরে এসেছে।

আঙ্গিকের দিক দিয়ে ধ্বনি প্রধান ছন্দকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ. ১১৯

বক্তব্যে বৈশিষ্ট্য আছে, কখনো কখনো সুন্দর পরিবেশ রচিত হয়েছে, যেমন 'পূর্ণিমা' কবিতাটিতে—

'তবু তার অলখ অপূর্বরূপ ইন্দ্রধনু ময়ূর পেখমে
কোকিলের কণ্ঠঝরা মধুর নিঃস্বনে
মৃত্যুক্লিন্ন রাজপথে বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
অথবা আষাঢ় ঝরে অন্যথা বৃষ্টির চেতনায়
বিচিত্রস্বরূপা দেখি
বেদনা মধুর,
ভাটিয়াল সুরে ঝুরে
লালনের ললিত কলায়
মৃত্যুলগ্নীরূপ তার দুরাগত, তবুও নিবিড়
রক্তে রক্তে মীড় তার বেজেছে নিয়ত ;
তালী তমালের বনে, রজনীগন্ধায়
সুকোমল মাতৃস্নেহে, কঠোর ঝঞ্ঝায়
পুরুষ পৌরুষ তার, তবু সে তো নবীন কোমল....

(চৈত্র যখন)[১]

এই অপরূপ স্বদেশ—পূর্ণিমা চাঁদ নানাদিক থেকে আচ্ছন্ন। বেদনা বোধ তাই কবির মনে। কবির মনে একটি দ্বন্দ্ব বহমান, আপোষ ও বিরোধের দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন কবিতায়, বিভিন্নভাবে তার ছায়াপাত হয়েছে, এমনকি প্রেমের কবিতাতেও এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখতে পাই,—যার থেকে মুক্তি চেয়েছেন, স্বার্থের প্রাচীর ভেঙে ফেলে প্রেয়সীকে বেরিয়ে আসার ডাক দিয়েছেন—

তাই বলি ভেঙে ফেল প্রেয়সী
স্বার্থের সাজানো প্রাচীর ;
প্রেম খোলে বন্ধন রশ্মি
প্রেম চায় মরণ নজির,
দুই মনে একই কথা জাগবে
এক ভাষা একই সুরে গাওয়া

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৫

পতংগ বহ্নিতে জ্বলবে
আগুনের তৌহিদ পাওয়া।

(প্রাচীর : পরিক্রম)[১]

এখানে চিরায়ত কথাটা বলারই চেষ্টা করেছেন, দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য উন্মুখ হয়েছেন। কিন্তু সত্যিই কি তিনি কখনও তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন? মনে তো হয় না! উদাহরণস্বরূপ একাধিক কবিতা থেকে উপমা দেওয়া যেতে পারে। তাঁর 'পাগলা ঘোড়া' কবিতার মধ্যে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয়নি বলেই ঘোড়া ছুটে চলেছে—

মনের আঙিনা মাঠ হয়ে যায়, আকাশ ছড়ায়
উই ঢিবি আর আস্তাবলের সীমানা হারায়
গোবীর পাহাড়ে, তিব্বত চূড়া, আগ্নেয়গিরি
তারার ভস্মে
সান্নিপাতিক রোগীর কাঁপুনি হাড়ের চূড়ায়
মাত্‌লামি চোখ তবুও জ্বলেছে বিনিদ্রিত
খুরের দাপটে কপাট ভেঙেছে অনবরত॥

(সমকাল)[২]

কবির যেন শান্তি নেই, স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি রুক্ষ ধূসর চৈত্রে, যখন পদ্মার দেহ রোগশীর্ণ, জীর্ণ বেলাভূমি, তখন জলের তরল লোভে কবি ছুটে চলেন, কিন্তু কোথায়? তার কোন নির্দেশ নেই—

যখন কঠিন চৈত্র শাস্তি দেয়, আগ্নেয় ঝলকে
ঝলসায় মোলায়েম ত্বক, কচ্ছপ সূর্যের বন্দী
ছায়া ফেলে ধীরে পোড়ান রাস্তায়, গমকে গমকে
হাঁকে বায়ুর বিক্ষোভ, পথ চলি ধীরে, আলো অন্ধ
সূর্য সঙ্গী, পানির তরল লোভে ছুটে চলি আমি
যেখানে পদ্মার দেহ রোগশীর্ণ, জীর্ণ বেলাভূমি—

(যখন কঠিন চৈত্র শাস্তি দেয়)[৩]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১১
২. ঐ পৃ. ৯
৩. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০০

কবি কি ভয় পান? বিহ্বল হন? বীতশ্রদ্ধ? এই যান্ত্রিক সভ্যতার করাল রূপটাই কেন তার চোখে ভাসে? উত্তরণের কথা কেন মনে পড়ে না?—

'শহরে বন্দরে শুধু আগুনের হাতেমী দিদার
ট্রয়ের ছড়ায় জোড়া শিখা নৃত্যে মৃত্যুবিহার,
বাগদাদে গম্বুজ ফাটা সশব্দ কল্লোল,
বোমার বিধ্বস্ত বক্ষ লণ্ডনের ঘন ডামাডোল,
মাদ্রিদ, বার্লিন, আর মরু লিবিয়ায়
বিরোধী আগ্নেয় বায়ু
ক্ষণে ক্ষণে হেঁকে হেঁকে যায়।'

(বনিআদম্—তিন)[1]

মৃত্যু নীল ছবি, জ্বলন্ত অঙ্গার চোখে পাপের মিছিল, অনর্থ উল্লাস দেখছেন প্রেমের ক্ষেত্রেও,

……ইউলিসিস পথ-হারা, তবু তো জ্বলছে ট্রয়ে চিতা,
'মজনুন্ কয়েসের অনর্থ-উল্লাস,
প্রণয়ের বহ্নি রচে চিরঞ্জীব সতর্ক সবিতা ॥
—মুক্তি; মুক্তিপথ বলো—"

(বনিআদম্—পাঁচ)[2]

আরো দ্বন্দ্ব, মূলগত দ্বন্দ্ব তাঁর পৃথিবীকে ঘিরেই—

"হে শ্যামাঙ্গী ধূসরাঙ্গী পৃথিবী,
প্রেম আর বিরোধের দ্বন্দ্বে ছন্দিত পৃথিবী
আকাশ মাটির প্রণয়ে উদ্বুদ্ধ পৃথিবী
সিংহ ও মেষের দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ পৃথিবী
হে আমার প্রচণ্ড সুন্দর
অচলাবরুদ্ধ ঘন আরব্ধ পৃথিবী
তোমারি মৃত্তিকা-কণা মূর্ত, আনন্দিত
মেদে, মাংসে, মজ্জায়, সজ্জায়;

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০০-৬০১
২. ঐ পৃ. ৬০১

জীবন-মৃত্যুর নাট্যে নৃত্যলোল তোমারি প্রকৃতি
নূপুর বাজিয়ে চলে আমার শিরায়।

(বনিআদম্—দুই)[১]

এ সব থেকে প্রতীয়মান হয়, কবি পথহারা, তিনি সঠিক কোন বক্তব্য নিয়ে হাজির হতে পারেননি, উৎসকে জানার ক্ষমতা তাঁর নেই, কোন সমস্যার জট খোলার পন্থা তাঁর অজানা, তিনি যেন দ্বন্দ্ব জর্জর, বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত এক আশ্চর্য সংবেদনশীল মানুষের প্রতিভূ—কী করতে হবে, কী করা উচিত, সঠিক জানেন না—তাঁর কবিতা তাই ক্ষণিক বুদ্বুদ তুলে আবার মিলিয়ে যায়, যায় আবেগ, অনুভূতি স্থায়ী অনুরণন জাগাতে পারে না, যে দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের কথা বলেছেন, কবিতার মধ্যে আমরা তেমন কিছু খুঁজে পাই না।

॥ ১২ ॥ পূর্ববঙ্গের যেসব কবি সেখানকার কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেখানকার কাব্যলক্ষ্মী যাঁদের সাধনায় দীপ্তি ও সৌন্দর্যে ভূষিত হচ্ছেন, কবি আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫) তাঁদের অন্যতম। সংবেদনশীল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত এই কবির কবিতা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, যুগ জীবন ও সমাজ চিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে চোখের সামনে, চিত্রধর্মময় তাঁর রচনা, কিন্তু বড় বাস্তব, রূঢ় হলেও সত্য, কখনও কখনও যেন কড়া চাবুকের আঘাত, অন্তর্জ্বালা, দাহ, বেদনা ও যন্ত্রণার অপূর্ব অনুরণন।

মানস প্রবণতায় অথচ, অনেক সময় আবদুল গণি হাজারীকে রোম্যান্টিক বলে ভুল করে বসি। তাঁকে সেইভাবে প্রচার করার চেষ্টা করাও হয়েছে পূর্ববঙ্গের সমালোচক মহল থেকে। অথচ সুস্থ সুন্দর সাধারণ জীবনের তৃষ্ণায় বিভোর এই কবি জীবনকে ভালবাসেন, প্রতিপলে বেঁচে থাকতে থাকতে। কেমন এ বেঁচে থাকা? কেমন এ ভালবাসা?—

অনেক মৃত্যুকে বুকে করে আমাদের বেঁচে থাকা
অনেক ঝড়ের পীড়ন পাঁজরার তলে।
আহা! এ জীবন কী দামে বিকোবে?
......স্নায়বিক হাত বন্ধুরা বৈঠা ঠেলে
কোন এক বন্দরে—কে জানে কোন বন্দরে—
কোনও বন্দরে তবু
নামতেই হবে;

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬১০

এই শপথ বেঁচে থাকে
মরে না বলেই—

মর্গের অন্ধকারে কত মৃত্যু
জীবনের হিসেব না দিয়েই
ইতিহাসের আড়ালে হলো।
তারপর নির্বাক প্রভাত
অসংখ্য প্রশ্নের সামনেই ধ্যানে বসলো।
বরকতের মায়ের কান্না
কতবার পৃথিবীর বুক চিরে
কতবার নিস্তব্ধ হলো।
এত মৃত্যুর কথা স্মরণ করেই
আমাদের আয়ু মৃত্যুহীন
আর তোমায় ভালবাসি বলেই,
জীবন আমার
এত সহজে প্রাণ দিয়ে যাই।

(ভালবাসি বলেই : সামান্য ধন)[১]

বড় মর্মভেদী দৃষ্টি কবির। অনেক সময় তির্যক মনে হয়। তাই, এমন সময়, অনেক মৃত্যুকে বুকে করেও কবি দেখেন—

ফুলার রোডের কৃষ্ণচূড়ার গাছে
রঙের আভাস ছেনালীর মত লাগে।

(ভালবাসি বলেই : সামান্য ধন)[২]

আশ্চর্য লিপি কুশলতা, চিত্রাঙ্কনে এই অপরূপ দক্ষতা সত্যই আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা দাবি করতে পারে। রোম্যান্টিকতার আমেজ মেশানো থাকলেও সে জ্বালা এবং দাহ মিশে আছে এ দুটো পংক্তিতে, তার তুলনা মেলা ভার।

প্রকাশিত কবিতার বই 'সামান্য ধন' (১৯৫৯) এবং 'সূর্যের সিঁড়ি' (১৯৬৫)। সম্প্রতি প্রকাশিত আর একটি কাব্যগ্রন্থ 'জাগ্রত প্রদীপ' (১৯৭০)।

১, আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৮-১৯
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৮

এই চিত্রকুশলী কবি অনায়াসেই যে কোন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কবিতায় অপূর্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। অন্তর্ভেদী কবির দৃষ্টি। দেখার মধ্যে দিয়ে তিনি অবলীলাক্রমে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে নেন—সেই পরিবেশে কবিতার পরিসরে আমাদের যুগের জীবন-যন্ত্রণার কথা, হতাশা, অসহায় অবস্থার কথা রূপ পায়। কতখানি সততার সঙ্গে স্টীমারে মাল বহনকারী ভারবাহী কুলিদের চিত্র অঙ্কন করেছেন—

শেষ রাত থেকে নুনের বস্তা মাথায়
উলঙ্গ বাদামী পিঁপড়েরা
নড়বড়ে সিলিপাটের উপর দিয়ে
ভারী পায়ে ঢুকছে দানবের শরীরে।

(গিলছে, গিলছে, গিলছে)[১]

এই খানেই কবির কর্তব্য শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি, সংবেদনশীল মন বেদনায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছে যথার্থ মানুষের দেখা পেয়ে—হোক না সে স্টীমারের সারেং বা একজন সাধারণ যাত্রী—

ঠোঁটের খড়ি
বিদীর্ণ তালু
কালো শিরে চোখ
বিস্রস্ত দাড়ি
এবং শত যোজনের অঙ্গীকার
শীতলক্ষা থেকে পদ্মা মেঘনা যমুনা

অথবা,

চাষীর কাঁধের বেতের ধামায়
সদ্য কাটা কলায় পাক ধরেনি এখনো—
ময়লা গামছায় মুছলেন তিনি একগুচ্ছ দাড়ি থেকে
দিনের প্রথম কান্নার অশ্রু।[২]

তাঁর কবিতার মুকুরে যে মিছিল প্রবাহিত হয়ে চলে তাতে সহজেই নিজেদের চিনে নিতে পারি—

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. একান্ন
২. ঐ পৃ. একান্ন-বাহান্ন

যেমন,

কি চমৎকার চিন্তা, ১৯৭০ সনের সেরা—
স্বামী নই
পিতা নই
ভ্রাতা নই
কোন এক রঙিলা নায়িকার প্রেমিক—
নির্দায় ভারমুক্তির স্বাদ
সংগ্রামে সার্থক পলায়নের সুযোগ
অথচ মনে মনে সবকিছু রইল বেঁচে
দেহের আশ্লেষ
চোখের তৃপ্তি—
দুই হাতে নিপিষ্ট শরীর—
স্বপ্নের মত মনে হয়···
(প্রত্যুষের অন্ধকারে দুটি হাত : জাগ্রত প্রদীপে)[১]

অথবা,

জীর্ণ নৌকার পাটাতনে উদ্‌লা উনুনের আগুন
ফুটন্ত চালের পুরাতন ঘ্রাণে
বেগুন সেদ্ধর সংবাদ
লুঙির মালকোচা
উলঙ্গ শিশুর কোমরের কার
লম্বিত হয়ে নুনু ঢাকে
আর তার প্রশ্নার্ত কালো চোখ আগন্তুক অন্ধকারকে
কিছু জিজ্ঞাসা করতে জানে না
দারিদ্র্যে হিস্থায় পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকার
তার বাদামী লালিত্যে ছায়া ফেলে।[২]

কবি সন্ত্রাস দেখেছেন, এ যুগে ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের রূপ দেখছেন—

---

১. আবদুল গণি হাজারী, জাগ্রত প্রদীপে পৃ. ৫৪

২. আধুনিক কবিতা, পৃ. বাহান্ন-তিপান্ন

যখন কোন মহিলাকে হত্যা করা হলো
মরা নদীর ভাঙা সাঁকোর ধারে
তাকে কি অসহায়—দেখাচ্ছিল
কপালের টিপটা তার মুছতে মুছতে
উপরের দিকে বেঁকে গেছে
হাতের কাঁচের চুড়িগুলোর দু একটা
ভেঙে পড়ে আছে ঘাসের ওপর
মুখ খানা কাৎ হয়ে—
না কিছু দেখছে না
না কিছুই দেখছে না সে
বুকের কাপড় পায়ের নগ্ন গোছা
কিছুই না
আর কিছুই দেখবে না সে
ঘাসের সবুজে তার বিস্মিত চোখ দুটো
এক ভয়ার্ততায় স্থির
এক অসম্ভব প্রশ্নের মত—
জুলাযথার সতীত্বের মত।

(সূর্যের সিঁড়ি)[১]

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নরূপ—
তাই মার্কিন টেপরেকর্ডারে
হনলুলু থেকে কেনা
হাওয়াই সংগীত বাজালাম আমি :
আ—লো—হা—
এসো পশ্চিম থেকে অদূর কিম্বা সুদূর
এবং ধর্ষণ করো
আমার আনারসের জমিকে
আমার শর্করা চাষীর জননীকে

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. ২৭

এবং কলাবাগানের অন্ধকারে পলায়মানা বালিকার—
সতের বছরের ত্রাসিত যৌবনকে।

(সূর্যের সিঁড়ি)[১]

'প্রেসক্লাবে তোমরা' এবং 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতা দুটি যে কোন পাঠকেরই ভাল লাগবে। প্রথম কবিতায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেসক্লাব যখন উল্লাসে হৈ চৈ এবং তাসখেলা, পানোৎসবে মাতে, তখন সিঁড়ির নিচের অন্ধকারে তক্ষকের ডাক তীক্ষ্ণতর হয়। 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতায় ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় আমলাদের স্ত্রীর অর্থাৎ উপরতলার মহিলাদের অর্থহীন, গতানুগতিক লালসামদির নীতিহীন সাধারণ জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন জীবনের কামনা বাসনা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে হাহাকার, ব্যর্থতা, হতাশা ও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে।

'জাগ্রত প্রদীপে' কবির দেখার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু বলতে সংকোচ হয়, চিত্রকল্পের বাহুল্য, তার কমনীয়তা, তার তেজ এবং প্রভাব যেন কমে এসেছে। তাহলেও জাগ্রত প্রদীপে আবদুল গণি হাজারী তাঁর বক্তব্যকে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। অন্নপূর্ণার দেশের কী হ'ল, তার যথার্থ বর্ণনা—

হায়, অন্নপূর্ণার প্রাক্তন গলি
গোলাভরা ধান
নদীভরা মাছ
পৌষের পিঠা
মসজিদের শিন্নি

মা ফাতেমার ফুটন্ত হাঁড়ির সামনে
দীর্ঘ প্রতীক্ষ মাসুম শিশুর কান্না
অন্নপূর্ণার অবুঝ স্মৃতির হাঁড়িতে
নবান্নের স্বপ্ন কাঁদে।[২]

অথবা,

সোনার দেশের অবস্থা—
রেডিয়োর নবজীবনের গান আশ্চর্য লাগে—

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ২১

২. অন্নপূর্ণারদেশ, জাগ্রত প্রদীপে, পৃ. ৩৬

আমার সোনার দেশ।

আমার সোনার দেশ।

ধুলিতে ড্রিল করে দেশপ্রেমের অন্বেষণ
সরল কবিদের শর্তাবদ্ধ শব্দাবলী
কখনো জেহাদের প্রতিজ্ঞার পিছনে
বঞ্চনার কান্নায় বিচূর্ণ
বেহালার তার ধরে চেয়ে থাকে
গৃহস্থঘরের নাবালিকা বধূর মত
প্রতিশ্রুত ভ্রাতার বারবার স্থগিত
আগমনের সড়কের ধূসর দীর্ঘতায়

দূরাগত গাড়ীয়ালের বুকফাটা সুর
চাকার আর্তনাদের সাথে
ব্যথিত প্রত্যাশার অসমর্থিত সংবাদ।

হায় আমার সোনার দেশ।
প্রার্থনার প্রভাতে তোমাকে সত্য মনে হয়
অথচ সূর্যের প্রাখর্যের নিচে
আমার দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা যায় না।[১]

আবার,

হঠাৎ-ধনীর নির্মম মার্সিডিজ
সন্ধ্যার রক্তে আঁচিয়ে নিলো

নির্বিত্ত হকারের
সিংগেল চায়ের বারোয়ারী পেয়ালায়
আমাদের গণতন্ত্রের বুদ্বুদ যখন
আসন্ন বিস্ফোরণকে হৃদয়ে চেপে
দূর বন্দরের দুর্বোধ্য কোলাহল শোনে।[২]

১. প্রত্যুষের অন্ধকারে দুটি হাত, জাগ্রত প্রদীপে, পৃ ৫৭
২. ক্লিফটন করাচী ঐ পৃ. ২৫

অথচ, প্রচণ্ড আশাবাদী কবি আবদুল গণি হাজারী। যুগের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে চান না, তাঁর বক্তব্য এক্ষেত্রে—

"আমার যুগের যন্ত্রণাকে
শায়িত কোরো কবরে
আমার পাশেই।

(যন্ত্রণায় মৃত্যু)[১]

তাই তিনি অকপটে বলতে পারেন—

আমি বিশ্বাস করতে চাই
কিশলয়ের মত
সূর্যকে
আমি বিশ্বাস করতে চাই
উত্তালঢেউয়ের মত
বালুতটকে
আমার বিশ্বাসই আমার জ্ঞান
আমার জ্ঞানই আমার ঈশ্বর।

(বিশ্বাসের ইচ্ছা)[২]

অথবা,

প্রতিশ্রুত দিবসের শপথ,
হে মানুষের সন্তানেরা
তোমাদের পিতাকে ছড়িয়ে দিলাম
জন পদে
যমুনার তরংগে
পদ্মার পলিতে
বৈঠার ক্লান্তিতে
লাংগলের বীর্যে
জুমরের প্রত্যাশায়।

তোমাদের পিতাকে ছড়িয়ে দিলাম

১. জাগ্রত প্রদীপে, পৃ. ৩৮
২. ঐ পৃ. ১১

সংশয়ের ভ্রূভংগে
প্রত্যয়ের অস্থিতে
বন্ধ্যারাত্রির উন্মুখ গর্ভে
সূর্যের স্বপ্নে
মধ্যরাত্রির জাগ্রত প্রদীপে······

(জাগ্রত প্রদীপে)[১]

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের অর্থাৎ উপরতলার লোকদের প্রতি কবির ব্যঙ্গ—

শীতাতপহীন বিবেকের জানালায় বসে
আমরা রৌদ্র দেখি
উত্তাপ দেখিনা
শূন্য চারীর নির্ভার অভ্যাসে
ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকি
এবং দুঃখের মাঠগুলি
সুন্দর ছবি মনে হয়

(প্রথম শ্রেণীর যাত্রী)[২]

'মা'কে কবিতায় কবির যন্ত্রণা, তিনি অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছেন—

আমার বিশ্বাস, মা আমার, তোমায় উদ্বিগ্ন করেছে
আমার অবিশ্বাসে, জননী, তোমার আতংক
তোমার অশ্রুর সিঞ্চনে তবু
কি অপ্রমেয় প্রাণের বীজ।

(মা—কে)[৩]

অথচ, দৃঢ় প্রত্যয় কবির, রোগশয্যা শায়িত রোগীও ভাবছে—

প্রখ্যাত আত্মার অমরত্বের প্রতীক্ষা না রেখে
বিশ্বাসের ব্যবসায়ীদের নিরন্তর শ্লোগানের
যান্ত্রিক আশাবাদকে

১. জাগ্রত প্রদীপে, পৃ. ১৫
২. ঐ পৃ. ২৪
৩. ঐ পৃ. ২৭

প্রস্তুত ডাক্তারের অনির্ণেয় সিদ্ধান্তকে
ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে।
প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর ছায়াকে পদাঘাত করার সিদ্ধান্তে।

(বিছানায় শায়িত রোগী)[১]

মৃত্যুর ছায়াকে পদাঘাত করার এই সিদ্ধান্তে অবিচল বলেই কবি 'সংশয়ের শয়তান থেকে' মুক্তি চেয়েছেন, কবি বলতে পারেন,

সম্ভবের দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে
তোমার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ
শীতের দীর্ঘ রাত্রির শেষে
স্বাগতম সূর্যের হাসি।
আমাদের নদীর ওপর কুয়াশা
ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জন্মের দ্বিধার মত
সূর্যের হাসির সঙ্গে মিলিয়ে যায়
নতুন পৃথিবীর জন্ম হয়
কিশলয়ের সম্ভাবনায়।

(জন্মদিন)[২]

এই নতুন পৃথিবীর জন্মস্বপ্নে উদ্বেল কবি সন্ধান করেছেন 'রক্ত বীজেরা কোথায়'—

এবং পণ্ডিতের নিমগ্ন চশমায়
বিভ্রান্ত মাকড়ে অদৃশ্য জাল বোনে
নতুন যাদুঘরের প্রস্তাবিত পাথরে তখন
রূপালী কনির স্পর্শ
উৎসবের কোরাসে দষ্টির প্রভুদের ঘোষণা
তখনো সেই রক্ত বীজেরা কোথায় অহরহ
করাল সুপ্তির কবলে—?
ঈশ্বরকে এই জিজ্ঞাসা অর্পণ করে
হজরতের ধৈর্যের প্রতীক্ষা করি।

(রক্ত বীজেরা কোথায়)[৩]

১. জাগ্রত প্রদীপে, পৃ ৫১
২. ঐ পৃ ৬১
৩. ঐ পৃ ৬২

॥ ১৩ ॥ আশরাফ সিদ্দিকীর (১৯২৬) কবিতা পড়তে আমাদের ভাল লাগে, তার প্রধান কারণ কোথায় যেন তাঁর কবিমানসের সঙ্গে আমাদের একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। কবির সঙ্গে সাযুজ্য বোধ করি। এ কৃতিত্ব সব কবির ভাগ্যে ঘটে না। এদিক দিয়ে আশরাফ সিদ্দিকীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নিখাদ ও নিখুঁত হয়ত নয় তাঁর কবিতা, হয়ত খুব উঁচুদরের কবিও নন তিনি, জৌলুষ ও আড়ম্বরের দিক থেকেও হয়ত তাঁর কবিতা ততখানি আকৃষ্ট করবে না, কিন্তু আমাদের মনের নিভৃততম প্রদেশে কখনো বেদনা, কখনো অপরূপ মৃদুব্যঞ্জনা নিয়ে আঘাত করে, সাড়া জাগায়, তাঁর প্রধান কারণ, তিনি আমাদেরই কথা বলেন, আমাদেরই মনের খবর তাঁর কবিতার পংক্তিতে খুঁজে পাই। তাঁর প্রকাশিত কবিতার বই: 'উত্তর আকাশের তারা', 'সাত ভাই চম্পা', 'তালেবমাস্টার' ও 'অন্যান্য কবিতা' (১৯৫০), 'বিষকন্যা' (১৯৫৫) ও 'কাগজের নৌকা'।

উষ্ণ আবেগ এবং প্রগাঢ় কুসুমিত হৃদ্য অনুভূতিতে তাঁর সাবলীল কবিতা স্বাদু ও রমণীয়ই শুধু হয়ে ওঠেনি, স্বাভাবিক, সতেজ, প্রাণবন্ত এবং প্রিয় মনে হয়।

আবেগ প্রবণ কবি আশরাফ সিদ্দিকীর মানস প্রবণতায় রোম্যান্টিক স্বপ্ন দিদৃক্ষা। গোধূলী নদীর তীরে কবির স্বপ্ন—

> তোমার সাথে পার হবো সে এমন পারের কড়ি
> কোথায় পাবো ! কোথায় এমন মন পবনের দাঁড় !
> কিন্তু তবু একটি আশা : শিরীষ ফুলের গানে
> ভালবাসার সোনার রেণু ছড়িয়ে বারবার
> বলেছি তাকে তুমিই আলো, তুমিই মায়া-মণি !
>
> সকাল দুপুর বিকাল শেষে সন্ধ্যানদীর কূলে
> মেহগিনীর বনের ধারে শিরীষ ফুলের গানে
> ওগো মাঝি, আমার নায়ের উঠেছে পাল ফুলে
> আজকে দেখি, ভানুমতীর খুলেছে মাঠের দ্বার।
>
> (বিষকন্যা)[১]

ট্রেনে চাপলে, ট্রেনে চলতে চলতেও কবি ভাবেন, দয়িতের সঙ্গে—

> "সকাল সাঁঝে দিবস রাতে আলোক আঁধিয়াবে
> ছুটছে ট্রেন ! আমরা যাবো দূর সে তেপান্তর !

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৯৮

দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে মাঠ-বন।
কাল সকালে নাববে গিয়ে কোন্ সে ইষ্টেশন॥"

(বিষকন্যা)[১]

কবির এ কল্পনা, এ যাত্রা অবশ্যই রোমান্টিক। কিন্তু তার রোম্যান্টিকতা এইখানেই শেষ হয়ে যায়নি। ধরার ধূলায় নেমে, বাস্তবের সংঘাতের সেই রোম্যান্টিকতায় সেই স্বপ্ন দিদৃক্ষায় তাঁর মানসীর এ কী মূর্তি তিনি প্রত্যক্ষ করছেন —

পার হ'য়ে মাঠঘাট পার হ'য়ে কত না নগর
এঁদো ডোবা, এঁদো ঝিল্ পার হ'য়ে কত প্রান্তর
তোমাদের দেশে এসে নাবলাম।
যতদূর দেখা যায় সারি সারি কবর শুধু
মহামারী বিষে বিষে সারাগ্রাম করিতেছে ধূ ধূ ... ...
শাহ্জাদি! শাহ্জাদি! শাহ্জাদি!
ডালিমের মত তব সুরক্তিম যৌবন প্রবাল—
কোন্ সে মায়াবী শ্বাসে পুড়ে পুড়ে হ'ল কংকাল?

(শাহজাদীর দেশে : উত্তর আকাশের তারা)[২]

এবং—

কাঁচের বরণ কন্যা—মেঘের মতন চুল—সেই ঘরে
শুধালাম : কেমন আছো?
: এতদিনে মনে প'লো? ছিন্ন কাঁথার মাঝে
ম্লানমুখ মধুমালা নীল হাসি হাসে।
: গজমোতি হার কই? মেঘ ডম্বরু শাড়ী!
মধুমালা! মধুমালা! এ কেমন দেখি?

. . ..

শুধু মশকের ডাক! মধুমালা অচেতন!
ফিরিলাম। মোরও দেহে ঘুম নামে পাছে॥

(মধুমালা : সাত ভাই চম্পা)[৩]

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. ৩৬
২ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০৩
৩ ঐ পৃ ৬০৪

আমাদের মাটির আঙিনায় প্রাত্যহিক পরিবেশে যে স্বপ্ন এবং যে বাস্তবের মুখোমুখি আমরা, অতি বিশ্বস্তভাবে তার রূপায়ণ দেখতে পাই এইভাবে আশরাফ সিদ্দিকীতে, এবং কোথাও কোথাও জীবনানন্দের দেখা পাওয়া যায় তাঁর কবিতার মধ্যে। সেখানে কবিকে আরও বিষণ্ণ এবং বিষাদক্লান্ত মনে হয়। যে সোনার মেয়ে কলসী ভাসিয়ে এসেছিল প্রাণ যমুনায়, তার মুখ ভেঙেচুরে গেছে,—

ভ'রে ওঠে তবু আঁখি
বোবা বেদনায়!
যে চাঁদ ডুবিয়া গেছে শাওন মেঘের তলে
ভ'রে ওঠে তবু আঁখি
বোবা বেদনায়!
যে চাঁদ ডুবিয়া গেছে শাওন মেঘের তলে
যে মালা শুকিয়ে গেছে
মরু সাহারায়—
তবু তারি কান্না কাঁপে কেন কাঁপে, কেন কাঁপে
উত্তর মেলেনা কোন
বাদল হাওয়ায়।"

(মেঘমল্লার উত্তর আকাশের তারা)[১]

অথবা,

একদিন চাঁদরাতে কোন এক চাঁদমুখ
এমনই মধুমাসে কবে সে
বলেছিলো যাবে নাকো ফুলের মালার মত
আমারে জড়িয়ে ধরে রবে সে।
বহুদূর বহুদূর
সে চাঁদ তো ভেঙে চূর
সে মেয়েটি ফিরে আর আসেকি?

(মায়াবী আকাশ : উত্তর আকাশের তারা)[২]

১. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ পৃ. ৬০৫
২. ঐ পৃ. ৬০৫-৬

স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন ভেঙে চুরে যাওয়া, মাটিতে আপন পরিবেশে ফিরে আসা— আশরাফ সিদ্দিকীর বৈশিষ্ট্য।

আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাঁর 'তালেব মাস্টার' ও 'মনোমোহন মাস্টার' কবিতা দুটির কথা না বললে। প্রথমটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত। তালসোনাপুরের অতি গরিব তালেব মাস্টার মড়কে ছেলেকে হারিয়েছেন বিনা চিকিৎসায়, মেয়ে তার গলায় দড়ি দিয়ে জ্বালা জুড়িয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতের সোনার দিনের আশায় তালেব মাস্টার শতছিন্ন জামা কাঁধে ফেলে এখনো তাঁর পাঠশালায় যান, নিজেকে তাঁর মনে হয়—

আমি যেন সেই হতভাগ্য বাতিওয়ালা
আলো দিয়ে বেড়াই পথে পথে কিন্তু
নিজের জীবনই অন্ধকার মালা।

(তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা)[১]

মনোমোহন মাস্টারেরও সেই একই অবস্থা, ১০০ বছরে মারা গেছেন, নিদারুণ অর্থকষ্টে ভুগেছেন, কিন্তু একদিনের জন্য কারো কাছে হাত পাতেননি। তফাতের মধ্যে এই মনমোহন মাস্টার তর্জন গর্জন করতেন, ছাত্ররা প্রচণ্ড ভয় করত তাঁকে।

নজরুলকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন আসরাফ সিদ্দিকী, ১৯৫০-এর নজরুল—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! হে আমার অকৃতজ্ঞ দেশ।
বাংলার বিদ্রোহী কবি বিনা পথ্য বিনা চিকিৎসায়
ক' পয়সা খরচ করে দেখে এসো শ্যামবাজার গিয়ে
তিলেতিলে পলেপলে অন্ধপারে চলেছে এগিয়ে!
স্ফীতোদর প্রকাশক এতক্ষণে গণছে হয়ত:
এবার কবির বই—এ লাভ হলো ক' হাজার কত॥

(নতুন কবিতা)[২]

কাজেই কবির রোমান্টিক স্বপ্নভাবনা কী প্রেমের ক্ষেত্রে, কী সংসারের সংগ্রামে কী বিপ্লবী কবির দুর্দশা দেখে ভেঙে চুরে গেছে—এ যুগের কোন কবি কি কেবল রোমান্টিক থাকতে পারেন? একালের যথার্থ কবির বা সত্যকার কবি ধর্মের স্বভাব

১. আধুনিক কবিতা পৃ: ৩৬-৩৭
২. ঐ পৃ: ৩২

তা' নয়। আসরাফ সিদ্দিকীর কবিতায় যুগের প্রতিফলন আছে। তিনি আমাদের অনেক কাছের কবি।

॥ ১৪ ॥ আবদুর রশীদ খান (১৯২৭) -এর প্রকাশিত কবিতার বই—'নক্ষত্রমানুষ মন' (১৩৫৮), 'বন্দী মুহূর্ত' (১৩৫৯) এবং 'বিস্মিত প্রহর'। প্রেমের কবিতায় তিনি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। সাদামাটা ভাষা, মাঝে মাঝে সুন্দর উপমা, যেমন কাছে কাছে থাকলেও দুটি রেল লাইনের মধ্যে সর্বদা ব্যবধান থাকে, সেইরকম প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যেও হাজার যোজন ব্যবধান থাকতে পারে, হাতে হাত রাখলেও। একটি কবিতার ভেতর দিয়ে বলেছেন—

তুমি-আমি আজো কাছে কাছে—
এই দেখো : তুমি তো আমার হাতে
তোমার কোমল হাত
আলগোছে রেখেছো এখন,
তবু জানি :
আমাদের ব্যবধান হাজারো যোজন ;
গাড়ী যায়, গাড়ী আসে,
রেললাইন সমান্তরাল,
কা'রো চোখে মিশে গেছি,
তবু মিশি নাই,
তবু কাছাকাছি :
এই রেল-লাইনের মতো।

(রেল লাইন : নক্ষত্র মানুষ মন)[১]

উল্লাপাড়া ষ্টেশন আর একটি প্রেমের কবিতা, যেখানে উনিশ বছর আগের রোশনা বেগমকে 'স্বামী পুত্র মেয়ে নাতনী নিয়ে আত্মহারা' দেখেও রওশোনের কত স্মৃতি তোলপাড় হয়ে উঠেছিল—

'কয়টি ছেলেমেয়ে' ?—
রোশনা বেগম বলেছিলেন যেন এক গা নেয়ে
বলেছিলাম, 'বিয়ে আমার হয়নি আজো, তাই'...
দীপ্তিতে এক চমক দিয়েই রোশনা বেগম হয়ে গেলেন ছাই।

---

১. আধুনিক কবিতা পৃ. ৪১-৪২

উল্লাপাড়ায় রওশন আমার চরম পরাজয়।
উল্লাপাড়ায় হারিয়ে এলাম জীবন স্বপ্নময়॥

(বন্দী মুহূর্ত)[১]

আবদুর রশীদ খান শহরের পরিবেশে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর অন্তরে প্রতিরোধ আসে। কখনো মনে হয়, শহরে

'আলখাল্লার আড়ালে ভেল্কীবাজী
ওঁৎপাতে তাই প্রাত সড়কের মোড়ে ;
বিকল মনের পেছনে বিকার যেন
ধূর্ত শিয়াল হয়ে অলক্ষ্যে ঘোরে।

ওরা বলে, নাকি এখন চেনাই দায়,
আমিও তো বলি আমিই কি সেইলোক
বাসে ফুটপাতে বাজারে রেস্তোরায়
যে লেখে চতুর হাতের পুণ্য শ্লোক ?

(বিস্মিত প্রহর)[২]

শহরে বদলে গেছেন, মানুষ দুরকম হয়ে যায়। আবার কখনো বা সন্ধ্যায় 'শহর' দেখে ভয় লাগে কবির—মনে হয় তাঁর,

"সন্ধ্যার শহর পায় ছাড়পত্র বিকৃত সত্তার।"

(বিস্মিত প্রহর)[৩]

আবার অন্য সময় শহরের কথা ভেবে মনে হয়—

দিয়েছো মাথায় ধূলি ধূসরতা,
বাড়ালে আমার রক্তের চাপ,
যন্ত্রের নামে যন্ত্রণা দিয়ে
সফল করেছো কার অভিশাপ।
সুখের অথৈ বন্যার জলে
শান্তিকে খুঁজি অশান্ত প্রাণে,

১ আধুনিক কবিতা, পৃ. ৪৩
২. ঐ পৃ. ৪৫
৩ ঐ পৃ. ৪৫

চোখ-ঝলসানো নেশার শহরে
পাইনি হদিস তার কোনখানে।

(পরিক্রম, জুলাই আগস্ট, ১৯৬৯)[১]

শহর কৃত্রিম, বিকৃত সত্তার, যন্ত্র এখানে যন্ত্রণা আনে। শান্তি পাওয়া দুরাশা। শহর সম্বন্ধে হয়ত এগুলো সঠিক, কিন্তু সবটা নয়। হয়ত কবির খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীই এজন্য দায়ী।

আবদুর রশীদ খানের কবিঅন্তরে কী একটা যন্ত্রণা আছে, বেদনা ও দুঃখের অনুরণন ঝঙ্কৃত তার প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই। কবি স্বস্থ হতে পারেননি। বৃথাই তাই শূন্যতাবোধ তাঁর—

আশা কি আকাঙ্ক্ষা নয়, সুখ নয়, বেদনাও নয়,
অন্তহীন শূন্যতার মর্মমূলে কী এক অক্ষয়
মৃণালে পরম তৃপ্তি।

সেই তৃপ্তি কবরে শোয়ায়ে
শূন্যতার যন্ত্রণায় সীমাহীন ক্লান্তির শরীরে
এখন গলির মুখে অন্ধকারে আমরা ক'জন।

(যন্ত্রণার অন্ধকারে আমরা কজন : বিস্মিত প্রহর)[২]

এই যন্ত্রণার অন্ধকার থেকে আবদুর রশীদ খান মুক্তি পাননি—অথবা মুক্তি তিনি পেতে চান না!

॥ ১৫ ॥ পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল সংগ্রামী কবিদের অন্যতম মযহারুল ইসলাম (১৯২৭)। প্রকাশিত কবিতার বই—'মাটির ফসল' (১৯৫৫), 'বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি' (১৯৭৬) ও 'আর্তনাদে বিবর্ণ' (১৯৭০)।

প্রথম কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন মযহারুল ইসলাম। মাটির স্বপ্ন ও মানুষের প্রেম তার চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু সংগ্রামের কবি তিনি। পথ চিনে নিয়েছেন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে এই সংগ্রামী চেতনা ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কোটি মানুষের অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত :

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৪৮ ৫০
২. ঐ পৃ. ৪৭

কোটি মানুষের হৃদয়ে মুখর হয়
রৌদ্র রাঙা শপথের স্বাক্ষর
: আমরা বাঁচতে চাই।
: আমরা বাঁচতে চাই।
এই অগ্নিবলয়ের প্রান্তে
সরব হয়েছে অগণিত মানুষের দল
ঝড়ে ঝাপটায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তরী
ভিড়েছে এই আলোর উপান্তে
যেখান থেকে ইতিহাসের যাত্রারম্ভ
যেখান থেকে সব মিছিলের
নব দিগন্তে পদ সঞ্চার।

(অগ্নিবলয়ের প্রান্তে : বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি)[১]

শান্তি কামনা, শান্তি প্রার্থনা মানুষের সহজাত। 'শিলাইদহে সন্ধ্যা' কবিতায় সেই শান্তির প্রার্থনা বিশ্বমানবের হয়ে :

শান্তি দাও আমাদের, আমরা শান্তির ছায়াকামী
আমরা শান্তির ছায়াকামী
হিংসার বহ্নিশিখা এ মাটিতে আর জ্বালাবো না।

(বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি)[২]

কিন্তু, সভ্যতা, সমাজ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে? কোন সংশয় নেই সে সম্পর্কে আমাদের এই কবির—

একথা বলতে দ্বিধা নেই আর কোনো
আমরা এখন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে
যতই না আজ সূর্য স্বপ্ন বোনো
মৃত্যু আঁধার আসছে হস্ত বাড়িয়ে।

(একটি সত্য ভাষণ : বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি)[৩]

কিন্তু দারুণ এ হতাশা গ্লানির চিত্র এঁকেই কবি তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি।

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৫১-৫২
২. ঐ পৃ. ৫৩
৩. ঐ পৃ. ৫৩

আর্তনাদে বিবর্ণ কবি। তবু তিনি পথ খুঁজে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। অত্যাচার, সন্ত্রাস থেকে মুক্তির জন্য কথা বলেছেন।

শ্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন কবি। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে বেশিরভাগ সময় ছড়ার ছন্দে জ্বালা ধরানো কবিতা লিখেছেন। আর্তনাদে বিবর্ণ একটি জ্বলে-পুড়ে যাওয়া হৃদয়ের মর্মন্তুদ বিবরণ। মানুষ যে কী পরিমাণ উত্তক্ত ও সন্ত্রাস কবলিত হলে এধরনের কাব্য রচনা করতে পারে, কাব্যগ্রন্থটি তার প্রমাণ। মানুষের সত্তা যে হাজার অত্যাচারেও মরে যায় না, কাব্যটি পড়ে তা বুঝতে পারি।

৩৮টি কবিতার সঙ্কলন। অনেকগুলি ছড়ার ছন্দে আয়ুব খানের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অঙ্গার এক একটি ছোট কবিতা। সবগুলোই এখন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। অধিকাংশ কবিতা কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে একাধিকবার প্রচারিত হয়েছে, এবঙ্গে সমাদৃত হয়েছে। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছড়াগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। কয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি—

১. ঘুণ ধরেছে বাতাস গুলোর
পাঁজর জুড়ে
তোমার আমার মুখে চোখে তা
পড়ছে উড়ে,
পড়ুক, তবু কলম পিষে
দিনের শেষে হারিয়ে দিশে
উন্নতি যে কখন কিসে
এ-ভাবনাতেই মগ্ন আমি
উপায় খুঁজি যখন যেমন
উর্দ্ধে উঠি পঙ্কে নামি।

(ঘুণ : আর্তনাদে বিবর্ণ)[১]

২. ঝড় ভেঙেছে আবাস
অগ্নি-দাহন প্রাণে
বহ্নিশিখার আভাস
জীবন জুড়ে আনে।

১. মযহারুল ইসলাম (১৯৭০), আর্তনাদে বিবর্ণ, পৃ. ২২, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, রংপুর।

জীবন ঝালা পালা
দুষ্ট গ্রহের ফেরে,
শনির দৃষ্টি-জ্বালা
শান্তি নিল কেড়ে

(পিণ্ডিতে সিন্নি : আর্তনাদে বিবর্ণ)[১]

৩.　এই তো সবে দেখে এলাম সারা জাহান ঘুরে
কেউতো কোথাও গান ধরে না মোদের মত
এমন বিকট সুরে।
দেখে এলাম গরুর জাতি, সভ্য বটে
কেমন মধুর ডাকে হাম্বা রবে
সবাই যদি চেষ্টা করি, ব্যাঙের জাতি, শিখতে পারে তবে,
শোনো সবাই-আমরা এসো শপথ করি আজ
গরুর মতন সভ্য হব, বাক্য কবো, ফিরবো ধরার মাঝ,
ভেকের জাতির সব কলঙ্ক মুছে
গরুর মতন সভ্য হলে কুদিন যাবে ঘুচে।

(দেশ বেড়ানো ব্যাঙ)[২]

৪.　ইসলামাবাদ কাঁপিয়ে মর্দ হেঁকেছেন হুঙ্কার
চট্টগ্রামের পাহাড়ের গায়ে ঠেকেছে শব্দ তার
বলেছেন তিনি গরু আর মেষ
এই নিয়ে আছে বঙ্গাল দেশ
দিয়ে দাও কিছু ঘাস ও বিচালি আহারের সম্ভার
জাবর কাটবে, আরামে ঘুমুবে নীরবে নির্বিকার।

সে আদেশ তার পালিত হয়েছে এসেছে বিচালি ঘাস
বদলাতে তার ঘরে ঘরে জাগে বিদ্রোহ প্রতিভাস

---

১. মযহারুল ইসলাম (১৯৭০), আর্তনাদে বিবর্ণ, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, পৃ. ৩০
২. আর্তনাদে বিবর্ণ পৃ. ৫১

প্রতিধ্বনিতে কাঁপে এ বঙ্গ
ইসলামাবাদে জাগে আতঙ্ক
প্রাণ পাখী তার দেহ ছেড়ে যায় পড়ে থাকে শুধু লাস
এতো বাহাদুর ! হায়রে মর্দ ! ভাগ্যের পরিহাস।

(ভাগ্যের পরিহাস)[১]

মযহারুল ইসলাম কবি হিসেবে তাঁর সংগ্রামী দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। তাঁর কাব্য ও কবিতা প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়েছে। আরও একটা কথা। পূর্ববঙ্গের ব্যঙ্গ কবিতার শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর কবিতাবলী একদিকে যেমন ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল, মানুষের সংগ্রামী চেতনার জলন্ত বহিঃপ্রকাশ, তেমনি কাব্য কলাকৃতির ক্ষেত্রেও উজ্জল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, শ্লেষ, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তিতে শানিত, ধারালো, এবং জিগীষু যোদ্ধার প্রতিজ্ঞাপত্র।

॥ ১৬ ॥ রফিক আজাদ (?) এর কাব্য গ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস' (১৯৭১) এবং 'অসম্ভবের পায়ে' (১৯৭৩)। তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয়, ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণাকে পায়ে মাড়িয়ে চলছেন, অন্ধকারে শ্বাসরুদ্ধ, তার করাল দ্রংষ্টায় ক্ষত-বিক্ষত, সে যেন বাঘিনীর মত তাড়া করছে কবিকে—আর কবি—

ভয় পেতে পেতে আমি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে
দৌড়ালাম
আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে আমি চীৎকার করে
উঠলাম
শেষ অব্দি আমাকে সে তার থাবার নাগালে পেলো
এবং আমার বুকে একটা ঝক্‌ঝকে নতুন হাসি আমূলে
বসিয়ে দিলো।
কিছুক্ষণ খেলিয়ে নিয়ে আমায় তাজা রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে সে
চলে গ্যালো
আর বন্দরের উপান্তে পরিত্যক্ত রক্তাক্ত শব
পড়ে রইলো।

(বাঘিনী আমার শব : অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস)[২]

১. আর্তনাদে বিবর্ণ, পৃ. ৭৬-৭৭
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. ২৫৩

এই সমাজ এবং সময়ের অতি বাস্তব রূপায়ণ তাঁর কবিতায়,—

সমুদ্র অনেক দূর, নগরের ধারে কাছে নেই :
চারপাশে অগভীর অস্বচ্ছ মলিন জলরাশি ।
রক্ত-পুঁজে মাখামাখি আমাদের ভালবাসাবাসি ;
এখন পাবোনা আর সুস্থতার আকাঙ্ক্ষার খেই ।

(নগর ধ্বংসের আগে : অসম্ভবের পায়ে)[১]

আরও—

দুঃস্বপ্নে উত্যক্ত আমি এই দ্যাখো, তোমার সন্তান
মুখ গুঁজে পড়ে আছে, বালুকায়, দুরূহ সময়ে ॥

(জন্মদাতার প্রতি)[২]

জীবনটা তুচ্ছ নয় অথচ মৃত্যুর করাল ছায়া যেন সবত্র বিস্তৃত, "স্বগত মৃত্যুর পটভূমি দেখছেন, বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তেই" 'শেষ—নেই—দুঃখের অবসান চাচ্ছেন'

পিছলিয়ে পড়ে গ্যালে, ব্যাস ।
যদিও লাঠিই আমাদের
তৃতীয় পায়ের থেকে ঢের দৃঢ়
তবুও ঘৃণাই হাতে ধরে আছি ক্ষীণায়ু জীবন
মৃত্যুকেই ভালবাসি
জীবনটা তুচ্ছ নয় বলে ।

(দুজন বৃদ্ধ বলছেন : অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস)[৩]

অথবা—

প্রতিটি মুহূর্তে তুমি অগ্রসরমান
মহান মৃত্যুর দিকে,

(মূর্খের মতন শুধু)[৪]

কবিকে এই সভ্যতা যেন গণিকার মত গ্রাস করতে চাচ্ছে, 'ধাধা অন্ধকার'

১. রফিক আজাদ, (১৯৭১) অসম্ভবের পায়ে, ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা, পৃ. ১২
২. ঐ ঐ ঐ পৃ. ২৪
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. ২৫২
৪. অসম্ভবের পায়ে, পৃ. ৪৪

দেখছেন, বিফল রোদনে শেষ অশ্রুবিন্দু নীরবেই ত্যাগ করে যান (হে দরোজা) অথবা 'কেবল চোখের জলে ভরে দিতে পারি একটি অদৃশ্য শুষ্ক বঙ্গোপসাগর'।

(স্মৃতি, চাঁদের মতো ঘড়ি)[১]

অথচ কাঁড়ি কাঁড়ি স্বপ্ন কবির, অবাস্তব রাজহাঁসের আকাঙ্ক্ষায় থাকেন, 'নৈশ প্রার্থনা' তাঁর—

'বন্ধুদের বলবোনা,······মধ্যরাতে তবু
গোলাপ ফুটুক এক······নিঃসঙ্গ করুণ।
এবং আমার চেতনায়, সেই বিশুদ্ধ গোলাপ
মৃত্যুর মতন চিরস্মরণীয় হোক॥

(নৈশপ্রার্থনা)[২]

এবং

বিধ্বস্ত মনোধি রাজ্যে ঠাণ্ডা, গাঢ় শিশিরে, সবুজে, ভাসমান কেশগুচ্ছ,
বঙ্কিম গ্রীবায়, ঠোঁটে, বাহুমূলে, প্রিয়তমা, পুঁতে দিই প্রগাঢ় চুম্বন:
তুমি জ্ব'লো বৈপরীত্য চান্দ্রক্রোধ, হার্দ্যাবেগ, স্নিগ্ধ স্বর্ণ-পুরানো প্রদীপ।
এবং এখন ছাখো: 'নীলিমা নিমগ্ন আমি, চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা'॥

(মনোভূমি বনোভূমি)[৩]

আরও

সাজানো বাগানে ঝলমলে আলোকের চাষ ক'রে
অভিজ্ঞতা আছে, প্রত্যূষের কোমল, পাতলা, মিহি
স্নগন্ধি রোদের চাষ। এবার আমার ক্ষেতখানি
সুরভিত কুয়াশায় ভ'রে তুলি যত্নে, পরিশ্রমে।

(কুয়াশার চাষ)[৪]

যদিও রফিক সাহেব জানেন স্বপ্ন এবং বাস্তবে এখন আকাশ পাতাল তফাৎ, ক্ষুধা এখন সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে—

১. অসম্ভবের পায়ে, পৃ. ৪
২. ঐ পৃ. ৩৮
৩. ঐ পৃ. ৫৮
৪ ঐ পৃ. ৫৪

একাকী ভ্রমণ সেরে ফিরে এলো
আমার কুকুর,
বললো সে : 'প্রভু,
মানুষ আসলে ফুল পছন্দ করে না ; তার চেয়ে
রুটি ও সব্জীর গন্ধ ওরা বেশি ভালবাসে। তবু
'গোলাপ, গোলাপ' ব'লে চীৎকার করা ওদের স্বভাব,—
একজন গোলাপ-সুন্দরী একঘণ্টা ব্যাপী শুধু
এই-কথা আমাকে বোঝালো।

(ক্ষুধা ও শিল্প)[১]

এবং এই পচা গলা সমাজ ব্যবস্থা কী দারুণ অংক্ষর্য :

জ্যোৎস্নাকে আমার চাই, জ্যোৎস্নাকে ভীষণ প্রয়োজন।
'জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না' ব'লে হেঁকে চতুর্দিকে শাড়ীর আঁধার !
এই ভীড়ে কী-করে যে খুঁজে পাবো তাকে,
নিজস্ব জ্যোৎস্নাকে ?

দারুণ রংগুড়ে এক কৃষ্ণ-শাড়ি এসে
'কী ব্যাপার রফিক সাহেব ? কাকে চাই, জ্যোৎস্নাকে তো ?
-জ্যোৎস্না আর নেই ; সেদিন দুপুর রাতে
তাকে এই মহল্লার ক'জন বিখ্যাত বদমাশ
ফুসলিয়ে নিয়ে গ্যাছে নগরের বাইরে কোথাও……'
-ব'লে অর্থপূর্ণ হেসে
আমার চোখের মধ্যে অন্ধকার হেনে চ'লে গ্যালো !!

(জ্যোৎস্না আর নেই)[২]

রফিক আজাদ নানান যন্ত্রণায় পুড়ে মরছেন, শুদ্ধ জীবনের জন্য আগ্রহ তাঁর, কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকা ছাড়া কিছু দেখতে পান না, মৃত্যুকে তাঁর মহান মনে হয়, হয়ত এও নিদারুণ ব্যঙ্গ, কিন্তু জলে পুড়ে মরতে মরতেও উদ্ধার পাবার কোন নির্দিষ্ট পথের সন্ধান তিনি জানেন না ! তাই স্বপ্ন দেখলেও তা স্বপ্নের পর্যায়েই রয়ে যায়।

১. অসম্ভবের পায়ে, পৃ. ৪২
২. ঐ পৃ. ৩২

রফিক আজাদ কবিতা নিয়ে, অঙ্গসজ্জা নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। সফল হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ

১. "...আমার প্রেয়সী পাখী হ'য়ে গ্যালো, হায়!"

(স্বগত মৃত্যুর পটভূমি)[১]

২. ডাকি তাকে
অকপটে বন্ধুর মতন
আকাঙ্ক্ষায়:
'আয়,
আয়,
আয়,

. ...., (অবাস্তব রাজহাঁসের আকাঙ্ক্ষায়)[২]

শব্দ ব্যবহারে, উপমা প্রয়োগে আঙ্গিকেও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সনেটগুলি সুগ্রথিত। রফিক আজাদ কবিতা লিখতে জানেন। তিনি তাঁর রোগশয্যা থেকে, মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে উত্তরণও চান—

দূষিত আলোক থেকে
প্রতিশ্রুত অন্ধকারে সিঁড়িহীন পিচ্ছিল পথে
—মদের পিপের মতো গড়িয়ে চলছি
অন্য কোনো গ্রহের উদ্দেশে

সেই গ্রহে
কোনো কাম্নসিক ক্ষুধা ও পিপাসা থাকবে না-
মানুষ যেখানে
ব্যতীত কোমল স্বপ্ন
অন্য খাদ্য গ্রহণও করবে না।'

(বাতাসের উল্টোদিকে যাত্রা)[৩]

১. অসম্ভবের পায়ে, পৃ. ১৪
২. ঐ পৃ. ৩৯
৩. ঐ পৃ. ৩১

॥ ১৭ ॥ পূর্ব বাঙ্‌লার কাব্য আন্দোলনে কবি শামসুর রহমান (১৯২৯) একটি অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র—স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি বহু আলোচিত কবিদের অন্যতম।

ওদেশের কাব্য সাহিত্যে পালা বদলের কাল হিসেবে ১৯৫২ সালটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। পঞ্চম দশকের কবিরা ত্রিশের যুগের আবহাওয়া পরিমণ্ডল থেকে নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। ত্রিশের দশকে যে গীতিকবিতা দেখা গিয়েছিল, যে রোম্যান্টিকতা বিদ্যমান ছিল, পরবর্তী যুগে তা স্তিমিত। ঐ যুগে কবির স্থান ছিল কবিতার পরে, কিন্তু পরবর্তীকালে কবি তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সম্যক সচেতন।

এই ধারার কবি শামসুর রহমান। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্‌লায় যে নতুন কবিগোষ্ঠী সমাজ, পরিবেশ জীবন ও দেশের পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে কাব্যের রস আহরণ করলেন, আত্মস্থ করলেন, প্রকাশ করলেন, প্রচার করলেন, শামসুর রহমান তাঁদের অন্যতম।

তিনি বুদ্ধিবাদী কবি। যদিও তাঁর অনবদ্য সব কবিতার উৎস মুখ হৃদয়ের গভীরে, তাহলেও আবেগের চেয়ে বুদ্ধিকেই তিনি বেশ প্রাধান্য দিয়েছেন, আবহমানকালের যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যের ধারার সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেয়েছেন। অথচ অত্যন্ত সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ কবি তিনি।

প্রকাশিত কবিতার বই: ১. 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৩৬৬) ২. 'রৌদ্র করোটিতে' (১৩৭০) ৩. 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৩৭৩) ৪. 'নিজবাস ভূমে' ও ৫. 'নিরালোকে দিব্যরথ'।

কবিতা পুস্তকগুলির নাম পর্যালোচনা করতে গেলে দেখা যায়, আধুনিক যুগ-জীবন ও সামাজিক পরিবেশের অনিশ্চয়তা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অন্ধকার, অনিয়মিতত্তা, অসমতা, অক্ষমতা, ও অনিত্যতা কবিকে পীড়িত করছে, স্বস্তি,শান্তি, সুখ দিচ্ছে না, তাই মৃত্যুর কথা বারবার এসে পড়ছে, মৃত্যুর নিরিখে বিচার করতে হচ্ছে সবকিছু, হেরে যাওয়া, পিছিয়ে যাওয়া ভাব একটা, যদিও স্বপ্ন কবির অন্তরে এবং মস্তিষ্কে বাসা বেঁধেছে, যদিও, মৃত্যুর পর করোটিতে রৌদ্রের জীয়ন কাঠি ছোঁয়াতে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নীলিমা বিধ্বস্ত, বিধস্ত—এ যুগের অনেক কিছুই-সমাজ, মন, মানুষ, মূল্যবোধ! কিন্তু তবু নিজ বাসভূমির কথা কবির মানসে—এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি হতাশ হতে পারেন না—এতসব অসঙ্গতি এবং অবক্ষয়ের মধ্যে অন্ধকারে নিরালোকে দিব্যরথ দেখেন তিনি।

নিরালোকে দিব্যরথ পুস্তকটি এদেশের কবি বিষ্ণু দের নামে উৎসর্গীকৃত। বাঙ্‌লাদেশ হবার আগেই এই উৎসর্গপত্র রচিত। দুই বাঙ্‌লার কবিদের মানস

প্রবণতার সাযুজ্যই প্রমাণিত হয় এতে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠার আকুল আকাঙ্ক্ষারই প্রমাণ এটি। বস্তুতঃ কবির মহানুভব ও উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায় এতে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষ্ণু দেও পশ্চিম বাঙ্লার বুদ্ধিবৃত্তি প্রধান কবি। এদিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে শামসুর রহমানের চরিত্র ও কবিতার মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রকাশ ভঙ্গীতে, শব্দ ব্যবহারেও যেন বিষ্ণু দে অনুসারী তিনি, অনেক সময় যে দুর্বোধ্যতা তাঁর কাব্যে বিদ্যমান তাও বিষ্ণু দে-তে প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

শামসুর রহমান যদিও জীবনের অবক্ষয়, অবদমন ও অশান্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, এঁকেছেন, তবুও এর মূল্যবোধের প্রতি তাঁর মমতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তিনি সুস্থ সুন্দর স্বপ্ন থেকে কোনদিন বিচ্যুত হতে পারেননি। যদিও কিভাবে সে স্বপ্নের রূপায়ণ সম্ভব, কী ভাবে আসবে উত্তরণ, নিরালোকে দিব্যরথ আনবার পূর্ব প্রস্তুতি কী হবে সে সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ হননি, যে প্রচণ্ড সাহস, শক্তি এবং সংগ্রাম দরকার, সে বিষয়ে সরব হতে দেখি না।

এ ক্ষেত্রে তাঁকে কিছুটা সীমাবদ্ধ মনে হয়, যেন মার খাওয়া জর্জরিত মানবাত্মা বন্দী আছেন, বুঝছেন নিজের সঙ্গিন অবস্থা, জানছেন বিষাক্ত পারিপার্শ্বিকতা, কিন্তু মুক্তি কোন্ পথে, সে নির্দেশ দেবার সামর্থ নেই তাঁর।

অথচ তিনি জীবনকে দূরে সরিয়ে রাখেননি—বরং বারবার জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। কিন্তু কোন ঋণাত্মক মতাদর্শ, কোন বিশ্বাস বা আস্থা কেন দেখতে পাই না তাঁর কাব্যে? এ কি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা? কিন্তু এ চেষ্টায় সৎ কবি কি কখনো সফল হতে পারবেন?

সৎকবি শামসুর রহমান এই জন্যই যে তিনি শুধু শিল্পের জন্য শিল্পে বিশ্বাসী নন, শিল্প সর্বস্ব নিরঙ্কুশ কবিতাই শুধু তাঁর কাম্য নয়। মালার্মের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মালার্মে নিরঙ্কুশ শিল্প সর্বস্ব কবিতাতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সমাজ যেখানে নির্দ্বন্দ্ব নয়, শিল্প সেখানে নিরঙ্কুশ হতে পারে না। তাই ঐ বিশ্বাসে অবিচল হয়েও মালার্মেকে বিচরণ করতে দেখি জীবনের বিস্তীর্ণ বহু বিস্রস্ত জটিলতার মধ্যে। কিন্তু শামসুর রহমান কি তাই? শামসুর রহমানের মধ্যে আমরা দেখি একটা যন্ত্রণা, জ্বালা, অসামঞ্জস্যজনিত ক্ষোভ, কখনো তিনি বা বিদ্রূপে ও ব্যঙ্গে সোচ্চার—যা মালার্মেতে একান্তই দুর্লভ।

শামসুর রহমানের কাছে এই জন্যই আমাদের এখনো অনেক কিছু প্রত্যাশার।

প্রথমতঃ, তিনি সৎ কবি। দৃষ্টির প্রাখর্য আছে, বুদ্ধির দীপ্তি আছে, মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন তিনি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কাব্যের আঙ্গিক ও উপকরণে তিনি এক জায়গায় থেমে থাকেননি। উপমা, চিত্রকল্প, প্রতীক, ঐতিহ্য ও উপকরণ দেখে মনে হয় তিনি এগিয়েই গেছেন উত্তরোত্তর। তৃতীয়তঃ, তাঁর কবি সত্তার বৈশিষ্ট্য অবিসংবাদিত, তাঁকে সহজেই চেনা যায়, কবিতা তাঁর স্বতোৎসারিত, বিশিষ্টতামণ্ডিত। চতুর্থতঃ, তার কবিসত্তা ও কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তার কবিতা পাঠককে পড়তেই হবে এবং পাঠকের মনকে গভীর-ভাবে নাড়া দেবেই, সাড়া জাগাবেই, ভাবিয়ে তুলবেই, মস্তিষ্কের কোষে জ্বালা ধরাবেই।

কবির আকাঙ্ক্ষা কী ছিল? পৃথিবীতে এসে রূপালী স্নানের অনুভূতি স্পন্দন জাগিয়েছিল তার হৃদয়ে ঃ—

> শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
> অথবা প্রখর ধূ ধূ পিপাসার আজলা ভরানো পাণীয়ের খোঁজ
> শান্ত সোনালী আল্পনাময় অপরাহ্নের কাছে এসে রোজ
> চাইনিতো আমি। দৈনন্দিন পৃথিবীর পথে চাইনি শুধুই
> শুকনো রুটির টক স্বাদ আর তৃষ্ণার জল।

(রূপালী স্নান : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[১]

কিন্তু যে সমাজে তিনি বাস করেন, তার অবস্থা কী? সেখানে অভাব, অনিশ্চয়তা। শ্রান্ত, ক্লান্ত দুর্বিষহ রূপ এ জীবনের। কবি তাই রুটির কাছ থেকে দূরে যেতে পারলেন না, জীবনের বিশীর্ণ বিবর্ণ রূপকে কবিতায় ধরতে যত্নবান হলেন—

> শুয়ে আছে একজন নিরিবিলি ভোরের শয্যায়
> শীত গোধূলির শীর্ণ শব্দহীন নদীর মতন
> শিথিল শরীর তার লেগে আছে ফ্যাকাশে চাদরে।

(তার শয্যার পাশে : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[২]

এবং—

> লোবানের ঘ্রাণ সহজেই

১ আধুনিক কবিতা, পৃঃ একষট্টি
২. ঐ ঐ

ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে ; নীল আঙুলের
প্রান্তে বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।

(প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[১]

মৃত্যুর বাস্তবতাই কবির চিত্তকে বারবার ব্যথিত, মথিত করছে।

'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' কাব্য গ্রন্থে কবি যে পৃথিবীর কথা বলেছেন, তা বিষণ্ণ, মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন যেন তিনি। ক্ষয় এবং বিলয়ের দৃশ্য দেখছেন কবি। পৃথিবীর এক ভয়াবহ মানচিত্র আঁকছেন শামসুর রহমান,—

সেখানে গভীর খাদ আছে এক কুটিল ভয়াল :
অতিকায় সিংহের হাঁ-য়ের মতো অদ্ভুত শূন্যতা
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত তাঁর, আদিগন্ত বিভ্রমে বিহ্বল।
অতল গহ্বরে সেই আছে শুধু পাঁক, শুধু পাঁক।
আকাঙ্ক্ষিত ফুলদল, লতাগুল্ম, পদ্মের মৃণাল
অথবা অপ্রতিরোধ্য পিচ্ছিল শৈবাল, এমনকি
গলিত শবের কীট, কৃমিপুঞ্জ—ঘৃণিত, জটিল—
কিছুই জন্মে না তাতে, মৃত্যু ছাড়া জন্মে না কিছুই।

(খাদ, প্রথম গান : দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[২]

কবি কিছুতেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা বৈগুণ্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারছেন না। 'এ কোন দেশ!' এখানে সূর্যহীন অজ্ঞাতবাসে হৃদয়ে অন্ধকারে শুধুই প্রেতের গান—'নেই কোন সমুজ্জ্বল মুখ'! অথচ ছিল তো তাঁর স্বর্গদীপ্ত প্রাণ—

যে চেতনা এলো ফিরে দুঃস্বপ্নের কুয়াশা চিরে
জীবনে আমার অন্ধ নিয়তির মত দুর্নিবার,
চাইনি এমন আলো অভিসন্ধি যার নিমেষেই
নরক বিলাসী শুধু লুব্ধ এক তৃষিত কোরাসে।
এখন যে অগ্নিকুণ্ড দাহ আনে কে তাকে নিভাবে
প্রসন্ন রূপালী জলে? সূর্যহীন হয়েছে এখন
যে হৃদয় অনেক অজ্ঞাতবাসে, অন্ধকারে তার

১. আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃ. ৩০৮
২. আধুনিক কবিতা পৃ. বাষট্টি

শুধুই প্রেতের গান—নেই কোন সমুজ্জ্বল মুখ।

স্বর্গদীপ্ত প্রাণ নিয়ে এসে এ কোথায় কোন দেশে
হারিয়ে ফেলেছি রূপ পশুর রোমশ অন্ধকারে ?
এখানে মড়ার খুলি ধুলোয় গড়ায় চারদিকে,
খেলার খুঁটির মতো অসহায়, ভবিষ্যৎ হীন।

(পূর্বলেখ : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[১]

ঐ যে 'ভবিষ্যৎহীন' কথাটা, এটা কিন্তু হতাশার কথা নয়, কবি এক ভবিষ্যতের আশা করেছেন বলেই কথাটা বলা হয়েছে। বস্তুতঃ কবি চান জীবনের পরিপূর্ণতা, সেই চাওয়া :

এ্যাপোলো তোমার মেধাবী হাসির সোনালি ঝরণা
শিশু পৃথিবীর ধূসর পাহাড়ে কখনো কি রবে লুপ্ত ?

আমরা এখানে পাইনি কখনো বন্ধু তোমার
সোনালি রূপালি গানের গভীর ঝঙ্কার,
শাণিত নদীর নিবিড় বাতাস মানবীর মতো তাকে চেতনার রাত্রে,
তবুও এখানে আমরা সবাই বিবর্ণ রোগী পৃথিবীর পথে,
হৃদয়ের রঙ মনের তীক্ষ্ণ ক্ষমতা ফেলেছি হারিয়ে।

(এ্যাপোলোর জন্য প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)[২]

দ্বিতীয় কাব্য 'রৌদ্র করোটিতে' শামসুর রহমানের অগ্রসরমানতা লক্ষ্য করি দুটি দিক থেকে। প্রথমে যে প্রাণহীন মৃত্যুর ছবি এঁকেছেন পূর্ববর্তী গ্রন্থে, তার তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থে কিছুটা প্রাণের সঞ্চার লক্ষ্য করি। দ্বিতীয়তঃ, কাব্য কলাকৃতির দিক থেকে তাঁর উন্নতি আশ্চর্য এবং নতুন, পূর্ব গ্রন্থের মত আড়ষ্টতা নেই, তাঁর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাব্যাঙ্গনে নিজস্ব বিচরণক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন, তিনি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়—

একটি প্রখর পাখি ঠুকরে দেয় অবিরত
পোকা খাওয়া মূল্যবোধ। আমরা যে যারমত পথ চলি
দেখি বুড়ো লোকটা পার্কের বেঞ্চে বসে হাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০৮
২. আধুনিক কবিতা পৃ. বাষট্টি

অভিশাপ ছুঁড়ে দেয়, গাল পাড়ে ভিখারীকে আর
উদ্ধি পড়া সরুগলি চমকায় নগ্ন ইসারায়,
বেকার যুবক দৃষ্টি ছায় সিনেমার প্ল্যাকার্ডের
রঙ চঙে ঠোঁটে, বুকে আর মদির উরুতে।

(ছুঁচোর কীর্তন : রৌদ্র করোটিতে)[১]

'রৌদ্র করোটিতে' শামসুর রহমানের কবি মানসের দু'টি রূপ প্রত্যক্ষ করি। প্রথমতঃ, মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে তিনি বাঁচতে চাইছেন, স্বপ্ন দেখছেন, পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরছে, উজ্জ্বল আঁশের মতো ধ্বনি ঝরছে, অথবা প্রত্যক্ষ করছেন, ক্ষুধার্ত বালকরা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তন্দুরের তাপের আশায়, অথবা পৃথিবীতে জীবনের দান গানে গানে, প্রাণ লোকে খুঁজে ফিরছেন অপমৃত্যু সুন্দরের স্মৃতি—

১. পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ চেয়েছে চাঁদের কাছে বুঝি
একটি অদ্ভুত স্বপ্ন তাই রাত্রি তাকে দিল উপহার
বিষাদের বিস্রত তনিমা
যেন সে দুর্মর কাপালিক
চন্দ্রমার করোটিতে আকণ্ঠ করবে পান সুতীব্র মদিরা
পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরে
হরিণের কানের মতন পাতা ঝরে ধ্বনি ঝরে
উজ্জ্বল আঁশের মতো ধ্বনি ঝরে ঝরে ধ্বনি
ঝরে পৃথিবীতে।

(পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ : রৌদ্র করোটিতে)[২]

২. রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়
অধিক ঘনিষ্ঠ হ'ল তন্দুরের তাপের আশায়।

(তিনটি বালক : রৌদ্র করোটিতে)[৩]

৩. বাঁচার আনন্দে আমি চেতনার তটে
প্রত্যহ ফোটাই ফুল, জ্বালি দীপাবলী
ধ্যানী অন্ধকারে। আর মৃত্যুকে অমোঘ

১. আধুনিক কবি ও কবিতা পৃ ৩০৯
২. আধুনিক কবিতা, পৃ. তেষট্টি
৩. আধুনিক কবিতা, পৃ. ৬৪

জেনেও স্বপ্নের পথে, জেনেও আমার
পৃথিবীকে খুঁজি
জীবনের দান গানে গানে, প্রাণলোকে
খুঁজে ফিরি অপমৃত সুন্দরের-স্মৃতি।

(ঘূর্ণাবর্ত : প্রথম গান, রৌদ্র করোটিতে)[১]

মৃত্যুকে অমোঘ জেনেও এখানে তিনি স্বপ্নের পথে পৃথিবীকে খুঁজছেন, বাঁচার আনন্দে, চেতনার তটে ফুল ফোটাচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁর কবি মানস এই পৃথিবীর মলিনতা, রুক্ষতা, প্রত্যক্ষ করছেন, কুৎসিত নগ্নতা চোখে পড়ছে, মানুষ জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ছে, ভীরু মেষের মত ব্যবহার করছে, কেউ কেউ বা মুখোশ পরছে। সাংঘাতিক অবস্থা এ দেশের, যেখানে জ্যান্ত মানুষ ভাগাড়ে ঘুমোয় আর রাস্তায় জটলা করে হায়েনা, নেকড়ের পাল, গোখরো, শকুন প্রভৃতি। এখানে কবির দৃষ্টিভঙ্গী তির্যক, ব্যঙ্গের বিদ্রূপের সাহায্য নিয়েছেন, মনের জ্বালা মেটাতে চেয়েছেন বিদ্রূপের কশাঘাতে—

১. মেষরে মেষ, তুই আছিস বেশ,
মনে চিন্তার নেইকো লেশ।
ডানে বললে ঘুরিস ডানে,
বামে বললে বামে।
হাবে ভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষধামে।

(মেষ তন্ত্র : রৌদ্র করোটিতে)[২]

২. ঐরাবতের খেয়াল খুশির ধন্দায়
ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়।
প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে
যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে।
সেই চালে ভাই মিত্র কিম্বা শত্তুর
চলছে সবাই—মস্ত সহায় হাতীর শুঁড়।

(হাতির শুঁড় : রৌদ্র করোটিতে)[৩]

---

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. চৌষট্টি
২. ঐ চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি
৩. ঐ , পঁয়ষট্টি

৩. এদেশে হায়েনা, নেকড়ের পাল,
গোখরো, শকুন, জিন কি বেতাল
জটলা পাকায় রাস্তার ধারে।
জ্যান্ত মানুষ ঘুমায় ভাগাড়ে।
এ দেশে আ'মরি যখন তখন
বারোভূতে খায় বেশ্যার ধন।
পাননাকো হুঁকো জ্ঞানী গুণী জন,
প্রভুরা রাখেন ঠগেদের মন।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রৌদ্র করোটিতে)[১]

'বিধ্বস্ত নীলিমা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই বোধ আরও ছড়িয়ে দিয়েছেন, তীব্র তীক্ষ্ণ হয়েছে, শব্দাবলী চয়নে আরও মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পৃথিবীর রূপ কবির চোখে একই থেকে গেছে, জীবনের বোধগুলো হারিয়ে যাবার বেদনা ও যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করছেন এখানেও কবি। বস্তুতঃ, তাঁর অঙ্কিত চিত্রাবলীতে একটি অস্থির, অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতাশাগ্রস্ত সমাজ জীবনের রূপ পেয়েছে—

১. চতুর্দিকে যে বিচিত্র চিত্রশালা দেখি রাত্রিদিন
তাতে সব ব্যঙ্গচিত্র। চোখ জুড়ে আছে কিমাকার
জীবন মথিত দৃশ্য : বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের
আত্মার সদ্গতি ক'রে সম্মিলিত শৃগাল ভালুক,
ফিরে আসে ময়লা গুহায়।

(বামনের দেশে : বিধ্বস্ত নীলিমা)[২]

২. আমি এক কঙ্কালকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটি, প্রাণ খুলে
কথা বলি পরস্পর। বুরুশ চালাই তার চুলে,
বুলাই সযত্নে মুখে পাউডার, দর্জির দোকানে নিয়ে তাকে
ট্রাউজার, শার্ট কোট ইত্যাদি বানিয়ে ভদ্রতাকে
সঙ্গীর ধাতস্থ করি ;

(যে আমার সহচর : বিধ্বস্ত নীলিমা)[৩]

---

১. আধুনিক কবিতা পৃ. পঁয়ষট্টি
২. ঐ পৃ. ছেষট্টি
৩. ঐ পৃ. ছেষট্টি

এই যখন দেশের পরিস্থিতি, তখন ক্ষোভ স্বাভাবিক। বিদ্রূপ মিশ্রিত সেই ক্ষোভ—

প্রভু শোনো, এই অধমকে যদি ধরাধামে পাঠালেই,
তবে কেন হায় করলে না তুমি তোতাপাখি আমাকেই ?
দাঁড়ে ব'সে ব'সে বিজ্ঞের মতো নাড়তাম লেজখানি,
তীক্ষ্ণ আদুরে ঠোঁট দিয়ে বেশ খুঁটতাম দানা পানি।
মিলতো সুযোগ বন্ধ খাঁচায় বাঁধা বুলি কুড়োবার,
বইতে হতোনা নিজস্ব কথা বলবার গুরুভার।

(প্রভুকে : বিধ্বস্ত নীলিমা)[১]

তবু, শ্যামল পৃথিবীর নীলিমা বিধ্বস্ত হবে জেনেও আশা ও আশ্বাসের স্বর হারিয়ে যায়নি কবির কণ্ঠ হতে, তিনি চাওয়ারও সাহস দেখিয়েছেন।

…আমরা ক'জন হতচ্ছাড়া
যাবো মাঝ রাস্তা দিয়ে ভাগ্যের ছ্যাকড়া গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে
বড়ো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সম্প্রতি, আমরাই
শহরে বাগান চাই লিরিকের প্রসন্নতা-ছাওয়া ;
এবং বিশ্বেস করো আছে আজো চাওয়ার সাহস।

(সম্পাদক সমীপেষু : বিধ্বস্ত নীলিমা)[২]

এবং সাংসারিক সমস্ত অসঙ্গতি সত্ত্বেও—

বুকে শুধু অজস্র শব্দের ঝিলিমিলি। যে-সুকৃতি
জমেনি কিছুই তার কথা ভেবে মাথা করি হেঁট—
ঘুমায় পুরোনো বাড়ি, জ্বলে দূর তারার সেনেট।

(বাড়ি : বিধ্বস্ত নীলিমা)[৩]

'নিরালোকে দিব্যরথ' কাব্য গ্রন্থে কবির যে জ্বালা ছিল, অন্তর্দাহ ছিল, তা তীব্র হয়েছে, তিনি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, মাটির সঙ্গে আরো যেন দৃঢ় সংবদ্ধ হয়েছেন, প্রতিকারের জন্যে তাকে আরো সোচ্চার হতে দেখি, জাড্য কাটিয়ে উঠতে দেখি, বাঙ্ময় ও সক্রিয় হ'তে দেখি।

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. সাতষট্টি
২. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৬০৯
৩. ঐ পৃ. ৬১০

বাঙ্‌লা বর্ণমালাকে সংস্কারের অছিলায় ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করার বিরুদ্ধে তাইতো কবি বলতে পারেন—

১. তোমাকে উপড়ে নিলে, বলো তবে, কী থাকে আমার ?
উনিশশো বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।...
(বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা : নিরালোকে দিব্যরথ)[১]

২. নক্ষত্র পুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই।
(বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা)[২]

শামসুর রহমানকে এই কাব্যে অনেকখানি নতুন লাগে। জীবনকে যেন খুঁজে পেয়েছেন, নতুনভাবে দেখছেন, সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন :

জীবন মানেই
মাথলা মাথায় মাঠে ঝাঁ ঝাঁ রোদে লাঙল চালানো,
জীবন মানেই
ফসলের গুচ্ছ বুকে নিবিড় জড়ানো,
জীবন মানেই
মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাঁড় বাওয়া আর পাল খাটানো হাওয়ায়,
জীবন মানেই
পৌষের শীতার্ত রাতে আগুন পোহানো নিরিবিলি।
জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো,
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্য মুঠি তোলা,
(ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯, : নিজবাসভূমে)[৩]

এ এক অন্য শামসুর। এর চেহারাই আলাদা। সৎ কবির পক্ষেই এটি সম্ভব। এইভাবে এগিয়ে আসা। এইভাবে জীবনের বোধকে চেতনার রঙে রাঙিয়ে নেওয়া।

১. আধুনিক কবিতা পৃ. আটষট্টি
২. ঐ পৃ. ঐ
৩. ঐ পৃ. উনসত্তর

শামসুর রহমান এখানে কবির নির্দিষ্ট দায়িত্বই পালন করেছেন, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছেন। শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষায় তাই তিনি কম্বুকণ্ঠ :

তবে বলেছিলাম কি,
এয়ার পোর্টে, অফিসে—হোটেলে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে
এভেন্যু, মার্কেটে, দেয়ালে দেয়ালে
আমার ঘরের মধ্যে, আমার গলায়
কারুর দুর্দান্ত মহাজনী ফটো ঝুলিয়ে দিয়ে
বলবেন না,
তাকাও উনি যে ভাবে তাকিয়ে আছেন,
হাসি ছড়াও অবিকল তাঁর হাসির মতো।
দয়া ক'রে আমাকে ঠিক নিজের মতোই থাকতে দিন।
আর আমি যদি লেখক হই, অনর্গলের প্রম্পটারের মতো
সর্বক্ষণ বিড়বিড় ক'রে ব'লে দেবেন না
কী আমাকে ভাবতে হবে, কী আমাকে লিখতে হবে।

(দুঃস্বপ্নে একদিন : নিজবাসভূমে)[১]

শামসুর রহমান যদিও বুদ্ধিবাদী, আত্মকেন্দ্রিকতা সম্পন্ন কবি, মত ও পথ সম্পর্কে তিনি তাঁর কাব্যে কোন কথা বলেননি, তাহলেও জীবনের স্বপক্ষেই তাঁর কাব্য, শেষ পর্যন্ত সংগ্রামকে এড়াতে পারেননি। তিনি কি মহৎ কবিতা উপহার দিয়েছেন ? এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলা যেতে পারে, অগ্নিগর্ভ সমাজ ও সময়ের রেখাচিত্র অঙ্কনে সাধারণ মানুষের পক্ষেই বিশ্বস্ত থেকেছেন। তাঁর ঐতিহ্যে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত—মানুষ, মাটি ও কাব্যের সংযোগ এবং মিলন সাধনা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। প্রতিভাধর কবি হিসেবে তাঁর অবদান পূর্ব বাঙ্‌লার কাব্যে অনস্বীকার্য। দিন এখনো শেষ হয়ে যায়নি—ওদেশের সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছে অনেক অনেক বেশি। কবি হিসেবে ভবিষ্যতে তিনি কীভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন, সৎকবির ধর্মে অবিচল থাকতে পারেন কী না তার উপরেই কাব্যাঙ্গনে তাঁর ভবিষ্যতের আসন চিহ্নিত হবে। জীবন ধারণা ও জীবনবোধের প্রতি সবসময়ই তিনি 'সিরিয়াস'। তবে তাঁর কাব্যে সাবজেকটিভিটিজমের প্রাধান্য। সংগ্রামের নির্দিষ্ট অঙ্গনে এসে তাঁকে একটি পথ নিতেই হবে। পূর্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. সত্তর

কাব্য আন্দোলনের নানান ধারায় শামস্থর রহমান কীভাবে তাঁর কর্তব্য পালন করবেন, আমরা আগ্রহে তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবো। শক্তিশালী, কুশলী কবিশিল্পী তিনি—জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পোড খাওয়া তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মানস এখনো স্থষ্টি সঙ্কল্পে অটল, প্রৌঢ়ত্বেও তিনি প্রতিশ্রুতিপূর্ণ—স্থষ্টিশীল—পূর্ববঙ্গের কাব্য বাগিচার তিনি বিশিষ্ট একটি পুষ্প—এখনো যে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একথা বলা চলে না—অগ্রসরমানতাই তাঁর কবি জীবনের ধর্ম—এবং তাঁর জীবন কবিতাতেই উৎসর্গীকৃত।

॥ ১৮ ॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬) একজন প্রতিভাধর প্রতিশ্রুতিবান কবি। পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলনে তাঁর একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র স্থান আছে। জন্ম যশোরে, ১৫ই আগস্ট। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি। সাহিত্যে পি. এইচ. ডি. (ঢাকা), এফ. আর. এ. এস. (লণ্ডন)। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক (এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) মনিরুজ্জামান সাহেব ১৯৭২ সালের বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক, এবং এ পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি কবিতা বিভাগে।

তাঁর প্রকাশিত কবিতা পুস্তকের তালিকা—

(১) 'দুর্লভ দিন' (১৯৬১), (২) 'শঙ্কিত আলোক' (১৯৬৮), (৩) 'বিপন্ন বিষাদ' (১৯৬৮), (৪) 'প্রতন্ন প্রত্যাশা' (১৯৭৩), (৫) 'Poems' (1967, 2nd Edn. 1972) (৬) 'এমিলি' (৭) 'ডিকিনসনের কবিতা' (১৯৭৪)

এছাড়া উল্লেখযোগ্য তাঁর গবেষণাগ্রন্থ—

'আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' (১৮৫৭-১৯২০), ১৯৭০, 'বাঙ্‌লা কবিতার ছন্দ' (১৯৭০) 'আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র'। তিনি দুখানি নৃত্যনাট্যও লিখেছেন—'কর্ণফুলী' (১৯৬২) ও 'নবারুণ' (১৯৭২)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা দীপ্তি, দ্যুতি ও শ্রীসম্পন্ন, হৃদয় এবং বুদ্ধির আশ্চর্য সংমিশ্রণ হলেও হৃদয়বৃত্তিরই প্রাধান্য, আনন্দিতস্বরে আবৃত্তি করার মতো, জীবন ও যৌবনের জয়গানে মুখর, স্বাদু ও রম্য। প্রকাশ ভঙ্গীর দিক দিয়ে এবং বাচন ভঙ্গীতে একটি বিশিষ্টতার ছাপ আছে। তাঁর কবিতা পড়লে সহজেই চিনে নিতে পারা যায়। ছন্দে তাঁর দক্ষতা আছে। কবিতার লেখার সময় তিনি অন্যমনস্ক হন না। কবিতার মত অমর শিল্পের সাধনায় তাঁর তন্ময়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান একজন সার্থক গীতিকার। গানের বই অনির্বাণ

উৎসর্গ করেছেন অমর শহীদ ও বীর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। ৪৪টি গান আছে। আবেগ প্রবণতা দেখা যায়। গ্রামবাঙ্‌লার রূপ কোন কোনটিতে প্রাধান্য পেয়েছে। সহজ ভাষায় দ্যোতনাদানে মনিরুজ্জামান তুলনাহীন :

১. ঘাসের শিশির বনের পত্রশিরে
গুনগুন ডাকা ভ্রমরের মঞ্জীরে
আমার দেশের স্বপ্ন সুষমা
অপরূপ রূপে সাজে।

(অনির্বাণ : গান সংখ্যা-২)[১]

২. ঘাসের শিশির
তটিনীর নীর
আমার দেশের প্রিয় গল্প বলে।
স্বপ্ন অলির
শুনি মঞ্জির
মনের হরিণ তার ছন্দে চলে।

(অনির্বাণ : গান সংখ্যা-৩১)[২]

গীতিময়তা তাঁর কবিতার একটি ধর্ম। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে তিনি একজন সার্থক গীতিকার। কিন্তু সার্থক গীতিকার হলেই যে গীতিধর্মী কবিতা রচনা করা যায়, আমরা তা বিশ্বাস করি না। বস্তুত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঐতিহ্য সমন্বিত সুন্দর স্বচ্ছন্দমনের অধিকারী, অভিজ্ঞাত আবেগ এবং এষণা কখনও উদ্বেল হয়ে ওঠে না, কিন্তু মনকে সমূলে নাড়া দেয়, আবিষ্ট করে, কিন্তু মোহ ছড়ায় না। তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতা অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে পাঠককে।

মানস প্রবণতায় মনিরুজ্জামান রোম্যান্টিক। গীতি কবিতায় তাঁর স্ফূর্তি, পূর্ববঙ্গের কবিদের আসরে এ ব্যাপারে তিনি অসাধারণ 'প্রথমসারি' অনন্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। শব্দচয়নে, অর্থের ব্যঞ্জনায়, রূপকল্পে, তিনি মিষ্টি ছবি, মনোহর, মনোরম, মনোমুগ্ধকর পটভূমিতে আঁকতে পারেন অনায়াসে। আধুনিক কবিতাও যে শ্রুতিসুখকর, সুন্দর, সহজ, সাবলীল অথচ ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থবহ হতে পারে, মনিরুজ্জামানের কবিতা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অনির্বাণ ১৯৬৮, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা-১ পৃ. ১০
২. ঐ পৃ. ৪০

…রক্তবীজের স্বচ্ছ সরোবরে
আহত শরশয্যা পাতা যেন,
স্পর্শ জ্বালা বাতাসে সঞ্চিত,
চরণে বাজে কাঁকর মায়ামৃগের ;
আকাশে এই তীক্ষ্ণ অনুভব
ছড়িয়ে যাক অথবা থাক মনে
কান্না সে তো রৌদ্রে জ্বলা মণি
দাহ স্মৃতি ; কাঞ্চি রাখে বুকে

(কান্না যেন : দুর্লভ দিন)[১]

অথবা

লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি
এ তিন ভুবনে নেই তো তোমার জুড়ি;
বিদ্যুতে মেঘে অর্পিত তনু কেশ
দেখে বললাম।

(রূপম : দুর্লভ দিন)[২]

মনিরুজ্জামানের আর এক বৈশিষ্ট্য, তিনি আবহমানকালের যে সব উপাদান প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, সে সব অবহেলাভরে দূরে সরিয়ে দেননি, সেসবের মধ্যে থেকেই কাব্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন, এবং পরিবেশনের গুণে সেসব ভাব-সম্পদে সম্পূর্ণ চিত্তগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে, তাঁর আন্তরিকতা পাঠক মনেও অনুরণন তুলেছে, আবহমানকালের কাব্যধারার সঙ্গে অত্যাধুনিক হয়ে এই যে সজ্ঞানে সংযোগ রক্ষা, এর জন্য তাঁকে বাহাদুরি দিতেই হয়।

রেখে যাও হাতের সোনা হাতে
খুলে নাও বর্ণমণি, সাথে
কি আছে কি নেই, অবহেলা
কি করে ঝরবে সারাবেলা।

(বর্ণমণি : বিপন্ন বিষাদ)[৩]

১. আধুনিক কবিতা, পৃ. ১৯১-১৯২
২. ঐ পৃ. ১৯২
৩. বিপন্ন বিষাদ, পৃ. ৩৫

অথবা,

ছড়ানো সোনাকে মেলাবো মালার ছন্দে
দোলাবো গানের কলাপ মত্ত আলাপে
প্রিয় পরিখার পরম শয়ন গন্ধে
মূর্ছিত মন মুগ্ধ আবেশকে মাপে।

(সম্মিলন : বিপন্ন বিষাদ)[১]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর কবিতা স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকলতার সঙ্গেই তুলনীয়। হৃদয়ের গভীর উৎস হতে উৎসারিত না হলে এত আলোকিত ভাষায় অপরূপ কবিতার আলপনা আঁকা সম্ভব নয়।

কিন্তু তাঁর মধ্যে এতসব পেলেও, এইখানেই ইতি টানলে তাঁকে খণ্ডিত বলে মনে হত। মনিরুজ্জামান তা নন। যুগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। কবি তিনি। কবির দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কবি, কবিতাতে তাই সোচ্চার তিনি—

আর কোন আশা নেই, কবি ছাড়া ?

মৃত মহাজনদের ডেকে ডেকে
কেন আর অবশিষ্ট শক্তিক্ষয় তবে ?
কবিদের কাছে এসে
আর কোন কেউ নেই কবি ছাড়া।
... ...

কবিদের কথা শোনো
সভ্যতার অলীক মুখোশ ছিঁড়ে
ময়দানে মিছিলে চলে এসো
পরস্পরের দেহে হাত রাখো
দেখো ধুকপুক করে কিনা প্রাণ।
মানুষের মৃত্যু হলে তার সাথে

১. বিপন্ন বিষাদ, পৃ. ৩৮

মানুষের পৃথিবীও মরে
ধ্বংসের নিরোধে দাঁড়াও।
কবিদের কথা শোনো
হে আমাদের দেশবাসী
কবিদের কথা শোনো
কবি আর সত্য একাকার।

(পূর্বদেশ)[১]

মিছিলের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি কবি, কবি আরও সজাগ সতর্ক তে বলেছেন মহাযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে।

: আপন ঘরে স্বর্গসুধা
স্বপ্ন মাধুরিমা,
নরক বাকি সব :
সার জেনেছে বক্র প্রভু
খেয়াল খুশী মত
পাহাড় সম শব
সাজিয়ে রাখে, গর্বে ঘোরে
কাঙালী মুল্লুকে
আগুন জ্বলে মনে
ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে
মায়ের চোখে জ্বালা
প্রভুর প্রহরণে।

(উৎপ্রান্তিক : বিপন্ন বিষাদ)[২]

এতো গেলো আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে কবির দায়িত্ব। এ ছাড়াও তাঁর দেশে কী হাল? মাতৃভূমি, মাতৃভাষা মাতা প্রাণের অধিক প্রিয় বলে জেনেছেন যাঁদের তাঁদের রক্ষার সঙ্কল্প—

শুনেছি তোমার মুখে; মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, মাতা
প্রাণের অধিক প্রিয় এবং সত্যের পথ শ্রেষ্ঠ

১. আধুনিক কবিতা, পৃ: ১৯৭-১৯৮
২. ঐ পৃ: ১৯৫

চিরকাল। আজ সেই পণ দেখি কোটি কোটি চোখে
প্রদীপ্ত। তোমার দীপ জ্বেলে যায় প্রাণ থেকে প্রাণে
আলোর অমৃতধারা, যার পটে অনন্ত সত্যের
দোলে রূপ : আত্মার দর্পণে তার সাহসী উন্মেষ।

আমার অক্ষম হাতে যে প্রদীপ শিখা তুমি দিলে
ঝড়ে জলে বিপাকে দুর্দিনে তাকে কি করে বাঁচাই
আমি বুঝিনা, কেবলি সন্তর্পণে রাখি তাকে তবু
কম্পমান, বুঝি সে সতর্ক রাখে অজ্ঞান আমাকে,
অথচ তোমাকে দেখি নিষ্কম্প্র সদাই, তাই আজ
তোমার হাতেই দেই তোমার ধ্যানের ফুলমধু।

[মণীষা : (ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাকে) :] (বিপন্ন বিষদ)[১]

স্মরণ করেন দুরন্ত আবেগে কৃষ্ণচূড়ার মেঘ, সেই ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদের স্মরণে—

বিষণ্ণ পিপাসা
নিয়ে তাই তারা ছড়িয়েছে
কী দুরন্ত কৃষ্ণচূড়া মেঘ
ঝড়ের আবেগ
তারা জুড়ে আছে এদেশের সমস্ত হৃদয়
তাই তারা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়॥

ক্লান্তির রাত্রিকে ঢাকো এ সূর্যের
প্রমত্ত আস্বাদে। সমুদ্রের
বিশাল গহ্বরে আনো
প্রজ্ঞার তরঙ্গ অবিশ্রাম
কৃষ্ণচূড়া মেঘে হোক মুখরিত
একঝাঁক নাম।[২]

১. বিপন্ন বিষাদ, পৃ: ৫০
২. একুশে ফেব্রুয়ারী, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৩
(একুশের সংকলন ১৯৭১, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২১০-১১)

সঙ্কল্পে দৃঢ় কবিচিত্ত। নিশ্চিত নির্ধারিত পথে যাবার শপথ উচ্চারিত তাঁর কণ্ঠে—

তোমার নামের মধু নিয়ে
পূর্বের সভাতে আজ গড়ে তুলি
সহস্র মনের ধ্যানের মোহন সৌধ।
তোমার প্রাণের স্পর্শ লেগে আছে
সেইতো পরম ;
আমরা নিশ্চিত যাব
নির্ধারিত পথে
তোমার বিজয় রথে
পেয়েছি যা অম্লান আলোকে
তাই আজ নিত্য নব প্রেরণার
উৎস সুধা হোক।
একটি উজ্জ্বল দিন একটি সে মণিবর্ণ আলো
এবার সবার প্রাণে কিমাশ্চার্য প্রদীপ জ্বালালো।

(মণিবর্ণ)[১]

মনিরুজ্জামান উজ্জীবিত চেতনাসম্পন্ন আত্মবিশ্বাস দৃপ্ত, জীবন ও জাগরণের তরঙ্গদোলায় দোলায়িত সুন্দর মন ও মানসের কবি, মাতৃভূমি, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক, কাব্যলক্ষ্মীর সাধনায় উদ্গতচিত্ত! মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বয়স ৪০ও পার হয়নি। এই তো তাঁর দেবার সময়—কাব্যে ও সাহিত্যে তাঁর প্রতিভা আরও নব নব জোয়ার নিয়ে আসবে। আমরা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী।

॥ ১৯ ॥ নির্মলেন্দু গুণ একজন শক্তিশালী তরুণ আধুনিক কবি। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কাব্য আন্দোলনে অত্যল্প কালের মধ্যেই তাঁর একটা স্থায়ী আসন কায়েম হয়েছে বলা চলতে পারে। কবিতায় চিত্রকল্প রচনায়, উপমা ও সমাসোক্তি ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর প্রকাশিত বই 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (প্রথম ১৯৭০) ও 'না প্রেমিক না বিপ্লবী' (১৯৭২), 'কবিতা', 'অমীমাংসিত রমণী' (১৯৭৩)।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় প্রসাদ রম্যতা আছে, তাঁর বাচনভঙ্গী অত্যন্ত বলিষ্ঠ, এতটুকু জড়তা, সঙ্কোচ বা দ্বিধা নেই। এইজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। পাঠক তাঁর সব কবিতা পছন্দ করুক বা নাই করুক, রুদ্ধনিঃশ্বাসে পাঠ করবেই।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম, পৃ. ৪৭

পাঠককে তিনি সজাগ রাখেন, আকৃষ্ট করেন—এগুণ যে কোন কবির পক্ষেই যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই।

এতৎসত্ত্বেও বলা চলে নির্মলেন্দু গুণ তাঁর নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পাননি—এখনো তা তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

গ্রাম জীবন এবং শহর উভয়ই তাঁর কবিতার উপজীব্য। প্রেম এবং বিপ্লব উভয়ই তাঁর কবিতার মধ্যে যেন সমানভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। চিরাচরিত ধারা কিছু কিছু কবিতার মধ্যে আবহমানের ঐতিহ্য নিয়ে উঁকি দিচ্ছে, তেমনি কিছু কিছু কবিতায় অতি আধুনিকতা, চিরাযত মূল্যবোধের উপর অশ্রদ্ধা অত্যন্ত উৎকটভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

দেশপ্রেমের কবিতাগুলিতে আন্তরিকতা আছে—

১. অথচ আমার সঙ্গে
হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র, আমি জমা দিইনি

(আগ্নেয়াস্ত্র : না প্রেমিকা না বিপ্লবী)[১]

২. সুজলা সুফলা বাংলা প্রিয় জন্মভূমি
শ্যামরক্তে পোষা নীলপাখি
তুমি তো কিছুই নিলে না।

(রক্তলগ্ন সাপ)[২]

৩. এরকম বাংলাদেশ কখনো দেখনি তুমি
মুহূর্তে সবুজ ঘাস
পুড়ে যায়, ত্রাসের আগুন লেগে
লাল হয়ে জ্বলে ওঠে চাঁদ।

(প্রথম অতিথি)[৩]

৪. বাংলাদেশে বৃষ্টি হলেই
আগুন হবে
রোদ উঠলেই সোনা

(রোদ উঠলেই সোনা)[৪]

১. নির্মলেন্দু গুণ, না প্রেমিক না বিপ্লবী, কে এম ফারুক খান কর্তৃক প্রকাশিত খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ৬৭ প্যারীদাস শেঠ বাঙলাবাজার, ঢাকা। ১৯৭২। পৃ. ৯
২. ঐ ঐ পৃ. ১৭
৩ ঐ ঐ পৃ. ৩০
৪. না প্রেমিক না বিপ্লবী, পৃ. ৩২

৫. তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।

(মুখোমুখি)[১]

৬. ডাক টিকিটের মতো শহীদের রক্তকণা
লেগে থাকা স্ট্রীটে
একটি উজ্জ্বল খাম পড়ে আছে, বিপ্লবের
কোকিল কংক্রিটে।

(কংক্রিটের কোকিল)[২]

এইরকম আরো কবিতা শহীদ, অবরুদ্ধ বর্বরতা, কুশল সংবাদ, স্বাধীনতা, উলঙ্গ কিশোর, শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ, ভালোবাসার পুরোনো বর্গাস, স্বদেশের মুখ শেফালী পাতায় প্রভৃতি।

তিনি বলছেন অবরুদ্ধ আবেগে :

জননীর নাভিমূল ছিন্ন করা রক্তজ কিশোর তুমি
স্বাধীনতা তুমি দীর্ঘজীবী হও, তুমি বেঁচে থাকো
আমার অস্তিত্বে
স্বপ্নে
প্রেমে
বল—পেন্সিলের যথেচ্ছ অক্ষরে
শব্দে
যৌবনে
কবিতায়

(স্বাধীনতা উলঙ্গ কিশোর)[৩]

মুজিবের ছিলেন সমর্থক, 'সল্টলেকের ইন্দিরা'য় স্তুতিগান করেছেন। কিন্তু তবু, প্রশ্ন থেকে যায়। আবেগই সবথেকে বড় কথা নয়। এক জায়গায় অকপটেই বলছেন :

যেহেতু যাইনি যুদ্ধে মুখোমুখি হইনি শত্রুর
তাই ঠিক বলতে পারিনা
শত্রু কি বন্ধুর জয়

১ না প্রেমিক না বিপ্লবী, পৃ. ৩৭
২. প্রেমাংসের রক্ত চাই. পৃ. ৪৩
৩. না প্রেমিক না বিপ্লবী, পৃ. ৫৮

প্রেম কি ঘৃণার—সব দৃশ্য শান্ত করে
কখন ফিরবো ঘরে……

(যেহেতু যাইনি যুদ্ধে)[১]

তাঁর বিভ্রান্তি আরও একটি কবিতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়: 'যুদ্ধের বিভ্রান্ত বন্দী।' মোট কথা কবিতা হিসেবে চমৎকার উতরে গেলেও তাঁর দেশের জনগণ তাঁর কাছে জবাবদিহি অবশ্যই চাইবেন, কোথায় তাঁর সত্যকারের অবস্থান? সেদিন সঠিক উত্তর দিতে পারার উপরই তাঁর দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা নির্ভর করছে।

এইবার প্রেমের কবি হিসেবে নির্মলেন্দু গুণের বিচার করা প্রয়োজন। যদিও পরমায়ু, ফুলদানি ফুল প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় রোম্যান্টিক গীতি কবিতার ভাবাবহ বিদ্যমান, তাহলেও তাঁর নিচের আলোচ্য কবিতাবলীতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন নেই, বরং তিনি দারুণ রকম দেহবাদী হয়ে পড়েছেন।

'তুলনামূলক হাত'[২] কবিতায় তাঁর বক্তব্য:

১. তুমি যেখানেই স্পর্শ রাখো সেখানেই আমার শরীর

২. তুমি যেখানেই ঠোঁট রাখো সেখানেই আমার চুম্বন।

পরমায়ু[৩] কবিতায়—

যেন আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো
যেন বা মানুষই চিরকাল ভালবেসে
লীলার চোখের মতো বেঁচে থাকবে।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টিশক্তি, মনে হয় আবিল হয়ে গেছে। রিপুর দংশনে আত্মহারা হয়েছেন। কবিতার মধ্যে তারই প্রাধান্য কখনো শ্রেষ্ঠ কবিতা হতে পারে না, বিশেষতঃ যেখানে মূল্যবোধ অবদমিত। উদাহরণ:

১. প্রেম এসে যাযাবর কণ্ঠে চুমু খেলে মনে হয় বিরহের
স্মৃতিচারণের মতো সুখ কিছু নেই।
বাক্ স্বাধীনতা পেলে আমি শুধু প্রেম, রমণী, যৌনতা
ও জীবনের অশ্লীলতার কথা বলি।

(অসমাপ্ত কবিতা)[৪]

---

১. না প্রেমিক, না বিপ্লবী. পৃ. ৬০
২. ঐ পৃ. ৪০
৩. ঐ পৃ. ৩৩
৪. প্রেমাংশুর রক্ত চাই. পৃ. ৩৭

২. কিছু না পাওয়ার অভিমানে একজন জ্বল—
জ্যান্ত পাপ, খাপহীন তলোয়ার নিয়ে আমরা দু'জন তাই গতকাল সারা
রাত ধরে যে যুদ্ধের শরীর দেখেছি সেখানে স্পষ্টতঃ জীবন থেকে
যৌবন, স্বপ্ন থেকে দুঃস্বপ্ন, সিদ্ধান্ত থেকে গন্তব্য, গন্তব্য থেকে
আলো খণ্ডিত বাঙ্‌লার মতো যেন চিরকাল মীমাংসিত সত্যে আলাদা।

(হিমাংশুর স্ত্রীকে)[১]

৩. মৈথুন শেষ হয়ে গেলে যেমন নিজেকেও অপ্রিয়
দোষী অপরাধী মনে হয়

(সহবাস)[২]

৪. তোমাকে দেখার নামে কুকুর আর কুকুরীর
অচ্ছেদ্য সঙ্গম দেখা হোলো।

(সহবাস)[৩]

৫. অযৌক্তিক স্তনগুলো কাঁপায় আমাকে
কি দারুণ অহঙ্কারে নিতম্ব কার্পাশে নাচে তোর
আমি তোকে খাসীর সিনার মতো টুকরো টুকরো কেটে ফেলবো আজ

দু হাত বিচ্ছিন্ন তোর মৃতদেহ আচার্যের প্রতিমার মতো
নাভীর সামান্য নীচে কালোচাঁদ
ক্ষত চিহ্ন পিঠে নিয়ে আজীবন পড়ে থাকবি তুই।

(দাংগা)[৪]

৬. বিবাহিত মানুষের কিছু নেই
একমাত্র যত্রতত্র স্ত্রী শয্যা ছাড়া। তাতেই শয়ন করো
বাথরুমে পূজোঘরে, পার্কে, হোটেলে···
···যেমন প্রত্যহ মানুষ
ঘরের দরোজা খুলেই দেখে নেয় সব কিছু ঠিক আছে কিনা
তেমনি প্রত্যহ শাড়ির দরোজা খুলেই স্ত্রীকেও

১. প্রেমাংসর রক্ত চাই, পৃ. ৫৫
২. ঐ
৩. না প্রেমিকা, না বিপ্লবী, পৃ. ২৫
৪. ঐ পৃ. ২২

উলঙ্গ করে দেখে নিতে হয়
ভালো করে দেখে নিতে হয়
জঙ্ঘায়, নিতম্বে কিম্বা সংরক্ষিত যোনির ভিতরে
অপরের কামনার কোন কিছু চিহ্ন আছে কি না !

(স্ত্রী)[১]

অতঃপর অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা পড়ে মনে হয় না যে তিনি যন্ত্রণা কাতর কবি—পথ হাঁটছেন কঠিন যুগ ও জীবন চিরে। কোথায় যেন একটা অসংগতির সুর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তিনি কি কখনো তার থেকে মুক্ত হতে পারবেন ? না চিরকালই না ঘাটকা, না ঘরকা—না প্রেমিক না বিপ্লবী রয়ে যাবেন ? —

এইসব প্রাত্যহিক ভয়ে মোটামুটি কেটে গেছে
কেটে যাচ্ছে
না—প্রেমিক না—বিপ্লবী পঁচিশ বছর
কেটে যাবে আরও কিছু দিন।

(কাপুরুষের স্মৃতিচারণ)[২]

॥ ২০ ॥ ফারুক সিদ্দিকী রচিত 'স্বরচিহ্নে ফুলের শব' (১৯৭২) একটি অতি অদ্ভুত কবিতার বই। ২৮টি কবিতা আছে এই পুস্তকে। কিন্তু নামছাড়া কোন কবিতাই বোধগম্য হল না বারবার পড়ার পরও। সুধীন দত্তের অক্ষম অনুকরণ করতে গিয়েছেন হয়ত। অথবা, মনে হয় বাঙলা অভিধানের প্রকাশকের সংগে ষড়যন্ত্র আছে—এ বই কিনলে একটা অভিধানও কিনতে হবে। কিন্তু তাতেও সুরাহা হবে বলে আমাদের মনে হয় না—এতই দুর্বোধ্য ও দুষ্পাচ্য এগুলি। আহা, ঈশ্বর, ঈশ্বরী, কিমাকার, অমা (যথা অমাশব্দ, অমারৌদ্র ইত্যাদি) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বহুল ব্যবহৃত যত্র তত্র। এছাড়া সংস্কৃত ও ইংরাজীতে কতকগুলি যৌন অঙ্গের (যথা শিশ্ন, ফ্যালোপিয়ান, শ্রোণিপাত প্রভৃতি) নামও ব্যবহৃত কয়েকটি কবিতায়—বলা বাহুল্য মানে বোঝার উপায় নেই।

কিছু কবিতার কয়েকটি চরণ :—

বিচিত্র কোরকগর্ভে অসমাস্থমধ্যমা নৈরাশ্য, অবকাশে গোধূলিতে অভিহাস্য

১. না প্রেমিক, না বিপ্লবী, পৃ. ২২
২. ঐ পৃ. ৪৮

নন্দিত ? নৈরাশ্যপীড়িত সৈকতে কে কতটুকু সৃষ্টির পবিত্র কানাকড়ি শব শিকার করে হয়েছে অমাধুর্ত সার্থবাহ শতকের নীড়ে ? উদ্ভাসিত বিভ্রাটে ঠিক বর্ণিত বশত এই বিবমিষা গ্রীবার গন্ধের বিকারে, তৃষ্ণবতী পদ্মকোরক ফুলদল অপঘাত আঘাতে দগ্ধ, তবু কি দুঃস্বপ্নে সম্মোহন অবাধ ! সারাক্ষণ মুহূর্তগ্রাসী মৃত্যুর রক্তচক্ষুসংকাশে অভীক সৌরভে আত্মা ব্যাদানমৌন

সংশয়ে নিশ্চল। পরাক্রান্ত স্বর্গের চটুল লিপিচিহ্ন। সময়ের গ্রীবাখানি মারীচমুখাকৃতি যেন আত্মহন্তার কুশলী ছায়াকর। একপর্ব নির্জনাশ্রয়ী আলোর তীরে তীরে শান্তির প্রতারক পল্লবিত আজি, কোথায় কালো মাকড়সা ক্ষতকণ্ঠোচ্চারিত পসারী, ভাবি সমভাবে শাশ্বত জয়ী ?……

(জয়)[১]

২. সত্তা রাত্রিদিন কিমাকার রণক্ষেত্রের ধর্ষিত নক্ষত্র—অকাল কুমারীস্রোত জ্যোতির্ময় সাপুড়ের স্বর্গে : অরুণ হীরামন যেন এক পংকিল অনুপম বৃশ্চিক সমাচ্ছন্ন অভিচারী বাদুরের প্রকোষ্ঠে স্থির : সুচির আপিলা চাপিলা এই স্মৃতির তিমিরে একটু পদক্ষেপ কি ভয়াবহ মর্মগাথা, যেন আদরিণী কান্নার বীভৎস প্রসন্ন স্তবকে সমকক্ষ, আজকাল সন্ধির উচ্চারণ যাচিত উপহাস, কফিনের কর্কশমরালেমৃতপ্রায়, আপাতমধুর সবঅবাক ঠিকঠাক !

(স্বরচিহ্নে ফুলের শব)[২]

৩. ……সূর্যমুখী অধঃপতনচোখে নিখিল প্রকৃতির অল্পপ্রাণ প্রেয়সীর রাঙা ফুল, কোন্ ইতিহাস প্রখ্যাত বেলায়—মানুষের একাকী জন্মান্ধ আয়ু, সংকলিত কাল, অবশেষে পরিচ্ছন্ন পথসেতু রচনা মাঝে মানবিক কলরোলে উদ্বেলিত হবে কি পতন—বদল, উত্তর সন্ধে ?

(উত্তর সন্ধ)[৩]

ইত্যাদি। কোন কোন কবিতার দু-একটি লাইনের কিছুটা বোঝা যায়। যেমন :

১. স্বরচিহ্নে ফুলের শব—ফারুক সিদ্দিকী, বর্ণবীথি ৩/৩বি, পুরানো পল্টন ঢাকা-২। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৯। পৃ.
২. ঐ পৃ. ১৬
৩. ঐ ঐ পৃ. ২৫

পৃথিবীর কুটিল বিধি বিধানের খিলান ধরে নিতুই বন্ধু ডাকে
আমাকে তিমির চূড়ায়,—'ফারুক দেখ্, এই তোর
সত্তার নাচের মাতাল মুদ্রা'— ।

(দুটি কবিতা)[১]

স্বরচিহ্নে ফুলের শব কি তাই ?

॥ ২১ ॥ পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতার বর্ণোচ্ছল শোভা যাত্রায় মহিলা কবিদের অবদান এবং অংশ গ্রহণ পুরুষদের তুলনায় কম হলেও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এইসব কবি এসেছেন সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসার থেকে।

পূর্ববঙ্গের মহিলা কবি হিসেবে প্রথমেই নাম করতে হয় বেগম সুফিয়া কামালের। এঁর কবি জীবন দীর্ঘ। বিভাগ পূর্ববর্তী সময় থেকেই ইনি কবিতার চর্চা করছেন। তাঁর কবিতায় দরদ অকৃত্রিম। মানবিক সহানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। তিনি পূর্ব বাঙ্‌লার মহিলা কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এবং বহুল পরিচিত। ওখানকার জন মানসে তাঁর একটি স্থায়ী আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই মহিলা কবি সংগ্রামী চেতনা সম্পন্নও। দরকার হলে মিছিলে নেমেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন রাজনীতিতে। পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার দাবি তাঁর কণ্ঠেও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

এই দিক দিয়ে বলতে পারা যায়, রাষ্ট্র সমাজ ও জীবনের সঙ্গে এই কবির সম্পর্ক রয়েছে।

কবির প্রকাশিত কবিতার বই 'সাঁঝের মায়া' (১৯৩৮) 'মায়া কাজল' (১৩৫৮), এবং 'মন ও জীবন' (১৩৬৪) এছাড়া 'কেয়ার কাটা' (১৯৩৭) নামে তাঁর একটি গল্প সঙ্কলনও আছে।

বেগম সুফিয়া কামাল রবীন্দ্রবলয়ের অন্তর্ভুক্ত কবি। এদিক দিয়ে গোলাম মোস্তাফা, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ মুসলিম কবি এবং করুণানিধান, কালিদাস প্রমুখ হিন্দু কবি যাঁরা রবীন্দ্রবলয় তাঁদের জীবনে অতিক্রম করতে পারেননি, বেগম সুফিয়া কামাল তাঁদেরই সমগোত্রীয়। ধর্ম,সৌন্দর্য্য, প্রকৃতি প্রেম ও অতীত চেতনা এঁদের কবি মানসকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। বেগম সুফিয়া কামালের জীবন দুঃখ ভারাক্রান্ত। নানারকম আঘাত তিনি পেয়েছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে তাই বুঝি বেদনা ও বিষণ্নতার অনুরণন দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বিষাদ ও বেদনা ব্যক্তিগত স্তরে থেমে যায়নি—তাঁর মুন্সিয়ানা এবং

১ স্বরচিহ্নে ফুলের শব—ফারুক সিদ্দিকী পৃ. ২৩

কবি হিসেবে কৃতিত্ব এইখানেই যে বিষণ্ণতা বেদনা ও বিষাদ পাঠকমনে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন, তাঁর মর্মের যন্ত্রণাকে সুন্দরভাবে শিল্পে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

তব শান্ত স্নিগ্ধ স্পর্শ লভি
এ দেহ ধূপের ধূম বিথারিবে মৃদুল সুরভি
অজস্র নক্ষত্রপুঞ্জে অনির্বাণ উৎসব দেওয়ালী
তোমার আকাশে শোভে; হেথা মোর প্রতিদিন
চিত্ত করে নিত্য অভিসার
তোমারে মিশায়ে যেতে প্রিয়তম নিশীথ আমার

(আমার নিশীথ)

অথবা,

শুনি বৃষ্টি ঝরিবার সুর
প্রিয়, বসন্তের অবসানে
কোন ক্ষোভ জানিবে না মনে।

(বসন্ত বিদায়)[১]

বেগম সুফিয়া কামালের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি মৃদু স্বভাবের কবি। আরও, সুন্দর, শান্ত, দীপ্ত, উজ্জ্বল, সংবেদনশীল, সহজ, সাবলীল তাঁর ভঙ্গী। বৈদগ্ধ্যের ছাপ আছে। অশুচি, কুরুচি, অনুপস্থিত। এশুধু তিনি মহিলা কবি বলেই নন, এ তাঁর কবি স্বভাবেই। এদিক দিয়ে তিনি সত্য সত্যই সুন্দর স্বচ্ছ-শ্রীসম্পন্ন কবি মনের অধিকারী।

কিন্তু বেগম সুফিয়া কামাল তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা মেলে ধরলেও, যতটুকু প্রকৃতিতে আছে, ততটুকুই দেখিয়েছেন, তার বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। এ বর্ণনা তাই বর্ণনাই থেকে যায় অনেক সময়। জীবনানন্দের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই এক্ষেত্রে তাঁর দীনতা ধরা পড়ে। ঋতুর কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সেটা শুধু ঋতুর কবিতাই থেকে গেছে, তার চেয়ে বড় কিছু, বেশি কিছু তিনি দিতে পারেননি।

আমি শরতের কবি ধান্যশীর্ষে রক্ত নীলোৎপলে
আকাশের ছায়া পড়ে আঁখি মোর ভরে আঁখিজলে।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম। পৃ. ৯৮

হেমন্তের কবি আমি, হিমাচ্ছন্ন ধূসর সন্ধ্যায়
গৈরিক উত্তরা টানি মিশাইয়া রহি কুয়াশায়।
শীতের ঋতুর কবি থাকি বসন্তের পথ চাহি-

(মন ও জীবন)

কবি আঙ্গিকের দিক থেকেও পুরাতন বাদী রয়ে গেছেন।

বেগম সুফিয়া কামাল এর সংগ্রামী কবিমানস নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। মূলতঃ তাঁকে আমরা আধুনিক কবি বলতে পারি না। যেমন গোলাম মোস্তাফা এবং শাহাদৎ হোসেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খুব স্বচ্ছ। শহীদদের নিয়ে তাঁর অতি সুন্দর একটি কবিতার শেষ কয়েকটি চরণ :

রচিয়াছে ভাষা যারা রক্তের অক্ষরে
লিখিয়া রাখিয়া গেল নাম
একুশের দিনে তাদের জানাই সালাম।

(শহীদ স্মৃতি)[১]

তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কে এবং সমাজ সচেতন মন সম্পর্কে জানতে পারা যায় নিচের কবিতাটিতে :

গড্ডালিকা-প্রায়
অন্ধ তমসার স্রোতে ভেসে চলে যায়।
উৎসবের এই সজ্জা, আনন্দের বাঁশী।
ব্যর্থতায় ম্লান হয়, অশ্রুজলে ভাসি
এ মাটি পঙ্কিল হয়, আকাশ মলিন
বন্দী আত্মা কেঁদে ফেরে, হয়নি স্বাধীন।
এখনও রেখেছে বেঁধে তীব্র অধীনতা নাগপাশ
কী জানি ফুটিবে কবে মুক্তি পলাশ।

(উৎসবের এই সজ্জা)[২]

সহজ কথা সহজভাবেই প্রকাশ করেছেন তিনি। এই জন্য সাধারণের দরবারে তাঁর জন্য একটি শ্রদ্ধার আসন আছে। উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, কবিতার আঙ্গিকের প্রতিও এই কবি যথেষ্ট সজাগ নন।

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ. ২৩
২. ঐ পৃ. ১১৬

বেগম সুফিয়া কামাল যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনা তাঁর কাব্যে লালিত করে রেখেছিলেন, হয়ত জীবনের অপরাহ্ণে পৌঁছে ততখানি ধরে রাখতে পারেননি—নিষ্ঠুর বন্ধুর পথে নেমে এসেছেন মানুষের একেবারে কাছাকাছি। তাঁর এই আসাটাই বড় সার্থক আসা—তাঁর কবি হৃদয়ের সব থেকে বড় পরিচয় ।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের কবি সাহিত্যিকরা নারীদের অধিকার সম্পর্কে বরাবরই সোচ্চার। সর্বাধিক মনে পড়ে মধুসূদন দত্তের কথা। তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রগুচ্ছের মধ্যে নারীচেতনা, নারীহৃদয়, তাদের অধিকার এবং দাবি যে ভাবে জোরদার ভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে, তা অন্য জায়গায় বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। এর পরে, রবীন্দ্রসাহিত্য, নজরুলের কাব্যে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবিসম্বাদী প্রাধান্যও স্বীকৃত। শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছেন নারীর স্বাধিকার।

এলো কল্লোল ও কালি কলমের যুগ। এইকালের কিছু লেখক যৌন ক্ষুধাকে সাহিত্যের দরবারে নিয়ে এলেন। কিন্তু এরও জন্যে কোন কোন লেখক অর্থ-নৈতিক অকিঞ্চনের বলি নারীর মহীয়সী রূপটিকেও তুলে ধরলেন। তবে একথা নিষ্ঠুরভাবে সত্য যে, শ্রেণী সচেতন নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা তখনো কিন্তু সম্ভব হয়নি। নারী যেন শুধু উপভোগের বস্তু এবং তাকে নিয়ে গল্প রচনা করাই লেখকরা শ্রেয় মনে করলেন। হয়ত সেকালে শ্রেণী সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু লেখকরাও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিরূপণে ব্যর্থ হলেন।

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। মহিলা কবির আবির্ভাব হল না বাঙ্‌লাসাহিত্যে। পুরুষ প্রাধান্যেরই কি ফল এটি? আমাদের পারিপার্শ্বিকতাই কি এজন্য দায়ী নয়?

স্বাধীনতার পর সারাবাঙ্‌লা দু'টুকরো হয়ে গেল। যে স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীদের দান কোন অংশে কম ছিল না, দেশ ভাগ হয়ে যাবার পর সেই নারীরাই হল আশ্রয়হীন। দুর্বার অর্থনৈতিক ভাঙন, অসহায় মানব চেতন, নিরাশ্রয় নারী সমস্তরকম প্রগতির উৎসাহজনক কথার মধ্যেও তারা গতিহীন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খপ্পরে তারাই প্রথম উৎসর্গীকৃত। নারীর মহিমা, মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত।

এদেশের এই হাল। আধুনিক মহিলা-কবি হিসেবে একজনেরও নাম আমরা করতে পারব না পশ্চিমবঙ্গে, যিনি কাব্যের জগতে স্বতন্ত্র এবং স্বনামধন্য, যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব ও উল্লাসবোধ করতে পারি, যিনি আমাদের জনজীবন মথিত করেছেন,

যিনি সাড়া জাগিয়েছেন কাব্যের অমল অঙ্গনে। এই দীনতা সত্যই বড় দৃষ্টিকটু! বাঙ্‌লা সাহিত্য আধুনিক বাঙ্‌লা মহিলা কবি সৃষ্টি করতে পারেনি!

ওপারের মুসলমান সমাজকে আমরা ভুল বুঝে এসেছি। এবং বোরখার আড়ালেও ওদেশে যে অগ্নিময়ী মূর্তি বিরাজ করে আমরা তার ভয়ংকর রূপ কল্পনাও করতে পারিনি। অন্ধ আচারের আবর্তে নারীদের আবর্তিত ভেবে, নিজেরাই অন্ধ থেকেছি।

আবার সেই পারিপার্শ্বিকতার কথা এসে পড়ে। পূর্ববঙ্গে যে আবহাওয়া, যে পারিপার্শ্বিকতা, যে সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, সেখানকার নারীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছেন, তাঁরা অধিক সংখ্যায় কাব্য চর্চা করেছেন, স্বভাবতই আগুনদিনের সেসব কাব্যে ললিত মধুর পদধ্বনি আমরা পাব না, আমরা হয়ত নিখুঁত কবিতা বলতে যা বুঝি, আঙ্গিক, অলঙ্কার, ছন্দ ইত্যাদি তাও সবসময় সবার ক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে না, কিন্তু তৎসত্বেও বাঙ্‌লার কাব্যাঙ্গনে এইসব সংগ্রামী কবিদের কণ্ঠনিনাদে নিশ্চয়ই উচ্চকিত হয়ে উঠেছে এবং মহৎ মহিলা কবির আবির্ভাব সম্ভাবনার মুহূর্তকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কাব্য আন্দোলন যেখানে জীবন আন্দোলনে রূপান্তরিত, সেখানে আমরা আমাদের বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

যবনিকা উত্তোলনের কালে সংগ্রামে সামিল হয়েছেন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত নারী। দেশকে উপলক্ষ্য করে যে নারী জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আগেই তাঁরা তার ছাপ বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্যে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। একথা বলে রাখা ভাল, বাঙ্‌লাদেশের নারী সম্প্রদায় আচারনিষ্ঠ সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ নয়। সামাজিক রক্ষণশীলতার ফলে তাঁদের আন্দোলন ব্যাহত হয়নি। এমনকি পূর্ববঙ্গের উৎসব অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান নারীরা একত্র হয়ে উৎসব পালন করেছেন। আর তারই মধ্যে ধীরে ধীরে খসে পড়েছে ধর্মীয় অন্ধকার গোঁড়ামি। সেই গোঁড়ামি দূর হওয়ার দরুণ শুধু সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই অপসৃত হয়নি, মুসলমান নারী সমাজ বঙ্গদেশের অঙ্গনে কুসংস্কার শূন্য হয়ে আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন।

সমাজ বড়, না স্বদেশ ও স্বাধীনতা বড় এই প্রশ্ন থেকেই আমরা মনে করি, সামাজিক কূপমণ্ডূকতার অবসান ঘটেছে পূর্ব বাঙ্‌লার নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

চোখের সামনেই যদি আত্মীয়স্বজন বা হিতৈষী সংগ্রাম করতে করতে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দেয়, তখন মা ও বোন কি ঘরের মধ্যে রক্ষণশীলতার আগারে আবদ্ধ থাকতে পারেন? পারেন না। তাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়:

শহীদ ভাইদের শোণিত তাপে উত্তাপিত
একটি স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক ॥

(কল্পনা মোহরের : একুশে ফেব্রুয়ারী)[১]

এবং,

সেকালের মা বোনের বুকে সেই রক্ত কথা কয়,
তাই দেখি দিকে দিকে নবজাতকের অভ্যুদয়।

(মেহবুবা মোখলেস পারুল : একুশে ফেব্রুয়ারী)[২]

একুশে ফেব্রুয়ারীর আহ্বানই যেন বন্যার স্রোতের মতো পূর্ববঙ্গের নারী সমাজের চিন্তায় ও মননে আঘাত হানল। মমতাজ বেগম মঞ্জু তাঁর "কাঁদতে যে মানা" কবিতায় পবিত্র ক্রোধে পাক জঙ্গীশাহীর স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন। তিনি লিখলেন :

পিশাচ তার
পৈশাচিক উল্লাসে মেতে
বুলেট মেরে সংহার
করছে সঙ্গীনে গেঁথে।

(কাঁদতে যে মানা)[৩]

সংগ্রামী মহিলা কবিরা আন্দোলনের মধ্যে থেকেই যেন এরকম আগুনের কবিতা লেখার প্রেরণা পেয়েছেন। রেবেকা সুলতানা শীলা তাঁর কবিতায় লিখছেন,

বন্ধুরা আমার
তোমরা মরেও মরনি—
বেঁচে আছো আজও আমাদের মাঝে
সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে,

(বন্ধুরা আজ লাল ফুল)[৪]

এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তো সম্ভব হবে আগামী দিনের বিপ্লব! আতিয়া রসুল যেন সেই বিপ্লবের পদধ্বনি শুনেছেন :

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ. ২৪
২. ঐ পৃ. ২৫
৩. ঐ পৃ. ৩৫
৪. ঐ পৃ. ৩৭

বেদনায় নীল সাগরের বুকে
শুনি তার পদধ্বনি।[১]

আশাবাদী কবি এঁরা। দুঃখ যন্ত্রণা অত্যাচার অবিচার হতাশা আনতে পারে না। তারা ইসলাম সমস্ত দুঃখকে ভুলে গিয়ে তাই এই স্বপ্ন দেখতে প্রয়াসী হন—

এই মাটিতে নিত্য নতুন
সোনার স্বপ্ন দেখি।
এই মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে
আশারই গান লেখি।[২]

তাঁদের কবিতায় কৃষিপ্রধান পূর্ব বাঙ্‌লার ছবিও ফুটে উঠেছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত কৃষকদের জীবন নিয়েও মহিলা কবিরা কবিতা রচনা করেছেন। আবার যারা শ্রমিক, যারা গড়ে তুলেছে শিল্পনগরী ও সভ্যতার অট্টালিকা তাদের সংগ্রামের ভিতর জীবনের মানদণ্ড রচিত হবে, এই বক্তব্যও পরিষ্কার। কল্পনা মোহরের লিখছেন :

যে মুষ্টির ঘাযে পাথর কাটার শক্তি আছে, যার দৌলতে
শিল্প নগরী ও সভ্যতার অট্টালিকা গড়ে ওঠে,
তাদের হাতে দিতে হবে জীবনের মানদণ্ড,
সংগ্রামিক হতে গড়ে উঠবে তা।
মানবিক অধিকারে আত্ম প্রতিষ্ঠায়।

(দীর্ঘশ্বাস ভরা পৃথিবী)

এই কবি আবার কান পেতে শুনতে পেয়েছেন কে যেন আসছে হ্যাজ স্কুল মাস্টারের ঘরে, কৃষকের ফালের ডগায়, শ্রমিকের স্বেদবিন্দুর ভিতরে, রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে! সে কে? তার নাম বিপ্লব :

আবার, রিজিয়া মোসফেক এর কণ্ঠে শুনি :

সহিতে পারি না আর কালের উত্তাপ
জাতির মঞ্চে নাচে স্বার্থ পিপাসুরা
সেকি বীভৎস দানবের নৃত্য
প্রতি পদাঘাতে তার জীবন যায়
......সভ্যতার সভ্য নয় এ অসভ্যদের

১. গ্রাম থেকে সংগ্রাম পৃ. ৩৮
২. ঐ পৃ. ৪৯

আজকের প্রভাতী সূর্যটা যেন
রিক্ত ব্যথা মুক্ত যদি হয় কোনদিন
সুপ্ত শত সভ্যচারীদের কোরাস সঙ্গীতে
আসিবে আবার নূতন দিন

(যুগান্তর)

অপরূপ দেশপ্রেমে উচ্ছ্বসিত এক কবি হৃদয়ের শপথ :

আমার জন্মের পর প্রথম ভালবাসলাম আমার মাকে
ভালবাসলাম আমার মায়ের উজ্জ্বল মুখমণ্ডল,
আহা কি অপূর্ব ! আশ্বাসভরা সে মুখ সে চোখ অতুলনীয়
আমি বুঝলাম আমার মা অটুট, আমার মা অনন্যা একক।
আমার মাকে আরো গভীর করে ভালবাসলাম
ভালবাসলাম আমার অস্তিত্ব দিয়ে—
আমার রৌদ্রালোকিত দিনে, মাকে আরো গভীর করে
ভালবাসব বলে শপথ নিলাম।

সেই রৌদ্রালোকিত দিন সত্য সত্যই কবে আসবে ?

ধর্মকেও মহিলা কবিরা চুল চেরা বিচার করেছেন। শান্তা ভৌমিক 'একজন মাস্টার গিন্নির চিঠি' কবিতায় লিখছেন, ঈদ গরীবদের জন্য নয়, তাদের জন্য আছে শুধু রোজা। কত সত্য নির্মম এই কথাগুলো। ও দেশের হিন্দু মুসলমান মহিলারা সংগ্রামের আহ্বানে একাকার হয়ে গেছেন।

পূর্ববঙ্গের যে সব মহিলা কবি পালাবদলের গীত রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বেগম সুফিয়া কামাল, কল্পনা মোহরের, তারা ইসলাম, নার্গিস খানম, মেহবুবা মোখলেস পারুল, মমতাজ বেগম মঞ্জু, রেবেকা সুলতানা শীলা, আতিয়া রসুল মেরু, প্রিয়াদি (ছদ্মনাম ?) প্রমুখ অনেকেই।

সমাজের নিয়মবন্ধন গণ্ডী পার হয়ে যে শ্রেণী সচেতন সমাজমুখীন মহিলা কবিরা বাঙ্‌লা সাহিত্যে নতুন সৃষ্টিতে কণ্টকাকীর্ণ পথকে সমুজ্জ্বল করতে পারেন, তাঁরা শুধু অভিনন্দন যোগ্যই নন, পথপ্রদর্শকরূপে নমস্ত।

॥ ২২ ॥ লতিফা হিলালীর কবিতায় নগর চেতনা যেমন প্রতিবিম্বিত, তেমনই দেখি প্রকৃতির সাবলীল রূপাভাস। তাঁর কবিতায় সুন্দর চিত্রকল্প ফুটে ওঠে :

১. কাঁচ স্বচ্ছ শিশিরের শুভ্রতায় সবুজ পাহাড়
রোদের ছোঁয়ায় জ্বলে ; মগ মেয়ে ঝিনুক কুড়ায়—

নিটোল পায়ের ছাপ, ভেজাবালু, হৃদয় উন্মনা,
স্রোতের উজান ঠেলে সাম্পানে প্রাণের দোসর—
আসবে ব্যাকুল হয়ে সুনিভৃত ঘরের ছায়ায়
দিগন্তে দেখেছে স্বপ্ন নীলিমায়, বিফল হবে না
কেন না হৃদয়ে জ্বলে সূর্যের প্রথম প্রহর।

(হিমছড়িতে সকাল)[১]

অথবা

২. জানালার রোদ, দূর আকাশের নীল সব ছায়া ছায়া
জীবন মরণ যুদ্ধে ক্লান্ত বৃদ্ধ হাঁপায় পশুর মত
আর অগাধ চিত্তের বোঝা অর্থহীন জেনে ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়
মাত্র দু'দিন পর—নদীতে কুয়াশা ঝুলে থাকা ভোরে
তাকে ট্রাকে তুলে দেওয়া হয়

(একটি মৃত্যুর ইতিহাস)[২]

জাহানারা আরজুর কবিতায় কখনও বা সহজ সরল প্রেমের কথা, আবার কখনও ইচ্ছার নিষিদ্ধ হাওয়া।

১. জানিনা কখন মধুময় হোল আলো,
জানিনা কখন লিখে রাখি সেই কথা
কেন লাগে আজ ভালো।

(স্বাক্ষর)[৩]

২. যদি কোনো এক নির্জন মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ণ প্রখরতায়,
স্নায়ুর কোষে কোষে ইচ্ছার নিষিদ্ধ হাওয়া বন্ধা হারায়,
ইত্যাদি।

(মুহূর্ত)[৪]

এই কবির কবিতা পাঁচ মিশালী ভীড়ে সহজেই হারিয়ে যায়। কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

১. লতিফা হিলালী, এক আকাশে অনেক তারা পৃ. ৬
২. লতিফা হিলালী, সমকাল : কবিতাসংখ্যা ১৩
৩. জাহানারা আরজু, নীলস্বপ্ন : সেপ্টেম্বর (১৯৬২)
৪. ঐ রৌদ্রঝরা গান : ডিসেম্বর (১৯৬৪)

গ্রন্থপঞ্জী

১. হাসান মুর্শিদ	১. বাঙ্‌লাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি।
২. রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত	২. আধুনিক কবিতা। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মাঘ, (১৩৭৭)।
৩. হাসান হাফিজুর রহমান	৩. আধুনিক কবি ও কবিতা। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ মাঘ, (১৩৭৯)।
৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়	৪. জসীম উদ্দীন, ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, (১৯৬৭)। কবি ফররুখ আহমদ। ঢাকা, মোহাম্মদ নাসির আলী, পশ্চিম নওরোজ কিতাবিস্তান, (১৯৬৯)।
৫. আজাহার ইসলাম	৫. বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ)। আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ কার্তিক (১৩৭৬)।
৬. সনাতন কবিয়াল ও দুর্গাদাস সরকার সম্পাদিত	৬. গ্রাম থেকে সংগ্রাম
৭. সুকুমার সেন	৭. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। বর্ধমান সাহিত্য সভা (১৯৭১)।
৮. দুর্গাদাস সরকার	৮. সাপ্তাহিক বাঙ্‌লাদেশ, জুলাই (১৯৭১)।
৯. আনোয়ারুল করীম	৯. বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক। কুষ্টিয়া, সৈয়দা আমেনা আনোয়ার, পশ্চিম নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, (১৯৬৯)।
১০. এ. কে. এম আমিনুল ইসলাম	১০. জসীমউদ্দীন, কবি ও কাব্য। (১৯৫৬) ঢাকা, ওদুদ পাবলিকেশান।
১১. সৈয়দ আলী আহসান	১১(ক). কবিতার কথা। (১৯৫৭) ঢাকা, ওয়ার্সী বুক সেণ্টার।

(খ) একক সন্ধ্যায় বসন্ত। পৃ. ৬০, ঢাকা, নওরোজ, কিতাবিস্তান, (১৩৬৯)।

(গ) অনেক আকাশ, (১৩৬৬) পৃ. ৪৪ ঢাকা, বার্ডস এণ্ড বুকস।

(ঘ) হুইটম্যানের কবিতা (অনুবাদ)। সাহিত্যিকা।

(ঙ) ইকবালের কবিতা (অনুবাদ)। (১৯৫৭) পৃ. ৯০ প্যারাডাইস লাইব্রেরী।

১২. আহমদ শরীফ

১২. পুঁথির ফসল। উনত্রিশ পুঁথিকারের নির্বাচিত কবিতাংশের সংকলন ও সম্পাদনা। ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশান, (১৯৬৬)।

১৩. লতিফা হিলালী

১৩. এক আকাশ অনেক তারা। ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, বাঙলা বাজার, ঢাকা—১, প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, (১৩৬৯)।

১৪. নির্মলেন্দু গুণ

১৪(ক). না প্রেমিকা না বিপ্লবী। খান বাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ৬৭, প্যারীদাস রোড, বাঙলা বাজার, ঢাকা—১। জুন (১৯৭২), ২য় প্রকাশ।

(খ) প্রেমাংশুর রক্ত চাই। খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর (১৯৭০)।

(গ) কবিতা, অমীমাংসিত রমণী। প্রথম প্রকাশ আগস্ট (১৯৭৩), প্রগতি, শাহবাগ এভিনিউ, ঢাকা-২

১৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

১৫(ক). অনির্বাণ। রেনেসাঁস্ প্রিণ্টার্স, ১০, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১ প্রথম প্রকাশ ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৮)।

(খ) বিপন্ন বিষাদ, ৪৪ শরৎ গুপ্ত রোড। ঢাকা-১। প্রথম প্রকাশ ২৫শে অক্টোবর (১৯৬৮)।

(গ) শঙ্কিত আলোক, ৪৪ শরৎ গুপ্ত রোড ঢাকা-১। প্রথম প্রকাশ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৫)।

(ঘ) প্রতনু প্রত্যাশা, প্রথম প্রকাশ কার্তিক (১৩৮০)। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা-১

(ঙ) দুর্লভ দিন, (১৩৬৮) পৃ. ৫৫ ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী ।

১৬. আলাউদ্দীন আল আজাদ — ১৬(ক). মানচিত্র, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ, (১৩৬৮); মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা।

(খ) ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ। প্রথম প্রকাশ মে (১৯৬২), মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা।

(গ) সূর্য জ্বালার সোপান। প্রথম প্রকাশ, ১লা অগ্রহায়ণ, (১৩৭২) মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ ঢাকা।

১৭. ফারুক সিদ্দিকী — ১৭. স্বরচিহ্নে ফুলের শব। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, (১৩৭৯,)বর্ণবীথি, ৩/৩ বি, পুরানো পল্টন ঢাকা-- ।

১৮. আবদুল গণি হাজারী — ১৮. জাগ্রত প্রদীপে। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর, (১৯৭০) নওরোজ কিতাবিস্তান, বাঙ্‌লা-বাজার ঢাকা-১

১৯. আবু কায়সার — ১৯. আমি খুব লাল একটি গাড়ীকে, প্রথম প্রকাশ ভাদ্র, (১৩৭৯), গণকণ্ঠ প্রকাশনী, ৩৭২, এলিফ্যাণ্ট রোড, ঢাকা-২

২০. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, — ২০(ক). রক্তিম হৃদয়। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ, (১৩৭৭) ৯, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩

(খ) অন্ধকারে একা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর (১৯৬৬) ওসমানিয়া বুক ডিপো ১৬/১১, বাবুবাজার, ঢাকা।

(গ) জুলেখার মন, (১৮৫৯) পৃ. ৭১ ঢাকা, লতিফা বানু।

২১. জিয়া হায়দার

২১. একতারাতে কান্না। প্রথম প্রকাশ আষাঢ় (১৩৭০)। পৃ. ৭৪ প্রকাশনী ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২

২২. খোদেম ফাতুন

২২. বেদনার এই বালুচরে। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, (১৯৬৩), আইডিয়াল লাইব্রেরী ১৪১ নিউমার্কেট ঢাকা।

২৩. তালিম হোসেন

২৩(ক). দিশারী। পৃ. ৬৩ ঢাকা, মৌসুমী পাবলিশার্স, (১৯৫৬)।

(খ) শাহীন, (১৯৬২) পৃ. ৭০ ঐ,

২৪. আহসান হাবীব

২৪(ক). ছায়াহরিণ, (১৯৬৯)। পৃ. ৬৪ ঢাকা কথা বিজ্ঞান,

(খ) রাত্রিশেষ, (১৯৬২)। পৃ. ৬৪, ঢাকা ইন্‌লেণ্ড প্রেস।

(গ) সারা দুপুর, কথা বিজ্ঞান।

২৫. আসরাফ সিদ্দিকী

২৫(ক). উত্তর আকাশে তারা, (১৯৫৮) পৃ. ৭০ ঢাকা, সবুজ লাইব্রেরী,

(খ) তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা, (১৯৫০)। পৃ. ৮২ ঢাকা, কিতাব মঞ্জিল,

(গ) বিষকন্যা, (১৯৫৫)। পৃ. ৩৪ ঢাকা, সাঈদা সিদ্দিকী,

২৬. ফররুখ আহমদ

২৬(ক). সাত সাগরের মাঝি, (১৯৫২)। পৃ. ৮৩ ঢাকা, তমদ্দুন প্রেস,

(খ) সিরাজম মুনিরা, (১৯৫২)। পৃ. ৮৩ ঢাকা, তমদ্দুন প্রেস,

(গ) নৌফেল ও হাতেম (কাব্যনাট্য) (১৯৬১)। পৃ. ৯১, ঢাকা, পাকিস্তান লেখকসঙ্ঘ।

২৭. সানাউল হক

২৭(ক). নদীও মানুষের কবিতা, (১৩৬৩)। পৃ. ৭২ ঢাকা, ওয়ার্সী বুক সেণ্টার।

(খ) সম্ভবা অনন্যা (১৩৬৯)। পৃ. ৬২ ঢাকা, পূর্ববাণী,

(গ) সূর্য অন্তত্তর, (১৩৬৯)। পৃ. ৯২ ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী,

২৮. মযহারুল ইসলাম

২৮. মাটির ফসল (১৯৫৫)। পৃ. ১০৭, ঢাকা, নিয়ামত পাবলিশিং কোং।

২৯. সিকান্দর আবুজাফর

২৯(ক). প্রসন্ন প্রহর (১৩৭১)। পৃ. ৮০,

(খ) তিমিরান্তিক, (১৩৭১)। পৃ. ৮২,

(গ) বৈরী বৃষ্টিতে, (১৩৭১)। পৃ. ৮০, ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী।

৩০. শামসুর রহমান

৩০(ক). প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, (১৩৬৬)। পৃ. ৬৬, ঢাকা বার্ডস্‌ এণ্ড বুকস।

(খ) রৌদ্র করোটিতে, (১৩৭৫)। পৃ. ৮০ ঢাকা, লেখক সঙ্ঘ প্রকাশনী,

৩১. সুফিয়া কামাল

৩১(ক). মন ও জীবন, (১৩৬৪)। পৃ. ১৪২, ঢাকা, বায়জীদ খান পন্নী।

(খ) সাঁঝের মায়া (১৯৩৮)।

(গ) মায়া কাজল (১৩৫৮)।

(ঘ) উদাত্ত পৃথিবী।

পাঁচ

পূর্ববঙ্গের (বাঙ্‌লাদেশের) কাব্য সমালোচনার ধারা

[বাঙ্‌লাদেশের (পূর্ববঙ্গের) কাব্য ও কাব্য সমালোচনার ধারা।
পশ্চিমবঙ্গের কাব্য ও কাব্য সমালোচনার রীতির সঙ্গে তুলনা]

পূর্ববঙ্গের কাব্য ও কাব্যধারা প্রসঙ্গে ও দেশের সমালোচকরা কী বলছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন, কাব্যসাহিত্যের গতি-প্রগতি নিয়ে তাঁদের মতামত কী, বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যের আবহমান কালের স্রোতধারা কি ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, কাব্যের গঠন-পদ্ধতি, ভঙ্গী ও ভঙ্গীমা নিয়ে তাঁদের মতামতই বা কী, কতখানি তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কতটাই বা তাঁরা আশাহত, অর্থাৎ এককথায় ও দেশের সমালোচকের দৃষ্টিতে পূর্ববঙ্গের কাব্যের মূল্যায়ন কী এবং এ বঙ্গের সঙ্গে তথা চিরকালীন বাঙ্‌লা কাব্য ধারার সঙ্গে যোগসূত্র সম্পর্কে তাঁদের মনোভঙ্গীই বা কী সে বিষয়ে এবার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সৈয়দ আলী আহসান একজন খ্যাতনামা কবি। মহম্মদ আবদুল হাইয়ের পরিচিতিও আমাদের অজানা নয়। বাঙ্‌লা ধ্বনিতত্ত্ববিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের অধ্যক্ষ ও বাঙ্‌লাভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডঃ মহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন ঢাকা খিলগাঁও এলাকায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৫০।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগেরও অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর আগে আর কোন মুসলমান ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্‌লায় B. A. (Hons.) ও এম. এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হননি।

জন্ম মুর্শিদাবাদের মরিচা গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। ডঃ শহীদুল্লাহের অবসরের পর তিনি বিভাগীয় প্রধান হন। অধ্যক্ষ হাইয়ের রচনাবলী—সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ভাষা ও সাহিত্য, ধ্বনি বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব, মধ্যযুগের বাঙ্‌লা গীতি কবিতা।

ডঃ মহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান পূর্ববঙ্গের কবি সম্পর্কে যা বলেছেন, অনুধাবন করা যাক।

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) সম্পর্কে এঁদের বক্তব্য, ইনি রবীন্দ্র ঐতিহ্যানুসারী, অধিকারী ও শ্রদ্ধাবিনত ভক্ত—গতিবিধি স্বপ্নের জগতে। তাঁরা বেনজীর আহমদ (১৯০৩) ও মহীউদ্দিন (১৯০৬)-এর মধ্যে দেখেছেন নজরুলের বিদ্রোহ ও চাঞ্চল্য। গোলাম মোস্তাফার (১৮৯৭) সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু ইসলাম ও প্রেম। তাঁর প্রেমের কবিতায় প্রথম যৌবনে নারীর প্রেমের একটি তরল আনন্দ এবং উল্লেখ আছে। তার ছন্দ নৈপুণ্য সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। বেগম সুফিয়া কামালের (১৯১১) বিরহের কবিতায় স্নিগ্ধতাপ দেখেছেন। শূন্যতার জন্য হাহাকার নেই। কবি কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০৯)-এর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, একপ্রকার সরল চাপল্য এবং আনন্দে তাঁর কবিতা-বিশিষ্ট। আবদুল কাদির (১৯০৬) তাঁদের মতে রবীন্দ্র ঐতিহ্যানুসারী।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রয়াসে বাঙলা কাব্য প্রথম পর্যায়ের কয়েকজন কবি সম্পর্কে তাঁদের মতামত উল্লেখ্য এই কারণে যে, দেখা যাচ্ছে সমালোচক-যুগল উল্লেখিত কবিবর্গকে আধুনিক যুগের আলোকে সহৃদয় দৃষ্টিতে দেখেছেন। একথা তো ঠিকই যে এক সময়ে তাঁরা যথেষ্টই সাড়া জাগিয়েছিলেন নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে। যদিও এ সবের অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ধার করা। যুগ ও জীবন সম্পর্কে, তার সময়ানুযায়ী প্রয়োজন সম্পর্কে, পরিবর্তন সম্পর্কে এঁরা কতখানি সচেতন ছিলেন, কতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন, সে সমালোচনা কিন্তু অনুপস্থিত।

তাহলেও অন্যদিক রয়েছে। এবার তাই আমরা দেখতে পাব। ডঃ হাই এবং আলী আহসান, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ ও সমর সেনকে ব্যতিক্রম-বহুল কবি বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন যে এরা কাব্য সূত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন প্রয়াণেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সে সঙ্গে অবশ্য যথেষ্ট বাচালতা এবং অনুপলব্ধ যৌন ভাবাবেগের বাহুল্য ছিল। নজরুল যে সমাজবোধের পরিচয় কাব্যে এনেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি তাঁরা দেখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের "প্রথমা" কাব্যগ্রন্থে।

জীবনানন্দ (১৮৯৯-১৯৫৪) সম্পর্কে বলেছেন: জীবনানন্দ প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। তিনি যে জগৎ নির্মাণ করেছেন সে জগৎ তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলের নয়। তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী হচ্ছে কুহেলিকার, ছায়ার, হেমন্তের জলস্রোতের, ইঁদুরের, প্যাঁচা আর বাদুড়ের। এবং ছায়া ও আলোতে যে হরিণী

করছে খেলা তার। যা কিছু গোপন এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তাই তাঁর মনে মাদকতা জাগিয়েছে। পাখী এবং প্রাণ তার পৃথিবীর প্রধান অধিবাসী। তাই নাটোরের বনলতা সেনও পাখীর নীড়ের মত চোখ তুলে তাকান। ফরাসী চিত্রকার রুশোর মত তিনি পরিচিত পৃথিবী থেকে অন্তরাল খুঁজেছেন। রুশোর ছবিতে সাপ আছে, হাঁস আছে, অপরিচিত লতা, ফুল, ফল আছে এবং তার সঙ্গে অনৈসর্গিক হয়ে বসেছে মানুষ। রুশোর ছবির প্রধান রং হচ্ছে ঘন সবুজ এবং নীল। জীবনানন্দের প্রকৃতির রং ধূসর। তাঁর কাব্য চিত্ররূপময়।

এই সমালোচনা ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা ধার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে চিত্ররূপময় কবি বলেছিলেন।

বিষ্ণু দে সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য—তাঁর কবিতায় শব্দ বিন্যাস এবং ছন্দ কৌশলের একটি নূতন আবিষ্কার আমরা লক্ষ্য করি। বিভিন্ন চিন্তার ভগ্নাংশ নিয়ে একটি সামগ্রিক আবেগের ইশারা আর কবিতাকে অনেক সময় দুর্বোধ্য করেছে। আঙ্গিকের এ নতুন অভিজ্ঞতার জন্য তিনি ইলিয়টের নিকট ঋণী।

সমাজ সচেতন, চিন্তায় মার্কসপন্থী। সামাজিক বিভিন্ন অবস্থা এবং মানুষে মানুষে বৈলক্ষণের যে প্রকৃতি, তিনি কাব্যে তাঁর স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। কখনও কখনও হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের কোন চরণ দুর্ঘটনার মত আবির্ভূত হয় এবং তখন আমরা লক্ষ্য করি যে আবির্ভূত চরণটি নতুন অর্থে প্রকাশিত হচ্ছে।

তাঁর বাক্য বিন্যাসে ব্যাকরণের যুক্তি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন চরণ কিংবা স্তবকগুলি পারম্পর্য বিরোধী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুভূতির উজ্জ্বলতা।

নজরুলের (১৮৯৯-১৯৭৬) মূল্যায়ন করছেন। ইংরেজ কবি কিপলিং এর সঙ্গে নজরুলের তুলনা। কিপলিং কাব্য ক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পায়ত্ত কবিতা লেখবার চেষ্টা করেননি।··· নজরুলের সর্বপ্রধান বিশিষ্টতা হচ্ছে তাঁর সাময়িকতা।

প্রথমতঃ, নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন ইসলামের ঐতিহ্যের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্যও তাঁর কাছে অপরিচিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, নজরুল এসেছিলেন অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে এবং সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। তৃতীয়তঃ, দেশের রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

মুজাফফর আহমেদ রুশ বিপ্লবের সঙ্গে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত—সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পন্ন—নজরুলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক।

নজরুল, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে হয়ত নতুন কিছু তাঁরা বলেননি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পূর্ববঙ্গের বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে[১] এঁদের একটি করে নির্দিষ্ট স্থান আছে। বাঙলা কাব্যের ইতিহাসের ধারায় দুই বঙ্গের কবিদের সমালোচনা সেই কারণেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যায়ের গ্রন্থখানি থেকে বিশদ উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হল।

কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কাজী দীন মহম্মদ[২] মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার উল্লেখ করেছেন; কাব্যলক্ষ্মী রসরঙ্গে আত্মার রতিসুখ সম্ভোগকালে রসমূর্চ্ছিত মানবের ভাববিধুর গদগদ ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশই কবিতা।

রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। জানিয়েছেন কবিতার উৎসভূমি কবির হৃদয়ে—

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিচরণ
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলি জালে।

ইনি কবিতাকে মৃন্ময় কবিতা ও তন্ময় কবিতা দুইভাগে ভাগ করেছেন। গীতিকবিতা বা লিরিক প্রথমটির উদাহরণ, বস্তুনিষ্ঠ কবিতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

সনেটকে মৃন্ময় কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তন্ময় কবিতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন; যেমন, গাথা কবিতা, কাহিনীকাব্য, মঙ্গলকাব্য, মহাকাব্য, রূপক কবিতা, নীতি কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, লিপিকা ইত্যাদি—

গাথা কবিতার উদাহরণ—

মৈয়মনসিং গীতিকা, মহুয়া, মলুয়া, দেওয়ানামদিনা।

কাহিনী কাব্যের উদাহরণ দিয়েছেন রঙ্গলালের কাঞ্চীকাবেরী।

মঙ্গলকাব্য আলোচনায় মুকুন্দরামের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্য সাহিত্যিক মহাকাব্যের চমৎকার নিদর্শন। কায়কোবাদের অতিদীর্ঘ মহাশ্মশান কাব্যখানি যে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেনি, স্পষ্টভাষায় সে কথা উল্লেখ করেছেন।

---

১. মহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। আধুনিক যুগ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাঙলা বাজার হল ঢাকা।

২. কাজী দীন মহম্মদ (১৯৬৮), সাহিত্য শিল্প। আহম্মদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা।

নীতি কবিতার উদাহরণ দিয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্ভাব শতক, রবীন্দ্রনাথের কণিকা, কুমুদরঞ্জনের শতদল ও রজনীকান্ত সেনের অমৃত।

রূপক কবিতা—দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ।

সাঙ্কেতিক কবিতা—রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী।

ব্যঙ্গ কবিতা—ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল (Satire)।

লিপি কবিতা—মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য।

প্যারোডি—মোহিতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও সজনীকান্ত দাস।

এত দীর্ঘ উদ্ধৃতি এই জন্য যে, কবিতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সমালোচক সমস্ত উদাহরণ দিয়েছেন, আবহমান কালের বাঙ্‌লা সাহিত্য থেকে। লক্ষণীয়—পূর্ববঙ্গের কোন কবির বা কাব্যের নাম কিন্তু উদাহরণগুলোর মধ্যে অনুপস্থিত।

এই সমালোচক পূর্ব পাকিস্তানের কাব্যসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলছেন, "মধুসূদনের আবির্ভাবে বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্য Epic-এর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়। হেম নবীন কায়কোবাদে মহাকাব্যের রূপ ও রস অল্পবিস্তর সার্থকভাবে প্রবাহিত হওয়ার অবকাশ পায়। বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্যে সার্থক গীতিকবিতার প্রথম সৃষ্টি বিহারীলালের আবির্ভাবের ফলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এবং তার সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরা বাঙ্‌লা গীতি কবিতাকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আজকের দিনের বাঙ্‌লা কাব্যসাহিত্য বিশ্ব-কাব্যসাহিত্যের দরবারে আপন গৌরবে একই আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

দেশবিভাগের আগের কবিদের মধ্যে কায়কোবাদের সপ্রশংস নাম করেছেন। মহাকবি আখ্যা দিয়েছেন, তার পরেই বলছেন, মহাকবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেও কায়কোবাদের কাব্যের ধারা ছিল গীতিধর্মী।

এর সঙ্গে আরও যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন: কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমেদ, মঈনুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম, সৈয়দ এমদাদ আলী, আবদুর কাদির, শেখ হাবিবুর রহমন, জসীমউদ্দীন, বন্দে আলী-মিয়া, কাদের নওয়াজ, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ কবি অল্পবিস্তর রবীন্দ্রনাথের মিহি কোমলসুর ও নজরুলের ওজস্বিনী সুরের প্রতিধ্বনি এঁদের কাব্যে যদিও স্বকীয় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

ফররুখ আহমদকে বলেছেন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবিদের অগ্রদূত। ইসলামী ঐতিহ্যের উদ্দীপ্ত কবি তালিম হোসেন। এঁদের অনগ্রসরতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, আধুনিক যুগ থেকে পিছিয়ে পড়া সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়েনি।

আবুল হোসেন তার মতে রোম্যান্টিক ভাবাদর্শের কবি। আহসান হাবীবকে উল্লেখযোগ্য কবি বলেছেন, তাঁর আছে সুমার্জিত ভাষা, সুসংগত শব্দ প্রয়োগ এবং ছন্দ-নৈপুণ্য, দক্ষ-শিল্পী তিনি—তাঁর কবিতার আবেদন সর্বব্যাপী।

তাঁর মতে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি সানাউল হক, (রোম্যান্টিক কবি মানসের অধিকারী), আবদুর রশীদ খান্ (রোম্যান্টিক কবি, কাব্যরীতি আধুনিক), সৈয়দ আলী আহসান (টি. এস. এলিয়টের ভাবশিষ্য), বাঙলাদেশের প্রকৃতি তাঁর কবিতায় আধুনিক ভাবরসে অভিষিক্ত হয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে , সিকান্দার আবু জাফর (ছন্দনৈপুণ্য ও প্রকাশভঙ্গীর দক্ষতা) শামসুর রহমান (অতি আধুনিক কবিতার ভাব কঠিন রূপকর্মকে রূপায়িত করবার প্রয়াস—তাঁর কবিতার ভাববস্তু ঠিক সহজবোধ্য নয়। জীবনানন্দ বুদ্ধদেবের রোম্যান্টিক ভাববৈশিষ্ট্য এবং সুধীন্দ্র দত্তের ক্লাসিকেল রীতির আভাস), হাসান হাফিজুর রহমান (আধুনিক সমাজচেতনার সঙ্গে তাঁর কবি-মানসের সামঞ্জস্য ও নিরঙ্কুশ গদ্য প্রধান কবিতা), আবদুল গণি হাজারী, আলাউদ্দীন আল আজাদ, বোরহীন-উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, আবুহেনা মোস্তাফা কামাল, আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং রফিক আজাদ।

এ কালের মহিলা কবিদের মধ্যে নাম করেছেন নুরুন নাহার (ইসলামী ঐতিহ্য ও তমদ্দুনে সমৃদ্ধ,) শাহেদা খানম বেগম জেবু আহমদ ইত্যাদি।

কাব্যসাহিত্যের মূল্য নিরূপণের প্রচেষ্টা সাহিত্য রসিকদের কাছে এক বিশেষ ধর্ম এবং সর্বকালে সর্বদেশে আদরণীয়। সাহিত্যেই তো ঘটে সমাজ এবং জীবনের প্রতিফলন। কোন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-কল্পনা, অগ্রগতি বিচারে কাব্যসাহিত্যের মূল্য যখন নিরূপণ করা হয়, তখন সেই জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতাই বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা ও বিচার বিবেচনার আবশ্যকতা কি এবং কোথায়? সঠিক সমালোচনা কবির চোখ ফুটিয়ে দেয় এবং তাঁর ভবিষ্যৎ রচনা পদ্ধতি রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি সজাগ হন, সচেতন হন।

সমালোচককেও অবশ্য উদার ও সহৃদয় হতে হবে। যথার্থ যিনি সমালোচক, তিনি পরোক্ষভাবে কবিকে উৎসাহিত করেন, তাঁর মানোন্নয়নে, দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য করেন।

মূলতঃ সমালোচনার দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

বিশ্লেষণ মূলক (Analytical) ও সংশ্লেষণাত্মক (Synthetical)। এছাড়া আছে রসজ্ঞ সমালোচনা (Appreciative), সৃজনাত্মক সমালোচনা (Creative) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical)।

পূর্ববঙ্গের কাব্যসাহিত্যের সমালোচকগণ বুদ্ধিদীপ্ত, অনেকেই সাহিত্যিক এবং এদের মধ্যে কবির সংখ্যাও কম নয়। সেই কারণে সমালোচনার মানদণ্ড মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে কঠিন। তাঁরা সত্যান্বেষণেই প্রবৃত্ত। অবশ্য কেউই যে ভাবের ঘরে চুরি করছেন না, একথা বলা চলে না।

মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেকেরই আছন্ন ভাব রয়েছে। দীন মহম্মদ এবং ডঃ আবদুল হাইয়ের সমালোচনাতেও আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। এটি স্বাভাবিক। একটি নতুন সৃষ্ট জাতি তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাবার পর ধর্মকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল কিন্তু পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি কি ভাবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সে নিগড়ও ভেঙ্গে ফেলেছিল শেষ পর্যন্ত।[১]

১৯৬৮ সালে বাঙ্‌লা একাডেমীয় সাহিত্য সেমিনারের সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডঃ কাজী দীন মহম্মদ স্পষ্টই বলেছিলেন, যে "আমাদের জাতীয় তাহজীব, তমদ্দুন ও সাহিত্যের সঙ্গে একাডেমীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিগত দশ বছরে গবেষণা, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সঙ্কলন, অভিধান প্রণয়ন, বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ, সংস্কৃতিমূলক সভা ও সেমিনারের আয়োজন এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদির প্রকাশনা ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং তার সাফল্যজনক বাস্তবায়তনের মাধ্যমে বাঙ্‌লা একাডেমী আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।[২] তাঁর মতে আজাদী পূর্বকালে হীনমন্যতাবোধ ও অনুকরণপ্রিয়তাকে সম্বল করে সাহিত্যের যে ধারা আমাদের নামে চলে আসছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই সে ধারার মোড়

১. দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২. ফজলুল করিম সরদার : আমাদের সাহিত্য (১৩৭৬)। পৃ. ৫

ফিরেছে। একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে নিজস্ব সাহিত্য, তাহজীব ও তমদ্দুনের পরিপূর্ণভাবে বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিই ছিল নবজাগ্রত পাকিস্তানী জাতির অন্তরের কামনা।"

আমাদের মনে হয়, ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাহজীব ও তমদ্দুন মিলিয়ে ফেলেছেন কাজী দীন মহম্মদ সাহেব। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি (বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায়) পর্যালোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে বাধ্য হই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য থেকে তথাকথিত ধর্মের মুখোশ খুলে গিয়ে সাহিত্য জনমানসের অত্যন্ত কাছাকাছি নেমে এসেছে। ভণ্ড ও প্রতারকদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে আর থাকেনি, তার সৃষ্টির সোনার নূপুর বাজিয়ে সাহিত্য সাহিত্যই হয়ে উঠবার প্রয়াস পেয়েছে। কোন ক্ষুদ্র সংস্কার, ধর্ম, দেশ ও গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায়নি। পূর্ব বাঙ্‌লার সাহিত্য সাদামাটা যদিও বা হয়, তার অলঙ্করণে যদিও বা ঘাটতি কিছু থেকে থাকে, কিন্তু সব থেকে তার বড় গৌরব এই যে, সে সাহিত্যের স্বকীয় মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। সত্যকার সাহিত্য হয়ে উঠেছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্য একাডেমীর সেমিনারের কবিতা শাখায় যাঁরা সভাপতি, মূল প্রবন্ধ পাঠক ও আলোচক ছিলেন, তাঁদের সকলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত কবি। এই কারণে আলোচনা অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বিশ বছরের কবিতার উপর দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ববঙ্গের কোন কোন কবি (তাঁরা কেউ কেউ তখন পশ্চিমবঙ্গেই থাকতেন) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবাবহে উদ্বুদ্ধ ছিলেন, এবং কেউ কেউ নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে উল্লসিত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে আছেন গোলাম মোস্তাফা, শাহাদাৎ হোসেন ও বেনজীর আহমদ।

তিনি উল্লেখ করেছেন বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমানদের কথা নেই বলে মুসলমানরা হিন্দু সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁদের জীবন ও সমাজ নিয়ে লেখবার আবেদন নিয়ে। প্রসঙ্গতঃ এসেছে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের একটি সভায় শরৎচন্দ্রের কাছে মুসলমানদের আবেদন, এবং শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি, যে তিনি মুসলমানদের কথা লিখবেন। এ তো গেল বিংশ শতাব্দীর কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন ভেবেছিলেন মহরমের কাহিনী নিয়ে

মহাকাব্য লিখবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা হয়ে ওঠেনি এবং তাঁর প্রত্যাশা ছিল মুসলিম সমাজে এমন এক মহাকবির আবির্ভাবের, যিনি ঐ মহাকাব্য রচনা করবেন। বলা বাহুল্য সে প্রত্যাশা পরে পূর্ণ হয়নি। কায়কোবাদ ও ইসমাইল হোসেন সিরাজী তীব্র ভাবাবেগে উদ্বেলিত ছিলেন, কাব্য কুশলতায় সচকিত ছিলেন না।

কোন কবি, যেমন সৈয়দ আলী আহ্‌সান নিজেই দো ভাষী পুঁথির 'চাহার দরবেশ' অবলম্বনে লেখা 'চাহার দরবেশ' কবিতা লিখেছেন। রীতি আধুনিক, মূলকাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে দোভাষী পুঁথি থেকে। সমালোচক (সৈয়দ সাহেব) নিজেই বলছেন, "কবিতাটি কাব্যরীতির দিক থেকে খুব যে সফলকাম সে কথা বলছি না···তবে ইতিহাসের ধারার মধ্যে এর একটা স্বীকৃতি আছে।

আলী আহ্‌সান বলছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই অনলস কাব্য সাধনায় সব মুহূর্তেই নিবিষ্টচিত্ত বেগম সুফিয়া কামাল, মহীউদ্দীন, মঈনুদ্দীন, আবুদুল কাদির, বন্দে আলী মিয়া ও জসীমউদ্দীন। শেষোক্ত কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তা, পল্লী জীবনের সৌন্দর্য ও সৌরভ আজও উজ্জ্বল ও অনন্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রবীন ও নবীন কবিদের মধ্যে বিরোধ (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নতুন খাতে বাঙ্‌লা কবিতার ধারা বয়ে চলল।

বিষয় হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতায় ইসলাম একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এক্ষেত্রে ফররুখ আমেদের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনিও বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। তাঁর অনুসারীদের কাব্যে অনুকরণের রূঢ়তা। প্রকাশ চাঞ্চল্যহীন। মোট কথা সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য—"কিন্তু ইসলামকে অবলম্বন করে ঠিক সেই ধরণের মহৎ কবিতা সৃষ্টি হতে পারছে না—যেমন উর্দুতে হয়েছে।"

আমরা বলতে চাই, ফররুখ আমেদের মত সূক্ষ্ম কারুকার্যবিদ কবি যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে ইসলামী 'ভাবধারা' নিয়ে কবিতা রচনায় অন্য কেউ সার্থক হবেন না। বস্তুতঃ যুগ ও জীবনের মধ্যেই এর ব্যতিক্রম। সার্থক কবিরা হয়ত আর ইসলাম নিয়ে বা ধর্ম নিয়ে কবিতা রচনায় ব্যস্ত থাকবেন না কোনদিনই।

এসেছে আরও ভাবাবহ সমাজ সচেতন মনোভঙ্গী। এই ধারার পাকিস্তানের পূর্ববর্তী কবি আবুল হোসেন ও আহসান হাবীব।

রচনার জন্ম পরিশ্রম, নতুন ভঙ্গী আবিষ্কার করা, নিজের মনের কথা বলা এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ নবীন কবি বিশেষ তৎপর।

সিকান্দার আবুজাফর সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান বলেন, তাঁর রচনার বক্তব্যে একটা স্পষ্টতা আছে। আঙ্গিকের কৌশল থেকে বক্তব্যের স্পষ্টতায় তিনি নজর দিয়েছেন বেশি। একটা নিরাভরণ তীব্র আক্রমণের মত তাঁর শব্দাবলী···তাই স্মরণযোগ্য বিশেষ করে। সানাউল হককে বলেছেন অসম্ভব পরিশ্রমী কবি ও সহিষ্ণু।

শামসুর রহমানকে বলেছেন নাগরিক কবি। তাঁর নাগরিকতা অনেকটা বিদেশী। তার কারণ তিনি তাঁর কবিতার মধ্যে যে সমস্ত নায়ককে কল্পনা করেছেন, সে নায়ক ঠিক আমাদের পথ ঘাটের নায়ক নয়, এবং সে নায়কের আবেগগুলোও ঠিক আমাদের দেশী আবেগ নয়। তাঁর প্রায় কবিতার মধ্যেই বিদেশী আবহ এসেছে। কিন্তু সে আবহ দেশীয় পরিমণ্ডলের জন্য সত্য নয়। সত্য হয়নি বলেই তা স্বীকার পায়নি।

শামসুর রহমান সম্পর্কে সমালোচক অত্যন্ত বেশি কঠোর ও কঠিন। তিনি বলছেন, "বরঞ্চ বলা যায়···শহীদ কাদরী ও হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতার মধ্যে আমাদের পরিমণ্ডল, আমাদের সমাজ, আমাদের প্রতি-দিনকার ইচ্ছা, আমাদের প্রতিদিনকার দৃষ্টিপাত, এগুলোর ছবি পরিস্ফুট হয়েছে।"

সৈয়দ আলী আহসানের মতে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল মাহমুদের অনুশীলন ও সার্থকতা পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। শব্দ ব্যবহারের পরীক্ষায় আগ্রহী মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান অতি অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করেছেন।

অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সৈয়দ আলী আহসান বলছেন, কবি হিসেবে একজন সাহিত্যিক পূর্ব-পাকিস্তানে যতটা বেশি প্রতিষ্ঠিত, ঔপন্যাসিক হিসেবে বা ছোট গল্প লেখক হিসেবে ততটা বেশি উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত নন। অর্থাৎ 'কবি' এ নামটা অসম্মানের নয়।

সবশেষে তাঁর বক্তব্য, তাঁদের কবিদের পাঠক নির্মিত হয়নি। তার কারণ, তাঁদের সমালোচকও নির্মিত হয়নি।

বিগত উনিশ শতকের অত্যন্ত দুর্বল কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আধুনিক কবিতাও পূর্ববঙ্গে চালু। সে সব পাঠেও লোকে আনন্দ পাচ্ছে,

আবার আধুনিক কবিতা পাঠেও লোকে আনন্দ পাচ্ছে। তার বক্তব্য শেষ করেছেন, উন্নাসিক সমালোচকদের হাত থেকে কবিদের মুক্তি পাবার আশা নিয়ে।

ঐ একই সেমিনারে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মোটামুটিভাবে সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। আরবী ফারসী ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর মত আহসান সাহেবের মতই। তিনি বলেন, বস্তুতঃ কাব্যানুভবের যন্ত্রণাদগ্ধ মুহূর্তকে প্রকাশ করবার জন্যে কবি যে শব্দ ব্যবহার জরুরী মনে করবেন, সে শব্দ প্রয়াসের উপল চিহ্ন হয়ে নয়, অনিবার্যভাবে তাঁর কাব্যে আসবে।··· কবির উচিত ব্যবহার্য শব্দের মূল ভাষায় সমকালীন প্রয়োগজাত তাৎপর্য সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়া

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পঞ্চম দশকের কাবদের প্যাকিস্তান আন্দোলনের কাব এবং ষষ্ঠ দশকের কবিদের ভাষা আন্দোলনের কবি বলেছেন। হাসান হাফিজুর রহমান, আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দীন আল আজাদ, শামসুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী প্রভৃতির কবিতায় ভাষা আন্দোলন সম্পূর্ণ কাব্যিক অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। এ পর্যায়ের কবিরা পূর্ববর্তী তিন দশকের কাব্য ভাবনাকে অতিক্রম করবার শক্তি সঞ্চয় করল এবং বহুলাংশে তার গ্রাম্যতার অপবাদ মুক্ত হল। এ দশকের শেষার্ধের তরুণ কবিরা ক্রমবর্ধমান নগর চেতনায় আন্দোলিত আধুনিক বিশ্বের আণবিক অনিশ্চিতি অস্তিত্বের যন্ত্রণা, প্রেম ও একাকীত্ব বোধে চঞ্চল ও সংক্ষুব্ধ নিরীক্ষা প্রিয় বিদগ্ধ ও চিন্তারাজ্যে নবনবোন্মেষশালী। সৈয়দ শামসুল হক, আবুহেনা মোস্তাফা কামাল, ফজল শাহাবুদ্দীন, আল মাহমুদ, জিয়া হায়দার, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবদুস সাত্তার, শহীদ কাদরী ও অনেকেরই মধ্যে এই আধুনিক কাব্য ভাবনার বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য ধ্বনিত। ষাটের শেষদশকে অনেক তরুণ কবির আবির্ভাব। এঁদের মধ্যে মীজানুর রহমান, শেলী, শাহেদ কামাল, মাসুদ আহমেদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ মাহমুদ, রফিক আজাদ প্রভৃতি অনেকেই সম্ভাবনাপূর্ণ। জসীমউদ্দীন থেকে তরুণতম পূর্বোল্লেখিত সব কবিই সৃষ্টিশীল, তবে ছয় ও সাত দশকের কবিরাই সবচেয়ে সৃষ্টিমুখর এবং বস্তুতঃ এঁদের হাতেই পূর্ববঙ্গের কবিতা বৈচিত্র্যময়; শক্তিশালী ও আধুনিক জীবন চেতনায় শব্দবর্ণ গন্ধরূপময় হয়ে উঠছে। এঁরা আধুনিক বিশ্বের সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে এক দিকে যেমন সচেতন, অন্যদিকে দেশপ্রেম এঁদের মজ্জাগত।

কবি বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর কিন্তু সৈয়দ আলী আহসানের আলোচনাকে স্মৃতি-কথন বলেছেন। বলেছেন ভাবাবেগযুক্ত। বিশ্লেষণ হীন। তাঁর মতে ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া ও কাব্যাদর্শ একেবারে ভিন্ন। ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়ায় গোলাম মোস্তাফা বিচলিত ও অস্থির, তাই কবিতা বলতে তিনি পদ্য বুঝেছেন, পদ্যের মাধ্যমে জ্ঞাপন করেছেন তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা। শাহাদাৎ হোসেনের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাঁর মতে আবুল হোসেন ও আহসান হাবীব তিরিশের যুগের কাব্যাদর্শই অনুসরণ করেছেন। আবুল হোসেনের কাব্যরীতির মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর প্রতিফলন দেখেছেন। আহসান হাবীবের সমাজ সচেতনতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঐতিহ্যেই।

সৈয়দ আলী আহসানের চাহার দরবেশ-এ আবিষ্কার করেছেন সংস্কৃতি-চিন্তায় ভ্রান্তিবিলাস—অভিজ্ঞতার একমাত্রিক ব্যবহারে কাহিনীর বিন্যাসে বহুস্তর সংলগ্ন হয়নি, কৌতূহলের প্রমাণ মেলেনি, শব্দ চেতনা ও ভাষা ব্যবহারে গতানুগতিকতাই উচ্ছ্বসিত।

তিনি বলেছেন, স্বাধীনতার পর তিরিশের কাব্যাদর্শই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারণে ভিন্নতর দ্যোতনা লাভ করেছে। শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান সবাই ঐ কাব্যাদর্শের প্রেমেই কাজ করে চলছেন। তিরিশের মতোই এখানের কবিরা আন্তর্জাতিক বাসিন্দা।

নাগরিক চেতনা কাজ করছে আল মহমুদ, শামসুর রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, শহীদ কাদরী প্রভৃতির মধ্যে। ঐ নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি লাভ করেছে নতুন একটা রাষ্ট্রের পটে, ঐ নাগরিক চেতনাই কাব্যাদর্শকে তীক্ষ্ণ, তীব্র ও সচেতন করে তুলেছে। সৈয়দ আলী আহসানের সাম্প্রতিক ইচ্ছা অথবা আকাঙ্ক্ষা কিংবা আবেগের ফ্রেম ঐ নাগরিক চেতনার পটে, যে চেতনা আন্তর্জাতিকতাকে স্বীকার করে, অবচেতনাকে মেনে নেয়, বুদ্ধি ও অধীত বিদ্যার সহস্র আলোক প্রক্ষেপণে হঠাৎ তাৎপর্য আবিষ্কার করে। বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ইতিহাস ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ-ধর্মী হতে চেয়েছেন। তাঁর সতর্কতা সবিশেষ লক্ষণীয়।

কবিতা সেমিনারের সভাপতির ভাষণে ডঃ মযহারুল ইসলাম বলেন যে, অকারণ ও যদৃচ্ছ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করলেই যে ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে, অথবা শুধু এরই ফলে যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের মুক্তি আসবে তা নয়। শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখা দরকার।

কবি ও সাহিত্যিকদের বাক্ স্বাধীনতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন কবিরা হচ্ছেন ভোরের পাখীর মত—নতুন গানে ঘুমন্ত মানুষকে তাঁরা জাগিয়ে তোলেন। ইতিহাসে নির্যাতিত নিপীড়িত কবিরাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন।···কবিদের চিন্তায় স্বাধীনতা তথা সত্য ভাষণের স্বাধীনতা অবশ্যই দিতে হবে। সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে না পারলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা আদৌ সম্ভব হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, সঙ্কলন বিভাগের আজহার ইসলাম বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ) নামে ৭৬৮ পৃষ্ঠার একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন[১]। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ঈষৎ পূর্ববর্তী কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকদের যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। এতে তিনি আর একটি কাজ প্রশংসাজনকভাবে করেছেন, গবেষকদের কাছে যা মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে সেটি হল আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অমুসলমান ও মুসলমান সাহিত্যধারাকে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি দরকার নয়—বরং বর্জনীয়। কিন্তু দুই বাঙলার সাহিত্য প্রয়াস জানতে হলে গ্রন্থটি অপরিহার্য। এবং এর পরিধি বলা বাহুল্য ১৮০০ সালেরও আগে থেকে। তথ্যনিষ্ঠা অনমুকরণীয়। লেখক শ্রমশীল।

বাঙলা কাব্যের আলোচনা শুরু করেছেন দোভাষী পুঁথি সাহিত্য থেকে। এর আদি সূচনা মুঘল যুগে। কবিগানের যুগ এবং বাউল গান কীভাবে হিন্দু মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল তা দেখিয়েছেন। আধুনিক বাঙলা কবিতার ভূমিকায় যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্তের দীর্ঘ আলোচনা আছে। ঈশ্বর গুপ্তের রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, যা যথার্থ। রঙ্গলালের প্রসঙ্গে তাঁর রচনা আদিরসাত্মক নয় বলে প্রশংসা আছে। বলেছেন, তিনিই আধুনিক বাঙলা কাহিনী কাব্যের প্রথম কবি। কিন্তু সমালোচনা করেছেন, "মূল কাহিনীর ভুল শিক্ষা এবং স্বীয় জ্ঞান ও বিচারশক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যে রঙ্গলাল রাজপুত বীরের গৌরব বৃদ্ধির আশায় প্রতিপক্ষ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক মুসলিম চরিত্রকে চরম হীন বর্ণে চিত্রিত করলেন। নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্তের আত্ম-

১. আজহার ইসলাম,—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠার অত্যুৎসাহ এই আচ্ছন্ন মানসিকতা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।”

মধুসূদন সম্পর্কে—বস্তুতঃ সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যেই মধুসূদন অনন্যসাধারণ : কি জীবনী শক্তির প্রাচুর্যে, কি প্রতিভার বিদ্যুৎ দীপ্তিতে, কি সৃষ্টির অসামান্যতায় তিনি অতুলনীয়। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোথাও ক্ষুদ্রবুদ্ধি নেই, নাটকে প্রহসনে কাব্যে সর্বত্রই বিশুদ্ধ শিল্পরীতি, বিরাট ব্যাপ্ত জীবনচেতনা এবং সর্বোপরি মহিমা অপূর্ব শক্তিমত্তার সমাহারে প্রকাশিত হয়েছে।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার সম্পর্কে এই সমালোচক প্রতিধ্বনি করেছেন যে, মেঘনাদ বধ অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত বাণীরূপ, বৃত্রসংহার কৃত্রিম কবিকল্পনার ব্যর্থসৃষ্টি, বীরবাহু কাব্যে হেমচন্দ্র হিন্দু গৌরব প্রতিষ্ঠার বাসনায় মুসলমানকে হীনদর্প ও প্রতিপক্ষরূপে চিত্রিত করায় রঙ্গলালের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।···হেমচন্দ্রের কবি মানস হিন্দুর কর্মবাদে বিশ্বাসী।

নবীনচন্দ্র সেনের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলছেন, কাব্য রচনায় নবীন সেনের সমস্ত আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, কাব্যের বিষয়বস্তু ও ভাবের সামঞ্জস্য বিধানে তিনি নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন না। এক দিকে দেশাত্মবোধের প্রাবল্যে আবেগ প্রকাশ। অন্য দিকে ইংরাজের প্রশংসা—এই সঙ্গতিহীন দ্বিবিধ ভাবের তাড়নায় কবিচিত্ত উৎক্ষিপ্ত ও দ্বিধাযুক্ত। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান তাঁদের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বলেছেন, “মুসলমানরা পাপাচারী ও দুর্বৃত্ত ছিল (নবীন সেনের ধারণায়) কিন্তু ইংরেজ ন্যায়পরায়ণ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের সমস্যা ও সঙ্কট এখানে যে পাপাচারী এদেশীয় মুসলমান নৃপতির সহায়তা করব, না ন্যায়-পরায়ণ বিদেশী ইংরাজকে বরণ করব? শেষ পর্যন্ত বিদেশী ইংরাজকেই বরণ করা হয়েছে।”

কায়কোবাদের মূল্যায়ন করছেন আজহার ইসলাম—“কায়কোবাদ তাঁর কাব্যে জাতীয়তাবাদের যে আদর্শের ছাপ রেখেছেন, তা হেম নবীনের জাতীয়তাবাদের ভাব ধারার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে কবির স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে, হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির প্রতিই তাঁর সমবেদনা সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মহাকাব্যের বিশেষ কোন চরিত্র কিংবা বিশেষ কোন বীরত্ব ব্যঞ্জক ঘটনার মধ্য দিয়ে যে ভাবে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপন করা সম্ভব, কায়কোবাদের সে কৌশল জানা ছিল না।

ডঃ আনিসুজ্জামান এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "কায়কোবাদ যখন মহাকাব্য লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন বাঙ্‌লা সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগের অবসান হইয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের হাতে গীতিকাব্যের নব রূপায়ণের মধ্যে বাঙ্‌লা সাহিত্যের যেদিক নির্দেশ ছিল কায়কোবাদ তা বুঝতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতিকে তিনি ঈর্ষা করতেন তাই রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেননি।[১]

হোসেন ইসমাইল সিরাজীর কবি মনের প্রশংসা করেছেন এই সমালোচক। তাঁর মহাশিক্ষা কাব্য আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ গোলাম সাকলায়েন সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "সম্পূর্ণ কাব্যখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে আমরা একখানি জাতীয় সম্পদ প্রাপ্ত হইতাম।"[২] উল্লেখ্য এই কবি ইংরাজ রাজের বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় মহাশিক্ষা কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন। লেগেছিল দীর্ঘ বারো বছর। কোথায় এবং কিভাবে এই বিরাট বই লিখেছিলেন তা নিজেই বলেছেন—চন্দননগরে রাজদ্রোহ মোকর্দমার পরামর্শ হেতু আত্মগোপনাবস্থায়।

বিহারীলাল এবং রবীন্দ্র পূর্ববর্তী কবিদের সুন্দর প্রয়োজনভিত্তিক সমালোচনা করেছেন, প্রতি কবির বৈশিষ্ট্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন স্বল্প পরিসরে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।"

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা সম্পর্কে ঋজু স্পষ্ট ও দৃঢ় বক্তব্য বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁর মতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতার ভাষা তীক্ষ্ণ এবং জোরালো। ভাবালুতাহীন ঋজু, বলিষ্ঠ--তিনি স্বাতন্ত্র্যধর্মী। তাঁর কবি মন সনেটের গাঢ় পিনদ্ধ কায়ায় ভাবপ্রকাশে সচেষ্ট। করুণ রসের বিরোধী কবি মনেপ্রাণে যৌবনের পূজারী ছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে নতুন ঢং-এর আমদানী করেছেন। জোলো আবহাওয়ায় বর্ধিত ন্যাকামী সুলভ প্রেমের প্রতি সমকালীন বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের মনের যে প্রবণতা ছিল সে সম্পর্কে তিনি বিদ্রূপ বাক্য বর্ষণ করেছেন।

১. ডঃ আনিসুজ্জামান-মুসলিম মানস ও বাঙ্‌লা সাহিত্য। (১৭৫৭-১৯১৮)

২. গোলাম সাকলায়েন."সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (১৩৬৪)।

জীবনানন্দের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি জীবনানন্দকে রোম্যাণ্টিক প্রেমের কবি বলেছেন। অতি মাত্রায় ইন্দ্রিয়সচেতন কবি। তাঁর কোন কবিতাই কবিত্বের ফাঁকা ফানুসের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাব্যের উপাদানকেও কবি ইন্দ্রিয় চেতনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। জীবনানন্দ শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করেননি। এই যুক্তির সমর্থনে তাঁর বক্তব্য যে জগৎ এবং জীবনের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য জীবনানন্দ তাকে কিছুতেই অশ্লীল বলে ভাবতে পারেননি। তাই শিশির সিক্ত হেমন্তের পাকা ধানের ডগাকে তিনি নারীর দুধে আর্দ্র স্তনের সঙ্গে উপমিত করেছেন, কিম্বা মানব জীবনের আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত কাম ও বাসনার স্ফুরণ লক্ষ্য করেছেন—বনের ভিতরে জ্যোৎস্নার প্লাবনে মিলনাকাঙ্ক্ষী মৃগীর কামার্ত চীৎকারে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আভিজাত্য ও দুরূহতা সাধারণ পাঠকের বুদ্ধি ও বোধের অন্তরায় বলে সমালোচক মনে করেন। তাঁর মতে জীবনানন্দ দাশও কিছুটা দুরূহ। তবে তাঁর কাব্যের দুরূহতা এলিয়টীয় অর্থাৎ কবিতার স্থানে স্থানে অনেক শূন্য স্থান রেখেছেন কবি, যা পরিপূর্ণ করে নেবার দায়িত্ব পাঠকের। কিন্তু শব্দ ও ভাবে সুধীন দত্তের কবিতা দুরূহ। অবশ্য সমালোচক বলেছেন যে সুধীন দত্তের কবিতা এক সচেতন শিল্পী মনের বুদ্ধি নির্ভর সৃষ্টি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। ভাবের দিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা বিদ্রোহের—নিপীড়িত ও বঞ্চিত সমাজগোষ্ঠীর জন্য এক নতুন উপলব্ধি আছে কবির। কবি দিয়েছেন মানুষের আদি ও অকৃত্রিম জীবন প্রবৃত্তির স্বীকৃতি। গভীর মানবতাবোধ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সেই কারণে দিগন্ত প্রসারী।

বুদ্ধদেব বসুকে বলেছেন আধুনিক যুগের একজন শক্তিশালী কবি। তাঁর কবিতার ভাব ভাষা ও বাণীভঙ্গীতে কবির আধুনিক সত্তার পরিচয় প্রকট। প্রথম দিকের কবিতায় রবীন্দ্র প্রভাব—মাঝখানে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব—কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষের কবিতা ও অন্যান্য আধুনিক রচনায় মাধ্যমে যখন রবীন্দ্রনাথের অতি আধুনিক সত্তার পরিচয় পান তখন প্রচণ্ডভাবে রবীন্দ্র ভক্ত হয়ে পড়েন।

বিষ্ণু দের কবিতায় এই সমালোচক বুদ্ধিবাদী সচেতন শিল্পী-মানসের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতা দুরূহ ও বুদ্ধি নির্ভর। স্বপ্নিল বিলাসকে তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যে জর্জরিত করেছেন। কবিতা রচনায় তিনি T. S.

Eliot-এর ভাব শিষ্য, Eliot-এর বাণীভঙ্গী এবং রীতিনীতি তাঁর কবিতায় সুলভ। কবিতায় মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব।

উপরোক্ত সমালোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে এটুকু বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কবির রচনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও জ্ঞান আছে। বিশ্লেষণ ভঙ্গী কিছুটা ভাসাভাসা; অগভীর। মূল বক্তব্য কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভর নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচকদের সমালোচনার উপরনির্ভর করেছেন। অতি আধুনিক কবিদের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিরিশের যুগের দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করেছেন। অতি আধুনিক কালের সঙ্কট আবর্ত ও চিন্তার দৈন্য কিছুটা ধরা পড়ে। তাহলেও বিশেষভাবে উল্লেখ্য বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান সাহিত্যিকদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলেও বাঙ্‌লা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য থেকে গেছে—দুই বঙ্গের সাহিত্য আলোচনা সমভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মধুসূদনের প্রতি সশ্রদ্ধ অঞ্জলি নিবেদন করেছেন, "প্রমীলা বীর্যে রক্ষ কূলবধূ, স্নেহে, প্রেমে, প্রণয়ে কুলাচারে বঙ্গের গৃহাঙ্গনে তার অবস্থিতি বিরুদ্ধ গুণের আরোপ করে মধুসূদন যে নারীপ্রতিমা গড়ে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তাতে তাঁকে বঙ্গ কাব্য সৃষ্টি জগতের বিশ্বকর্মা আখ্যা দেওয়া চলে।"[১]

পূর্ব-পাকিস্তানের সমালোচকদের আলোচনায় একটি বিষয় বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে নিশ্চয়ই উপরোক্ত দীর্ঘ অধ্যায়গুলিতে।

সেটি হল বিভাগ পূর্ববর্তী আধুনিক বা তথাকথিত আধুনিক মুসলমান সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁদের কারুর কারুব অত্যধিক উৎসাহ। শেখ আবদুর রহিম, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, ফজলল করীম, মতীয়ুর রহমান, বেগম রোকেয়া, নুরুন্নেসা, কায়কোবাদ, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের রচনার পুনরুদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়নে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বিশেষ করে বাঙ্‌লা একাডেমী। উপরোক্ত লেখকদের গ্রন্থাবলী পুনঃ প্রকাশ করা হয়েছে। ওঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক আলোচনাও করেছেন ও দেশের বিদগ্ধ মহল। কিছু কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি সেসব, গবেষকদের মতামত তুলে ধরেছি।

১. ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, বাঙ্‌লার কবি মধুসূদন।

কবি সাহিত্যিকদের নব মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষতঃ নতুন রাষ্ট্রের প্রবর্তনের পর এটাই স্বাভাবিক ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিছু অমূল্য মণিরত্ন এর ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের দাবী অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ও সামাজিক কারণেই তাঁদের আসন স্থায়ী বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু এই সাহিত্য প্রসঙ্গে যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব কোন কোন সমালোচক বিশেষভাবে বাঙ্‌লা একাডেমীর পরিচালকদের মধ্যে দেখা গেছে সেটা নিঃসন্দেহে সমান নিন্দনীয়। সাহিত্যিক কখনো সাম্প্রদায়িকতার মাপ-কাঠিতে বিচার করা যায় না।

প্রসঙ্গ যখন উঠলই, বাঙ্‌লা একাডেমীর কথা বলে নেওয়া দরকার। এটির সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৪ সালে, ভাষা আন্দোলনের ফলেই, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের বাসভবন 'বর্ধমান হাউস' অফিসে, ঢাকার প্রান্ত সীমায়। বাঙ্‌লা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সরকার। কিন্তু মূলতঃ এটি সরকারী আনুকূল্যে চলে। এর পরিচালক যাঁরা হয়েছিলেন, এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী দীন মহম্মদ, কবীর চৌধুরী—তাঁদের হয়ত ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য ছিল—এই একাডেমীর কার্যধারার মধ্যে দ্বিজাতীতত্বের মৌল আদর্শ প্রতিবিম্বিত দেখতে পাই। কাজেই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী ছিলই। যেমন, যে আধুনিক গদ্য ও সামাজিক কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে একাডেমীর পক্ষ থেকে, তাতে মুসলমানদেরই রচনা স্থান পেয়েছে। বাঙ্‌লা অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরবী ফারসী বহুল একটি মুসলমানী বাঙ্‌লা ভাষার আদর্শ রচনার কাজ দালালদের মত পরিচালকবর্গ চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বা রবীন্দ্রনাথের কোন বই একাডেমী থেকে প্রকাশ করা হয়নি। কাজী দীন মহম্মদ ছিলেন সাম্প্রদায়িক পরিচালক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে স্বীকৃতি পাননি। তাঁর পরিচালনায় বাঙ্‌লা সন বদলে সংস্কৃত বঙ্গাব্দ তৈরী করেছে, চালু করেছে বাঙ্‌লা একাডেমী। এ বঙ্গাব্দও সমান দোষে ভরা। এ ছাড়া বাঙ্‌লা একাডেমীর অধিকাংশ পরিকল্পনায় আধুনিক সমস্যা সংঘাতপূর্ণ জীবনের প্রতি বিমুখ। তবু বাঙ্‌লা একাডেমী ভাল কাজও করেছে। এখানে তার বর্ণনা দেওয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মূল অনুসন্ধানে সামান্য অগ্রসর হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে দেশের শ্রদ্ধাশীল সাহিত্যিকদের আরও কিছু তথ্য এখানে উপস্থিত করা হল।[১]

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আনিসুজ্জামান সম্পাদিত ৩১ জন সাহিত্যিকের রচনা সম্বলিত একটি সফল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ শহীদুল্লাহ্ রবীন্দ্রনাথকে সুফী কবিদের সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুস্থ সুন্দর স্মৃতিচারণ করেছেন জসীমউদ্দীন। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিকটি দেখিয়েছেন রফিকুল ইসলাম। শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯০ সালে। শেষ পরিদর্শন করেন ১৯০৭ সালে। তাঁর মতে শিলাইদহ তো তীর্থস্বরূপ। বাঙলা ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ মহম্মদ আব্দুল হাই বলেছেন যে, কবি তাঁর প্রতিভা বলে ভাষাতত্ত্বের বিশেষ শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বাঙলা ভাষার যথার্থ চরিত্র উপস্থাপনা করেছেন, তাঁর 'বাঙলা ভাষা পরিচয়' ও 'শব্দতত্ত্ব' পুস্তকে। সানজিদা খাতুন তাঁর প্রবন্ধে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গুরুত্ব যেমন নিরূপণ করতে গিয়েছেন তেমনি সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে কিছুদিন পূর্ববঙ্গে অসুবিধার কথাও আলোচনা করেছেন। শামসুর রহমান বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাঙলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর অবদান স্মরণ করেছেন। আনিসুজ্জামান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িক বিরোধী মনোভাবের উপর জোর দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ১১৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় যুগশিক্ষা আয়োজিত এক সভায় সভাপতির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী বলেন যে, শ্রেণীবিশেষের সঙ্কীর্ণতা ও অজ্ঞতাই রবীন্দ্রসাহিত্য বিরোধিতার মূল কারণ। দৃষ্টান্ত সহযোগে তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের প্রতি বরঞ্চ পক্ষপাতিত্ব করেছেন। মুসলিম জাগৃতির পিছনে রবীন্দ্রনাথের কোন অবদান নেই এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক জ্ঞানের পরিচায়ক।

কবি বেনজীর আহমদ বলেন যে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য তিনজনের নিকট গভীরভাবে ঋণী। এই তিনজন হলেন রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করতে

১. অমিয়কুমার হাটি, পূর্ববঙ্গ : সংস্কৃতি ও কবি মানস; সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা—৭৩, পৃ. ৩২৯৬। ১৯৬৯

হলে এবং এই ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বিন্দুমাত্র প্রীতি বোধ থাকলে এই তিন জনের যে কোন একজনকে অস্বীকার বা বর্জন করা গর্হিত হবে।

রোকেয়া হলে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আবতুল হাই বলেন যে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে হাজির করে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছেন।

ডঃ আনিসুজ্জামান 'চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাকবিই নন, তিনি মহা সাধক, মহান বিশ্ব প্রেমিক, মানবতার মহান পূজারী, তিনি জাতিধর্ম দেশকালের উর্ধ্বে। তিনি এক অখণ্ড রূপে বিশ্বকে দেখেছিলেন। তাই বাঙ্‌লার কবি হয়েও বিশ্বকবি। স্রষ্টা ও সৃষ্টির অখণ্ড সত্তা তাঁর হৃদয়বীণায় এক অপূর্ব সুরলহরীর সৃষ্টি করেছিল। সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

১৯৬৯-র মে মাসে চারণিকের অনুষ্ঠানে দশজন সাহিত্যিক ও শিল্পীকে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার জন্য সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সাহিত্যে সম্বর্ধিত হন আবতুল হাসিম, ডঃ এনামুল হক ও বেগম সুফিয়া কামাল। সঙ্গীতে আব্দুল আহমদ, ওয়াহিতুল হক, সানজিদা খাতুন, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, জাহেতুল রহিম, আহমিদা খাতুন ও ফতিকুল ইসলাম। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ। এনামুল হক বলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি যখন ভাবেন তখন নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তিনি তাঁর জীবনকে খুঁজে পান। তিনি তাঁর অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পান। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চা মানেই তিনি মনে করেন জীবনের চর্চা।

আব্দুল হাসিম বলেন, রবীন্দ্রনাথ কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নন। রবীন্দ্রনাথ আবহমান বাঙালী সমাজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের দরবারে বাঙ্‌লা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য সংরক্ষণ ও আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে সংরক্ষণ একই সূত্রে গাঁথা। একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অজিতকুমার গুহের মতে বাঙালী মানস রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোকে চির উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী মানসের চিরকালীন ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা মানেই একটি জাতির ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা।

বৈপ্লবিক সত্তায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমদ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ মানবতার কবি, দার্শনিক কবি, ঋষি কবি ও শান্তির কবি। যুদ্ধ,

রক্তপাত ও হিংসার কুটিল চক্র এবং আণবিক বোমার হুঙ্কারের ঊর্ধ্বে উঠে জগৎকে মুগ্ধ করেছে, চকিত করেছে তাঁর শান্তির বাণী। প্রেম, প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এক রাষ্ট্র ও এক মানব সমাজ।

……বাঙালী জাতি ভাষা ও সাহিত্য এবং সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র কাব্য তথা রবীন্দ্রসাহিত্যই এক মস্তবড় বিপ্লব।"

শিলাইদহে সন্ধ্যা কবিতায় কবি মযহারুল ইসলাম বলেছেন—

মনে হয় এ শিলাইদহে
বিশ্বমানবের ভিড় দুই হাত তুলে আগ্রহে
জানাবে প্রার্থনা
শান্তি দাও আমাদের, আমরা শান্তির ছায়াকামী
আমরা শান্তির ছায়াকামী
হিংসার বহ্নি শিখা এ মাটিতে আর জ্বালব না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বভাবতই আসে নজরুলের কথা। বৈশাখের পরে যেমন জ্যৈষ্ঠ। ১৯৬৯ সালে ঢাকা নজরুল একাডেমীর তরফ থেকে যে উৎসবের আয়োজন হয়, তাতে আলোচনা সভা ও কাব্য পাঠে অংশ গ্রহণ করেছিলেন মুজীবর রহমান খাঁ, ডাঃ হাসান জামাল, ডাঃ মোহর আলী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী, বেগম সুফিয়া কামাল, জাহানারা আরজু, আবদুর রসিদ খান, ফতেহ লোহানী ও আলী মনসুর। নজরুল-গীতির পরিচালনায় ছিলেন, শেখ লুৎফর রহমান, বেদারুদ্দিন আহমদ ও সোহরাব হোসেন। প্রসঙ্গত নজরুল গীতির প্রচার ও প্রসারে ফিরোজা বেগমের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাঁর স্বামীও প্রখ্যাত নজরুল-গীতি বিশারদ। তিনি সম্প্রতি মারা গেছেন।

বাঙলা একাডেমীর সাহিত্য অনুষ্ঠানে ঐ সময় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান বেনজীর আহমদ, আবদুর রসিদ খান, ফজল শাহাবুদ্দিন, সৈয়দ শামসুল হক ও জাহানারা আরজু।

হাসান হাফিজুর রহমান একজন বিদগ্ধ সমালোচক ও পূর্ববঙ্গের একজন বিখ্যাত কবি।[১] রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে তিনি যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল যে, রবীন্দ্রনাথকে বহু আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১. হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবিতা।

দেবদেবী আশ্রিত আর্তিমূলক শঙ্কাবিধুর বাঙ্‌লা কাব্যে মানব জন্মের সার্থকতা ঘোষণার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছিলেন। কবির বেদনা ভরপুর উপলব্ধি এবং ব্যক্তিজীবন এই দুয়ের মাঝ থেকে দেবতা ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের আড়াল দূর করতে হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী বাঙ্‌লা কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং তিনি ঐ দায়িত্ব পালনে বিপুলভাবে সচেতন ছিলেন, তাঁর মধ্যে সর্বজনীন গোত্র চিহ্নমুক্ত ঐতিহ্যিক পরিচয়, তাঁর মধ্যে অনন্ত উৎসের খোঁজ, তিনিই প্রথম কাব্যিক **standard** বা মান তুলে ধরলেন। তাঁর কাব্যের মূল সবার সমৃদ্ধিরই দ্যোতক এবং রসধারা সবার জন্যেই গ্রহণীয় পটভূমি রচনা করেছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মক্ষেত্রে আত্মগত প্রতীক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। যে সংস্কার প্রবণতাটা বাঙ্‌লা কাব্যে পুরাতনের জের। কিন্তু জীবনের প্রতি ভালবাসাই হল তাঁর কাব্য প্রেরণায় ল নিয়ন্তা।

আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁস জীবনমুখী মূল্যবোধগুলোকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে সংস্থিত করেছিলেন।

নজরুলকে বলেছেন জাগরণের কবি। তিনি মূলতঃ মানুষের কারবারী। নজরুল বাঙ্‌লা কাব্যে বর্তমানতা এনেছেন। যা বাঙ্‌লা কাব্যের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির অবিসম্বাদিত উৎসের কাজ করেছে। তাঁকে মুসলিম জাগরণেরও একজন উদ্গাতা বলে অভিহিত করেছেন। আরও বলেছেন নজরুলের স্ববিরোধিতা ছিল চেতনগত দিক থেকে তিনি যুগ সজাগ কিন্তু মনোগত দিক থেকে তিনি আত্মবিলাসী।

নজরুল মন যেমন চির বিদ্রোহী, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও চির বিরহী।

তাঁর মতে জীবনানন্দ দাশে আধুনিক চেতনার অনুপ্রবেশ এবং জীবন ও সমাজ সত্য সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ সুপ্রচুর থাকা সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে কবির ব্যক্তি-মানসই প্রধান নিয়ামক শক্তি। তাঁর কাব্যে সমসাময়িক পরিবেশ ও সত্য সংক্রান্ত অবলোকনশীলতা তিরিশের কবিতায় পূর্বসূরীর দায়িত্ব পালন করেছে মাত্র।

তাঁর মতে বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম ধারা একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে নতুন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ধারক যে সাহিত্য উদ্যম ওতেও মুসলিম সাহিত্য সাধনার স্বতন্ত্র সুর প্রথম থেকেই স্পষ্ট। পাশ্চাত্য প্রভাবিত অনেকাংশে সচেতন এবং পরিকল্পিত এই সাহিত্য পুনর্গঠনের যুগে বাঙ্‌লা সমাজের মুসলিম সাহিত্যকরা প্রথমে কেন একাত্ম হতে পারেননি,

তার পিছনে তিনি জটিল রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কারণ আবিষ্কার করেছেন। এরই ফলে ঐ সাহিত্য ধারায় অংশ গ্রহণ করতে দীর্ঘ ষাট বছরের মত বিলম্ব হয়েছিল। তিনি ১৮৬৩ সালের মুসলিম লিটারেরী সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময়কে মুসলিম সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত বলে গ্রহণ করেছেন, এবং বলছেন তার বিশ বছরের মধ্যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিষাদসিন্ধুতেই মুসলিম সাহিত্যিকের শিল্পবোধ বাঙলা সাহিত্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উৎসারিত জীবন চেতনাকে সংশ্লিত করার স্বাভাবিক সূত্র খুলে নিতে সক্ষম হয়েছে। এইধারা মুজিবর রহমান, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, প্রভৃতি নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার পথ রেখে সমগ্র বাঙলা সাহিত্যেরই অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

কাজেই তাঁর আলোচনাতেও দেখা যাচ্ছে হাসান হাফিজুর রহমান সাহেবও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী না এনে পারেননি।

তাঁর পুস্তকের একটি অংশে পুরো উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, বিষয়টি এই যে, মুসলিম বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য কোন উপাদান আমাদের সাহিত্যে স্থান পাবে না এ ধারণা যেমন অযৌক্তিক তেমনি মুসলিম ঐতিহ্যকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়াও সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রশয় দেওয়া মনে করাও সঠিক ভাবনা নয়। এখানে আমার স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, মুসলিম বৈশিষ্ট্যই পূর্ব পাকিস্থানের বাঙলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র আলেখ্য রচনার মূল সূত্রকে ধরিয়ে দিচ্ছে এবং বিশেষভাবে আমাদের সাহিত্যের নতুন উদ্ভাবনা ও সক্রিয়তার প্রাথমিক উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রাধান্য দেশ বিভাগের বাস্তবতারই অপরিহার্য প্রতিফলন এবং একে স্বীকার করা বাস্তবকে স্বীকার করার নামান্তর। কেন না স্বাতন্ত্র্যের মূলগত কোন কারণ না থাকলে দেশ ও জাতির স্বতন্ত্রীকরণ হত না। অবশ্য অচিরেই যে কোন সময়ে এ দেশের সাহিত্যউদ্যম সর্বজনীন জীবনে প্রসারিত হতে পারে—তার আভাসও এখনই খুব অস্পষ্টও নয়। বলা বাহুল্য সেইটাই সাহিত্যের অগ্রগতির স্বাভাবিক পথ। উৎকেন্দ্রিক মনোভাব নিয়ে বিশিষ্ট একক প্রবণতাকে চিরস্থায়ী করতে গেলে শিল্পে সাহিত্যের সুস্থ বিকাশকেই বাধা দেওয়া হয়। তাছাড়া সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সাহিত্যের প্রাণের সামান্যতম যোগও নেই। অন্যপক্ষে একটি দেশের সাহিত্য সেই দেশকেই পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার প্রয়াসী। এমন বাধামুক্ত বিকাশেই দেশজ সাহিত্য গড়ে ওঠে নিজস্ব রঙ রূপ স্বাদ নিয়ে এবং সে জন্যই এক

দেশের সাহিত্য থেকে আর এক দেশের সাহিত্য আলাদা। সুতরাং একথা বলা চলে যে, মুসলিম বৈশিষ্ট্যের সাম্প্রতিক প্রাধান্য এ দেশের সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক হওয়ার প্ররোচনা না দিয়ে এ দেশের খাঁটি রূপের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পটভূমিই রচনা করেছে বরং।

কথার মোড়কে কিন্তু ভাবের ঘরে চুরিই ধরা পড়ছে। অর্থাৎ বুঝেও জেনেও আধা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পারছেন না।

গোলাম মোস্তাফা সম্পর্কে এই সমালোচক বলছেন যে, তাঁর কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠামো গত বক্তব্যেই ভার হয়ে উঠেছে, ধর্মের কবিতার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত আবেদন উদ্দীপনা আশা ও আস্থার জায়গায় অতীতের বা ধর্মের মোহান্ধ প্রচারপ্রধান হয়ে উঠেছে, আঙ্গিক হয়ে উঠেছে ছকে ফেলা ছন্দোবদ্ধ নিবন্ধের। আরো কিছু কিছু একটি উঁচু ভাব বিস্তার করতে গিয়ে খেই হারিয়ে মামুলি কথায় পর্যবসিত হওয়া, মিলের দৃষ্টিকটু অসামঞ্জস্য বাস্তবতা ফোটাতে গিয়ে নিতান্ত অকাব্যিক চিত্রের প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি।

শাহাদাৎ হোসেন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাঁর ভাষা ক্ল্যাসিক মনে হলেও আদতে তিনি ভাষা ও ভাবের উভয় ক্ষেত্রেই রোম্যান্টিক। তিনি তাঁর মজ্জাগত পরিমণ্ডল থেকে নড়েননি। তাঁর বৃত্ত ছোট সীমাবদ্ধ কিন্তু বড় সত্য তাঁর অস্তিত্বের মতই, সে অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে এক পুরোপরি কবির অস্তিত্ব।

আবদুল কাদিরের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি মনোভাবে রোম্যান্টিক, রোম্যান্টিকতায় তিনি আবার বাস্তবতাবাদী যা ভোগবাদে পর্যবসিত। তাঁর কাব্য এই নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে প্রসারিত নয়।

এই সমালোচক বলেছেন, ফররুখ আহমদের মুসলিম পুনর্জাগরণ বোধ এবং সে বিষয়ের বক্তব্যকে কাব্য বলে ভুল করার কোন কারণ নেই, নজরুলের attitude ছিল শুধুই জাগরণের, ফররুখের ছিল উদ্বোধনের।

শেষ পর্যন্ত আদর্শ কাব্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে, আদর্শ সাধনাকেই আঁকড়ে ধরেছেন প্রাণপণে। ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়টা নেমে এসেছে সহজেই সরল পথেই।...ফররুখ আহমদ আমাদের কাব্যসাহিত্যে আধুনিক উত্তরণে প্রকৃত সাহায্যটা করেছেন তাঁর কাব্য ভাষা ও আঙ্গিকের প্রয়োগে।

আহসান হাবীব প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি প্রগ্রেস-এ অব্যাহত নন। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি ভাবৈশ্বর্যপূর্ণ হলেও নৈর্ব্যক্তিকতার দরুণ

সেগুলোকেও যান্ত্রিক ছকে ফেলা বলে মনে হয়। মনে হয়; প্রস্ফুটিত নয়, ধারণা সঞ্জাত।

আবুল হোসেন দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর অনেক কবিতায় অভ্যাসের স্বচ্ছল অবদান বলে মনে করেন, এই সমালোচক, তিনি বলেন, আবুল হোসেন পরিশ্রমে শালীন, কিন্তু উদ্ভাবনায় স্পন্দিত নন। আহসান হাবীব তাঁর মতে সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ, আর আবুল হোসেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধে স্থিত। ফলে আবুল হোসেনে তিনি গণতন্ত্রের উত্তরাধিকারী লক্ষ্য করেছেন, আর আহসান হাবীব নতুন উত্তরাধিকারীর মুখাপেক্ষী। এবং যেহেতু গণতন্ত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি কালে একাধারে চূড়ান্ত পরিকর্ষণে সমৃদ্ধ ও ক্রান্তি চিহ্নে আক্রান্ত সেজন্য আবুল হোসেনের কাব্যেও গণতান্ত্রিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে ব্যক্তির crisis-এর প্রতিফল অবিমিশ্র। এই অনন্য সাধারণ বৈদগ্ধ্যের গুণটি অবশ্য অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দের মাধ্যমেই বাঙ্‌লা কাব্যে প্রথম প্রতিফলিত হয়।

সৈয়দ আলী আহসান সম্পর্কে আলোচনায় বলেছেন যে, তিনি চল্লিশ দশকে কবিতা লেখা শুরু করলেও সাম্প্রতিকতম কবিতার উজ্জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাতে তিনি আত্মগত প্রেক্ষিত খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিকতম নিরীক্ষণ ও অগ্রগামী কবিদেরই একজন। শিল্প-বোধের সঙ্গে জীবনশীলতার সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছেন।

সানাউল হকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন আতিশয্য, অসংযম, অপরিচ্ছন্নতা, অকারণ সর্বসংলগ্নতা এবং ছন্দ ও মিলের ক্ষেত্রে অমনোযোগ, অসতর্কতা এবং পরিশীলন বিমুখতাই কবি সানাউল হকের পক্ষে সুকবি হয়ে ওঠার সম্ভাব্যতার অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বলে তাঁর ধারণা হয়।

শামসুর রহমান প্রসঙ্গে—শামসুর রহমানের মূল্যবোধ প্রধানতঃ শিল্প ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কিন্তু এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে জড়িত হয়েছে পরিপার্শ্ব, সমাজ ও সময়সজ্ঞানতা। আসল কথা হল একজন কবির ধারাবাহিক বিকাশ, গভীর অস্তিত্ব-বিন্যাস এবং শিকড় শক্ত সংস্থিতির জন্যে যে কোন প্রকারের মূল্যবোধ এক অপরিহার্য চাহিদা। শামসুর রহমানের মূল্যবোধ তাই তাঁর প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এক সম্ভাবনাপূর্ণ উৎসভূমি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যাপক সম্পাদিত আধুনিক কবিতা বইয়ের প্রারম্ভে রফিকুল সাহেবের মনোজ্ঞ সমালোচনা রয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ রবি ভক্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর মধ্যেও মৌলিক গদ্য লেখক প্রমথ চৌধুরী বা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের মত সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবও সমকালীন উল্লেখযোগ্য কবিদের উপর না পড়ে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তাঁর স্বভাবজাত সাধনা যা রবীন্দ্র পরিমণ্ডল থেকে অংশতঃ স্বতন্ত্র। সত্যেন্দ্রনাথের সাধনা বাঙলা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিতে কম সহায়তা করেনি। শুধু সমকালীন কবিদের উপরই নয়, পরবর্তীকালের অর্থাৎ আধুনিক কবিদের অগ্রগামী জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও তাঁর প্রভাব পড়েছিল।

এই সমালোচক বলছেন যে, মোহিতলালের বৈদগ্ধ্যের মুখোশ আর যতীন্দ্রনাথের নির্লিপ্ততার বাধা নজরুলে ছিল না। এমন কি কল্লোলের কবিদের সঙ্গেও নজরুলের মৌলিক পার্থক্য ছিল। কল্লোলের বিদ্রোহ ছিল ভাবগত, সাহিত্যের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে নজরুলের বিদ্রোহ শুধু ভাবগত নয়, বস্তুগতও বটে, সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত। নজরুল আধুনিক বাঙলা কবিতাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন। কাব্য ক্ষেত্রে নজরুল রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার না করেও অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন, ফলে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হল। নজরুলের কবিতায় আমরা প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে সংশয় দেখতে পাই। প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে দেহজ কামনা বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতির স্বীকৃতি নজরুলে স্পষ্ট। ঈশ্বরে অবিশ্বাস না হলেও প্রথাগত নীতি ধর্মে আস্থার অভাব নজরুলে প্রবল। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকেও তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন। মার্কসীয় দর্শনে পরিপুষ্ট না হয়েও সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ-সৃষ্টির আশা নজরুল কাব্যে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত। প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে ভাষা সম্বন্ধে শুচিবাই পরিহারে, নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, বিষয়ের বৈচিত্র্যে নজরুল আধুনিক কবিদের অগ্রজ জীবনানন্দ দাশকেও প্রভাবিত করেছিলেন।

এই মূল্যায়ন যথাযথ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত।

তিরিশের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে—প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল এই কবি ত্রয়ের এবং ত্রিশ দশকের আধুনিক কবিদের সৃষ্টিধারার সন্ধিক্ষণের

কবি। অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহানুভূতি নজরুলেরই অনুসারী, প্রেমেন্দ্র মিত্রও বিদ্রোহের কথা বলেছেন। সে বিদ্রোহ নজরুলের অনুরূপ···

এই সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের বিপরীতধর্মী প্রতীক, চিত্রকল্প ও উপমা সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করে জীবনানন্দ বাঙলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে গেছেন। বিষ্ণু দের কবিতা সম্পর্কে বলেন, তার কবিতায় পাই জ্ঞান, বিদ্যা ও সমাজনীতির কঠিন অনুশীলন ও কঠোর অনুশাসন। বিষ্ণু দে সদাজাগ্রত মননের কবি। যে মনন কখনো এলিয়ট কখনও বা মার্কস লেলিনের মন্ত্রে দীক্ষিত। এলিয়টের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করে তিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

···বিষ্ণু দের কোন কোন কবিতা সহজবোধ্য নয় বলে তাঁর অনেক কবিতার দুরূহ ব্যাখ্যা সম্ভব। যেমন 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাকে প্রেমের কবিতা বা বিপ্লবের জয়গান উভয় অর্থেই গ্রহণ করা চলে। ওফেলিয়া ও ক্রেসিদা সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব পর। বিষ্ণু দের মেজাজ আপাতদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতার অনুকূল নয়। কিন্তু গীতিধর্মিতা বিষ্ণু দের কবিতায় ফল্গুধারার মত প্রচ্ছন্ন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছেন নৈঃসঙ্গের সম্রাট। স্বর্গ ও মর্তে সমান অবিশ্বাসী। আঙ্গিকে ধ্রপদী, রোম্যান্টিক প্রেরণায় অবিশ্বাসী। প্রেরণার পরিবর্তে চেতনায় বিশ্বাসী, যে চেতনা মেধা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় লব্ধ।

অমিয় চক্রবর্তীকে এই সমালোচকের আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আধ্যাত্মিক ও মরমী, বৈরাগী, হয়ত বা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও জগৎকে দেখতে চেয়েছেন বলেই। অমিয় চক্রবর্তী জ্ঞানের সঙ্গে বোধের, ঐতিহ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার যোগ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তী সব চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক। দেশ কাল, জাতিধর্ম, বর্ণগোত্রের গণ্ডী তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাঁর কবিতা সব চেয়ে বেশি কসমোপলিটান অথচ উৎকেন্দ্রিক নয়।

ধারাবাহিক তার সূত্র ধরে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করে বলছেন, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তী এই পাঁচজন কবিকে ত্রিশোত্তর আধুনিক বাঙলা কবিতার প্রতিনিধি স্থানীয় কবি ধরে নেওয়া যায়। এরা শুধু ত্রিশ দশকেই বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেননি। পরবর্তী কয়েক দশকের আধুনিক বাঙলা কবিতাও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাঁদের কবি

কর্মের আদর্শে। বস্তুতঃ বাঙ্‌লা কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দানের প্রয়াসে বাঙ্‌লা কবিতার ঋতু বদলের পালায় আলোচ্য কবিদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আবুসায়ীদ আইয়ুব ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত সঙ্কলন 'আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতা' ত্রিশের ঐ কাব্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল। আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার বৈচিত্র্য আনয়নে আরও যে কবিদের ভূমিকা উল্লেখ্য তাঁরা হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য।

এইবার পূর্ববঙ্গের কয়েকজন কবি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার মূল বিষয় বস্তু সূত্রাকারে গ্রথিত করা যাক।

আহসান হাবীব সমাজ সম্পৃক্ত মনের অধিকারী। ফররুখ আহমদের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম ধর্মীয় আদর্শ সমষ্টির রাজনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিবেদিত ও নিয়োজিত, ফলে অনেক সময় তিনি উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব দ্বারা আচ্ছন্ন। আবুল হোসেন অধিকাংশ সময়েই জীবনের গ্লানি আর পরাজয়কে তার খণ্ড ক্ষুদ্র, নিরবচ্ছিন্ন ট্র্যাজেডিকে কবিতায় পরিণত করেন। এ ব্যাপারে কবির চিত্ত সংবেদনশীল। সৈয়দ আলী আহসানের কবিতা একান্তভাবে ব্যক্তি ও আত্মনির্ভর, সাধারণতঃ সমকালীন জীবনের সমস্যাকে অবলম্বন করে না। তাঁর কবিসত্তা ক্রমান্বয়ে নিজেকে অতিক্রম করার চেষ্টায় রত। সিকান্দার আবু জাফরের বৈশিষ্ট্য হতাশায় নয়, নৈরাশ্যে নয়, আত্মসমর্পণে নয়, মৃত্যুর ভৎ'সনা উপেক্ষা করে আঁধার গোরের ক্ষেত্রে ভোরের বীজ বপন করতে পারেন বলেই, ক্লান্তিহীন যত্নে প্রাণের পিপাসাটুকু জাগিয়ে রাখতে সক্ষম বলেই সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা সে দেশের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তালিম হোসেনের কাব্য সাধনার মূল অনুপ্রেরণা যেহেতু ইসলাম ও পাকিস্তান, সে কারণে হৃদয় নির্ভর কবিতায় কবি আত্মস্থ হতে পারেন না। সানাউল হক মূলতঃ মানুষ ও প্রকৃতি প্রেমে আচ্ছন্ন, যে মানুষ ও প্রকৃতির সত্তা অবিচ্ছিন্ন। আবদুল গণি হাজারীর আছে কবির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, যা সহৃদয় সংবেদনশীল, অপাত্রে বর্ষিত নয়। আসরাফ সিদ্দিকীতে সত্যেন দত্তীয় মৌতাত আছে ছন্দের দোলায়। আবদুর রশীদ খান গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে শহরকে আশ্রয় করে যন্ত্রণার অধিকারী হয়েছেন। মযহারুল ইসলাম কালো দশকে সাহসী কবিতা লিখেছেন—প্রতিবাদের ভাষা

জুগিয়েছেন, ব্যঙ্গ কবিতার শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শামসুর রহমানের কবি ভাষা তাঁর নিজস্ব, তার সাহায্যে সর্ব শ্রেণীর পাঠকের কাছে তিনি আবেদন সৃষ্টি করেন। ও দেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সর্বত্রগামী। আলাউদ্দীন আল আজাদের কবিতায় আছে আশাবাদী সংগ্রামী মনোভাব। হাসান হাফিজুর রহমানের অভিজ্ঞতার মূল প্রেরণা ওদেশের আর দেশবাসীর চরিত্রের প্রতারকরূপ ও তার স্ববিরোধ। তিনি পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ও সমাজ জীবনের কবি ভাষ্যকার। গ্রামীণ জীবনের আধুনিক রূপকার আল মাহমুদ। ফজল শাহাবুদ্দীন কুৎসিৎ নগ্নতার আর উজ্জ্বল অশ্লীলতার রূপকার। কবি ও গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান শুধু শব্দালঙ্কারেই নয়, অর্থলঙ্কারের ব্যবহারেও নিপুণ। তাঁর কবিতায় সৌন্দর্যের পরিচর্যা এক স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে। ওমর আলী মূলতঃ প্রেমের কবি। পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিদের মধ্যে শহীদ কাদরী শহরকে সব চেয়ে বেশী ব্যবহার করেছেন।

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতে অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক সাধু। তিনি আধুনিক, কারণ, তাঁর চেতনা জটিল, ঘন, গভীর, অরণ্যের মতন, তিনি দ্বিধা বিভক্ত, দ্বিত্ব ব্যক্তিত্বে তিনি আক্রান্ত, অথচ তিনি সাধু।

তাঁর মতে নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের জয়ধ্বনি আমাদের উদ্দীপ্ত করে। তাঁর প্রেমের স্তবগান আমাদের মাতাল করে, কিন্তু আমরা অভিজ্ঞ হই না প্রেমে কিম্বা বিদ্রোহে। একটি অস্থিরতায় আমরা শুধু দগ্ধ হই।[১]

মধুসূদন সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসনের মন্তব্য, মধুসূদনের বিশিষ্টতা খুঁজতে হবে অন্য ক্ষেত্রে, গতিময় উপমার ক্ষেত্রে, প্রগাঢ় উপমা এবং বাঙালী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত উপমা ব্যঞ্জনায়। বাঙ্‌লা কাব্যে এগুলো নতুন সৃষ্টি। এ নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কাছে ঋণী।

বলাবাহুল্য এ প্রসঙ্গ অবতারণা করে সৈয়দ আলী আহসান মধুসূদনের একটি বৈশিষ্ট্যকে যথার্থ ফুটিয়ে তুলেছেন।[২]

১. বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, শাহাবুদ্দীন আহমদ, স্বদেশ ও সাহিত্য। বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, ১৫ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; পৃ. ১৪১। (১৩৭৭)

২. সৈয়দ আলী আহসান, কবি মধুসূদন। বাঙ্‌লা সাহিত্য সমিতি, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, করাচী। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। ১১০ পৃ. মূল্য তিন টাকা। সৈয়দ আলী আহসান, মেঘনাদবধ কাব্যে মানবভাগ্য। বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, ৪র্থ, ৩য় সংখ্যা (১৩৬৭)। পৃ. ৮।

মেঘনাদবধ কাব্যে মানবভাগ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য, বহুল আলোচনা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান, যেখানে বলেছেন নিয়তির অনিবার্যতার সঙ্গে দেবতাদের সক্রিয় বিরুদ্ধতা সম্পর্কে রাবণের অজ্ঞানতাকে যখন আমরা মিলিয়ে দেখি তখন নিয়তির পরিহাসটা বড় বেশি নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র সেই নিষ্ঠুরতার কারণেই রাবণ আমাদের হৃদয়ের এত নিকটে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত নতুন কিছু নয়, কিন্তু যে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গী অবলম্বন করা হয়েছে প্রবন্ধটিতে তাতে মধুসূদনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন; মধুসূদনের কবিকৃতির যথাযথ মর্যাদাসহ আলোচনা করেছেন।[১]

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, এ কাব্যে প্রাচীন পুরাণের দেবকল্প নরনারী নরকল্পতা পেয়েছে। উজ্জ্বল অঙ্গাভরণ, শোভা এবং সৌন্দয সত্বেও তারা বাঙালী জীবনের অভীপ্সা এবং আনন্দ নিয়ে লৌকিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি এবং স্নিগ্ধতা ঘোষণা করেছে।[২] মোহাম্মদ ফজলুর রহমান[৩] সুফিয়ান সাহেবের[৪] তিন খণ্ডে সমাপ্ত প্রায় ৮০০ পৃ. ব্যাপী সাহিত্যের ইতিহাসের এই পুস্তকটি প্রসঙ্গে বলেছেন: সুফিয়ান সাহেবের আগে যে সকল হিন্দু ঐতিহাসিক বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন, তাঁদের রচনার মধ্যে হিন্দু মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট। হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন। মুসলমান লেখকদের লেখা বিরাট পুঁথি সাহিত্যের দিকে তাঁদের নেক নজরে পড়েনি। বহুক্ষেত্রে তাঁদের সাহিত্য আলোচনায় নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দৃষ্ট হয়। কেবলমাত্র দীনেশচন্দ্র সেন বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্বন্ধে বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ আলোচনা করেছেন।

হিন্দু লেখকদের রচনায় তাঁদের ধর্মীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য ও ভাগবত পুরাণের অনুবাদ ও বৈষ্ণবকবিতা বিশেষ

১. সৈয়দ আলী আহসান, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, (১৩৬৮), পৃ. ৫।

২. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ, বাঙলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস। প্রকাশক, ছায়াবীথি প্রকাশনালয়, ঢাকা ও বগুড়া।

৩. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, পুস্তক সমালোচনা, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১৩ বর্ষ ১ম, সংখ্যা (১৩৭৮), পৃ. ১৪১।

৪. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, বাঙলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস। ছায়াবীথি প্রকাশনালয়, ঢাকা ও বগুড়া।

গুরুত্বলাভ করেছে। তাঁদের লেখায় দৌলত কাজী ও আলাওল প্রমুখ প্রতিভাশালী সাহিত্যিকদের অবদান ও দোভাষী পুঁথি যথাযোগ্য স্বীকৃতিলাভ করেনি। বাঙ্‌লাদেশে ফারসী ৬০০ বছরের অধিককাল রাজভাষা ছিল। হাফিজ সাদী, জামী, প্রমুখ সুফীমরমী কবিদের স্পর্শ পেয়ে বৈষ্ণব সাহিত্য এক নতুন রূপগ্রহণ করেছে ও বাউল গান এক স্নিগ্ধ মরমীভাবে আপ্লুত হয়েছে। হিন্দু লেখকরা একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত।

আলোচ্য বইটির তিনটি খণ্ডের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড ভারতচন্দ্র থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্বন্ধে বিস্তারিত মূল্যায়ন এই খণ্ডের বৈশিষ্ট্য।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। এককালে সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে কায়কোবাদ ও নজরুলকে কেন্দ্র করে চরম বিতর্ক হয়েছিল। কোন কোন মহলে নজরুল বিরোধিতা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। তার সম্পর্কে এমনও বলা হয় 'লোকটা মুসলমান না শয়তান?'

অপরদিকে 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল সমর্থনে প্রবল জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বলা বাহুল্য তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিকরা সর্বসময় প্রীতির ভাব পোষণ করেননি।

তৎকালীন (বিভাগ পূর্বের) নবনূর, ইসলাম দর্শন, মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায় এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। একটি কৌতুককর বিষয় হল সেকালে গোলাম মোস্তফা ইসলামের কথা বলেই রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও আমরা ইসলাম বিদ্বেষ খুঁজিয়া পাই নাই। বরং তাঁহার লেখায় এত ইসলামী ভাব ও আদর্শ আছে যে তাঁহাকে অনায়াসে মুসলমান বলা চলে"।[১]

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ সম্পর্কে সুদীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান।

ভূমিকায় বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙ্‌লা কবিতার ছন্দের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনায়।

১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম: মুসলিম বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রে ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা, ১৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৩৭৬) পৃ. ১।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর সনেট স্তবক বিন্যাসের রীতি বৈচিত্র্য ও নতুন কাব্য গঠন রীতি বাঙলা কবিতাকে আকস্মিকভাবে এক অভিনব অভিজ্ঞতা ও অত্যাশ্চর্য সম্ভাবনায় মণ্ডিত করে দিয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার পরবর্তী দিগন্ত উন্মোচন ঘটে রবীন্দ্র কাব্যে। বলা বাহুল্য কাব্য চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের মত বিপ্লবী ছিলেন না। তাই তাঁর কবিতার ছন্দও ধীরলয়ে বিবর্তিত ও ক্রমলালিত। তাঁর প্রবন্ধে এই বিবর্তনের প্রধান প্রধান প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।[১]

এপার বাঙলায়, যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও তাঁর কন্যা মাধুরী ভট্টাচার্য প্রথম পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতা নিয়ে তথ্যভিত্তিক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা সেখানকার আধুনিক কবিদের সঙ্গে, তাঁদের কবিতার সঙ্গে এদেশের সাধারণ পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন। পূর্ববঙ্গের কবিতার মূল্যায়নে তাঁরা এদিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন পশ্চিমবাঙলার সাহিত্য সমাজে।

বস্তুতঃ ভাষা আন্দোলনের ব্যাপকতা সত্ত্বেও, ওদেশের জনজীবনে ও সাহিত্যিক সমাজে বাঙলা ভাষার প্রতি নব আগ্রহবোধ, নিষ্ঠা ও মমতা ক্রমবর্ধমান জেনেও এদেশের সুধী সমালোচকসমাজ ও কবিসমাজ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীরব ছিলেন ওদেশের কবিকুল এবং তাঁদের কবিকৃতি ও কাব্যধারা সম্পর্কে। এই অনীহা বস্তুতঃ বিস্ময়কর, দুঃখজনক।

প্রথম কারণ মনে হয়, যোগাযোগের অভাব। বস্তুতঃ দুই বঙ্গের মধ্যে সাহিত্যিক যোগাযোগ তেমন কিছু ছিল না বললেই চলে। পাক—ভারত যুদ্ধগুলির পর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দরুণও বইপত্রের আদান-প্রদান সরকারীভাবে বন্ধ ছিল। চোরাপথে কিছু কাগজপত্র আসত, কিন্তু সাহিত্যিক ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না। সাহিত্যের মান মাপার মতো সামগ্রী তো অবশ্যই ছিল না। ১৯৬৫-র পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের কবিদের নূতন কবিতার বই যোগাড় করা রীতিমত দুরূহ ছিল, কাজেই সংগ্রহ যদি না করা যায় কবিদের কার্যাবলী, তাহলে স্বভাবতই আলোচনা সমালোচনার পক্ষে বাধা আসে।

---

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প. ৪৮।

কবিদের কুল, জাতি, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী জানার সঠিক সুযোগও ছিল না। প্রকৃত সমালোচনার ক্ষেত্রে কবিকে না জানা, তার সঙ্গে তাঁর জীবন ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় না থাকা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের নিজেদের সাহিত্যকৃতির উপর অসম্ভব এবং অবাস্তব আস্থাও এর একটি কারণ। আমরা তো ঐতিহ্য ভাঙিয়ে খাচ্ছি। পথটা তৈরী হয়েই আছে, মধু-রবীন্দ্র-নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্র-বুদ্ধদেব-প্রেমেন-বিষ্ণু দে-অমিয় চক্রবর্তী-সুকান্ত-জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ ইত্যাকার কবিদের প্রভাব প্রকট এবং এঁরাই কাব্য সাহিত্যের আসরে জমজমাট—আধুনিক সব কবিই এঁদেরই পথ ধরে এঁদেরই কোন না কোন ভাবাবহ নিয়ে হাজির—অন্যদের, অন্য দেশের বাঙালী কবিদের দিকে বিশেষ করে তাকাবার অবসর বা অবকাশও নেই, ইচ্ছা বা সামর্থ্যও নেই। অন্ততঃ ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়েও ছিল না। তারপর অবশ্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, রাতারাতি অনেক আধুনিক কবিই ওদের ভক্ত হয়ে পড়েন, অনেকে ওদেশের কবিদের কাব্য সঙ্কলনও প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের প্রথম দিকে এই অবস্থা দাঁড়ায়। পূর্ববঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে, মনে হয়, প্রচারের ব্যাপারে কিছুটা অনীহাও এর জন্য দায়ী। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ তখনও শত্রু রাষ্ট্রই। পূর্ববঙ্গের কবিরা অবশ্য দেশপ্রেমিক ছিলেন। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সময় অনেকেই দেশপ্রেমের কবিতা লিখেছেন। শামসুর রহমানও বাদ যাননি। তাঁদের মনে এই বোধও হয়ত থেকে থাকবে, যে তাঁদের কাব্য সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গে সমালোচকদের কাছে বিশেষ সমাদর পাবে না, হয়ত বা উপেক্ষা ও অনাদরই লাভ করবে। তাই বিশেষ দু-একজন বন্ধুকবি ছাড়া নিজেদের বই এদেশে পাঠানোর তেমন চেষ্টাও করেননি। পরে অবশ্য বরফ গলতে আরম্ভ করে। শামসুর রহমান তাঁর একটি কবিতা পুস্তক 'নিরালোকে দিব্যরথ' উৎসর্গ করেন এদেশের কবি বিষ্ণু দেকে।

এদেশের তথাকথিত বড় বড় সমালোচক আশুলাভের কথা ভেবে থাকেন। সেরকম কেউ কেউ ওদেশের কবিদের সমালোচনা লাভজনক মনে করেননি।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যে অন্তরায় হয়নি, এমন কথাও বলা চলে না। সমাজজীবন, শ্রেণীবৈষম্য, মধ্যবিত্ত মানসিকতা এসবও অনেকক্ষেত্রে দায়ী হয়েছে, পূর্ববঙ্গের কবিতা সম্পর্কে আলোচনা না করার কারণ হয়েছে।

আধুনিক কবিতার মোহনমধুর বিধুরসুন্দর রূপটাই বুঝি বেশি সময় আমাদের চোখে ভাসে। এক্ষেত্রে সেদিক দিয়ে রোমান্টিক ভাবকল্প কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারছেন না আধুনিক কবিবৃন্দ। ওখানকার অনেক সুন্দর আসল কবিতায় উত্তাপ ও জীবন তরঙ্গ তাই হয়তো এখানকার সমালোচকরা ঠিক আঁচ করতে পারেননি। বিশ্বাসই হয়তো করতে পারেননি যে, তাঁদের বাঁধাধরা ছক ছেড়ে আধুনিক কবিতা কেবল কয়েকজন রসবেত্তার সম্পত্তি না হয়ে, শুধু আধুনিক কবিতা বোঝেন, এমন এক গোষ্ঠীর সম্পত্তি না হয়ে, ওদেশে আধুনিক কবিতা ছড়িয়ে পড়েছে, ব্যাপ্ত হয়েছে, মিছিলে নেমেছে, রক্তে নেয়েছে, লড়াইয়ের ময়দানে কদম কদম এগিয়ে গেছে।

পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতা শুধু পাঠ্যপুস্তকের চৌহদ্দী বা আধুনিক কবিতার জন্য কয়েকজনের মনগড়া বেঁধে দেওয়া, ছকে কেনা সীমারেখার মধ্যে, লক্ষ্মণের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সে কারণেও বোধকরি সমালোচনার যোগ্য ভাবতে পারেননি এদেশের তথাকথিত বিদগ্ধ সমালোচকবৃন্দ।

ডাঃ জগদীশ ভট্টাচার্য ছাড়া, পান্নালাল দাশগুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক কাগজ 'কম্পাস' ও মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত পত্রিকা (মাসিক) 'নবজাতক' গঠনমূলক সত্যান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ওদেশের কাব্যসাহিত্যের সমালোচনা শুরু করেছিলেন এবং বিদগ্ধজনের অন্তরে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন।

এদিক দিয়ে পশ্চিমবাঙলায় যে কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, ওপারের কবিদের কাব্যধারা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়, ৺নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস সরকার, অমিয়কুমার হাটি, সনাতন কবিয়াল প্রমুখ।

সাপ্তাহিক বসুমতী একটি উল্লেখযোগ্য সময়ে (১৯৬৮ থেকে) এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা প্রায় নিয়মিতভাবে পূর্ববঙ্গের কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করতে লেগেছিলেন সুস্থ মানসিকতার উপর দাঁড়িয়ে।

স্টেটসম্যানের মত ইংরাজী পত্রিকাতেও পূর্ববঙ্গের কবিতার সমালোচনা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল এই সময়ে।

কলকাতা বেতার কেন্দ্র এই সময়ে সুযোগ্য পরিচালনার গুণে পূর্ববঙ্গের কাব্যসাহিত্য প্রচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ বেতার কেন্দ্রের এবম্বিধ ভূমিকা খুব কম সময়েই আমরা দেখতে পেয়েছি।

একটা কথা মনে রাখা দরকার, পূর্ববঙ্গের কাব্যধারা প্রসঙ্গে এইসব আলোচনা কিন্তু বহুলাংশে খণ্ডিত। সম্পূর্ণ নয়। সেটা বোধকরি সম্ভবও ছিল না। তাই বিশদ উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন হবে মনে করি। তাহলেও, কয়েকজন কবি ও সমালোচক পূর্ববঙ্গের কবিদের মূল্যায়ন কীভাবে করেছেন, কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের মনে হয়েছে, অধিকাংশ কবি ও সমালোচকই পূর্ববঙ্গের কবিদের সমালোচনা করেছেন অনেকটা যেন আকৃতিগতভাবে, প্রকৃতিগতভাবে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। কোন কোন সময় তাঁরা বেছে নিয়েছেন নামগোত্রহীন কবিদের। এতে অবশ্য সমালোচকের সাহসিকতা ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ এবং ধারাবাহিক আলোচনা যেহেতু কেউ করতে অগ্রসর হননি, সেইহেতু অল্পেই সুখী হতে হয়েছে। কবি দুর্গাদাস সরকার ও সনাতন কবিয়াল তাঁদের পূর্ববঙ্গের কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থ "গ্রাম থেকে সংগ্রাম" এর ভূমিকায় বলেছেন যে, ওদেশের কবিতার মধ্যে রয়েছে ওখানকার গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামের স্বরূপ। সেখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আন্দোলনের পিছনে পরোক্ষ কাজ করেছেন তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অনেক কবিতায় মুখের ভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেমন কবি হৃদয় সমর্পিত, তেমনি অনেক কবিতায় স্বদেশের প্রতি তাঁদের নির্মল ভালবাসা উচ্ছ্বসিত। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। যে কৃষক দিবারাত্র হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে বঞ্চিত, যে শ্রমিক অর্ধাহারে অনাহারে নিত্যনিয়মিত প্রতারিত, যে মধ্যবিত্ত অভাবের সংসারে ন্যুব্জ, কুব্জ তাঁরাও কবিতার রাজ্যে একাত্ম, একই সংগ্রামী চেতনায় আলোড়িত, উদ্দীপ্ত ও সংহত। তাঁদের এই সংগ্রাম, বঞ্চিত মানুষের আগামীদিনের বিজয়ের সংগ্রাম। এই সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রাম চলছে দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষের মধ্যে। তাই ওদেশের সংগ্রাম আত্মকেন্দ্রিক নয়, আন্তর্জাতিক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেই এই সংগ্রামের যোগবন্ধন চিহ্নিত। আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের উপর লিখিত কবিতার দ্বারাও ওদেশের মানুষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতা পড়লে ওদের আন্দোলন ও সংগ্রামের স্বরূপটা যাচাই করা হল বলে মনে হয়। তাঁদের কবিতা পড়লে বোঝা যায় তাঁরা কীভাবে সেখানকার জনসাধারণের সংগ্রামী স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছেন, সংগ্রামকে আগুনের মত ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁরা হাত গুটিয়ে থাকেননি, কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

বস্তুত, তাঁদের এই সঙ্কলন গ্রন্থটি ওপার বাঙলার সংগ্রামী মানুষেরই পুনরীক্ষণ। আরো একটি জিনিস, এই সঙ্কলন গ্রন্থটিতে তাঁরা অনেক মহিলা কবির কবিতা সংগ্রহ করেছেন। এতে বোঝা যায়, ওদেশের নারীরাও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সংকলকদ্বয়ের বক্তব্য, হয়ত কাব্যের কলাকৌশলগত ব্যাকরণের বিচারে অনেক কবিতাই নিখুঁত বলে মনে হবে না, তবু বক্তব্যের সরলতায়, গাম্ভীর্যে, ঋজু আঙ্গিক ব্যবহারের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন কবিতাই ব্যর্থ নয়। ডঃ অমিয়কুমার হাটি তাঁর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গের কবিদের এই সংগ্রামী মানসের উপরই জোর দিয়েছেন। একটি জাতিকে বদলে দিচ্ছে যে মানসিকতা, তার যথাযোগ্য প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গের কবিতায়। সমাজে এবং রাষ্ট্রে, জাতীয় জীবনে কবিতার এর থেকে বড় মূল্যায়ন আর কী থাকতে পারে? এ প্রসঙ্গে ভিয়েতনামের (উত্তর ও দক্ষিণ) আধুনিক কবিতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের আধুনিক কবিতার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ডঃ অমিয়কুমার হাটি সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে ওদেশের কবি সিকান্দার আবু জাফরের কবিকৃতি আলোচনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। অধ্যাপক ৺নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের কবি আতাউর রহমনের কবিতায় আধুনিক কবিদের মানস সঞ্জাত বিষাদ চেতনা, শূন্যতাবোধ ও নিরর্থকতার ছায়া দেখেছেন। এই কবিকে তিনি শক্তিমান বলেছেন। শব্দে, ছন্দে, তাঁর বক্তব্য চমৎকার শিল্পিত। তাঁর মতে. এই শূন্যতাবোধ আর এক ভাবে রণিত হয়ে উঠেছে কবি রেজাউল হকের কবিতায়। কিন্তু এ কবি চেতনার নৈরাজ্যে বিলীন হয়েও এই বর্ণালী প্রাণবন্ত পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে পারেননি। আত্মগত দ্বন্দ্বের সংঘাত পূর্ব-বঙ্গের আর এক কবি জুলফিকার মতিনের কবিতায় লক্ষ্য করেছেন সমালোচক, কিন্তু কেন এই ব্যর্থতা, এই নিরাশা, এই আর্তি, এই সর্বনাস্তিবাদ? পূর্ববঙ্গের এক শক্তিমান উজ্জ্বল কবি দিলওয়ার হোসেনের কবিতায় উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন। সমালোচক বলেছেন, এই কবি অনুভব করেছেন, কোথাও রয়েছে মৌলিক একটা বিভ্রান্তি, একটা অজ্ঞানের অপরাধ, যার ফলেই জীবনের সব প্রত্যাশা আর প্রত্যয়কে এক শূন্যতার অন্ধকারে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। যাকে মনে করা হয়েছিল ভবিষ্যতের দীপ্ত সূর্য সে এক হতাশ্বাস কৃষ্ণপক্ষের প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়।

১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,......সাহিত্য পাঠ: বেতার জগৎ, ৪১ বর্ষ, ৪ পৃ. (১৯৭০)

তাঁরা বলেছেন, অনুভব করেছেন, নিষ্ঠুর ব্যর্থতা, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে তাঁদের শরীর। কিন্তু বিষাদ যেমন কবিদের ব্যাপ্ত করে, তাঁদের অতি উন্মুখ অনুভূতিকেন্দ্রগুলিকে উদ্বেলিত এবং আচ্ছন্ন করে, তেমনি কবিই জানেন "এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জালে।" এক কৃষ্ণপক্ষের সূর্য অস্তগামী হোক —আর এক সূর্য দেখা দেবে।

জীবনের মুক্তির, মানবতার শ্যামল অশ্ব স্বদেশ। এই স্বদেশরূপী মুক্ত অশ্বকে চালিয়ে নিয়ে কবির বল্গায় শাসিত করে ছুটছে অন্ধস্বার্থ, নিষ্ঠুর পীড়ন। ১৯৬৯ সালের সীমান্তে দাঁড়িয়ে কবি মযহারুল ইসলাম জীবনধর্মী প্রেরণায় কবিতার আলোকাভিসারে ঐ অশ্বের জয়যাত্রা রচনা করেছেন। কণ্ঠে তাঁর সম্ভাবিত প্রত্যয়ী ভবিষ্যতের কথা।

সমালোচক সেই প্রত্যয়ী ভবিষ্যতের কথা আগ্রহ সহকারে শুনিয়েছিলেন এই বঙ্গের সাহিত্য পিপাসুদের কাছে। কত সত্যসন্ধ এই সমালোচকের দৃষ্টি! কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী[১] ওদেশের কবিদের প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গের তরুণ কবিদের কবিতা পড়তে পড়তে তাঁদের কাছে তিনি এই কারণে কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলেন যে, তাঁর যে জন্মভূমি তিনি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এবং যার কোলে আর কখনও স্থায়ীভাবে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ তাঁর শ্যামল মুখশ্রীকে তাঁদের কবিতার মধ্যে তিনি বার বার দেখতে পাবেন। তাঁর মতে তরুণ কবিরা হরেকরকম মানুষের মুখ তাঁদের লেখার মধ্যে এঁকে যাচ্ছেন, শহরের মাস্টার কেরানী ছাত্র মজুরের মুখের পাশাপাশি ছোটখাট গঞ্জ আর গ্রামাঞ্চলের জেলে, মাঝি, ব্যাপারী, পাইকার, চাষী, গেরস্তের মুখও সেখানে এতই অবিরল ফুটছে যে, মানুষ সম্পর্কে তাঁদের মৌলিক আগ্রহের একটা সন্দেহাতীত সাক্ষ্য তার মধ্যে পাওয়া যায়।

উপরন্তু, এই নবীন ও তেজী কবি সমাজের আপনাপন বিশ্বাসের ছবিও তাঁদের লেখার মধ্যেই ফুটেছে। কী তাঁদের প্রতিজ্ঞা ও কীসে তাঁদের প্রত্যয় তা জানাবার জন্যে আলাদা করে কোন "ফতোয়া" বা "ইস্তাহার" তাঁদের লিখতে হয়নি। তাঁদের কবিতা পড়েই আমরা জানতে পারছি যে, একদিকে পূর্ববাঙলার ভৌগোলিক প্রকৃতিকে, তার জল হাওয়া আলো ও মাটির নিজস্ব চরিত্রকে তাঁরা নিবিড়ভাবে ভালবাসেন, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিজীবী মানুষ হিসেবেও

১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাঙলাদেশের কবিতা, দেশ। ৩রা বৈশাখ, (১৩৭৮)।

তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন। ওদেশের কবি জানেন যে, সমকালীন জনসমাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও যন্ত্রণাকে একটা বাঙ্ময়রূপ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। ওদেশের তরুণ বয়সী এমন একজন কবিরও সম্ভবতঃ সাক্ষাৎ মিলবে না, ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যিনি নীরব, এমন কবিরও না, স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বাড়িয়ে অন্ততঃ কয়েক লাইন যিনি লেখেননি। লক্ষ্য যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা তখন অত্যন্ত সংযতবাক্ কবির কণ্ঠও তখন আবেগে কাঁপতে থাকে, উদ্দেশ্য যখন অত্যাচারীর সমালোচনা, অত্যন্ত নম্র স্বভাবের কবির কণ্ঠও তখন বিদ্রূপে বেঁকে যায়। তাঁদের কবি ধর্মই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও মানব ধর্মে আস্থাশীল। হিন্দু মানুষ, মুসলিম মানুষ ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ পরিচয়ে কোন আস্থাই তাঁরা রাখেন না। মানব পরিচয়কেই তাঁরা তাবৎ মানুষের সবচাইতে বড় পরিচয় বলে মেনেছেন। অন্যদিকে বাঙালী হিসেবেও তাঁদের গর্ববোধের অন্ত নেই।

কবি দুর্গাদাস সরকারের[১] (ছদ্মনাম হৃদয় ভট্টাচার্য) মতে, ওপারের সাহিত্যিকেরা সরকারী বাধা সত্ত্বেও থেমে থাকেননি, সেখানকার মানুষের স্বাধিকার বোধ, মেহনতী মানুষের সংগ্রাম বাঙ্‌লা সাহিত্যকে নতুন "ধ্বনি" দান করেছে। রসক্ষুণ্ণ না করেও সাহিত্যে যে নব জিজ্ঞাসার আরোপ করা যায়, ওপার বাঙলার সাহিত্যিকরা এদেশে সাহিত্যিক ও অবিভক্ত বাঙ্‌লার সাহিত্যিকদের মত তার প্রমাণ রেখেছেন।

তিনি বলেছেন[২] এখনো পর্যন্ত অনেকের ধারণা, পূর্ববঙ্গে কবি সাহিত্যিকদের ভূমিকা সম্পূর্ণ মধ্যবিত্তসুলভ। মধ্যবিত্ত সমাজ পূর্ববঙ্গের কবি সাহিত্যিকদের কাছে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে একথা যথার্থ। কিন্তু সেখানের কবিদের কাব্যদৃষ্টি শ্রেণীস্বার্থে সীমাবদ্ধ ছিল না। একমাত্র ভাষা আন্দোলনই তাঁদের কাব্যের মূলধন ছিল না। সমাজের অভ্যন্তরের মানুষ নির্যাতিত নিপীড়িত ও বঞ্চিত। এ ব্যাপারে কবি ও সাহিত্যিকদের দ্বিমত ছিল না। তবে দোলাচল মনোবৃত্তির দরুণ হয়তো কাউকে কাউকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়, কিন্তু আন্দোলন যত তীব্র হয়েছে, ধীরে ধীরে দোচলা মনোবৃত্তির

১. হৃদয় ভট্টাচার্য: গত চব্বিশ বছরের বাঙ্‌লা সাহিত্য, বাঙ্‌লাদেশ, সাপ্তাহিক, ১৩ই আগষ্ট, (১৯৭১)।

২. দুর্গাদাস সরকার বাঙ্‌লাদেশের কবি ও কবিতার মূল্যায়ন, ২৩শে জুলাই, (১৯৭১)।

অবসান ঘটেছে। তাই পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতায় সংগ্রামের মেজাজ ও মর্জি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তবে একথাও বিচার্য, তাঁদের কবিতা কতজন মানুষের কাছে পৌচেছিল? সেখানেও নিরক্ষরতার সংখ্যা হৃদয় বিদারক।

বস্তুত, পুঁথিজীবীমহল থেকে শ্রমিক ও কৃষক সম্প্রদায় যেভাবে পৃথক হয়েছিল পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতাই তার অবসান ঘটিয়েছে। এই সমালোচকের মতে ; এই ঐতিহাসিক সত্যের তাৎপর্য বিশেষ বিচার্য।

পশ্চিম বঙ্গের বিদগ্ধ সাহিত্যসেবী ভবানী মুখোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবে ও দেশের সমালোচক প্রাবন্ধিক আহমদ ছফার অনুসরণে বলছেন: তরুণদের আন্দোলনের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের খর তীব্র চেতনা, জগৎ এবং জীবন দেখার নতুন একটা ভঙ্গিমা লাভ করবে তাতো একরকম স্বাভাবিকই। বাস্তবিকই এই সময়ে বাঙ্‌লাদেশের আদিম সৃষ্টিশক্তির হাজার বছরের রুদ্ধ উৎসমুখ প্রায় একটা ভূমিকম্পে খুলে গিয়েছিল। ওদেশে এসেছিল একবারে অভিনব সৃষ্টির মুখর একটা তরঙ্গ প্রবাহ।

গ্রন্থপঞ্জী

কবির নাম	কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য প্রকাশ কাল
১. অন্নদাশঙ্কর রায়:	আলাপ। চট্টগ্রাম, বেগম উমর কুল আলিম, প. ওয়ার্সী বুক সেণ্টার, ঢাকা, (১৯৫৪)।
২. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়:	বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস।
৩. আজহার ইসলাম:	বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ। (আধুনিক যুগ) আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।
৪. আ. ন. ম. বজলুর রসীদ:	আমাদের কবি। (১৯৬০), বুক কোম্পানী, ঢাকা।

১. ভবানী মুখোপাধ্যায়: মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার: সত্যযুগ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

	কবির নাম	কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য প্রকাশ কাল
৫.	ডঃ আনিসুজ্জামান :	মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য। (১৭৫৭-১৯১৮) ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী, (১৩৭১)।
৬.	আব্দুল লতীফ চৌধুরী :	কবি কায়কোবাদ। জীবন চরিত ও কাব্য সমালোচনা। ২য় মুদ্রণ। খুলনা, ওরিয়েণ্টাল পাবলিসিং হাউস, (১৯৫৫)।
৭.	আব্দুল মান্নান কাজী :	আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা। পরিবর্তিত ২য় সং। ঢাকা ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, (১৯৬৯)।
৮.	আমিনুল ইসলাম :	মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের মূল্যায়ন, (১৯৬৯)। ঢাকা নলেজ হোম।
৯.	এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম :	বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য। (১৯৬৯)। ঢাকা বুক ষ্টল।
১০.	কাজী দীন মহম্মদ :	সাহিত্য শিল্প, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, (১৯৬৮)।
১১.	গোলাম সাক্‌লায়েন :	মুসলিম সাহিত্যিক। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, (১৯৬৭)।
১২.	ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম :	বাঙলার কবি মধুসূদন। ২য় সং। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান। (১৯৬৮)।
	লুল করিম সরদার :	আমাদের সাহিত্য। ১৮-২৪শে অক্টোবর, (১৯৬৮) তারিখে বাঙলা একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সেমিনারের পর্যালোচনা। সরদার ফজলুল করিম সম্পাদিত। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, (১৩৭৬)।
১৪.	বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর :	ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সমষ্টি, সাম্প্রদায়িকতা। (১৩৭৬)। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

কবির নাম	কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য প্রকাশ কাল
১৫. মযহারুল ইস্‌লাম :	সাহিত্য পথে। (১৯৬০)। ঢাকা, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী।
১৬. মুনীর চৌধুরী :	তুলনামূলক সমালোচনা। (১৯৬৯)। ঢাকা, আহম্মদ পাবলিশিং হাউস।
১৭. মুস্তাফা নুরুল ইসলাম	মুসলিম বাঙলা সাময়িকপত্রে ভাষা ও সাহিত্য। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৪ বর্ষ। ১ম সংখ্যা, (১৩৭৬)।
১৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দআলী আহসান :	"বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" (আধুনিক যুগ) ৩য় সং, চট্টগ্রাম, নাসিমবানু, বইঘর, (১৯৬৮)।
১৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য। (১৩৭২)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী। ২। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, (১৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা)
সুফিয়ান, নাজিরুল ইসলাম মোহম্মদ :	বাঙলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস। ২য় সং। প্রকাশক : ছায়াবিথি প্রকাশালয় : ঢাকা, ৩য় খণ্ড।
২১. সৈয়দ আলী আশরাফ :	কাব্য পরিচয়। (১৯৫৬)। ঢাকা মোকাররাম পাবলিশার্স।
সৈয়াদ আলী আহসান :	১। কবি মধুসূদন। বাঙলা সাহিত্য সমিতি, করাচী বিশ্বাবিদ্যালয়, করাচী নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। ২। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ। ১ম সংখ্যা, (১৩৬৮)।
২৩. শাহাবুদ্দীন আহম্মদ	স্বদেশ ও সাহিত্য। (বোরহাউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর)—বাঙলা একাডেমী পত্রিকা। ১৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, (১৩৭৭)।

কবির নাম	কাব্যের নাম ও সম্ভাব্য প্রকাশ কাল
২৪. হাসান হাফিজুর রহমান :	আধুনিক কবি ও কবিতা। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী, (১৩৭২)।

প্রবন্ধ : পত্রিকা

১. অমিয়কুমার হাটি :	পূর্ববঙ্গ ; সংস্কৃতি ও কবিমানস। সাপ্তাহিক বসুমতী, সংখ্যা ৭৩ ; ১৯৬৯, পৃ. ৩২৯৬।
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় :	সাহিত্য পাঠ, বেতার জগৎ, ৪১ বর্ষ। (১৯৭০), পৃ. ৪।
৩. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :	বাঙ্‌লাদেশের কবিতা। দেশ, ৩রা বৈশাখ, (১৩৭৮)।
৪. ভবানী মুখোপাধ্যায় :	মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার, সত্যযুগ। ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭২)।
৫. মুস্তাফা নুরউল ইসলাম :	মুসলিম বাঙ্‌লা সাময়িকপত্রে ভাষা ও সাহিত্য। বাঙ্‌লা একাডেমী পত্রিকা। ১ম সংখ্যা (১৩৭৩), পৃ. ১।
৬. হৃদয় ভট্টাচার্য :	গত চব্বিশ বছরের বাঙ্‌লা সাহিত্য। বাঙ্‌লাদেশ. (সাপ্তাহিক), ১৩ই আগস্ট, (১৯৭১)।
৭. দুর্গাদাস সরকার :	বাঙ্‌লাদেশের কবি ও কবিতার মূল্যায়ন, বাঙ্‌লা দেশ (সাপ্তাহিক)। ২৩শে জুলাই, (১৯৭১)।

ছয়

পূর্ববঙ্গের (বাঙ্‌লাদেশের) কবিতার কলাকৃতি

[কবিতার শিল্পরীতি : ভাষা : ছন্দ : অলঙ্কার : চিত্রকল্প]

কবিতা একটি অমল শিল্প। কবির সৃষ্টিশীল শিল্পসত্তা বাঙ্ময় হয়ে মাটি ও মানুষের সঙ্গে যখন কবিতার যোগসূত্র রচনা করে তখনই তা অনবদ্য রূপ নেয় এবং কবিতাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে। মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন রচনাকে আমরা কবিতা নাম দিতে রাজী নই।

জীবন জটিল কিন্তু সুন্দর। হতাশা বেদনা দুঃখ যন্ত্রণা জরা আনন্দ আশা ও অনাগত স্বপ্নের সঙ্গে মিলে মিশে যে অপরূপ যৌগিক রচনা করেছে, তাই তো জীবন। কখনো চড়াই, কখনো উৎরাই, দ্বন্দ্বমুখর—বিদ্বেষ বিশ্লিষ্ট স্বার্থ, হানাহানি, হীনমন্যতা। কখনো বা উদার আকাশের অবারিত আমন্ত্রণ। এগিয়ে চলা, উত্তরণের মন্ত্র তার কণ্ঠে। সার্থক কবিতায় এই জীবনেরই প্রতিফলন।

কবিতার আঙ্গিক, সাজসজ্জা, অলঙ্কার, ছন্দ ঘটিত মিলমাত্রা কবিতাকে প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত করবার জন্যই। এ যেন বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের সহায়তায় গোলাপকুঁড়ির গোলাপদলে বিকশিত হয়ে উঠা।

পূর্ববঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার কলাকৃতি প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে, এক্ষেত্রেও একটি ধারা আছে, এবং দুই বঙ্গের কবির ক্ষেত্রেই ধারাটি এক এবং অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান। কাজেই বলতে পারা যায় বাঙ্‌লা কবিতার ঐতিহ্য এদিক দিয়ে অনন্যসাধারণ। এবং একই সঙ্গে একথা বলা যায়, কালের অমোঘ প্রভাবে পরিবর্তনশীল। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে কবিকুল সদাসজাগ। কবিতার কলাকৃতি ও আঙ্গিকের নবরূপসজ্জায় রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাব বাঙ্‌লা কাব্য জগতে যুগান্তর এনেছে। রবীন্দ্রনাথ এখনো সমধিক দীপ্যমান। কিন্তু কবিরা এখানেই থেমে থাকেননি। রবীন্দ্রকাব্যের পরিমণ্ডল থেকে অংশতঃ স্বতন্ত্র আঙ্গিক প্রথম পাই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবের গতানুগতিকতা থেকে কাব্যকৃতিকে মুক্তি দিতে তাঁর সাধনা অনেকক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি অস্বীকার করার প্রয়াস দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়ের মধ্যে। কবিতার ভাষা ব্যবহারে তাঁর কিছু অভিনবত্ব দেখা গিয়েছিল। গদ্যময় ভাষা ব্যবহার করেছিলেন কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য অথবা বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিতে তাঁর কোন কোন কবিতার অর্থ বিভিন্ন ও বিচিত্র। দ্বিজেন্দ্রলালে এটি নেই। কিন্তু তাহলেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভা বাঙ্‌লা কাব্যের আঙ্গিক বদলে কোন বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কাব্যক্ষেত্রে তাঁর বিদ্রোহ ছিল অগভীর। প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। "রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে……" একটু বিরক্ত হয়ে এগুলো লেখা।[১] তাঁর সনেটের বাঁধন লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিভিন্ন যুক্তি তর্ক ভাষা ভাবে একেবারে আলাদা। আধুনিক যেসব বাঙ্‌লা সনেট রচিত হচ্ছে (বিষ্ণু দে, সনাতন কবিয়াল প্রভৃতি) তার বাঁধুনিতে প্রমথ চৌধুরীকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এরপর তথাকথিত দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যে দেখি—মুগ্ধ আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে স্পষ্টোচ্চারিত অভিযান, নিমিলিতনেত্রে সৌন্দর্যরতির উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আঘাত এবং গণসংযোগের প্রচেষ্টা। বুদ্ধিপ্রবণ, ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক তাঁর রচনা। আধুনিক জীবনের নৈরাশ্যের ছোঁয়াও দেখা যায়, যদিও তিনি শেষে রবীন্দ্র অনুবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁর বিলুপ্তি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। মোহিতলালে যেমন সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহের রেখাপাত দেখতে পাই না, সেইরকম তাঁর আঙ্গিকও ভাস্কর্যধর্মী, তাঁর কবিতার যান্ত্রিক বাধানিষেধ অতিক্রম করে সাধারণ পাঠক তাঁর কাব্যের রসাস্বাদে অসমর্থ। নজরুলে পাই মৌলিক পার্থক্য, তিনিই আধুনিক কবিতাকে জীবন সম্পৃক্ত করলেন, রাষ্ট্র ও সমাজে পরিব্যপ্ত হল তাঁর কবিতা। প্রবাদ, চলিতশব্দ, গ্রাম্য-শব্দ, বিদেশীশব্দ ব্যবহার করেছেন স্বচ্ছন্দে, ভাষা সম্পর্কে পরিহার করেছেন শুচিবায়, সৃষ্টি করেছেন তিনি চিত্রকল্প, বিষয়ের বৈচিত্র্যও তাঁর অনন্যসাধারণ। সুকান্তকে তাঁর সাক্ষাৎ উত্তরসূরী বলা যেতে পারে—যে কবিতার অর্থ সংগ্রাম, কবিতা মানুষের জীবনের সঙ্গী, তার জীবনদর্পণ, তিনি স্বল্পজীবী—সৃষ্টিও তাঁর কম। তবুও তাঁর শিল্পসাধনা ও কলাকৃতির কিছু উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন সনাতন কবিয়াল।[২] রবীন্দ্র পরবর্তী নজরুল ও সুকান্তের ভাবধারা

১. প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন।

২. সনাতন কবিয়াল, মাসিক বাঙ্‌লাদেশ, ১৯৭৩।

বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করেছে, ভবিষ্যতে আরও পথপ্রদর্শন করবে।

রবীন্দ্রবলয়ের বিপরীতমুখী আর এক দিগন্ত নিঃসন্দেহে জীবনানন্দ—আধুনিক কবিদের যিনি পুরোধা। তাঁর আঙ্গিক এককথায় অনন্যসাধারণ—অনাস্বাদিত পূর্ব। "জীবনানন্দের প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য গদ্যপন্থী শব্দের ব্যবহার। কবি প্রসিদ্ধির অনুসরণ না করেই অতিচলিত, গ্রাম্য, দেশজ শব্দ কিংবা ইংরাজী শব্দ নিয়ে তিনি এমন নিজস্ব শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন যা বাঙলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ হয়ে উঠেছে"।[১] সচেতন বা অচেতনভাবে আধুনিক কবিদের অনেকেই জীবনানন্দ প্রভাবিত।

রবীন্দ্র-বলয় বিচ্যুত এই দুইটি ধারা—একটি নজরুল-সুকান্ত অনুসারী ও অপরটি জীবনানন্দ অনুসারী—নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আজকের কবিদের কবিতার আঙ্গিকে, বক্তব্যে তারই কম বেশি অনুরণন। পশ্চিম বাঙলার ক্ষেত্রে যেমন পূর্ব বাঙলার কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদন করতে গেলেও তেমনই এই দুই ধারা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন কবিতায় এই দুই ধারা—অর্থাৎ জীবনানন্দের অন্তর্মুখী (introvert) কবিকৃতি। এরপর বৈশিষ্ট্য আনয়নে চেষ্টা করেছেন সুধীন দত্ত। কিন্তু তার পথরেখা পরবর্তীকালে কোন কবিই সচেতনভাবে গ্রহণ করেননি—গ্রহণ করা সম্ভবও নয়। বিষ্ণু দের 'টেকনিক' একটু ভিন্ন জাতের—কিন্তু অত্যন্ত মননধর্মী, বুদ্ধিবাদী, কখনও এলিয়ট ঘেঁসা। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, "তিনি এলিয়ট থেকে মুক্তি পেয়েছেন, মার্কসবাদের প্রভাব পড়েছিল তার উপর, তবে যান্ত্রিক মার্কসবাদও বিষ্ণু দে মেনে নিতে পারেন নি।"[২] যান্ত্রিক মার্কসবাদ আছে কিনা তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু বিষ্ণু দে কোথায় যেন বিরাট ব্যবধান গড়ে তুলেছেন কবিতা পাঠকদের সঙ্গে, তাঁর মননশীল মানসিকতা চিন্তা আঙ্গিক সর্বস্বই আজ এজন্য দায়ী।

উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমাদের মূল বক্তব্য এই যে, পূর্ববঙ্গের কাব্য কলাকৃতির উপর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ও জীবনানন্দের জীবন্ত

১. দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৬৪), আধুনিক বাঙলা কাব্য পরিচয়, পৃ. ২০২।

২. দীপ্তি ত্রিপাঠি—আধুনিক বাঙলা কাব্যপরিচয়, নাভানা (১৯৬৪), ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলি-১৩, পৃ. ২৭০-৮০।

প্রভাবই একক অথবা যুগ্মভাবে ক্রিয়াশীল। এইভাবে বিচার করতে গেলেও বাঙ্‌লা কাব্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যে পূর্ব বাঙ্‌লার কবিতা সংযুক্ত—কোন সময়েই সেই বোধ ব্যাহত হয় না।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই উভয় বঙ্গের আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতার কলাকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বসূরীদের কথা, পূর্ববর্তী যুগান্তকারী কবিদের কথা, কলাকৃতির ধারায় আবহমানতা এবং অবিচ্ছিন্নতা স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ল। এইবার আমরা পূর্ববঙ্গের কবিতায় শিল্পসত্তার আবিষ্কার ও পর্যালোচনায় অগ্রসর হব। আস্বাদন করব ছন্দ, যতি, মিল, চিত্রকল্পের জগৎ—একটি কাব্যে, গোটা কবিতায়, একটি স্তবকে বা লাইনে, তার ধ্বনি, রঙ ও গন্ধ নিয়ে ; বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব কোনটা কখন প্রাধান্য পাচ্ছে। রূপক, উপমা প্রভৃতি অর্থালঙ্কার টেনে আনব। পরখ করব বাক্যবিন্যাসের মুন্সীয়ানা, বাজিয়ে দেখব শব্দ চেতনা—সম্পূর্ণ কবিতার আলোকে, কবির মনোধর্মের আলোকে, দেখব কিভাবে শব্দে সঙ্গীত, ছবি, ইডিয়ম, বাক্যাংশ ও অলঙ্কার সৃষ্টির নূতন রঙে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

ওদেশের অধিকাংশ কবিই তানপ্রধান ছন্দ বেশী পছন্দ করেন। শামসুর রহমান থেকে দু'একটি উদাহরণ নেওয়া যাক:

১. আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে
কড়ি কাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
ফ্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধূলোয়
দুঃখ তার আঁকে চকখড়ি
এবং ধূলোয়
তুলি বাঁশি বাজা আমাদের এই নাটে।

(দুঃখ : রৌদ্র করোটিতে)

২. কখনো না দেখা নীল দূর আকাশের
মিহি বাতাসের
সুন্দর পাখির মতো আমার আশায়
হৃদয়ের নিভৃত ভাষায়
দুঃখ তার লেখে নাম।

(দুঃখ : রৌদ্র করোটিতে)

ওমর আলীর কবিতায় তান প্রধান ছন্দ—

৩. সে দেখে, রাত্রির নীলাকাশের উদ্যানে ফুটে আছে
স্বপ্নময় এক দেশে শেফালি, বকুল, কিংশুক।
সে দেখে, মজনুর চোখে পূর্ণশশী লায়লার মুখ।
ঘুমন্ত রাজকন্যার শিয়রে রৌপ্য কাঠি আর স্বর্ণ কাঠি তার কাছে।

(তীক্ষ্মমন)

ফররুখ আহমদের কবিতা—

৪. দূর দিগন্তের ডাক এলো,
স্বর্ণ ঈগল পাখা মেলো,
পাখা মেলো···

(গান)

বেগম সুফিয়া কামালের কবিতা—

৫. সন্ধ্যা দীপ জ্বালা গৃহে মায়ের জীবন ভরি তার
নামিয়াছে অনন্ত আঁধার।

(শহীদ স্মৃতি)

আবুবকর সিদ্দিকের কবিতা—

৬. সুতীব্র জ্বালার ক্রান্তি কেড়ে নিল সুরমা সানাই
আমার দু'ঠোঁট হ'তে। কীরিচ কর্তিত আশনাই
শর্বরী সম্ভোগে বন্ধ্যা বাগেশ্রী প্রসূতি মৃশা বায়,

(একক দরবেশ)

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা—

৭. যতই মুখোশ নাও না মহারাজ
ধূলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে তাজ।

(ইতিহাসের নীলাম)

তবে মিলের দিকে বদ্ধমূল কোন মোহ কোন কবিরই নেই। অমিত্রাক্ষর কবিতার সংখ্যাই বেশি। আধুনিক কবিতায় যতগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মিলবদ্ধ কবিতা রচনার থেকে মিলহীন কবিতা রচনাতেই ওখানকার কবিদের বেশী উৎসাহ এবং বেশী স্ফূর্তি। তবে সত্যেন্দ্রনাথের মতো ছন্দের দোলা ও অনুপ্রাসের ঝঙ্কার দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন—

আশরাফ সিদ্দিকার কবিতায়—

ছুটছে ট্রেন। পেরিয়ে পথ। পেরিয়ে মাঠ বন।
ঢুলছি আমি। ঢুলছো তুমি। কাঁপছে তোমার চুল।
ছোট্ট নদী এই পালালো। এ কোন ইস্টেশন।
দুলছি আমি। দুলছো তুমি। দুলছে তোমার দুল।

(ট্রেন : বিষকন্যা)

আশরাফ সিদ্দিকীর আরও দু' একটি কবিতা—

১. তুল্‌তুল্‌ টুক্‌টুক্‌
টুক্‌টুক্‌ তুল্‌তুল্‌
কোন্‌ ফুল তার তুল
তার তুল কোন্‌ ফুল ?

২. ট্রেনে যেতে দেখি পদ্মার পারে কাশের ফুল—
হাল্‌কা হাওয়ায় দোদুল দুল।

স্বপ্ন ফুল—

আমি দুলি আর তুমি দোল আর ট্রেন দোলে আর
পৃথিবী দোলে—

(পদ্মার পারে কাশের ফুল : সাত ভাই চম্পা)

ছড়ার ছন্দের দু' একটি সার্থক উদাহরণ—

১. মেঘরে মেঘ তুই আছিস বেশ,
মনে চিন্তার নেইকো লেশ।
ডানে বললে ঘুরিস ডানে,
বামে বললে বামে।
হাবে ভাবে পৌঁছে যাবি
সোজা মোক্ষধামে।

(শামসুর রহমান : মেঘতন্ত্র, রৌদ্র করোটিতে)

২. ঐরাবতের খেয়াল খুশীর ধস্তায়
ভোরের ফকির মুকুট পরে সন্ধ্যায়।
প্রাক্তন সেই ভেল্কিবাজির মন্তরে
যাচ্ছে চেনা অনেক সাধু-সন্তরে।
সেই চালে ভাই মিত্র কিবা শত্তুর
চলছে সবাই—মস্ত সহায় হাতির শুঁড়।

(শামসুর রহমান : হাতির শুঁড়, রৌদ্র করোটি

৩. হুজুর এবার গদ্দি ছাড়ুন
ফুস মন্তর যতই পাড়ুন
কাজ দেবে না, কাজ দেবে না
লোক ক্ষেপেছে এবার দারুণ।

(খলিলুর রহমান : হুজুর এবার)

৪. সঙ্গী আমার অন্ধকারের প্রেম
এলেম আমি মেঘের মাদল নিয়ে।
অশ্রু আমার শ্রান্তি ভুলে প্রীত
তোমার কান্না ঢাকতে পারি যদি

এই কবিতাটিতে মিল নেই। ছন্দের দোলা কিন্তু মন মাতায়।

৫. তোমার জাগরণেই দেখি তুমুল কোলাহল,
আলতো করে খুলেছ চোখ অমনি দেখি একি !

(ফরহাদ মজহার : মধ্যরাতে তোমার জাগরণ)

৬. স্বপ্ন হে মোর নিত্যকালের সঙ্গী
শিখলো কোথায় কালের চতুর ভঙ্গী ?

(মহম্মদ মাহফুজউল্লাহ : স্বপ্ন হে মোর)

এই কবিতাটিকে ছয়মাত্রা ধরেও পড়া যায়। কবির কৃতিত্ব উল্লেখ্য।

৭. মোহম্মদ মনিরুজ্জামানের কবিতা—
কান্না যেন রৌদ্রে জ্বলা মণি
ঝর্ণা নামা পাষাণে ঘুম ভাঙা
অনাবৃত অশঙ্ক ও
সিক্ত স্মৃতি কাঙ্খি রাখে বুকে

(কান্না যেন : দুর্লভ দিন)

শামসুর রহমানের দুটি ছয় মাত্রার কবিতা—

১. এদেশে হায়না, নেকড়ের পাল
গোখরো শকুন, জিন কি বেড়াল
জটলা পাকায় রাস্তার ধারে
জ্যান্ত মানুষ ঘুমায় অসাড়ে

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : রৌদ্র করোটিতে)

২. শুধু দু'টুকরো শুকনো রুটির নিরিবিলি ভোজ
অথবা প্রখর ধূ ধূ পিপাসার আঁজলা ভরানো পানীয়ের খোঁজ
শান্ত সোনালী কল্পনাময় অপরাহ্ণের কাছে এসে রোজ
চাইনি তো আমি।
(রুপালী স্নান : প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

আলাউদ্দিন আল আজাদের ছয় মাত্রার অপূর্ব কবিতা—

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু,
আমরা এখনো চার কোটি পরিবার
খাড়া তো রয়েছি। যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য—
পারেনি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে পদ প্রান্তে
যারা বুনে ধান। (স্মৃতি স্তম্ভ)

ছয় মাত্রায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের লেখা কবিতা—

১. লাল গোলাপটা তোমাকে মানায় বেশ,
অথবা তুমিই গোলাপের লাল কুঁড়ি,
এ তিন ভুবনে নেইকো তোমার জুড়ি ;
বিদ্যুতে মেঘে অর্পিত তনু কেশ (রূপম : দুর্লভ দিন)

২. ছড়ানো সোনাকে মেলাবো মাল্যর ছন্দে
দোলাবো গানের কলাপ মত্ত আলাপে
প্রিয় পরিখার পরম শয়ন গন্ধে
মূর্ছিত মন'মুগ্ধ আবেশকে মাপে (সম্মিলন : বিপন্ন বিষাদ)

৩. সাত মাত্রার কবিতা—

ঘুমেও কিছু স্বস্তি মেলেনা তো
মিলনে নয়, বিরহে নয়। আর
স্মৃতিও নয়, মরণও নয় যেন
কিছুই যেন যথেষ্ট নয় আর
হৃদয় জুড়ে কিসের হাহাকার ?
এমন করে বাঁধলে তুমি সখি ?

(সৈয়দ শামসুল হক : তুমি)

ছন্দোবদ্ধ মাত্রাযতি সম্বলিত এসব উদাহরণ দেওয়া হল এজন্যই যে ওপারের কবিরাও প্রথানুগ ব্যাকরণ সম্মত ব্যবহারে সিদ্ধ হস্ত। যদিও প্রচলিত রীতি ভাঙাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন।

মিলেও কোথাও কোথাও চমক লক্ষ্য করা যায়—

১. একদিন একটি লোক এসে বললো 'পারো ?'
বললাম, 'কি ?'
'একটি নারীর ছবি এঁকে দিতে,' সে বললো আরো,
'সে আকৃতি
অদ্ভুত সুন্দরী, দৃপ্ত, নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে—
পেতে চাই নিখুঁত ছবিতে।'
'কেন ?' আমি বললাম শুনে।
সে বললো, 'আমি সেটা পোড়াবো আগুনে।'

(ওমর আলি : একদিন একটি লোক)

মিলের চেহারাটা এখানে অনুধাবনযোগ্য।

২. 'পূর্ণ' কথাটার সঙ্গে মিল দেবার জন্য এইভাবে ব্যবহার করা হয়েছে :
তখুনি আমার রমণীয় আশ্বাসে
পরস্পরকে দেখলাম পরিপূর্ণ
নিষ্প্রাণ যতো ইচ্ছার সুতো উর্ণ
নাভের মতন সাজানো পরম বৃত্তে
অকৃপণ ধ্বনি হলাম অলীক চিত্তে (জিয়া হায়দার : এবং তখুনি)

এখানে উর্ণনাভ কথাটিকে ভেঙে দুই পংক্তিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলমাহমুদের কবিতায় মিলের নমুনা—

নিঃশব্দে যন্ত্রণাময় তিতাসের বুক চেরা পানি
যখন এগোতে থাকে অতিকায় লোহার কাছিম,
ময়লা দুহাতে ধরে কত শক্তি, বোঝে না সুখানি
ধাতব কোদাল শুধু টানে ছেঁড়ে জলের তাজিম—
দারুণ আক্রোশে ফোলে দানবের কাদা ভরা পেট
তিতাসের ড্রেজার যেন ভাসমান লোহার সনেট।

(ড্রেজার ব্যালেশর)

এখানে শব্দ, উপমা ও রূপক চয়নের মুন্সিয়ানাও দ্রষ্টব্য।

আর একটি মিলের নমুনা—

একটি গোপন সুর মল্লারের মতন নিয়মে
ছলছল নীল মাঠে শ্যামা ঘাসে শালিখের রোমে

(হুমায়ূন কবির : শুধু বৃষ্টি পড়ে)

সনেট রচনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় ফররুখ আহমদ, আলাউদ্দীন আলআজাদ, শামসুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রভৃতি কবির মধ্যে। শেষোক্ত কবির সনেটগুলিতে গভীর অর্থ দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। দু'একজন অল্পখ্যাত বা অখ্যাত কবির সনেট আমাদের চোখে পড়েছে। যেমন ইমামুর রশীদ, কল্পনা মোহরের, আবদুর রশীদ খান, মীর আবুল খয়ের, আহমেদ মনসুর, রফিক আজাদ প্রমুখ। এদের কবিতার হাত সুন্দর, সনেটে দখল আছে। দৃঢ়পিনদ্ধ সনেট রচনায় অনেকেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই আলোচনায় মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহের একটি প্রতিনিধি স্থানীয় সনেট তুলে দিলাম—

সুন্দর বনের বাঘ যাচ্ছে কমে এবং অধুনা
হাঙর কুমীর মত সমুদ্রে করে না আনাগোনা
ভোলে হিংস্রতার স্বাদ, দেখি বন্য বরাহের দল
বাঁধে না আক্রোশে আর আগেকার মতন দঙ্গল।
চিত্রল হরিণ সেও লুকিয়ে গিয়েছে ঘন বনে
ভয়াল আজদাহা ধায় প্রাণ ভয়ে গভীর গহনে।
উঁচিয়ে প্রচণ্ড শুঁড় আরণ্যক হাতীও পালায়
নিধনের যজ্ঞে যেতে শিকারী চলেছে পায় পায়
চোখে তার ঈর্ষা ঘৃণা বনের বাঘের মত জ্বলে,
অরণ্যে জন্তুরা কাঁপে মানুষের কঠিন কবলে।

(সুন্দর বনের বাঘ)

শামসুর রহমান লিখিত একটি সনেট (১৮ মাত্রার)—

নিজের বাড়ীতে আমি ভয়ে ভয়ে হাঁটি, পাছে কারো
নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। যদি কারো তিরিক্ষি মেজাজ
জ্বলে ওঠে ফস করে যথাবিধি, সেই ভয়ে আরো
জড়োসড়ো হ'য়ে থাকি সারাক্ষণ। আমার যে-কাজ

নিঃশব্দে করাই ভালো। বাড়ীতে বয়স্ক যারা, অতি
পুণ্যলোভী, রেডিওতে শোনে তারা ধর্মের কাহিনী।
যুবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহ্লাদী প্রজাপতি
মক্ষিরাণী। সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী।

মেথর পাড়ায় বাজে ঢাক-ঢোল, লাউড স্পীকারে
কান ঝালাপালা আর আজকাল ঠোঙ্গায় সংস্কৃতি
ইতস্ততঃ বিতরিত, কমৃতি নেই কালের বিকারে।
বুকে শুধু অজস্র শব্দের ঝিলিমিলি। যে-সুকৃতি
জমেনি কিছুই তার কথা ভেবে মাথা করি হেঁট,
ঘুমায় পুরোনো বাড়ি, জ্বলে দূরে তারার সনেট।

(বাড়িঃ বিধ্বস্ত নিলীমা)

শেষ দুই পংক্তির চমৎকার মিলটিও লক্ষণীয়।

উপরি উক্ত দুটি সনেট সম্পুর্ণ কবিতা এবং কবির মনোধর্মের আলোকে শব্দ চেতনার দ্যুতি, দীপ্তি, দাহ, ঋদ্ধ অনুভূতি, আবেগ ও এষণাও বিশেষভাবে বিচার্য।

শামসুর রহমানের একটি সনেট "তিনটি বালক" বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এখানে ৩+৩+২ | ৬ বা ৪ | ৪ বা ৬ সমান ১৮ মাত্রার চরণ গঠিত হয়েছে।

রুটির দোকান ঘেঁসে তিনটি বালক সন্তর্পণে
দাঁড়াল শীতের ভোরে, জড়োসড়ো। তিনজোড়া চোখ
বাদামী রুটির দীপ্তি নিল মেখে গোপন ঈর্ষায়
রুটিকে মায়ের স্তন ভেবে তারা, তিনটি বালক
তৃষিত আত্মাকে সঁপে সংযত লোভের দোলনায়
অধিক ঘনিষ্ঠ হল তন্দুরের তাপের আশায়।

সনেটটি যেন থাকে থাকে ইট সাজিয়ে তৈরী। এ ধরনের সনেটের দৃঢ় গঠন বাঙলা ভাষায় সম্পদ।

পূর্ববঙ্গের কবিদের বহু কবিতায় ২ | ১ টি পংক্তি চকিত বিদ্যুতের মত মনকে নাড়া দেয়। কোনো ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে অথবা কোন সংগীত যেন বহুক্ষণ অনুরণিত হয়ে থাকে। সিকান্দার আবু জাফরের এরকম কয়েকটি পংক্তি—

১. আলেয়ার হাসি ছড়ায় আজিকে প্রেত
অসম্মানের বীতংস ধৃত সুন্দর কল্যাণ

(ফাল্গুন হত গান)

২. আগামী কালের শিল্পী শোণিত স্বাক্ষরে
হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে এঁকো সেই কথা

(সেই রাত্রি)

৩. অবমস্তা ঋণমুক্ত হবে অপমানে

(এ দিনের পাখা)

৪. নিস্তেজ প্রশান্তি নিয়ে রাত্রি আসে অলস পাখায়
চেতনার সমস্ত শাখায়

(ঘুম ভেঙ্গে যায়)

৫. ভেঙে ভেঙে গেছে যত স্বপ্নের ধূসর শৈলতনু

(গোধূলির কবিতা)

৬. তোমার চোখের প্রশয় পড়ে পড়ে
কেটে গেছে কত বেলা

(কাহিনী)

৭. অবগায় শর্বরীর চোখের পাতায়
কথায় গাথায়

(রাত্রির কাহিনী)

১. ও ৩. নম্বরে রয়েছে সুধীন দত্তের মত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের প্রচেষ্টা, ৪. নম্বরে দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর সমাসোক্তি।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহের কবিতা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

১. নিহত সুখের প্রেমে দেখি দুঃখ কান্না ভরাতুর

(সুখ দুঃখের গল্প)

২. জীবনের সব বোধ সব সুখ দুঃখ আগানিয়া
অনুভূতিগুলো যেন শীর্ণ প্রাণ দাঁড়ে বাঁধা টিয়া

(দাঁড়ে বাঁধা টিয়া)

৩. দিন অবসান শেষে রাত্রি আসে প্রসন্ন বাগানে
নক্সা এঁকে চন্দ্রিমায় অলৌকিক মায়াবীর টানে
(প্রকৃতি কি বদলায় !)

৪. আমার চেতনা ছুঁয়ে সুরের আগুন যেন জ্বলে
অস্তিত্বের কারুকাজে
(যখন বেতারে)

৫. ছাউনি ফেলেছে দেখি সবখানে দারুণ দুর্দিন
(উত্তরাধিকার)

৬. রহস্য রহস্য ধীরে ক্রমাগত খোলে অন্তর্বাস
(পাঁচ পাহাড়ে সকাল)

১. নম্বরে প্যারাডকস্ লক্ষণীয়—উৎপ্রেক্ষাও দেখা যায়।

২. নম্বরে রূপকের একটি সুন্দর উদাহরণ ; উৎপ্রেক্ষাও বর্তমান।

৩. ও ৪. নম্বরে সমাসোক্তি লক্ষণীয়।

৪., ৫. ও ৬. নম্বরে চিত্রকল্প স্বাদু ও উপভোগ্য।

আবুল হোসেনের কবিতার উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প প্রভৃতি ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য—

ধারালো ছুরির নদী ফ্লাটের আকাশ
(ফাল্গুন ওগো ফাল্গুন)

এখানে রূপকের প্রয়োগ দেখা যায়।

অথবা

রাতের ফ্ল্যাটের থাবা, আপিসের দেয়াল পেরিয়ে
মাঠের সবুজ চোখ
কখনো কখনো
গড়াগড়ি, দেয় আজও
(কিমাশ্চর্যম্)

রমনার কৃষ্ণচূড়া নিয়ে আবদুল গণি হাজারীর অনবদ্য দুটি পংক্তি—

ফুলার রোডের কৃষ্ণচূড়া গাছে
রঙের আভাস ছেনালীর মত লাগে।
(ভালবাসি বলেই : সামান্য ধন)

চিত্রকল্প রচনায় উপরের কবিরা যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন শব্দে, বাক্যে, কবিতার পংক্তিতে, সমগ্র কবিতায় বিভিন্নভাবে দেশজ, কালজ নানা চিত্রকল্পে পূর্ববঙ্গের কবিতা সমৃদ্ধ। আরো কতকগুলি চিত্রকল্পের উল্লেখ করা হল—

১. আদিগন্ত ছুটে যায় শব্দময় সোনার হরিণ
(রূপকের ব্যবহার)

(হুমায়ুন কবীর : শব্দমাত্র)

তুলনীয়—

ঐ পক্ষধ্বনি
শব্দময়ী অপ্সর রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।

(রবীন্দ্রনাথ : বলাকা)

২. বাইরে যেওনা কেউ বর্ষার নিভৃত দেয়ালে মাথা রাখ

(হুমায়ুন কবীর : শুধু বৃষ্টি পড়ে)

৩. কোনো এক রবিবারে শহরের একমাত্র গীর্জার দরোজা
আলো করে দেখেছি দাঁড়িয়ে আছো তুষার কুমারী,
নীল মৌমাছির মত চোখ, ব্লণ্ড চুলে
সোনালী প্রপাত, যেন এই মাত্র নেমে এলে সাদা পরী তুমি,
হান্স এণ্ডারসনের পাতা থেকে।

(সেলিম সরোয়ার : স্বগত সন্ধান)

এখানে উপমা, উৎপ্রেক্ষার বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

অনুপ্রাস (গীর্জার দরজা) ও চিত্রকল্পের (তুষারকুমারী) ব্যবহার চোখ এড়ায় না।

৪. চাঁদ ভেঙে পড়ে আছে আয়নায়

(রাজীব আহসান চৌধুরী : চাঁদ আয়নায়)

৫. পাভাবাহারের কাছে দুঃস্বপ্নের আলো, যেন তার
মৌমাছি ফিরে গ্যাছে, রোদ রাঙা মাছি, কোনদিন
ঝলমলে উৎসবে এক খণ্ড ছায়া ফেলে দেবে
স্তাখো স্তাখো কি সুন্দর হরিণ ও চিতা অর্থময়।

(শাহ্‌যাদ কাদির— শক্র শক্র)

কতকগুলি পংক্তিতে চিত্রকল্প লক্ষ্য করা যায়।

৬. বিশ্বাস করুন সুন্দরীর হত্যাকাণ্ডে আমি ছিলাম না। তখন
কালো জোসনায় কালো বন্যায় আমার ভেতর বাহির রঙিন,
কেবল দেহমূলে একটি রূপসী শিখা ধীরে জ্বলে যাচ্ছিল, চির আঁধার
আমি তারি আলোয় কোথাও ভালো ছিলাম।

(সায়্যাদ কাদির : সুন্দরীর হত্যাকাণ্ড)

বিষম অর্থালংকার লক্ষণীয়।

আবার অত্যন্ত অবাস্তব চিত্রও পরিলক্ষিত হয়—

৭. হরিণীর ডিমের মতন সদ্য সাঁতার জানিনা বলে সারারাত কাঁদে।

(রুবী রহমান : বেঁচে বেঁচে এইসব)

অর্থ বলা বাহুল্য, অত্যন্ত দুর্বোধ্য। আরও

৮. সুগোল নির্লোম উরুদ্বয় সযত্নে ঝুলিয়ে রেখেছি ছ্যাখো,
লোহার পেরেকে।

(রাজীব আহসান চৌধুরী : চাঁদ আয়নায়)

এইরকম

৯. 'চায়ের অর্থ শীতলতা' এই অদ্ভুত সাইনবোর্ড কোনদিনও আর
পড়বে না চোখে

(আবু কায়সার : আমি খুব লাল একটা গাড়ীকে)

এখানে বিরোধাভাস লক্ষণীয়।

উদ্ভট কল্পনা—

১০. নিজের শব নিজের কাঁধে বয়ে ফেরার
উদ্ভট স্বপ্নে কেঁদে উঠেছিল

(ইমরুল চৌধুরী : উৎসবের দূরে)

একটি কাব্যে যে অপরূপ চিত্রকল্প মূর্ত হতে দেখা যায় তার প্রমাণ এনামুল হকের লেখা 'উত্তরণ' নামক ক্ষুদ্র কাব্যটি। এখানে অনির্বচনীয় ধ্বনি, রঙ, গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

১১. গোটা কবিতার মধ্যে চিত্রকল্পের এক সুন্দর উদাহরণ—
ধারালো উজ্জ্বল একখানি হাসি হাতে সে
এগিয়ে এলো
এবং আমাকে দ্রুত তাড়া করতে লাগলো

হাঁপাতে হাঁপাতে আমি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে
ছুটলাম—
ভয় পেতে পেতে আমি ভয়ে ভয়ে প্রাণপণে
দৌড়ালাম
আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে করতে আমি চীৎকার করে
উঠলাম
শেষ অব্দি আমাকে সে তার আবার নাগালে পেলো
এবং আমার বুকে একটা ঝক্‌ঝকে নতুন হাসি আমূলে
বসিয়ে দিলো
কিছুক্ষণ খেলিয়ে নিয়ে আমার তাজা রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে সে
চলে গ্যালো
আর বন্দরের উপান্তে আমার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত শব
পড়ে রইলো।

(রফিক আজাদ : বাঘিনী, আমার শব, অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস)

এই রকমই রফিক আজাদের আর একটা কবিতা "দুজন বৃদ্ধ বলছেন"—

১২. লাঠি ঠুকে পথ চলে থুড়থুড়ে বুড়ো
অকস্মাৎ অন্য কারো ঘাড়ে এসে পড়ে
করুণ বিনম্রী স্বরে বলে : 'মাপ করবেন
অন্ধ আমি, কিছুই দেখিনা আমি চোখে।'
আপনার মত আমিও আজন্ম অন্ধ—
অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে পথ চলি,
হয়তো কোথাও কোনো ড্রেনে কিম্বা নোংরা ডাষ্টবিনে
প'ড়ে যেতে পারি সহজেই
অথবা কলার খোসা ইতস্ততঃ পড়ে আছে গলির মোড়েই
পিছলিয়ে পড়ে গ্যালে, ব্যাস।
যদিও লাঠিই আমাদের তৃতীয় পায়ের থেকে ঢের দৃঢ়
তবুও ঘৃণাই হাতে ধরে আছি ক্ষীণায়ু জীবন
মৃত্যুকেই ভালবাসি
জীবনটা তুচ্ছ নয় বলে।

(অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস : ১৯৭১)

কবিতার স্তবকে চিত্রকল্পের আরো উদাহরণ—

১. শ্রান্ত কুকুরের মতো হৃৎপিণ্ড কাঁপে
আমার পায়ের নীচে, ভর দেওয়া রেলিংয়ের শীতল শরীরে
আপার বার্থের ঢিলা শেকলের লম্বতায়।
প্রত্যুষের পদ্মার বিস্তার কুয়াসার পিঁচুটিতে ঝাপসা

(আবদুল গণি হাজারী : পি. আর. এসের স্টীমার, গোয়ালন্দ : সূর্যের সিঁড়ি)

এখানের উপমাটিও লক্ষণীয়।

২. এসো মাংসের সাজঘরে

(আবদুল গণি হাজারী : কোন বন্ধুপুত্রের মৃত্যুতে)

৩. ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মত যেন চৌদিকে
শহর উজাড় হবে,—

(শহীদকাদরী : বৃষ্টি, বৃষ্টি, উত্তরাধিকার)

৪. শীতরাতে কি বিপজ্জনক ডাক ছ্যায় আহ্লাদে শহর

১. এর উপমা ও ৪.-এর সমাসোক্তিও অনুধাবনযোগ্য। ১. ও ৩.-এর উদাহরণটিতে রঙ্ ও ২ -এর উদাহরণে গন্ধ প্রাধান্য পাচ্ছে।

সিকান্দার আবুজাফরের কবিতায় চিত্রকল্প—

৫. ভিক্ষুকেরা বাস করে অন্তহীন নৈরাশ্য বিছিয়ে

(যাত্রী)

৬. নৈরাশ্যের কীটদগ্ধ স্বপ্নের প্রাসাদে

(প্রভাত)

রূপক ও বর্তমান

৭. ব্যাঘ্র কপিশা অগ্নিচোখের

(দাহ)

৮. কুঁড়ির গর্ভে কুসুম বেদনা তোমাকে আনতে হবে

(নির্বাণ)

অতিশয়োক্তি দৃষ্ট

৯. স্বপ্নের আকাশে ইঙ্গিতের ডানা মেলা দুটি নীল পাখি

(অশ্রুর স্বাক্ষর)

পরম্পারিত রূপক

১০. মৃত্যুকল্প হৃদয়ের একান্ত দীনতা।

(মৃত্যু নেই)

অন্ত কবির কবিতায়

১১. শুঁটকীর গন্ধে পরিতৃপ্ত মাছির আওয়াজ

(রাস্তা : আল মাহমুদ)

১২. আমার করতলে অস্থির ডাহুকের মত

(সৈয়দ সামসুল হক : কি মুহূর্ত, দুই একদা এক রাজ্যে)

রূপক, পারম্পরিক রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের উল্লেখ দেখা গেল। এইসব চিত্রকল্পে বাক্য বিন্যাসের মুন্সীয়ানাও লক্ষণীয়। ৬.-এর উদাহরণে ধ্বনি এবং ৭.-এর উদাহরণে ধ্বনি ও রঙ্‌ উভয়েই এবং ১১.-এর উদাহরণে গন্ধ প্রাধান্য পাচ্ছে।

কেউ কেউ বলেছেন আধুনিক কবিতার একটি ফসল মধ্যমিল বা অন্তমিল। মধ্যমিল প্রাগাধুনিক যুগের বহু কবিতায় মেলে। যেমন—

অচল অচল অতি পাষাণ পাষাণ মতি
কি হবে দুর্গার গতি যেতে নারি
যেতে নারি আমি হে।

(ঈশ্বর গুপ্ত)

পূর্ববঙ্গের কবিদের কবিতায় কয়েকটি মধ্যমিলের উদাহরণ—

১. কুমুদ কহ্লার হয়ে ভেসে যাই জলের লতায়
কে কোথায় সোনা খোঁজে জানিনাতো বৃষ্টি পড়ে আজ।

(হুমায়ুন কবীর : শুধু বৃষ্টি পড়ে)

২. তবু ডেকে কয় জন কয় চামার কামার

(হুমায়ুন আজাদ : কেমন অবাক)

৩. রাজকুমার তোমার রক্তে জন্ম নিক

(মহাদেব সাহা : ফিরে দাও রাজবেশ)

৪. স্মৃতিকে বুঝেছ কে আর ? স্মৃতির তরঙ্গ আমার
স্মৃতিরা নীল আর সবুজ আর তমসার মতো।

(সৈয়দ সামসুল হক : নীল সবুজ লাল তমসা)

৫. আর স্ত্রীলোকের ত্রিসীমার মাড়াইনি ছায়া

(সৈয়দ সামসুল হক : আসন্ন অরণ্য, দেশ একদা, একরাজ্য)

৬. বাতাসের হাহাকারে নৌকায় নৌকায়
দোলে, ডেমরায় শন শন ঘোরে, ওঠে
সাঁকো শূন্যমার্গে, বিহ্বল ছাগল গাধা
উড়ে যায় গ্রামের মাথায়।

(সৈয়দ সামসুল হক : বৈশাখের পংক্তিমালায়)

৭. শাখা গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, **হাজার হাজার বছরের ঢের**
পুরানো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি **প্রগাঢ় মদের**

(শামসুল হক : রূপালী স্নান)

৮. **স্মৃতির** মিনার ভেঙেছে তোমার

(আলাউদ্দীন আলআজাদ : **স্মৃতিস্তম্ভ**)

৯. কিছুই ভাবিনে **আর**। অবসর কোথায় **ভাবার**

(আবুল হোসেন : শেষমুক্তি)

১০. পোস্টার—আগ্নেয় গিরির **লাভার** মত

(সূচীপত্র : কাজী হাসানহাবিব)

১১. শেষ অব্দি আমাকে সে **তার** থাবার নাগালে পেলো

(রফিক আজাদ : বাঘিনী আমার শব)

নানা পরিবেশ থেকে আহৃত কতকগুলি উপমা। এগুলির মধ্যে **বাক্য** বিন্যাসের রীতি, চমক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা উল্লেখ করার মত।

১. কিষাণের ললাট রেখার মতো নদী
সবুজ বিস্তৃত দুঃখের সাম্রাজ্য

(আলমাহমুদ : রাস্তা)

২. আরক্তিম তৃতীয়ার চাঁদ প্রভুভক্ত ক্লান্ত কুকুরের নির্জীব জিভের মতো ঝুলে আছে।

(আলাউদ্দীন আলআজাদ : রাত্রি ও নগরী)

৩. নির্মম আঘাতে ক্ষত বিক্ষত শরীর
রক্ত যেন নীর

(আবদুল হুসেন : শেষমুক্তি)

'নীর শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণতঃ **জল** বলতে পূর্ববঙ্গের কবিরা **'পানি'** শব্দ ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

৪. কাকের চোখের মতো কালোচুল এলিয়ে
পানিতে বা চুবিয়ে রাঙা উৎপল

(সৈয়দ আলী আহসান : আমার পূর্ববাঙ্‌লা, দুই)

৫. আর সেই বেতো ঘোড়াটা অনেকক্ষণ ধরে ঝিমোচ্ছে
নিঃশব্দে কোনো আফিম খোরের মতো,......

(শামসুর রহমান : সেই ঘোড়াটা)

৬. ঘোড়ার নালের মতো চাঁদ
ঝুলে আছে আকাশের বিশাল কপাটে

(শামসুর রহমান : জনৈক সহিসের ছেলে বলেছে)

৭. ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের জানালা থেকে সরু
পাইপের মতো গলা বাড়িয়ে সারস এক শুক্কতাকে খায়।

(শামসুর রহমান : হরতাল)

এখানে জীবনানন্দের কথা মনে পড়ে যায়।

৮. আর আমরা সারাদিন সারারাত নারকোল পাতায়
কান্নার বাতাস বাজিয়ে দ্বীপের মতো জেগে থাকি

(সৈয়দ শামসুলহক : সাপ)

৯ কেঁপে উঠলাম ট্রান্সফিউশনেব রোগীর মতো

(আবতুল গণি হাজারী : পি-আর-এসের ষ্টীমার গোয়ালন্দ)

১০. সোনার টাকার মতো চকচকে এক গোছা ব্যাঙ

(হুমায়ুন কবীর : তবু বৃষ্টি পড়ে)

১১. চকিতে গির্জার সেই বিশাল দরোজা
শয়তানের ঠোঁটের মতোন খুলে গিয়ে

(সেলিম সরোয়ার : স্বগত সন্ধান)

১২. কেউ বলে যাচ্ছে যেনো যাতনার মতো মৃদু ঠোঁট ছুটি নেড়ে

পানের পাতার মতো নমনীয়

দীঘিতে ভাসতো ঘন মেঘ,
জল নিতে এসে সেই মেঘ হয়ে যেত ঠিক লীলাবৌদি
গোধূলি বেলায় (আবুল হাসান : পাখি হয়ে যায় এই প্রাণ)

১৩. প্রতিদিনই এরকম প্রতিটি পাখিকে যেনো ক্লীপের মতোন
এই বনভূমি গেঁথে নেয় তার স্নিগ্ধ সহজ খোপায়

(আবুল হাসান : মিস্ট্রেস, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট)

১৪. করুণ কোমল এই রোদন রূপসী মিস্ট্রেস ;
যেনো কোনো রেফ্রিজারেটারে তার
তুমুল হৃদয়টাকে রেখে দিয়ে নষ্ট ফল (ঐ)

১৫. কান্না যেন রৌদ্রে জ্বলা মণি

(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : কান্না যেন)

১৬. একটি স্বরচিত কবিতা শোনানর নির্লজ্জতা
রক্তের শব্দের মতো বইতে লাগলো
আমার একাকী আত্মার পেরেক বিদ্ধ ছিদ্র পথে
রক্তবমির মতো উগরে উঠলো একটি হিংস্র আর্তনাদ

(আলমাহমুদ : আমার সমস্ত গন্তব্যে)

১৭. দুঃখের মতন সাদা
(আবু হেনা মেস্তাফা কামাল : কয়েকটি বিব্রত মাছি—এ্যাম্বুলেন্সে)

১৮. মদের মতন তার বীণা

(আবু হেনা মোস্তাফা কামাল : ক্লান্তির গান)

১৯. এখনো পাতা বাহারের নক্সা আঁকা গাভীর স্তনের মতো টইটুম্বুর
মেঘদল

(হাসান হাফিজুর রহমান : চিরায়ত ছায়াছবি)

২০. কেমন সবুজ হয়ে ডুবে আছে ক্রিয়াপদগুলি
গভীর জলের নীচে কাছিমের মত শৈবালের সাজ ঘরে।

(শামসুর রহমান : হরতাল)

কয়েকটি সমাসোক্তি—

১. অশোকে পলাশে চলে কানাকানি

(আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ : প্রিয়তমাসু)

২. বাঁকানো পিঠ শহর ফের পাঠায় অঞ্জলি

(ফরহাদ মজহার : মধ্যরাতে তোমার জাগরণ)

৩. কিন্তু তার চাঁদ উড়ে গেছে কবে

(রাজীব আহসান চৌধুরী : চাঁদ আয়নায়)

৪. চেঁচিয়ে উঠলে তুমি হে মেঘ, হে আশ্বিনের ক্ষুধার্ত জিরাফ

(আবু কায়সার : আশ্বিনের ক্ষুধার্ত জিরাফ)

জীবনানন্দের ছায়াপাত লক্ষ্য করায়।

৫. চীৎকারে নীচে পড়ে আছে আমাদের শাদা শহর
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা, উরু, জানু

(আব্দুস মান্নান সৈয়দ : অনয় কবিতা)

৬. আমার ক্ষুধার্ত চুল বাতাসে লাফাচ্ছে অবিরাম

(শহীদ কাদরী : সেলুনে যাওয়ার আগে)

৭. পৃথিবী জুড়িয়ে যায় একটি উৎসবের দিনে

(আবুবকর সিদ্দিক)

৮. সত্য বুঝি অন্তিম শয্যায় শুয়ে আছে অকাতরে
আমারই একান্ত পাশে

(হাসান হাফিজুর রহমান : চিরায়ত ছায়াছবি)

৯. মড়কেরা আসে অলিতে গলিতে বিষ পতঙ্গের
ঝাঁকের মতো, হাসে খিলখিল নাচে কানকান……

(আলাউদ্দীন আল আজাদ : মড়ক)

১০. আশ্বিন এসেছে পাটের দাম না পাওয়া হাড় জিরজিরে কৃষকের মতো

(কায়সুল হক : এবার আশ্বিনে)

কয়েকটি অনুপ্রাস—

১. হুজুর হুজুর ছদ্ম পোষাক ছিন্ন করেছি
আমিও মজুর তোমাদের মতো মিছিলে নেবে না ?

(ইবনে আলি : স্বীকারোক্তি)

২. থমকে থাকা মেয়ে মুহূর্ত

(রাজীয়া খান : তেবটির আত্মচিত্র)

৩. বিষময় উক্তি যত উক্তির উদ্যোগে

(রাজীয়া খান : তেষট্টির আত্মচিত্র)

৪. রক্তের ধমনীতে এক একদিন
মুক্তির মৃদঙ্গ বাজে

(আবুল হুসেন : শেষমুক্তি)

৫. তাই সর্বনাশ বহ্নি বিদ্রোহের

(ঐ)

৬. পায়ের ছন্দ ওদের হল না নরম নিবিড় চোখে

(আ. ম. হেদায়েত উল্লাহ : রক্ত কপোতের জন্য)

৭. বিষদাঁত দুটো ভেঙ্গে দিতে হবে তার

(মোহাম্মদ মাসুন : একটি রাতের কোরাস)

৮. পিরেনিজ পাহাড়ের ছায়াঘন ম্লান সানুদেশ

(জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : ভূমধ্য সাগরের তীরে)

৯. দেবদারু বনে শোন কান পেতে পাহাড়ী পরীরা কাঁদছে

(ঐ : তীর্থযাত্রা)

১০. হাটের মাঠের ঘাটের লোকের মিতালী পাতাই
তাই অরণ্যে আমাদের মনে কোন খেদ নাই

(ঐ : এসো বাঙ্‌লার মাটির ভাষার ছেলেরা)

১১. হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজার খিল
সন্তাস্পর্ধে যে মাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে তবু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল

(শামসুর রহমান : রূপালী স্নান)

১২. পিরিচ চামচ আর চায়ের বাটিতে

(ঐ : দুঃখ)

১৩. মসজিদে আজানের আর্তস্বর আত্মাকে চিরে চিরে

(হাসানহাফিজুর রহমান : জীবনের ঘণ্টারোলে)

১৪. দিগন্তে দেখেছে স্বপ্ন নীলিমায়, বিফল হবে না
কেন না হৃদয়ে জ্বলে সূর্যের প্রথম প্রহর

(লতিফা হিলালী : হিমছড়িতে সকাল)

১৫. হে আমার বাংলা ভাষা, মা আমার
তোমার কাছে আমি আমৃত্যু অনন্তকাল কৃতজ্ঞ থাকবো
(ফজল শাহাবুদ্দীন : বাংলা ভাষা মা আমার)

১৬. তৃষ্ণার বিষণ্ণ তীর্থে বার বার হাত পেতে ধরি
প্রিয় মুখ। অন্তরালে গন্ধগান মৌলিক প্রদীপ
(হুমায়ুন কবীর : শব্দ মাত্র)

১৭. বস্তুতঃ তোমাকে খুঁজেছি সর্বক্ষণ স্বাতী
আসলে সুদূর সেই তেরশো আটায় থেকে তোমার সন্ধান
লীলাবতী। নকল নীল কমল পেরিয়েছি শ্যামল শৈশবে।
পার হয়ে সাদা শস্প হীন তেপান্তর, কালো নদ নদী
....
উধাও হয়েছো ঘন বন তুলসীর কালো ঝোপে,
কোনো এক রবিবারে শহরের এক মাত্র গির্জার দরোজা
(সেলিম সরোয়ার : স্বগত সন্ধান)

১৮. নানীর কোলের পাশে লাল শিমুলের নীচু তলে
(রুবী রহমান : বেঁচে থেকে এই সব)

১৯. নিশীথের নীল ভিড়ে অমল ধবল কেহ অভিজাত ভদ্র মহিলার
(আবু কায়সার : আশ্বিনের ক্ষুধার্ত জিরাফ)

২০. গলায় সিল্কের স্কার্ফ, চোখে রোদ চশমা ঠোঁটে জ্বলন্ত চুরুট
সুতীক্ষ্ণ শিসের শব্দে নিতম্বীরা সম্ভাষণ জানাল তোমাকে
(ঐ)

২১. সোনার বন্যার মত গলগল করে বলি অমিতাভ আকাঙ্ক্ষার কথা
(আবুল মান্নান সৈয়দ : রক্তের পলাশ বনে কালো ফেরেশতা)

আধুনিক কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য চিত্রকল্পের অব্যবহিত আগে বা পরে অথবা চিত্রকল্প হিসেবে কবিতার কলাকৌশলের মধ্যে মিথ (myth) বা পৌরাণিক অনুষঙ্গের ব্যবহার। পূর্ববঙ্গের কবিরাও তাঁদের কবিতায় কলাকৌশলে 'মিথে'র প্রয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায় কবিদের অতিবাস্তবতা বোধ এবং তাঁদের বক্তব্য বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি। এই 'মিথ' (ক) গ্রীক পুরাণ, ভারতীয় পুরাণ, আরব্য পুরাণ বা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের পুরাণকে অবলম্বন করে যেমন ধরা দিতে পারে তেমনি (খ) কোন

আঞ্চলিক, লৌকিক ও মৌখিক কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, কথাকাহিনী প্রভৃতিকেও অবলম্বন করতে পারে। এছাড়া রয়েছে এর একটা তৃতীয় দিক যাকে বলা হয় "Nature myth" বাঙ্‌লায় তর্জমা করে বলতে পারি "নিসর্গ পুরাণ"।[১] বাঙ্‌লা কাব্যে রস সমন্বিত প্রয়োগ দেখেছি মধুসূদনে এবং রবীন্দ্রনাথে। বিষ্ণু দের ক্ষেত্রে অনেক 'মিথ' প্রয়োগের ফলে কবিতা গুরুভার, দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

পূর্ববঙ্গের কবিদের মধ্যে এ-বিষয়ে সর্বাগ্রে নামোল্লেখ করতে হয় ফররুখ আহমদের। মুসলিম ঐতিহ্য প্রীতি তাঁর মজ্জাগত। তাহজীব ও তমদ্দুনকে তিনি তাঁর কাব্যের উপজীব্য বিষয় করছেন। আরব্য উপন্যাসের বিবিধ বিষয় এবং আরবীয় সংস্কৃতি তাঁর কাব্যের পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে। যদিও মাঝে মাঝে বিষ্ণু দের মতোই আমাদের কাছে এর জন্য তাঁর বক্তব্য দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে, তাহলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বলতে পারা যায়, তাঁর কবিতা সুখপাঠ্য এবং তিনি 'মিথ' প্রয়োগে আধুনিক কবিদের মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

১. আশাবাদী কবি যাত্রাপথের ঝড়ঝঞ্ঝা ও সমস্ত বিপদ আপদ পার হয়ে শেষ সীমায় উপনীত হতে দৃঢ় সঙ্কল্প :

পাল তুলে দাও, ঝাণ্ডা ওড়াও, সিন্দবাদ।
এল দুস্তর তরঙ্গ বাধা তিমিরময়ী
কি হবে ব্যর্থ ক্লান্ত রাতের প্রহর গুণে ?
নূতন সফরে হবে এ কিশ্‌তী দিগ্বিজয়ী

(নতুন সফর)

২. এবার তোমার যাত্রা সে পথে
যেথা উমরের পায়ের ছাপ,
জং ধরে যেথা প'ড়ে আছে হায়
আলীর হাতের জুলফিকার,
পিঠে বোঝা নিয়ে ক্ষুধিতের দ্বারে
চলে একটানা পথ তোমার
দেখো সিরাজুম মুণীরা জ্বলছে—
মুছে দিতে সব ফাঁকা প্রলাপ

(নিশান)

১. রবীন্দ্র কাব্যে নিসর্গ পুরাণ, সত্যেন্দ্রনাথ রায় (বিশ্বভারতী পত্রিকা), ৭১-৭৬।

এখানে আর্ত, উৎপীড়িত, বঞ্চিতদের প্রতি কবির সহানুভূতির স্ফুরণ দুর্লক্ষ্য নয়।

এই কবি লিখিত 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য নাটক মুসলমানী গাল গল্পের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণের অভিব্যক্তি। এখানেও কবির কণ্ঠে অভিশাপ-মুক্ত মানবতাবাদের জয়গান—

অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
নির্জন রাত্রির চাঁদ দেখা দেবে, স্বপ্নের শাজাদী
প্রশান্তি-সুষমা ঘেরা, শান্তি তবু পাবে না এ-মন
স্বস্তিহীন। রাত্রি তার শেষ হবে বুকে নিয়ে ব্যধি
দুরারোগ্য।

ফররুখ আহমদ অবশ্য অন্য কোন পুরাণ বা লোকগাথা লোকগীতির উপর দৃষ্টি দেননি। কিন্তু মুসলিম কবিদের মধ্যেই অনেকেই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির পুরাণ থেকে, লোকগাথা থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন। হিন্দু পুরাণ কাহিনীও বাদ যায়নি। কয়েকটি উদাহারণ :

১. সে দেখে, আরব্যোপন্যাসে মৃগাক্ষী শাহজাদী, দীপ্তা,
স্নিগ্ধ তনুরূপে তার
আলো তুচ্ছ, বীণানিন্দিত কণ্ঠে, কেশপাশ কচুরিপানার শিকড়ের
যুবরাজ সেলিমের চোখে যেন আনারকলির চুল, আর
সুন্দর বনের দৃঢ ময়ূরের চোখে রূপ, মেঘলা সায়াহ্নে শ্রাবণের
সে দেখে, অগ্নির স্পর্শে মোম গলে, দা ভিন্সির সম্মুখে ইজেল
সুন্দরী মোনালিসার চিত্রসহ। নিপুণ মিল্যানিয়ন শেষে
অ্যাটালান্টাকে দৌড়ে পরাজিত করে, ভেনাসের সোনালী আপেল
সুসার্থক। প্লুটো প্রসার্পিণকে নিয়ে দেশে যান
(ওমর আলী : তীক্ষ্ণমন)

২. হয়ত এখন বর্গীমুখের আদল
নিজের মুখে চিনতে পেরে
বুকে বাজছে বিসর্জনের মাদল
(সিকান্দার আবুজাফর : ইতিহাসের নিলাম)

৩. 'স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংশ' এই আমি শিখেছি
(আবুল ফজল : অপরাধ)

৪. "মা কৈকেয়ী সহায়িকা পিতার সেই প্রতিজ্ঞা পালনে,
অতএব সৌমিত্রী, মাতৃনিন্দা কর পরিহার—"
কে মহাবিস্ময়। এ যে আমারই ভ্রাতৃভক্তি চুরি করে নিয়ে
রঘুমণি রেখেছিল হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে
....
সমগ্র স্মৃতি আর সত্তার কত কাক চক্ষু ছবি
বেদ বেদান্তের পাতায়, ষড় দর্শনের অলিতে গলিতে,
গীতার কর্মনিষ্ঠ জীবন সঙ্গীতে,
পুরাণের কল্পরাজ্যে, ব্যাসের জীবনযজ্ঞের অধ্যায়ে অধ্যায়ে,
আউল বাউলের এক তারার উদাস আমন্ত্রণে,
পদাবলী কীর্তনের বিরহ বিধুর অঙ্গনে,
বেহুলার আকাশ আকুল করা বিপুল ক্রন্দনে,
অভিমানী রামপ্রসাদের ভক্তি বীণার বেহাগ বদনে

(শেখ সাবের আলি : শপথ)

৫. মারমুখী রোখে
স্বেচ্ছায় লোলুপ দাস ঝুলেছে ফাঁসিতে।
তীরের স্বচ্ছন্দ গতি—হেলেনের অবিনীত রূপ ;
ইউলিসিস পথহারা, তবুতো জ্বলেছে ট্রয়ে চিতা,
মজনুন খয়সের অনর্থ উল্লাস।
প্রণয়ের বহ্নি রচে চিরঞ্জীব সতর্ক সবিতা
মুক্তি, মুক্তি পথ বলো—

(আলী আশরাফ : বনিআদম্—পাঁচ)

৬ হে দেববেদী,
বুদ্ধ, ভগবান, যীশু,
মুশলিম ঈশ্বর, রক্ষা কর,
বাণীময় কর এই ধ্বনিহীন স্বর,
হেমলক বিষ দাও, বায়রণ শেলীর মতন
দেশকুল বর্জন লিখে দাও ভাগ্য পর্বে

(রাজিয়া খান : তেষট্টির আত্মচিত্র)

৭. পৃথিবীর সন্তান আমি হে অগষ্টাস
শান্তি চাই শুধু শান্তি চাই

(সানাউল হক খান : অগষ্টাসের পায়ে)

৮. হোমার
পিণ্ডার
কিংবা বাল্মীকির বংশধর ভাবি
হায়রে ঈশ্বর
কত আর হতাশায় ব্যবহৃত হবো ?

(আফজাল চৌধুরী : একটি কবিতা)

৯. জ্যোৎস্নায় ভরে আছে পৃথিবীর প্রান্তগুলি,
নির্জনতা জুড়ে ছিল সমস্ত মন্দির দেবালয়
আমার হৃদয় শুধু কান্নায় উতলা হয়
কি এক পবিত্র অভিমানে।
তথাগত, কি আমার সম্পর্ক তোমার সাথে
এ জন্মের জতুগৃহের দ্বারে
তোমারও হৃদয় সেদিন
এমনি কেঁদেছিল অভিমানে।

(মোহাম্মদ রফিক : বৈশাখী পূর্ণিমা)

১০. পদ্মের পাপড়িতে ডোমনি নাচিসনে আর
কিম্বা সরোবর ভেঙে মৃণালের অস্থিও চিবাস নে
জিনপুর বহুদূর, বীতরাগ তথাগত মৃত,
এমনকি কাহ্নপাও বিমনা নির্বাণে

(জিয়া হায়দার : নির্বাণ গাথা)

১১. আমার একাকী আত্মার পেরেক বিদ্ধ ছিদ্র পথে
রক্ত বমির মত উগরে উঠল একটি হিক্রু আর্তনাদ
"এলী এলী লামা সবক্তানী !"
আমার সমস্ত গন্তব্যে একটি একটি তালা ঝুলছে।

(আল মাহমুদ : আমার সমস্ত বক্তব্যে)

১২. আয় গেছে শাহজাদা নক্ষত্রের কৌতূহলে আক্রান্ত আঁধারে
এখন দুচোখ তার পড়ে নেবে নগ্ননীল কটির সংবাদ
কি হবে রাধার তবে ? ভরা যমুনায় যদিও ভাসছে চাঁদ
সে তো একা নয়, ভাসে কালো মশকের শব দুই পাড়ে
তার সঙ্গে সারি সারি। যেন যাত্রীদল পৌঁছে গেছে। শিহরিত
মৃত্যুর নিকটে শুধু জলের কল্লোল। শুধু কল্লোল ধ্বনিত।
কি হবে শ্যামের আর ? কি হবে বাঁশীর ? কই তার বৃন্দাবন ?
(সৈয়দ শামসুল হক : দারা শিকোহর স্বগত গুচ্ছ)

১৩. মুসার যষ্টির মতো তেমন কোনো অলৌকিক সঞ্চয়
নেই তো আমার হাতে যার স্পর্শে তুমুল বিরূপ
(হাসান হাফিজুর রহমান : চিরায়ত ছায়াছবি)

১৪. না কিছুই দেখছে না সে
বুকের কাপড় পায়ের নগ্ন গোছা
কিছুই না
আর কিছুই দেখবে না সে
ঘাসের সবুজে তার বিস্মিত চোখ দুটো
এক ভয়ার্ততায় স্থির
এক অসম্ভব প্রশ্নের মত
জুলায়খার সতীত্বের মত
(আব্দুল গণি হাজারী : যখন কোন মহিলাকে)

১৫. শাহ্জাদি ! শাহ্জাদি ! শাহ্জাদি
ডালিমের মত তব সুরক্তিম যৌবন প্রবাল
কোন সে মায়াবী শ্বাসে পুড়ে পুড়ে হল কংকাল
(আশরাফ সিদ্দিকী : শাহজাদীদের দেশে)

অথবা—

১৬. গজমোতি হার কই ? মেঘ ডমবরু শাড়ী
মধুমালা ! মধুমালা ! এ কেমন দেখি ?
শুধু মশকের ডাক। মধুমালা অচেতন
(আশরাফ সিদ্দিকী : মধুমালা)

১৭. বর্ষার বন্যায় তুমি অতলান্ত
অপরিমিত হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ
(সৈয়দ আলীআহসান : আমার পূর্ব বাঙ্‌লা—এক)

১৮. নূরুল আরেফিনের একটি কবিতার নাম—'অশ্লেষা বেলায় যাত্রা'। বলতে দ্বিধা নেই, দু একটি ক্ষেত্র ছাড়া সবগুলিই সুপ্রযুক্ত বোধগম্য এবং সাবলীলভাবেই কবিতার অঙ্গীভূত।

আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে গদ্য ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মিলের ঝোঁক অনেক কমে আসছে। জীবন গদ্যময় বলেই শুধু নয়—গদ্যও কবিতা হতে পারে তার প্রমাণ আধুনিক কবিরা পরপর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক নাম করা কবিদের সকলেই গদ্যে ছন্দে কবিতা লিখেছেন। কারুর কারুর ষ্টাইল অনন্য ও অননুকরণীয়।

গদ্য ছন্দের সার্থক রূপকার হিসেবে দুজন কবির উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবিতা পড়লেই এঁদের চেনা যায়—গদ্য কবিতা রচনায় এঁদের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। একজন সৈয়দ আলী আহসান। "আমার পূর্ব বাঙ্‌লা" শীর্ষক কাব্য গ্রন্থে গদ্য ছন্দে তাঁর অদ্ভুত মুন্সীয়ানার পরিচয় পাই :

বর্ষার বন্যায় তুমি অতলান্ত
অপরিমিত হৃদয়ের বৈকুণ্ঠ
আদিগন্ত জীবনের পরিধি
স্রোতবাহী নৌকার মতো সম্ভাষণ
গলুয়ের উপর ব'সে
গলা ছেড়ে গান গাওয়ার মতো
কি আশ্চর্য প্রাণের প্রসার।

অথবা—

আমার পূর্ব বাঙ্‌লা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ

সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি
আমার পূর্ব বাঙলা বর্ষায় অন্ধকারের
অনুরাগ।
হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া
সিক্ত নীলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনকলতায় ঘেরা
কবরী এলো করে আকাশ দেখার
মুহূর্ত।

গদ্য ছন্দে লেখা এমন সার্থক কবিতা সুদুর্লভ। কবির দীর্ঘ সাধনা ও অধ্যবসায় ছাড়া এরকম কবিতা লেখা দুরূহ। প্রকৃতিকে নিয়ে এই যে কথা ও কল্পনার যাদু, এক অপরূপ স্বপ্নলোক—এ সৈয়দ আলী আহসানের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

অন্য পরিবেশে এই রকম মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন শামসুর রহমান। তিনি নগর জীবনের বিদগ্ধ কবি—জীবনের প্রাত্যহিকতার মধ্যেও সুরের আভাস, ধ্বনির ঝংকার, স্বপ্নের মর্মর উচ্ছ্বসিত।

পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ চেয়েছে চাঁদের কাছে বুঝি
একটি অদ্ভুত স্বপ্ন তাই রাত্রি তাকে দিল উপহার
বিষাদের বিশ্রস্ত তনিমা যেন সে দুর্মর কাপালিক
চন্দ্রমার করোটিতে আকণ্ঠ করবে পান সুতীব্র মদিরা
পৃথিবীতে সম্পন্ন গাছের পাতা ঝরে
হরিণের কানের পাতা ঝরে ধ্বনি ঝরে
উজ্জ্বল আঁশের মতো ধ্বনি ঝরে ঝরে ধ্বনি
ঝরে পৃথিবীতে।

(পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ)

কবিতাটির সুর, স্বর ও ধ্বনিমাধুর্য মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। জীবনানন্দকে মনে পড়ে।

আরেকটি উদাহরণ—

আমাদের শতকের, জরা, ব্যাধি বড় বেশি
ভাবিত, বিপন্ন করে। দীর্ঘদেহী ইতিহাস অবেলায়
ছায়া ফেলে যায় যুগান্তের করিডরে। প্রত্যুষের শাদা
মোরগের কিরীটের মতো, সূর্য আমরা দেখিনি
কতকাল, কতকাল নিঃসঙ্গের ক্রুশকাঠ বয়ে
ফুটিয়েছি কতো রক্ত গোলাপ পাথুরে মৃত্তিকায়
ওরা পা রাখবে বলে

(অধমর্ণের গান)

আখতার হোসেন আঞ্চলিক গদ্য ছন্দে কবিতা রচনা করে নতুন এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন। বাঙ্‌লা ভাষায় এরকম নজীর খুব কম। এক হিসেবে তিনি সার্থক, কারণ কবিতা হৃদয়গ্রাহী হয়েছে—মানুষের মনকে, তার বোধশক্তিকে নাড়া দিয়েছে, চেতনার প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করেছে।

তুই ক করি মন কি কইর‍্যা
চোখে ঘুম অইবো
এ দ্যাশে যারা খুনী
হেরা বুক ফুলাইয়া পথ চলে
আর যারা ভালো মানুষ
হেরা পথে ঘাডে খুন হয়
তুই ক করি মন
একি রহম দ্যাশ্‌?

(করি মনকে)

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধকরি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এই হিসেবে কবিতাটি পূর্ববঙ্গের কবিতা আলোচনায় প্রতিনিধি-স্থানীয়। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণে এটিও অননুকরণীয়।

এইরকম ওমর আলীর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন—

আমি কিন্তু জামু্গা। আমারে যদি বেশী ঠাট্টা করো।
হুঁ, আমারে চেতাইলে তোমার লগে আমি থাকমু্ না।
আমারে যতোই কও, তোতাপাখি, চান, মণি, সোনা।

আমারে খারাপ কথা কও ক্যান, চুল টেনে ধরে।
শোবো না তোমার সঙ্গে, আমি শোবো অন্যখানে যেয়ে—
(আমি কিন্তু যামুগা)

অথবা সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় হঠাৎ আসা কয়েকটি লাইন—

গাল বাদ্য করি সুরা পেটে গেলে পর,
বেশ্যাকে বসাই কোলে। বলে সে হঠাৎ,
মিয়াভাই কি জিগান হাবি-জাবি, বাতি
নিবাইয়া দেই, না. বাতি থাকব কন।
আমার ব্যারাম নাই, নিশ্চিন্তে করেন।
(বৈশাখে রচিত পংক্তি মালা)

বিদেশী শব্দ বিশেষতঃ আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারে পূর্ববঙ্গের কোন কোন প্রখ্যাত কবির যে অহেতুক প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে ওখানকারই সুধী সমালোচকরা সোচ্চার ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ পূর্ববাঙলার একজন সমালোচকের[১] বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"মুসলিম তাহজীব ও তমদ্দুনের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে ফররুখ আহমদের কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যথেষ্ট। বিদেশী শব্দ প্রয়োগ ব্যাপারে নজরুলের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজে ধরা পড়ে। নজরুলকাব্যে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ হয়েছে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশেষ শিল্প দক্ষতার সঙ্গে। তুলনামূলকভাবে ফররুখ আহমদের কাব্যে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট থাকলেও তাতে শিল্পগুণের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। তবে সর্বক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কেননা ফররুখ আহমদও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবী ফারসী-শব্দ এমন সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং সামঞ্জস্যভাবে প্রয়োগ করেছেন যে তাতে কবির শিল্প দক্ষতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়। যেখানে তিনি মাত্রাতিরিক্ত এবং নিতান্ত অপরিচিত আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগপ্রবণতা দেখিয়েছেন, সেখানেই তাঁর ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠেছে। যেখানে আধুনিক জীবনচেতনা ও শিল্পকলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কবি আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেছেন, সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।"

১. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৮৫-৮৬

সমালোচনার এই ধারার সঙ্গে, এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত। সুখের বিষয় পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ আধুনিক কবিই বেশি বেশি আরবী ফারসী ব্যবহারের সুলভ ঝোঁক কাটিয়ে উঠেছেন।

তার ফলে অধিকাংশের কবিতায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ মাত্রা অতিক্রম করেনি, স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে।

আরও আছে দেশী শব্দের প্রয়োগ। এক্ষেত্রেও কুশলী শিল্পীর হাতে দেশী শব্দ সুষমামণ্ডিত হয়েছে। আরবী ফারসী, অন্যান্য বিদেশী শব্দ ও দেশী শব্দের কয়েকটি স্বাদু প্রয়োগের উদাহরণ—

১. 'কাল মাস্তলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মবভূর কুলে কুলে,
বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে

(ফররুখ আহমদ : দরিয়ার-শেষ রাত্রি)

২. তোমার সম্মুখে আজ শোণিতাক্ত যুদ্ধের ময়দান,
তোমার পশ্চাতে আজো প্রেতছায়া জিঞ্জীর জিন্দান ;

(তালিম হোসেন : দিশারী (১৯৬১), হে অভিযাত্রিক)

৩. "অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
নির্জন রাত্রির চাঁদ দেখা দেবে—স্বপ্নের শাজাদী
প্রশান্তি-সুষমা ঘেরা, শান্তি তবু পাবে না এমন
স্বস্তিহীন। রাত্রি তার শেষ হবে বুকে নিয়ে ব্যাধি
দুরারোগ্য। (ফররুখ আহমদ : নৌফেল ও হাতেম ১৯৬১)

এখানে "শাজাদীর" সঙ্গে "ব্যাধি" শব্দের মিল লক্ষণীয়।

৪. মৃত্যুর ভর্ৎসনা আমরা ত' অহরহ শুনছি
আঁধার গোরের ক্ষেত্রে তবু ত' ভোরের বীজ বুনছি।

(সিকান্দার আবুজাফর : সংগ্রাম চলবেই)

কিন্তু তালিম হোসেন যখন লেখেন—

৫. মনহুস জিন মুর্দা রাতের
অভিশাপে জরা জীর্ণ খাব
টুটে ফুটে এসো নূতন দিনের
নয়া জিন্দেগী ইন্‌কিলাব

তখন অর্ধেক আরবী ফারসী শব্দ আমাদের বোধগম্য হয় না।

৬. শেষ রাত থেকে নুনের বস্তা মাথায়
উলংগ বাদামী পিঁপড়েরা
নড়বড়ে সিলিপাটের ওপর দিয়ে
ভারী পায়ে ঢুকছে দানবের শরীরে
(গিলছে, গিলছে, গিলছে)
কজীব পিতলের চাকৃতির নম্বরে
মিষ্টার ব্রিটেনের নামাক্ষর
সতের বছর ধরে ঘষেছি আমরা আদর্শের ঝামায়
দৃষ্টি হীন মনোযোগে ধাতুর ঔজ্জ্বল্যে শ্রীবৃদ্ধি
তাই দোতলার রেলিং থেকে নম্বর স্পষ্টতর।
(আব্দুল গণি হাজারী : পি-আর-এসের ষ্টীমার)

দেশী ও বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণ কবিতাটির মধ্যে লক্ষণীয়।

৭. জীর্ণ নৌকার পাটাতনে উদলা উনুনের আগুন
ফুটন্ত চালের পুরাতন ঘ্রাণে
বেগুন শেদ্ধর সংবাদ
লুঙির মালকোচা
উলঙ্গ শিশুর কোমরের কার ....
(আব্দুল গণি হাজারী—ফেরী ঘাটে রাত্রি)

৮. কোমরের উপত্যকায় মেদের আক্রমণ
উদরের স্ফীতি
চিবুকের দ্বিত্ব
স্তনের অস্বাস্থ্যে শংকিত
হে প্রভু আমরা
চর্বির মসোলিয়মে হাঁস ফাঁস
আমরা কতিপয় আমলার স্ত্রী (আব্দুল গণি হাজারী : ঐ)

৯. যেনো কোনো রেফ্রিজারেটারে তার
তুমুল হৃদয়টাকে রেখে দিয়ে নষ্টফল,
আসে ইস্কুলে, ক্লান্ত এমন অধীরা,
(আবুল হাসান : মিস্ট্রেস—ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট)

১০. রোদের আঁচকে গলিত লাভার সব যেই তুলনা করা সম্ভব,
যেন অ্যাশফল্ট ফুঁড়ে বেতেক্কা দোকা মোটর গাড়িরা
(আবু কায়সার : আমি খুব লাল একটি গাড়ীকে)

১১. আমুণ্ডনখাগ্র তুমি লোবানের ঘ্রাণে ভরা —বেঁচে থাকতে কফিন পরেছো
শাদা কলঙ্ক না পড়া শিশুর মনের মতো বহু ব্যবহৃত দেহ আর
ত্যক্তমন ঢেকে নিয়ে, কেবলি ক্রন্দন এক আত্মার ফোয়ারা থেকে উঠে
"গ্রেফতার ক'রে রাখে ; মরণের পরে পরবে জীবনের লাল
জামা খানি।"
(আব্দুল মান্নান সৈয়দ : রক্তের পলাশবনে কোনো ফেরেশতা)

১২. মাছ কোটা কিম্বা হলুদ বাটার ফাঁকে
অথবা বিকেল বেলা নিকিয়ে উঠোন
ধুয়ে মুছে বাসন কোসন
সেলাইয়ের কলে ঝুঁকে, আলনায় ঝুলিয়ে কাপড়,
ছেঁড়া শার্টে রিফু কর্মে মেতে—
(শামসুর রহমান : কখনো আমার মাকে)

দেশী বিদেশী গ্রাম্য শব্দের বুনন অনুধাবনযোগ্য।

দু-একজন কবির কবিতায় চকিত চমকের মত বিজ্ঞান চিন্তা দেখা যায়—বিজ্ঞানের কোন কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ইংরাজীতে বা বাঙ্‌লাতেও। যেমন—

১. সুভা পোর্টে হুলুস্থুল ; হুলুস্থুল সেতারের তার হয়ে
আর্টারী বেজে ওঠে গানে—
(ফরহাদ মজহার : কবিতা, এর বিবিধ ব্যবহার ও সভা)

২. আমাদের তিন দিক হ'তে তিন **রবোটের** মত
আসছে ক্যামেরা ম্যান, তোলা হবে ফিল্ম
আমাদের চলছে শুটিং।
(রাজীব আহসান চৌধুরী : আমাদের চলছে শুটিং)

৩. **সান্নিপাতিক** রোগীর কাঁপুনি হাড়ের চূড়ায়
(সৈয়দ আলী আসরাফ : পাগলা ঘোড়া)

৪. কেঁপে উঠলাম **ট্রান্সফিউসানের** রোগীর মত।
(আবদুল গণি হাজারী : পি-আর-এসের স্টীমার)

এক্ষেত্রে উপমাও লক্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জী

কবির নাম	
১. অশোককুমার মিত্র :	নজরুল প্রতিভা পরিচিতি। (১৩৭৬)। ঢাকা, বাণীভবন। পৃ. ২৬১। ৮·০০।
২. আজাহার ইসলাম :	বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ; (১৩৭৬)। আধুনিক যুগ। ঢাকা, আইডিয়াল লাইব্রেরী। পৃ. ৭৬৮। ১৫·০০। (পূর্বপাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৭০ সালে আয়োজিত শিক্ষা সপ্তাহে অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রন পারিপাট্যের জন্য প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত।)
৩. আনিসুজ্জামান :	রবীন্দ্রনাথ। ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, (১৩৭৫) পৃ. ৫৬৭। ১৫·০০।
৪. আনোয়ারুল করীম :	বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও সহিত্যিক। কুষ্টিয়া সৈয়দ আমিনা আনোয়ার, বা নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা (১৯৬৯)। পৃ. ২২৩। ৪·০০।
৫. আব্দুল মান্নান কাজী :	আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসিলিম সনেট। (১৯৬৯)। পরিবর্ধিত ২য় সং। ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ। পৃ. ৫৫০। ১৬·০০
৬. আব্দুল লতীফ চৌধুরী	বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। (১৯৫১)। ঢাকা, হাসি প্রকাশালয়। পৃ. ১৪২। ২·৫০।
৭. আব্দুল হক :	সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ। (১৯৬৮)। ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী। পৃ. ২৫৫। ৬·০০।
৮. আব্দুল হাই, মুহম্মদ	সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ২য় সং। (১৯৬৫)। ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ। পৃ. ২৫৬। ৭·০০
৯. আব্দুল্লাহ ফারুক :	জীবনের শিল্প। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, (১৩৭২), পৃ. ৫৫। ২·০০।
১০. আবুল কাসেম :	আধুনিক চিন্তাধারা। (১৯৬৪)। ঢাকা, কামরুল আহসান এণ্ড ব্রাদার্স, পৃ. ১১২। ২·০০।
	আমাদের ভাষার রূপ। (১৯৬৮)। ঢাকা। ঐ পৃ. ৮১। ১·০০।

১১. আবুল ফজল : সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন। (১৯৬৪)। চট্টগ্রাম, এস. এম. জামাল আখতার। বইঘর। পৃ ৪৯৪। ১০.০০।

১২. আবু তালিব, মুহম্মদ বাঙলা সাহিত্যের ধারা; (১৯৬৮)। প্রাচীন ও মধ্যযুগ। রাজশাহী, উত্তরবঙ্গ লাইব্রেরী। পৃ. ২৮৭। ৬.০০।

১৩. আমিনুল ইসলাম মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের মূল্যায়ন। (১৯৬৯)। ঢাকা, নলেজ হোম। পৃ. ১২০। ৫.০০।

সময় ও সাহিত্য। (১৯৬৭)। ঢাকা, সাম্প্রতিক প্রকাশনী। নলেজ হোম। পৃ. ১২৮। ৪.০০।

১৪. আহমদ রফিক : শিল্প সংস্কৃতি জীবন। (১৩৬৬)। ঢাকা, কোহিনুর লাইব্রেরী। পৃ. ১৮৪। ৪.০০।

১৫. আহমদ হোসেন ছন্দ ও অলঙ্কারের কথা, (১৯৭০)। পরিবর্তিত ২য় সং, ঢাকা, ষ্টুডেণ্টস পাবলিকেসনস্। পৃ. ১৮১। ৫.০০। প্রথম প্রকাশ (১৯৬৮)।

১৬. গোলাম সাকলায়েন মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক। (১৯৬৭)। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান। পৃ ৩১৬। ৭.৫০।

১৭. জুলফিকার আলী মহম্মদ সাহিত্য স্বাধীনতা। (১৯০৮)। দিনাজপুর, নওরোজ সাহিত্য মজলিশ। পৃ. ৪৫। ১.৫০।

১৮. দীন মহম্মদ আলী: বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। ঢাকা ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ। (৪ খণ্ডে সমাপ্ত)।

১ম খণ্ড : (১৯৬৮)। পৃ. ৪০৯। ১০.০০।
২য় খণ্ড : (১৯৬৮)। পৃ. ৫৮৭। ১০.০০।
৩য় খণ্ড : (১৯৬৮)। পৃ. ৫০৮। ১৮.০০।
৪র্থ খণ্ড : (১৯৬৯)। পৃ. ৬৭৭। ২০.০০।

সাহিত্য শিল্প। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, (১৩৭৫)। পৃ. ২১৪। ৬.০০।

সাহিত্য সম্ভার। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, (১৯৬৫)। পৃ. ২০৪। ৫.০০।

১৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী : আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্য পরিচয়। (১৯৬৪)। নাভানা ৪৭, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা-১৩। পৃ. ৪০০। ৮·৫০। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, (১৯৫৮)।

২০. ফিরোজা বেগম : কবি গোলাম মোস্তাফা। (১৩৭৪)। ফিরোজা খাতুন সংগৃহীত ও সম্পাদিত। বাঙ্‌লা একাডেমী, ঢাকা। পৃ. ১৭৬। ৪·৫০।

২১. মযহারুল ইসলাম : সাহিত্য পথে। (১৯৬০)। ঢাকা, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, পৃ. ২৫৯। ৫·২৫।

২২. মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ : সমকালীন সাহিত্যের ধারা। (১৯৬৫)। ঢাকা, মোহাম্মদ নাসির আলী, নওরোজ কিতাবিস্তান। পৃ. ২৩৬। ৫·৫০।

২৩. মাহবুবুল আলম : বাঙ্‌লা ছন্দের রূপরেখা। (১৩৭০)। ময়মনসিংহ, সান্যাল এণ্ড সন্স। পৃ. ১২৭ ২·৫০।

২৪. মুনীর চৌধুরী : তুলনামূলক সমালোচনা। (১৯৬৯)। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস। পৃ. ২৭৮। ৮·০০।

২৫. মুসলিম চৌধুরী, মোহাম্মদ : প্রসঙ্গ বিচিত্রা। (১৯৬৬)। ঢাকা, মদীনা পাবলিকেশনস্‌। পৃ. ১৪৮। ২·৫০।

২৬. সত্যেন্দ্রনাথ রায় : রবীন্দ্র কাব্যে নিসর্গ পুরাণ। বিশ্বভারতী পত্রিকা।

২৭. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় কবি ফররুখ আহমদ। (১৯৬৯)। নওরোজ কিতাবিস্তান, বাঙ্‌লা বাজার, ঢাকা। পৃ. ৩০৪। ৯·০০।

২৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : কাব্যের স্বভাব। (১৩৭১)। মূল : এ ই. হাউসম্যান। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী, পৃ. ৭৬। ২·২৫।

২৯. হাসান হাফিজুর রহমান : আধুনিক কবি ও কবিতা। (১৩৭২)। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী। পৃ. ৩৩২। ৮·০০।

সাত

পরিশিষ্ট

[কবিসাহিত্যিক পরিচিতি : উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম]

পরিশিষ্টে বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিক পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কবি সাহিত্যিক বলতে অন্ততঃ একটি যে কোন ধরনের প্রকাশিত মৌলিক বা সম্পাদিত বাঙলা গ্রন্থের রচয়িতাকে বোঝান হয়েছে। বাঙলাদেশের কবি সাহিত্যিকগণও বাঙলা ভাষার সাহিত্যিক। দু-দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্র হিসেবে তাঁদের পরিচিতি প্রয়োজন। বাঙলাদেশের বহু জায়গায় সন্ধান করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাই লিপিবদ্ধ করা হল। বর্তমান তথ্য সংকলনে সাহায্য নিয়েছি আমাদের লেখক প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী গ্রন্থ থেকে।[1] এছাড়াও শামসুল হক সংকলিত ও সম্পাদিত বাঙলাসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১ম খণ্ড, (১৯৪৭—১৯৬৯)[2] ও ২য় খণ্ড, (১৯৪৭—১৯৬৯) এর পরিশিষ্ট ও (১৯৭০—১৯৭১)[3], এই পরিচ্ছেদ রচনায় যথেষ্ট উপাদান জুগিয়েছে।

গবেষণার বিষয়বস্তু এবং সময় হিসেব রেখেই এ পরিচ্ছেদে তালিকা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকাশনা শিল্পের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বছরগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করবার চেষ্টা করেছি। (এক) ১৯৫২ পর্যন্ত (দুই) ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত এবং (তিন) ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত।

প্রথমতঃ, ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পর অনেক সাহিত্যসেবী কলিকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। নতুন পরিবেশে তাঁরা স্থির হয়ে বসতে না বসতেই দেখা দিল রাষ্ট্রভাষার সমস্যা। 'উর্দু' পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রভাষায় ঘোষিত হওয়ায় কবি সাহিত্যিকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ ছাড়াও নতুন রাষ্ট্রে প্রেস নেই, নেই প্রকাশক ও ছাপবার মত পর্যাপ্ত কাগজ। তাই বই লেখা হলেও প্রকাশনায় জটিলতা থেকেই যেত। স্বভাবতই স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রাথমিক যুগে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সাহিত্যকর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

---

১. মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান সম্পাদিত—আমাদের লেখক প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী। বাঙলা একাডেমী, ঢাকা।

২. শামসুল হক, বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী—প্রকাশক পাকিস্তান জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র—ঢাকা, শাখা ৬৭ এ, পুরানো পল্টন ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর; ১৯৭০।

৩. শামসুল হক বাঙলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী—প্রকাশক কায়সুল হক। জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র। বাঙলাদেশ। ৬৭ ক, পুরানো পল্টন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুন, ১৯৭৩।

১৯৫২ সাল বাঙলা ভাষা-ভাষীদের কাছে চিরস্মরণীয়। অনেক বাধা, অনেক রক্তের বিনিময়ে বাঙলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেল। সাহিত্য সৃষ্টির দ্বার খুলে গেল। গ্রন্থ প্রকাশনীর জন্য দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন নতুন প্রকাশক নতুন নতুন প্রেস স্থাপন করে। তবে প্রকাশনী ক্ষেত্রের এই যে শ্রীবৃদ্ধি তা প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ হয়ে রইল পাঠ্যপুস্তকের জগতে। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত সৃষ্টি-ধর্মী সাহিত্যের প্রতি প্রকাশকদের খুব একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। এই সময়কে বাঙলাদেশের সাহিত্যের প্রস্তুতির যুগ বলা যায়।

এর পরের অধ্যায়ে প্রকাশনা শিল্পের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। টেকস্ট বুক বোর্ড গঠিত হল। পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসা তার হাতে চলে যাওয়ায় অনেক প্রকাশক সৃষ্টি ও মননধর্মী সাহিত্য প্রকাশের প্রতি নজর দিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রথম দশ বছর নতুন কবি সাহিত্যিকদের তেমন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তার কারণ সম্ভবতঃ একশ্রেণীর সাহিত্যিকদের কাছে আদর্শ ও মূল্যবোধের অনিশ্চয়তা। যাইহোক প্রস্তুতির পর্যায়ে যেটা তাদের অনেকটা অভ্যাসে এসে গেছে এবং কিছু উৎসাহী ও তরুণ সাহিত্যসেবীর আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে। এ ছাড়াও সাহিত্য ও প্রকাশনা শিল্পের উৎকর্ষের জন্য নানা পৃষ্ঠপোষকতাও অনেকখানি সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী বিভিন্নভাবে করা যায়। কালানুক্রমিক অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুযায়ী, দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থের বিষয় অনুযায়ী আর তৃতীয় বয়সানুযায়ী। বহু বইয়ে প্রকাশকাল সঠিকভাবে লিখিত না থাকায় বা কোথাও কোথাও না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ও পথে পা বাড়াইনি। বিষয় অনুযায়ী সাজালে বিভিন্ন লেখকের একই বিষয়ের বই একই স্থানে পাওয়া সম্ভব হলেও কবিতা যেহেতু আলোচ্য বিষয় সেজন্য এটাও পরিহার করেছি। বয়স অনুযায়ী সাজালে বিপদ থাকে ঠিকমতভাবে খুঁজে না পাবার তাই গ্রন্থসূচী প্রস্তুতের জন্য চতুর্থ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি এবং পরি-চ্ছেদটি যথাসম্ভব কবিদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজাবার প্রয়াস পেয়েছি। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নির্ঘণ্ট যতদূর সম্ভব নির্ভুল করবার চেষ্টা করেছি। লেখক কোন পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন তাও যতদূর সম্ভবমত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই পরিচ্ছেদের জন্য বাঙলা একাডেমী গ্রন্থাগারকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর প্রয়োজনবোধে ব্যবহৃত হয়েছে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড গ্রন্থাগার এবং জাতীয় পুস্তক কেন্দ্রে সংগৃহীত পুস্তকাবলী। ঢাকায় বিভিন্ন প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকেও তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা,যশোর ও কলিকাতার ফুটপাথের পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিকট থেকেও বিশেষ সাহায্য পেয়েছি।

যেহেতু সীমাবদ্ধ সময়ে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে, কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। কোন কবির নাম হয়ত বাদ পড়ে গিয়ে থাকতে পারে। এই অসাবধানতা মার্জনীয়। সব থেকে বেশী জোর দিয়েছি যুগ ও জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা বিচারের। এখানে কবিতা তাঁদের কবিতা ও আদর্শ নিয়ে সমষ্টিগতভাবে যেন সমাসীন। পূর্ববঙ্গের কবিতা আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধে এটি একটি আলোকোজ্জ্বল ঘটনা।

অনেক কবির জন্মস্থান বয়স ইত্যাদি চেষ্টা করেও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। কোথাও কোথাও বা বিভ্রান্তিমূলক সূত্র পরিহার করতে হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। সেক্ষেত্রে শুধু তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের কথাই জানিয়েছি।

যেহেতু কবিতাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাই কবিতা পুস্তকেরই প্রকাশন ও আনুসঙ্গিক সমস্ত কিছু বিশদভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবু যেসব কবি সাহিত্যের অন্য শাখাতেও পদচারণা করেছেন তাঁদের সমগ্র সাহিত্য-কীর্তি বোঝাবার জন্য যেসব শাখার বিবরণ যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, যোগ করেছি। সংগ্রহটি যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি।

আরো একটি কথা, প্রকাশিত বই-এ লিখিত সাল ব্যবহৃত হয়েছে তাই বঙ্গাব্দ ও খ্রীষ্টাব্দ যেখানে যা পেয়েছি তাই দেখিয়েছি।

এ সঙ্গে পাকিস্তান লেখক সংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত গ্রন্থের তালিকাও সংযোজিত করেছি ঠিক যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি ততটুকু।

অজিত দত্ত (১৯০৭)

জন্মস্থান : ঢাকা

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কুসুমের বাস। নষ্টচক্র।

অলি উল্লাহ (১৯২২)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : একদান জুয়া (১৯৬৩)। ঢাকা, রোজী এণ্ড ব্রাদার্স। ৪৭ পৃ.। ১'৭৫।

বজ্রে ঝড়ে (১৯৬৪)। ঢাকা, রোজী ব্রাদার্স, ৮০ পৃ.। ৩'০০।

রক্ত প্রাচী (১৯৬৭)। ঢাকা, কবিতা বিতান, ৬৩ পৃ.। ৩'০০। ১ম খণ্ড।

অজিতকুমার নিয়োগী (১৯২৩)

ইনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস লেখেন। পেশা সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ঝরাপাতা (১৯৫৪), Flashing wings (১৯৭৩), অনামিকা (১৯৫৮)।

ছোট গল্প : ধূসরলিপি,সবুজমরু (১৯৬৪)।

অবিনাশচন্দ্র পাল

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : দীপালি (১৩৫৮)। গোপালগঞ্জ, আতিয়ার রহমান, ১০০ পৃ.। ৩.০০।

আইনুদ্দিন আহমেদ (১৯০০-১৯৭০)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : অন্তদিন : অন্ত কবিতা (১৩৭৬)। মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত ব্রহ্মোত্তর, রংপুর, কবির উদ্দিন আহমেদ, ৩২ পৃ.। ২.৫০।

আজমল হোসেন

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : শ্যামলী (১৩৭৫)। কয়লা বাজার, খুলনা, ৭২ পৃ. ১.৫০।

আখলাকুর রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : জেহাদ ময়দান (১৯৬৫)। সিলেট, আব্বাসআলী, ৪২ পৃ.। ১.২৫

আজহারুল ইসলাম (১৯১৩)

জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ, ময়মন সিংহ। কবিতা, উপন্যাস লেখেন। বি.এ., বি.এল.। আইনজীবী। পরে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের আইন বিভাগে যোগ দেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ছায়াপথ (১৯৬৬)। ঢাকা, ইউসুফজী পাবলিকেশন্স, ১৭৪ পৃ.। ৪.০০।

উত্তর বসন্ত (১৯৭৩)। ঢাকা, বলাকা প্রকাশনী, ৪০ পৃ.। ২.০০।

উপন্যাস : মণিরার বিরাগ (১৯৫৫)। ২য় সং। ১ম প্রকাশ ১৯৫২।

আজিজুর রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : প্রতিক্রিয়া (১৩৭২)। রাজশাহী, ফয়সল আজিজ চৌধুরী, ৩৪ পৃ.। ২.০০।

এই মাটি এই মন (১৯৭১)। ঢাকা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ, ৫১ পৃ.। ২'৫০।

উপলক্ষের গান (১৯৭১)। ঢাকা, পাকিস্তান একাডেমী, ২০০ পৃ.। ৬'০০।

আজিজুল হক

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে (১৯৬৯)। ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী ৩২ পৃ। ২'৫০।

আজিজুল হাকিম (১৯০৮)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আজাজিল নামা (১৩৬৩)। ব্যঙ্গ কবিতা, ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার, ৭৪ পৃ.। '৬২।

বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর (১৩৬১)। ব্যঙ্গ কবিতা, ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার। ৭২ পৃ.। ২'৫০।

অনুবাদ : রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৩৬২)। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার। ২০ পৃ। ১'০০।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৫৫)। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার। ১৬ পৃ.। ১'০০।

আতাউর রহমান (১৯২৪)

জন্মস্থান : বগুড়া জেলার আক্কেলপুর গ্রাম। এম. এ। বর্তমানে বগুড়া এ এইচ. কলেজের বাঙ্‌লার অধ্যাপক। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : একদিন প্রতিদিন (১৩৭১)। ঢাকা, সাহিত্য মজলিস। ৭২ পৃ.। ২'৭৫।

দুই ঋতু (১৩৬৩)। বগুড়া, আবদুল হাফিজ, ৫০ পৃ.। ১'৫০।

প্রবন্ধ : কবি নজরুল (১৯৬৮)।

আজগর আলী, শাহ

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ঝরাফুল (১৯৬৪)। ঢাকা, সাদেক বুক ডিপো, ২০ পৃ.। '৫০।

আফজল চৌধুরী (১৯৪২)

জন্মস্থান হবিগঞ্জ, সিলেট। কবিতা লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা চট্টগ্রাম কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কল্যাণব্রত (১৯৬৯)।

আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬)

জন্মস্থান : নোয়াখালী। কবিতা, উপন্যাস, গল্প লেখেন। পেশা সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আমীর সওদাগর (১৩৬৬)। ঢাকা, ইষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স। ৮৪ পৃ.। ২'০০।

যেহেতু (১৯৫৪) ব্যঙ্গ। কবিতা, ঢাকা, নয়া দুনিয়া প্রকাশনী, ৪০ পৃ.। ১'০০।

উপন্যাস : প্রেম পরিণয় (১৩৬৫), বান (১৩৬৬)।

গল্প : অলিগলি শতপথ (১৩৬৬)।

আজমবী এফ. আর.

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : যুগের বাঁশী (১৩৬১)। জামালপুর, ৬৭ পৃ. ১'২৫।

গুলে পাকিস্তান (১৯৫৪)। চরপারা, জামালপুর, । ৮ পৃ., '১৩।

আবদুর রশীদ খান (১৯২৭)

জন্মস্থান : কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের জাফরাবাদ গ্রাম। এম. এ.। ইনি পাকিস্তান সরকারের বাঙ্‌লা অনুবাদ বিভাগে পাবলিকেশন রেজিষ্ট্রার হিসেবে কাজ করেছেন। কবিতা লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : নক্ষত্র মানুষ মন (১৯৫১), ঢাকা, মোহাম্মদ মামুন, ৫৮ পৃ.। ১'৫০।

বন্দী মুহূর্ত (১৯৫২)। ঢাকা, এশিয়া বুক হাউস। ৫৪ পৃ.। ২'৫০।

মহুয়া (১৩৭৩)। ঢাকা, ফেভারিট বুকস্‌। ৪৮ পৃ.। ২'০০।

বিম্বিত প্রহর (১৩৭৫)। ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী। ৫৬ পৃ.। ৩'০০।

অনিষ্ট স্বদেশ।

অনুবাদ : আকাশ জয়ের ইতিকথা, মুক্তা, কিশোর মনীষী।

কাব্যসংকলন : নতুন কবিতা, প্রেমের কবিতা।

উপন্যাস : মুক্তা (১৯৬২), জন ষ্টাইন বেকের (দি পার্ল) গ্রন্থের অনুবাদ।

আবদুল কাদির (১৯০৬)

জন্মস্থান : কুমিল্লাজেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত আড়াইসিধা গ্রাম, কলকাতায় কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পরে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রচার বিভাগে কার্যগ্রহণ, এবং বাঙ্‌লা উন্নয়ন বোর্ডে প্রকাশনাধ্যক্ষের পদে আসীন ছিলেন। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : দিলরুবা (১৩৩৫)। ত্রিপুরা, ওরিয়েন্ট পাবলিশার্স, ৬৬ পৃ.। ২'০০।

উত্তর বসন্ত (১৯৬৭)। সুলতানা ইব্রাহীম ৫৮ পৃ.। ২'২৫। ১৯৬৭ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত।

সম্পাদিত গ্রন্থ : নজরুল রচনাবলী, বোকেয়া রচনাবলী, দশটি সেরা গল্প (১৯৬৯)।

আজিজুল হাকিম (১৯০৮)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আজাজিল নামা (১৩৬১) ব্যঙ্গ কবিতা। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার, ৭৪ পৃ.। '৬২।

বিদগ্ধ দিনের প্রান্তর (১৩৬১)। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার, ৭২ পৃ.। ২'৫০।

অনুবাদ : রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (১৩৬২)। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার ২০ পৃ.। ১'০০।

রোবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৩৫৫)। ঢাকা, ইষ্টার্ন বুক সেণ্টার, ১৬ পৃ.। ১'০০।

আবদুল গণি হাজারী (১৯২৫)

জন্মস্থান : নাজিরপুর, পাবনা। কবিতা লেখেন। বি. এ.। পাকিস্তান অবজার্ভার গ্রুপে কাজ করেছেন। বাঙলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৬২)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : সামান্য ধন (১৯৫৯)। ঢাকা, রিপাবলিক পাবলিশার্স ৪৮ পৃ.। ২'০০।

সূর্যের সিঁড়ি (১৯৬৫)। ঢাকা, সুপ্রকাশ গ্রন্থ, ৯৩ পৃ.। ৩'৫০।

জাগ্রত প্রদীপে (১৯৭০)। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭৫ পৃ.। ৪'০০।

উপন্যাস : স্বর্ণ গর্দভ (১৯৬৪)।

আজিজ খান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : পায়ে চলা পথ (১৩৬১)। যশোহর, প্রান্তিক প্রকাশনী, ৫০ পৃ.। ১ ০০

আজমল হোসেন

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : শ্যামলী (১৩৫৫)। কয়লা বাজার, খুলনা, ৭২ পৃ.। ১'৫০।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩)

জন্মস্থান : চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস লেখেন এবং অনুবাদ করেন। এম. এ.। বাঙলা বিভাগ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকাতে অধ্যাপনা করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : 'জন্মান্ধ, কবিতা গুচ্ছ' (১৩৭৩)। ঢাকা, ধ্রুপদ, ৪০ পৃ.। ২'৭৫।

জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা (১৯৬৯)। ঢাকা, ধ্রুপদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৮৮ পৃ.। ৪'০০। মাতাল মানচিত্র (অনুবাদ কবিতা)।

প্রবন্ধ : শুদ্ধতম কবি (১৯৭২)।

গল্প : সত্যের মতো বদমাশ (১৩৭৫), চলো যাই পরোক্ষে (১৯৩৭)।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯১৪)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : অনুবাদ : আসরারে খুদী, ২য় সং। মুহম্মদ ইকবালের আসরার-ই-খুদী কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ। ঢাকা, তমদ্দুন পাবলিকেশনস্। ১৯৫ পৃ। ৪'০০। নসীম হিজাযীর 'মুয়ায্যম্ আলী' গ্রন্থের অনুবাদ।

উপন্যাস : খুন রাঙা পথ (১৯৫৫), গুলে বকাওলী (১৯৫৩), ভেঙ্গে গেল তলোয়ার (১৯৬৫), নসীম হিজাযীর 'আওর তলোয়ার টুট গেয়ি' গ্রন্থের অনুবাদ। মরণ জয়ী। (১৯৫৪), নসীম হিজাযীর 'দস্তান এ মুজাহিদ' গ্রন্থের অনুবাদ। শেষ প্রান্তর (১৯৬৩), নসীম হিজাযীর 'আখেরী চটান' গ্রন্থের অনুবাদ।

আবদুল মালেক, মোহাম্মদ

প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়া। মহম্মদ ইকবালের শিকওয়া ও জবাব-ই শিকওয়া কাব্য গ্রন্থের অনুবাদ (১৯৬০)। রাধানগর, রংপুর গ্রন্থকার ২৫ পৃ.। '৭০।

আবদুল হাই মাশরেকী (১৯১৯)

কবিতা, গল্প, নাটক লেখেন ও অনুবাদ করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : হুলু মিয়ার জারী (১৩৬১)। ঢাকা, তমদ্দুন লাইব্রেরী, ৩২ পৃ.। ১'০০।

গল্প : কুলসুম (১৯৪৪)।

নাটক : সাঁকো।

অনুবাদ : আকাশ কেন নীল (১৯৬৬)।

আবদুল বারী, সৈয়দ (১৮৭২-১৯৪৪)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আবেগ (১৯৫৮)। ত্রিপুরা, এম. ইসলাম ৫৬ পৃ.। ১'০০।

আবদুস সাত্তার (১৯২৭)

জন্মস্থান : ময়মন সিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত গোলরা গ্রাম। 'মাহেনাও এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বি. এ। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। কিছু অনুবাদও করেছেন। ১৯৬০ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন ও ১৯৬৬ সালে দাউদ সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : বৃষ্টি মুখর (১৯৫৯)। টাঙ্গাইল, ফাতেমা সাত্তার, ৪৮ পৃ.। ২'০০।

অন্তরঙ্গ ধ্বনি (১৯৬৭), আমার ঘর নিজের বাড়ী (১৯৬৯), নামের মৌমাছি (১৯৭২)।

অনুবাদ : আরবী কবিতা (১৩৭২)। কতিপয় আরবী কবিতার অনুবাদ। ঢাকা, আসাদ চৌধুরী, ৮০ পৃ.। ৩'০০।

গবেষণা : অরণ্য জনপদে (১৯৬৬), আরণ্য সংস্কৃতি ; In the sylvian shadows (১৯৭১)।

প্রবন্ধ : নজরুল গীতি সন্ধানে (১৩৭৬)।

নাটক : কবিদা (১৯৬০)।

আবু কায়সার (১৯৪৪)

জন্মস্থান : টাঙ্গাইলে জন্ম। কবিতা, কিশোর উপন্যাস লেখেন ও অনুবাদ করেন। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আমি খুব লাল একটা গাড়িকে (১৯৭২)। ঢাকা, ৩৭২ এলিফ্যান্ট রোড। ৫৫ পৃ.। ৩'৫০।

কিশোর উপন্যাস : রায়হানের রাজহাঁস (১৯৭৩)।

অনুবাদ : বুলগেরিয়ার ছোট গল্প।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ (১৯৩৪)

জন্মস্থান : বরিশাল। কবিতা লেখেন। এম. এ.। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ইনফরমেশন সেক্রেটারী'র পদে আসীন। সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন সচিব, বাঙলাদেশ সরকার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : সাত নরীর হার (১৯৫৫)। কখনো রঙ, কখনো সুর (১৯৭০)।

আবুবকর সিদ্দিক (১৯৩৮)

কবিতা লেখেন। এম. এ। অধ্যাপনা, বাগেরহাট কলেজ, খুলনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ধবল দুধের স্বরগ্রাম।

আবুল ফজল (১৯০৩)

১৯৬২ সালে উপন্যাসে বাঙলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : কাব্য সংকলন : কায়কোবাদ। কায়কোবাদের কবিতার সংকলন ও সম্পাদনা। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী (১৩৭৪)। ২২৪ পৃ। ৫'০০।

উপন্যাস : চৌচির (১৯৪৮), জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮), রাঙা প্রভাত (১৩৬৪), সাহসিকা (১৯৪৬)।

আবুল হাসান (১৯৩৭)

বরিশালে জন্ম। কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : রাজা যায় রাজা আসে (১৯৭৩), আমার প্রেম আমার প্রতিনিধি (১৯৭৪)।

আবুল হোসেন (১৯২১)

জন্মস্থান : ছিয়ারা, খুলনা। কবিতা লেখেন। এম. এ.। প্রথমে রেডিও পাকিস্তানের সহকারী কর্মসূচী নিয়ামক, পরে প্রচার দপ্তরের প্রকাশন বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নব বসন্ত (১৯৪২), বিরস সংলাপ (১৯৬৯)। ঢাকা, স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ৭০ পৃ.। ৩৫০।

১৯৬৩ সালে বাঙ্‌লা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত কবি।

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল (১৯৩৬)

জন্মস্থান : পাবনা জেলার গোবিন্দা গ্রামে জন্ম। কবিতা, গান, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ. (ঢাকা), পি. এইচ-ডি. (লণ্ডন)। এসোসিয়েট প্রফেসর, বাঙ্‌লা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : যৌবন বৈরী।

সম্পাদনা : পূর্ব বাঙ্‌লার কবিতা (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ সহযোগে)

আলতাফ হোসেন

জন্মস্থান : কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। কবিতা লেখেন। এম. এ.।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : সজল ভৈরবী (১৯৭২)।

অলমগীর জলীল (আবদুল জলীল আহম্মদ)

জন্মস্থান : মথুরাপুর, রাজশাহী (১৯২৮)। কবিতা, গান, শিশু সাহিত্য, নাটক লেখেন। এম. এ.। সহ পরিচালক বাঙ্‌লা একাডেমী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : খাতুন হুসনাবানু (১৯৭৪)।

প্রবন্ধ : গবেষণা মুসলিম মানস ও লোক সংস্কৃতি (১৩৭৭)।

শিশু সাহিত্য : তাক ডুমাডুম (১৯৭৩), জুতো পায় পুষি বিড়াল (গল্প, ১৯৬৩) এক যে ছিল পুতুল (উপন্যাস)।

সম্পাদনা : রাজশাহীর ছড়া (১৩৭০)। উত্তর বঙ্গের মেয়েলী গীতি (১৩৬৯)।

আল মাহমুদ (১৯৩৭)

জন্মস্থান : মোড়াইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা। কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা। সম্পাদক, গণকণ্ঠ, ঢাকা। বর্তমানে ইনি 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রুফ সেকশনে কাজ করছেন। ১৯৬৮ সালে বাঙ্‌লা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : লোক লোকান্তর (১৯৬৩)। ঢাকা, মোহাম্মদ আখতার, কপোতাক্ষ, ৬৪ পৃ.। ২'৫০।

কালের কলস (১৯৭৩), চট্টগ্রাম, বইঘর, ৪৮ পৃ.। ৩'০০।

সোনালী (১৯৭৩)।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২)

জন্ম : রায়পুরা থানার রামনগর, ঢাকা। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ., (ঢাকা), পি. এইচ-ডি. (লণ্ডন)।

অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ভোরের নদীর মোহনায় জাগরণ (১৯৬২)। ঢাকা, সাহিত্য ভবন, ৮০ পৃ.। ৩'০০।

মানচিত্র (৯৬১)। ঢাকা সাহিত্য ভবন, ৯০ পৃ.। ৩ ০০।

সূর্য জ্বালার সোপান (১৯৬৫)। ২য় সং। ঢাকা, পারাবাত প্রকাশনী, ৮০ পৃ.। ৩'০০।

নাটক : ইহুদীর মেয়ে, মায়াবী প্রহর, মরক্কোর যাদুকর।

গল্প : অন্ধকার সিঁড়ি (১৯৫৮), উজান তরঙ্গে (১৯৬২), জেগে আছি (১৯৫০), ধানকন্যা (১৯৫১), মৃগনাভি (১৯৫৪), যখন সৈকত (১৯৬৭)।

উপন্যাস : কর্ণফুলী (১৯৬২) (ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্ত), ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০), শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন (১৯৬২)।

আলি নওয়াজ

এম. এ.। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ছায়া-মিছিল। ময়মনসিংহ, আয়েশা আখতার (১৯৬৮)। ৭৫ পৃ.। ৩'০০।

অবসাদ। ময়মন সিংহ, আয়েশা আখতার (১৩৬৫)। ৮৭ পৃ.। ১'৫০।

আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭)

জন্মস্থান : নাগবাড়ী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। কবিতা লেখেন ও গবেষণা করেন। এম. এ. (ঢাকা) এম. এ (হরিয়ানা), পি. এইচ-ডি. (হরিয়ানা)। সাবেক বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক। বর্তমানে প্রধান সম্পাদক, জেলা গেজিটিয়ার, বাঙলাদেশ।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০)। ঢাকা, কিতাব মঞ্জিল (১৯৫০)। ৮২ পৃ.। ২'০০।

বিষকন্যা (১৯৫৫)। ঢাকা, সাঈদা সিদ্দিকী, ৩৪ পৃ। ১'০০।

সাতভাই চম্পা (১৯৫৫)। ঢাকা, সবুজ লাইব্রেরী, ৩৯ পৃ.। ১'৫০।

উত্তর আকাশের তারা (১৯৫৮)। ঢাকা, সবুজ লাইব্রেরী, ৬০ পৃ.। ১'৭৫।

কিশোর কবিতা: কাগজের নৌকা (১৯৬২)।

সম্পাদিত: নতুন কবিতা (১৩৫৭)। ছোটদের কবিতা (১৯৫৪)।

গল্পগ্রন্থ: রাবেয়া আপা (১৩৬২)।

সম্পাদনা: জমিদার দর্পণ (১৩৬২)। গাজীমিয়ার বস্তানী (১৩৬৭)। উন্নত জীবন (১৯৫৪)। কিশোর গল্পের লোক কাহিনী (১৩৭১)।

গবেষণা: লোক সাহিত্য (১৯৬৩)।

শিশু সাহিত্য: সিংহের মামা ভোম্বলদাস (১৯৬৩), আমার দেশের রূপ-কাহিনী (১৯৬৪), ইংরেজী ভাষায় নিউইয়র্ক ও লণ্ডনে প্রকাশিত: ভোম্বলদাস (১৯৫৯), টুনটুনি এণ্ড আদার টেল্‌স (১৯৬২), বেঙ্গলী রিডল্‌স (১৯৬১)।

অনুবাদ: এক যে ছিল সিংহমশাই (১৯৫৮), শিশুর দিগ্বিজয় (১৯৫৮), মহানুভব লিংকন (১৯৫৮), সাগর থেকে আনা (১৯৫৭), মজার মজার অঙ্কগুলো (১৯৫৭), দুনিয়া হাতের মুঠোয় (১৯৫৮), চলো যাই বই পড়ি (১৯৫৭), সাপের ফণা (১৯৬৫)।

আহমদ নওয়াজ (১৯০৫)

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: অন্তরীকা (১৯৬১)। ঢাকা, অনন্ত প্রকাশনী, ৮৮ পৃ.। ১'৭৫।

কুসুমিকা (১৯৬২)। ঢাকা, গ্রন্থকার, অনন্ত প্রকাশনী, ৭৫ পৃ.। ১'৫০।

গীতিস্তান (১৯৬১)। ঢাকা, গ্রন্থকার, অনন্ত প্রকাশনী, ১০৮ পৃ.। ১'৭৫।

গীতাঞ্জাম (১৯৬১)। ঢাকা, গ্রন্থকার, অনন্ত প্রকাশনী, ১০৫ পৃ.। ১'৭৫।

মধুমালতী (১৩৬৬)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ৬০ পৃ.। ২'৫০।

মুসলিম কবির পদ সাহিত্য (১৯৬১)। ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৯৫ পৃ.। ২'৭৫।

নবীগীতিকা (১৯৬৩)। ঢাকা, গ্রন্থকার, অনন্ত প্রকাশনী, ৯৫ পৃ.। ২'৭৫।

সুরাঞ্জন (১৯৬৭)। ঢাকা, গ্রন্থকার, অনন্ত প্রকাশনী, ১২৭ পৃ.। ৩'০০।

আহমদ রফিক (১৯২৯)

প্রবন্ধ—গল্প, কবিতা লেখেন।

এম বি বি এস। পেশা—চিকিৎসা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নির্বাসিত নায়ক (১৩৭৪)। ঢাকা, কোহিনূর লাইব্রেরী, ৭৩ পৃ.। ৩.০০।

প্রবন্ধ : শিল্প সংস্কৃতি জীবন (১৩৬৬)। নজরুল কাব্যে জীবন সাধনা (১৯৬৬)।

গল্প : অনেক রক্তের আকাশ (১৯৬৪)

আহসান হাবীব (১৯১৭)

জন্মস্থান : বরিশালের শংকর পাশাগ্রাম। কবিতা, উপন্যাস লেখেন।

পেশা—সাংবাদিকতা। ১৯৪৩ সালে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র অনুষ্ঠান পরিচালকের কাজ গ্রহণ, পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : রাত্রি শেষ (১৯৫৫) ২য় সং। ঢাকা, ইনল্যাণ্ড প্রেস, ৬৪ পৃ.। ২.০০।

ছায়াহরিণ (১৯৬২)। ঢাকা, কথাবিতান, ১৬৪ পৃ.। ২.৭৫। (১৯৬২ সালে অঙ্গ সজ্জার জন্য জাতীয় পুস্তক কেন্দ্রের পুরস্কার প্রাপ্ত।)

কাব্যলোক (১৯৬৮)। ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১২৮ পৃ. ১.৭৫। বিভিন্ন কবির কবিতার সংকলন ও সম্পাদনা।

সারাদুপুর (১৯৬৪)। ঢাকা, কথা বিতান, ৫৬ পৃ.। ২.০০। (১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার এবং অঙ্গসজ্জার জন্য জাতীয় পুস্তক কেন্দ্রের পুরস্কার প্রাপ্ত।)

উপন্যাস : আরণ্য নীলিমা (১৯৬৫), জাফরানী রঙ, পায়রা।

কিশোর গল্প : জ্যোৎস্না রাতের গল্প, মোহাম্মদ নাসির আলীর সঙ্গে যুক্তভাবে লিখিত বোকা চকাই।

সম্পাদনা : বিদেশের সেরাগল্প।

আহমদ শরীফ (১৯২১)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : চন্দ্রাবতী (১৩৭৪)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ৭২ পৃ.। ৩.৫০।

লাইলা মজনু, ২য় প্রকাশ (১৩৭৩)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ২৩২ পৃ.। ৬.০০।

মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ (১৩৬৯)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ৪৩৪ পৃ.। ৬.৫০।

মধুমালতী (১৩৬৬)। ঢাকা, বাঙলা একাডেমী, ৬০ পৃ.। ২.৫০।

মুসলিম কবির পদসাহিত্য (১৯৬১)।

ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫ পৃ.। ২.৭৫।

ইদরীস এ. কে. এম-ডি

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : পথের নিশান। ভূশপুর, কুমিল্লা (১৯৬১)। ১২৩ পৃ.। ২.৫০।

ইনামুল কবির ব্রহ্মা

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : চেতনার কাছে নিবেদিত কবিতাবলী (১৯৬৯)। রায়ের বাজার, ঢাকা, স্বজনী চক্র, মাওলা ব্রাদার্স, ১০৪ পৃ.। ৪.০০।

ইন্দুসাহা (১৯৪০)

কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : কিষাণ বউ (১৯৬৮), গঙ্গাপারের খেয়া (১৩৭৫), পলাশ কামিনী (১৯৬৬)।

নাটক : বেকার নিকেতন।

কবিতা : কনভয় (১৩৭৭)। ঢাকা, ধান সিঁড়ি প্রকাশনী, ৫৪ হৃষিকেশ দাস রোড। পদ্মা প্রকাশনী, ৩৯।৪০ হাটখোলা রোড, ৭২ পৃ.। ২.৫০।

ঝড় আসছে (১৩৭৯)। ঢাকা, আবুল হোসেন, ধানসিঁড়ি প্রকাশনী। ৮৮ পৃ.।

ইমরুল চৌধুরী

কবিতা, ছড়া ও গল্প লেখেন। এম এ.। বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : অন্ধকার ব্যাতিরেকে (১৯৬৯), ঢাকা, সপ্তক প্রকাশনী, ৪০ পৃ.। ২.৫০।

ছোটদের গল্প : ভূতের সাথে ষা'ট সেকেণ্ড।

ইমাউল হক (১৯২৩)

জন্ম : ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কবিতা লেখেন। সরকারী চাকুরে ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : অনুরাগ (১৯৬২)। ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, ৬৪ পৃ.। ২.৫০।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সৈয়দ, (১৮৮০—১৯৩১)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : অনল প্রবাহ (১৩৬০)। ৩য় সং সিরাজগঞ্জ, ১১৩ পৃ.। ২.৫০।

এস. এম. লুৎফর রহমান (১৯৪১)

জন্ম : সাবেক যশোর। গবেষণামূলক প্রবন্ধ, কবিতা লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : অগ্নি বাঙলা (১৯৭২)।

ওমর আলী (১৯৩৮)

জন্ম: পাবনায়। কবিতা লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ, কুষ্টিয়া কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি (১৩৬৭)। ঢাকা, কোহিনুর লাইব্রেরী, ৬৪ পৃ.। ২.৫০।

আত্মার দিকে (১৯৬৮), কুষ্টিয়া, সাহিদা বেগম, ১০০ পৃ.। ৩.০০।

অরণ্যে একটি লোক (১৯৬৬)। কুষ্টিয়া, সহিদা বেগম। ৭৬ পৃ.। ২.৫০।

নদী (১৯৬৯)। বেনিয়াপট্টি, পাবনা, পদ্মা বুকস। ৬০ পৃ। ২.৫০।

নি:শব্দ বাড়ী (১৯৭৩)।

কায়কোবাদ (মহম্মদ কাজেম আল কোরেশী) (১৮৫৮—১৯৫২)

জন্ম: আগলা ঢাকা। কবিতা লিখতেন। প্রাক্তন সরকারী চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: মহাশ্মশান (১৯৬৭)। ৫ম সং, ঢাকা, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ৩৪৭ পৃ। ১০.০০। প্রথম প্রকাশ (১৯০৪)। অশ্রুমালা (১৮৯৫) কাব্য, ৫ম সং। ঢাকা, গ্রন্থকার, খাসমহল ল্যাণ্ড রোড।

অমিয় ধারা (১৯২৩) ৩য় সং। ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন। ২৬৪ পৃ.। ৫.০০। তিনখণ্ডে একত্রে। প্রথম প্রকাশ (১৯২৩)।

মহরম শরীফ (১৯৩৩) ২য় সং। ঢাকা, গ্রন্থকার, খাসমহল ল্যাণ্ড রোড।

শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮)। সেগুন বাগিচা (১৩৫৬)। ২৯৫ পৃ.। ৪.০০। ২য় খণ্ড একত্রে। ১ম সং (১৩০২) সাল।

প্রেম পারিজাত (১৩৭৬)। ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ২৮৬ পৃ.। ৬.০০।

প্রেমের ফুল (১৩৭৬)। ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ১৪৪ পৃ.। ৪.০০।

প্রেমের রাণী। ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ২৪১ পৃ.। ৬.০০।

মন্দাকিনী ধারা। ঢাকা, পাকিস্তান বুক করপোরেশন ৮৪ পৃ। ৪.০০।

সেগুন বাগিচা (১৩৫৬)। ২৯৫ পৃ.। ৪.০০। ২ খণ্ড একত্রে ১ম সং, (১৩০২)।

কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬—১৯৬৩)

জন্মস্থান: পয়গ্রাম কসবা, খুলনা। কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন ও অনুবাদ করতেন। এম. এ.। অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: নওরোজ (১৯৩৮), পল্লীবাণী (১৯৪৩), পথের বাঁশী (১৯৪৫), আমরা বাঙালী (১৯৪৬)।

গদ্য : ইসলামের ইতিহাস।

অনুবাদ : মুক্তি (১৯৪৩), যুগবাণী (১৯৪৩), দেওয়ান-ই-হাফিজ (১৯৬১), মসনবীরুমী (১৯৪৮), করীম-ই-সাদী (১৯৪৮)।

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২—১৯২৬)

জন্মস্থান : খুলনা জেলার গদাইপুর গ্রাম। শিক্ষাবিভাগে বহুদিন কাজ করেছেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আঁখিজল।

উপন্যাস : আবদুল্লাহ (১৯৩৩)।

প্রবন্ধমূলক গ্রন্থ—প্রবন্ধমালা ও নবীকাহিনী।

কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯)

জন্মস্থান : মঙ্গলকোট বর্ধমান। কবিতা লেখেন। সরকারী চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : মরাল ও নীল কুমুদী।

কবীর চৌধুরী (১৯২৩)

জন্মস্থান : নোয়াখালী। অনুবাদ করেন ও নাটক, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ.। শিক্ষা সচিব, বাঙ্‌লাদেশ সরকার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : সিলেকটেড পোয়েমস : নজরুল ইসলাম, দি বিগ বিগ সি লাফটার অফ এ স্লেভ।

প্রবন্ধ : সমাজ ও সাহিত্য (১৯৬৮)।

অনুবাদ : নাটক—আহ্বান, সম্রাট জোন্স, শত্রু (১৯৬৩), অচেনা (১৯৬৯), অনুলেখন (১৯৬৯), হেকটর (১৯৬৯)।

ইংরাজী অনুবাদ : Selected Poems : Nazrul Islam, The Big Big Sea.

কে. এম. সমসের আলী (১৯০৯)

জন্মস্থান : মণ্ডলবরণ, বগুড়া। শিশু সাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ.। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (অবসর প্রাপ্ত)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আলিম্পন (১৯৩৪), স্বাক্ষর (১৯৪৯), সুরের মায়া (১৯৪০), রমনার কবি (১৯৬২), সোনার কমল (১৯৫৩), কল্লোল (১৯৭১), সুর ঝঙ্কার (১৯৭৫)।

খান মহম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১)

জন্মস্থান : চারিগ্রাম, ঢাকা। কাহিনীমূলক প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা লেখেন। ব্যবসায়ী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : আর্তনাদ (১৯৫৮), পালের নাও (১৯৫৬)।

ছোটগল্প : ঝুমকোলতা (১৯৫৬)

উপন্যাস : নয়া সড়ক (১৯৬৭), হে মানুষ (১৯৫৮)।

অন্যান্য গ্রন্থ : সোনার পাকিস্তান, খুলাফা—ই-রাশিদিন, রংমশাল, যুগস্রষ্টা নজরুল (১৯৫৭), ডক্টর শফীকের মোটর বোট, আমাদের নবী, মুসলীম বীরাঙ্গনা (১৯৩৬), লালমোরগ।

খাদেজা খাতুন (১৯১৭)

জন্মস্থান : মণ্ডলবরণ, বগুড়া। কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য লেখেন। এম. এ.। অধ্যক্ষা, সরকারী কলেজ (অবসরপ্রাপ্ত)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : বেদনার এই বালিচরে (১৯৬৩)। ঢাকা, মাহবুব হোসেন। ৫৫ পৃ.। ১.৭৫।

গল্প : শেষ প্রহরের আলো (১৯৬৯)।

রম্যরচনা : আরণ্য মঞ্জুরী (১৯৭১)।

লোকসাহিত্য : বগুড়ার লোকসাহিত্য (১৯৭০)।

কিশোর সাহিত্য : রূপকথার রাজ্যে (১৯৬৩), সাগরিকা (১৯৬৮)

খান আমানুর রহমান (১৯৩৯)

১৯৩৯ সালের বারই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা ও গান লেখেন এবং অনুবাদ করেন। ডাক্তারী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : বর্ণালী (উপন্যাস, ১৯৬৭), শূন্য মেলে (১৯৬৯) জাগ্রত ধরিত্রী (১৯৬৭)।

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭—১৯৬৪)

জন্মস্থান : মনোহরপুর, যশোর। কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। বি এ., বি. টি। প্রাক্তন শিক্ষক।

প্রকাশিত গ্রন্থ : অনুবাদ : তারনা-ই-পাকিস্তান (১৯৫০)। ঢাকা মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী। পৃ. ৭২।

কবিতা : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশ রোজ (১৯২৯), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান। ঢাকা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ২৮৯ পৃ.। ৬.০০। স্বরচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতা সংকলন বনি আদম। ঢাকা, বেগমমাহফুজা খাতুন। পৃ. ১৫৫।

জীবনী : বিশ্বনবী।

অনুবাদ : মোসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪৯), আলতাফ হোসেন হালীর মোসাদ্দস-ই-হালীর অনুবাদ। ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশনস। ১১০ পৃ.। ১'৫০।

কালাম-ই-ইকবাল, ইকবাল কাব্যের অনুবাদ (১৯৫৭)। ঢাকা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী। ৭২ পৃ.। ২'০০।

আলফুর আন, বাঙলা তর্জমা (১৯৫৭), শেকোয়া ও জওয়ার-ই-শেকোয়া (১৯৬০), মুহম্মদ ইকবালের 'শিকওয়া ও জওয়ার-ই-শিকওয়া'র অনুবাদ। ঢাকা, কর্ডোভা লাইব্রেরী। ৪২ পৃ.। ২'০০।

ছদরুদ্দীন (১৯১০)

জন্মস্থান : বেলকা, রংপুর। কবিতা, উপন্যাস লেখেন। এম. এ.। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী।

প্রকাশিত গ্রন্থ : উপন্যাস : ফাউন্টেন পেন (১৯৬০), যে ফুল পড়ল ঝরে (১৯৫৯), বোকেয়া (১৯৬০)।

কবিতা : অলসভাবনা (১৯৬৮), ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭ পৃ.। ৫'০০। স্বরচিত বিভিন্ন কাব্যের কবিতা সংকলন।

এক ফালি চাঁদ (১৩৫৭), বেলকা, রংপুর, মুস্তফা রেজা সাবের। ৩৬ পৃ.। ১'৭৫।

পয়গাম (১৩৫৮), বেলকা, রংপুর, মুস্তফা রেজা সাবের। ৬৪ পৃ.। ১'৫০।

সংগ্রাম (১৯৫১)। বেলকা, রংপুর, মুস্তফা রেজা সাবের। ৪১ পৃ.। ১'৫০।

জসীমউদ্দীন (১৯০৩)

জন্মস্থান : ফরিদপুর, তাম্বুলখানায়। কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা লিখেছেন। এম. এ.। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : সোজন বাদিয়ার ঘাট। ৭ম সং, ঢাকা, ফিরোজ আনোয়ার (১৯৬০)। ১৫২ পৃ.। ৩'৫০। 'Gypsy Wharf' নামে Barbara Painter ও Yann Lovelock কর্তৃক ১৯৬৯ সালে অনূদিত। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩।

নকশী কাঁথার মাঠ। ১১শ সং, ঢাকা, জামাল আনোয়ার, (১৩৭৩)। ৫৮ পৃ.। ১'৭৫। 'The field of the Embroidered Quilt' নামে Mrs. E. M. Milford কর্তৃক ১৯৩৯ সালে অনূদিত। প্রথম প্রকাশ (১৩৩৫)।

রাখালী : ৪র্থ সং, ইতিকথা বুক ডিপো (১৩৫৬)। ৬৬ পৃ.। ১'৭৫। প্রথম প্রকাশ (১৯২৭)।

বালুচর (১৯৩০)। ৪র্থ সং, ঢাকা, শেখ মণিরুদ্দীন এণ্ড কোং। ৬৪ পৃ.। ১'৫০।

ধানক্ষেত (১৯৬০)। ৩য় সং, ঢাকা, কামাল আনোয়ার, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭৯ পৃ.। ১.৭৫। প্রথম প্রকাশ (১৯৩১)।

গাঙের পার (১৯৬২)। ২য় সং, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তানের তথ্য বিভাগ। ৩৩ পৃ.। .৫০

জলের লিখন (১৯৬১)। ঢাকা, ফিরোজ আনোয়ার, পলাশ প্রকাশনী, ৭২ পৃ.। ১.৭৫।

মাটির কান্না (১৩৭২)। ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স, ৭২ পৃ.। ১.৫০। প্রথম সংস্করণ (১৩৬৮)।

মা যে জননী কান্দে। ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স (১৯৬৩)। ৪৮ পৃ.। ১.৭৫।

রঙিলা নায়ের মাঝি (১৩৬৬)। ৫ম সং, ঢাকা, কামাল আনোয়ার। ৬৩ পৃ.। ১.৭৫।

রূপবতী (১৯৫৯)। ২য় সং, ঢাকা, কামাল আনোয়ার। ৫৪ পৃ.। ১.৭৫। প্রথম প্রকাশ (১৯৪৬)।

সাকিনা (১৯৫৯)। ঢাকা নওরোজ কিতাবিস্তান, ৭৩ পৃ.। ১.৭৫।

সুচয়নী (১৩৬৮)। ঢাকা, কামাল আনোয়ার, পলাশবাড়ী, ২৮৪ পৃ. ৫.০০। স্বরচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কবিতা সংকলন।

হলুদ বরণী (১৩৭৩)। ঢাকা, কামাল আনোয়ার, ৭৪ পৃ.। ১.৭৫।

এক পয়সার বাঁশী, ২য় সং, (১৯৫৮)।

ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (১৯৭২)।

পদ্মাপার (১৯৫০)।

মধুমালা

গ্রামের মায়া

ওগো পুষ্পধনু

বেদের মেয়ে (১৯৫১)

পল্লীবধূ (১৯৫৬)

হাসু ৫ম সং (১৯৬৪)

স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ : উপন্যাস, গল্প : ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬৮)।

হলদে পরীর দেশে (১৯৬৫)।

যাদের দেখেছি, জীবন কথা (১৯৬৪)।

চলে মুসাফির (১৯৫৭)

বোবা কাহিনী (১৯৬৩)।

যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮)।

স্মৃতির পট (১৯৬৮)।

বাঙালীর হাসির গল্প ১ম খণ্ড (১৯৬০)। ২য় খণ্ড (১৩৭১)।

ডালিমকুমার (১৯৬৩)।

কাব্য নাট্য: বেদের মেয়ে, পল্লীবধূ।

ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)। ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী। ৮৬ পৃ.। ২.০০।

পল্লীগীতি সংগ্রহ ও সম্পাদনা

১. জারীগান (১৯৬৮)।

ইংরাজী গ্রন্থ: 1. The field of the Embroiderd quilt. Tr. E M. Milford (1939).

2. Folktales of Bangladesh, Tr. B. Painter

জালাল আহমদ চৌধুরী (১৯১৮)।

জন্মস্থান: নোয়াখালী। ১লা জুলাই ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতা, রম্যরচনা ও উপন্যাস লেখেন। একাউন্টস্ অফিসার, পরিবার পরিকল্পনা অফিস, ঢাকা।

প্রকাশিত গ্রন্থ: উপন্যাস: সত্তার নবদিগন্তে।

জাহাঙ্গীর চৌধুরী (মূল নাম): মফিজউদ্দীন আলী মুহম্মদ চৌধুরী, (১৯১৯)

জন্মস্থান: বগুড়া। উপন্যাস লেখেন। এম. এস-সি, ডি. এস-সি।

কবিতা: আধুনিক কোরিয়ার কবিতা (১৯৬৪)। ২য় সং, ঢাকা, কপোতাক্ষী (১৯৬৯)। কতিপয় কোরিয়ার কবির নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ।

উপন্যাস: সোনালী প্রহর (১৩৭৫)।

বটতলায় ঝড়, ব্যঙ্গ কবিতা (১৩৭৫)। ঢাকা, কপোতাক্ষী। ৬৬ পৃ.। ৩.০০। সচিত্র।

জামালউদ্দীন মোল্লা (১৯৩১)

কবিতা, গান লেখেন। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ:

কবিতা: প্রবালদ্বীপ। ঢাকা, জলিবুকস্ (১৩৬৭)। ৮৮ পৃ.। ৩.০০।

জাহাঙ্গীর হাসান কাদেরী, এস. এস. (১৯২১)

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিতা: শৈশবিকা (১৯৬৯)। গোপালপুর, ফরিদপুর টাউন লাইব্রেরী, রাজবাড়ী, ৫২ পৃ.। ২.০০।

জাহানারা আরজু (১৯৩২)

জন্মস্থান : মানিকগঞ্জ, ঢাকা। কবিতা লেখেন। বর্তমানে ঢাকা শহরের বাসিন্দা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নীল স্বপ্ন (১৯৬২)। ঢাকা, কবিতাঙ্গন, ১১৯ পৃ.। ৩'০০। রৌদ্রঝরা গান (১৩৭১)। ঢাকা, কবিতাঙ্গন, ৮৭ পৃ.। ৩'০০।

জাহানারা বেগম (১৯৩৮)

জন্মস্থান: পাবনায়। কবিতা, গল্প প্রবন্ধ লেখেন। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ইচ্ছার অরণ্যে (১৯৬৬)। ঢাকা, কাজী আজমল হোসেন, মডার্ণ পাবলিশার্স। ৬৫ পৃ.। ২'৫০।

কালের কথকতা (১৯৬৭)। পাবনা, রুনা ভূঁইয়া, নওরোজ কিতাবিস্তান। ৬৫ পৃ.। ২'৫০।

জিয়াহায়দার (১৯৩৬)

জন্মস্থান : পাবনা জেলার দোহার পাড়ায়। ১৮ই নভেম্বর ১৯৩৬। কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ লেখেন ও অনুবাদ করেন। এম. এ. (ঢাকা) এম. এফ. এ. (হাওয়াই) অধ্যাপনা, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙলা একাডেমীর সহকারী সংস্কৃতি অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : এক তারাতে কান্না (১৩৭০)। ঢাকা সপ্তক প্রকাশনী। ৭৪ পৃ.। ২'৫০

কৌটোর ইচ্ছেগুলো (১৯৬৮)। ঢাকা, সাইনিং বুক এজেন্সি,। ৪৬ পৃ.। ২'৫০।

জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : মৌসুমীবায়ুর গান (১৯৬০)। রাজশাহী, গ্রন্থকার। ৫৪ পৃ.। '৫০।

জুলকার নায়েন

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : মরণ মিছিল (১৯৬৭)। ঢাকা, অন্বেষা। ৪৪পৃ.। ২'০০।

জুলফিকার

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নতুন পৃথিবীর জন্যে (১৩৫৮)। ঢাকা, পলাশী পাবলিশিং হাউস। ৬৪ পৃ.। ২'৫০।

জুলফিকার হায়দার সুফী, (১৮৯৯)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ফাতেহা-ই দোয়াজদাহাম (১৩৬৮)। ঢাকা মিসেস রাবেয়া হায়দার। ৫২ পৃ.। ১'০০।

ফের বানাও মুসলমান (১৯৬৯)। ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী। ২০ পৃ.। ˙৫০।

ভাঙ্গা তলোয়ার, ২য় প্রকাশ (১৯৫৯)। ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী। ৫৩ পৃ.। ২˙৫০। প্রথম প্রকাশ (১৯৪৫)।

স্বপ্ন যার আনলো যে গড়লো যারা (১৯৫৯)। ঢাকা, ইসলামিক একাডেমী। ৩৬ পৃ.। ১.০০।

টি. এইচ. শিকদার (শিকদার ইবনে নুর, ১৯৪১)

জন্ম ২৩ শে জানুয়ারী ১৯৪১। কবিতা ও গান লেখেন। বি. এ. সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, বাঙ্‌লাদেশ বেতার।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নিষিদ্ধ বাগানে যাবো (১৯৭৩)

তাজামুল হোসেন চৌধুরী (১৯১৯)।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : ছায়ামৃগ দিন (১৯৬১)। ঢাকা, গুলশান লাইব্রেরী। ৬০ পৃ.। ২˙৫০।

কাব্যনাট্য : মহরম (১৯৫৭)। দিনাজপুর, মেহরাব আলী। ১৮ পৃ.। ˙৭৫। নাম পত্রে আছে তোজম্মুল হোসেন চৌধুরী।

তালিম হোসেন (১৯১৮)

জন্মস্থান : চাকরাইল, নওগাঁ মহকুমা রাজশাহী, ১৯১৮। কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা। ১৯৬৫ সালে বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত কবি। মাসিক 'মাহেনও' এর সম্পাদনা বিভাগে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : দিশারী (১৯৫৬)। ঢাকা, মৌসুমী পাবলিশার্স ৬৪ পৃ.। ২˙৫০।

শাহীন (১৯৬২)। ঢাকা, মৌসুমী পাবলিশার্স। ৭২ পৃ.। ৩˙০০।

তৈয়ব উদ্দীন

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : নকশা (১৯৫২)। ঢাকা, মৌসুমী পাবলিশার্স। ৪৪ পৃ.। ১˙৫০।

তৌফিকুল ইসলাম, (এস. এম)

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : প্রেমের নীড় ও অন্যান্য কবিতা (১৯৬৪)। লালমণির হাট, রংপুর, গ্রন্থকার। ২১ পৃ.। ১˙০০।

দাউদ হায়দার (১৯৫২)

জন্ম দোহার পাড়া, পাবনা, ১৯৫২। কবিতা লেখেন। ছাত্র।

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : জন্মই আমার আজন্ম পাপ (১৯৭৩)।

দিলওয়ার (১৯৩৭)

জন্মস্থান সিলেট : কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ঐকতান (১৯৬৪)। সিলেট, দিলওয়ার সম্বর্ধনা কমিটি ৬২ পৃ. ৩'০০।

উদ্ভিন্ন উল্লাস (১৯৬৯)। মৌলভী বাজার, সুরভি প্রকাশনী, ৫৬ পৃ.। ২'৫০।

জিজ্ঞাসা (১৯৫৩)। সিলেট, মুসলিম খান। ৪০ পৃ.। '৬২।

দিলওয়ার হোসেন

প্রকাশিত গ্রন্থ : কবিতা : দ্বিতীয় সূর্য শুক্লপক্ষের (১৯৬৯)। চন্দ্রপুরা, চট্টগ্রাম, কবিকীর্তি, । ৪৮ পৃ.। ৩'০০।

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)

জন্মস্থান : বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যান ও হাবিলদার পদে উন্নীত হন। মহাযুদ্ধের অবসানেই তিনি চাকুরী ত্যাগ করেন। কল্লোল গোষ্ঠীর পুরোধায় নজরুলের স্থান। ১৯২৪ সাল হতেই তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৩ সালে এই রোগে তাঁর স্মৃতিশক্তি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে। নজরুল বাঙ্‌লা সাহিত্যের আকাশ সীমায় ভোরের শুকতারার মতো চিরন্তন ও ভাস্বর। নজরুলের বিরাট সাহিত্য কীর্তির মধ্যে বাঙ্‌লাদেশে (পূর্ববঙ্গে) প্রকাশিত গ্রন্থের স্বল্প পরিচিতি সন্নিবেশিত হল।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

অগ্নিবীণা (১৯৫৮)। আবুলকাশেম সম্পাদিত। ঢাকা, সিটি লাইব্রেরী। ৬৬ পৃ.। ৩'০০। (মূলগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২২)

চক্রবাক (১৯৬৯)। সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত। হায়াৎ, কুমিল্লা, মোঃ মোজাম্মেল হক ভূঁইয়া, পুস্তক ঘর। ৫০ পৃ.। ৩'২৫। (মূল গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২৯)।

দোলনচাঁপা (১৯৬৯)। হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত। ঢাকা পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ১০০ পৃ.। ৪'৫০ (মূল গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২৩)।

নজরুল কাব্য সঞ্চয়ন (১৩৬৬)। ঢাকা, ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। ২৪৮ পৃ.। ৫'০০। (কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের কবিতার সংকলন)।

পূবের হাওয়া (১৯৫৪)। ২য় সং, ঢাকা, এ আর. খান ২৪।২৫ দাস লেন, ৪৯ পৃ.। ১'২৫। প্রথম প্রকাশ ১৯২৫।

মরুভাস্কর (১৩৭৬)। রাজ সং। ঢাকা, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো ১৪৩ পৃ.। ৫০। প্রথম প্রকাশ ১৯৫০।

সঞ্চিতা (১৯৬৯)। হায়াত মামুদ সম্পাদিত। ঢাকা, এ. কে. এম, ফজলুর রহমান। ৩১২ পৃ.। ৭'০০।

সর্বহারা (১৩৭৬)। হেলালউদ্দীন সম্পাদিত। বরিশাল, এম. এ. আলী, সেলিম প্রকাশনী। ৫৬ পৃ.। ২'৫০। (মূলগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২৬)।

সিন্ধুহিল্লোল (১৯৬০)। মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল সম্পাদিত। ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ৭৯ পৃ.। ৩৫০। (মূল গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ১৯২৭)।

নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫)

জন্মস্থান: কিশোরগঞ্জ। কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: প্রেমাংশুর রক্ত চা'ই (১৯৭০), ঢাকা, খান ব্রাদার্স। ৬২ পৃ.। ৩'০০।

না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), খান ব্রাদার্স, ঢাকা, বাঙ্‌লা বাজার। ৬৩ পৃ.। ৩'৫০

কবিতা: অমীমাংসিত রমণী (১৯৭৩)। প্রগতি, শাহবাগ এভিন্যু ঢাকা ২। ৬৪ পৃ.। ৫'০০

নুরুন নাহার (১৯২৩)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: অগ্নি ফসল (১৯৫১)। চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী। ৪০ পৃ.। ২'০০।

নেছার উদ্দীন (১৯২২)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: কাব্যবিতান (১৯৬৭)। খুলনা, নওরোজ লাইব্রেরী। ২১ পৃ.। '৭৫।

ফখরউদ্দীন আহম্মদ, কাজী

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: পড়ন্ত বেলা (১৯৬৮)। ঢাকা, আবুল বাশার। ১২০ পৃ.। ১'০০।

ফজলুর রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: জাগরণী (১৯৬৩)। সিলেট, গ্রন্থকার। ৫৪ পৃ.। ১'২৫।

ফজল মওলা, খন্দকার

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা: অস্ত তপন (১৩৭০)। সাহেব পাড়া, ময়মনসিংহ, নওবেলাল পাবলিকেশন, ঢাকা। ৭২ পৃ.। ১৯২৫।

ফজল শাহাবুদ্দীন (১৯৩৬)

জন্মস্থান : ঢাকা। কবিতা, গল্প লেখেন। সাংবাদিক। দৈনিক পাকিস্তানে 'ফিচার এডিটর' রূপে কাজ করেছেন। ১৯৭৩ সালে বাঙ্‌লা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত কবি।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : তৃষ্ণার অগ্নিতে একা ১৯৬৫। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স। ৮০ পৃ.। ৩'০০।

আকাঙ্ক্ষিত অসুন্দর ১৩৭৬। ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স। ৮০ পৃ.। ৩'৫০।

গল্প : দিক চিহ্নহীন (১৯৬৮)

অনুবাদ : লং কেলোর নির্বাচিত কবিতা।

ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)

জন্মস্থান : যশোর জেলার অন্তর্গত ঘোষ গতি নামক গ্রাম। ইনি 'বাসনা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সুফী ভাবাপন্ন লেখক রূপে খ্যাত।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : পরিত্রাণ (১৯০০), ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।

গদ্যগ্রন্থ : ছায়াতত্ত্ব (১৯০৩), পথ ও পাথেয় (১৯১৩) রাজর্ষি এবরাহিম (১৯২৪)।

ফজল এ খোদা (১৯৪১)

জন্মস্থান : ৯ই মার্চ ১৯৪১। কবিতা ও গান লেখেন। সম্পাদক, বেতার প্রকাশন, বাঙ্‌লাদেশ বেতার।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা গান : সূর্য স্বর্ণদ্বীপ (১৩৭৫)। ঢাকা, মাহমুদা সুলতানা। ৪৮ পৃ.। ৩'০০। বিতর্কিত জ্যোৎস্না (১৯৭৩)। সংগীতা (১৯৭৩)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা :

নাটক : মুক্তার পাড়া (১৯৭০)।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)

জন্মস্থান : মাঝ-আইল যশোর। কবিতা লিখতেন। সরকারী চাকুরে ছিলেন। ১৯৬০ সালে বাঙ্‌লা একাদেমী কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত কবি। লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনি পাকিস্তান ও রেনেসাঁ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৬১ সালে ৫০০০ টাকা প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পান।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : সাত সাগরের মাঝি (১৯৫২), ঢাকা, তমদ্দুন প্রেস। ৮৩ পৃ.। ২'৫০।
সিরাজুম মুনীরা (১৯৫২)। ঢাকা, তমদ্দুন প্রেস। ৮৮ পৃ.। ২'৫০।
মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩)। ঢাকা, বার্ডস্ এণ্ড বুকস্,। ১০০ পৃ.। ৩'০০।
হাতেম তায়ী (১৩৭৩)। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী। ৩২৮ পৃ.। ৮'০০। (১৯৬৬ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত।)

কাব্যনাট্য : নৌফেল ও হাতেম, কাব্যনাট্য (১৯৬১)। ঢাকা, পাকিস্তান লেখক সংঘ। ৯১ পৃ.। ২'৫০।

ছড়া : পাখীর বাসা (১৯৬৫), হরফের ছড়া (১৯৬৮), ছড়ার আসর (১৩৭৭)।

ফরহাদ মজহার (১৯৪৬)

জন্মস্থান : নোয়াখালী। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। ছাত্র (আমেরিকায় অধ্যয়নরত)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : খোকন ও তার প্রতি পুরুষ (১৯৭১)।

ফারুক মাহমুদ (১৯৩৪)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ধোলাই কাব্য (১৯৬৩)। ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। ঢাকা, গ্রন্থকার। ৭২ পৃ.। ২'০০।

ফারুক সিদ্দিকী, কাজী রব

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বিপ্রতীক (১৯৬৮)। বগুড়া, কাজী রব সিদ্দিকী,। ৩৬ পৃ.। '৭৫।

বজলুল রশীদ, আলম, (১৯১১)

কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণকাহিনী লেখেন। এম. এ., বি. টি.। অধ্যাপনা টিচারস্ ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা (অবসর প্রাপ্ত)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মরুসূর্য (১৯৫৬)। ঢাকা, তাদিল ব্রাদার্স। ১৭৪ পৃ.। ৩'০০।
পান্থবীণা (১৩৫৪)। ঢাকা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ৯২ পৃ.। ২'০০।

শীতে বসন্তে (১৩৭৪)। ঢাকা, বেগম হাশমত রশীদ। ৮৮ পৃ.। ৪.০০। শেষ ১৯ পৃষ্ঠা ইংরেজী কবিতা সম্বলিত।

একঝাঁক পাখী (১৩৭৬)। ঢাকা, আজাদ পাবলিশিং হাউস ৫৬ পৃ.। ৪.০০।

মৌসুমী মন (১৯৭০), রক্তকমল (১৯৭১)।

কাব্য নাট্য : ত্রিমাত্রিক (১৯৬৬)। ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান। ৭৬ পৃ.। ৪.০০

মেহের নিগার ও অন্যানিকা (১৯৬২)। ঢাকা, বেগম হাশমত রশীদ। ৬৮ পৃ.। ২.৫০। ৩২ পৃষ্ঠা থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা কবিতা সম্বলিত।

রঙ ও রেখা (১৩৭৫)। ঢাকা, বেগম হাশমত রশীদ। ৬০ পৃ.। ৫.০০।

উপন্যাস : অন্তরাল (১৯৫৮), মনে মনান্তরে (১৯৬১), পথ ও পৃথিবী (১৩৭০), দুই সাগরের দেশে (১৩৭০), দ্বিতীয় পৃথিবীতে (১৯৬০), পথ বেঁধে দিল (১৩৬৭)।

নাটক : উত্তর ফাল্গুনী (১৩৭১), একে একে এক (১৩৭৬), ঝড়ের পাখী (১৩৬৩), ধানকমল (১৯৬৯), যা হতে পারে, শিলা ও শৈলী, স্বর ও ছন্দ (১৩৭৩), সংযুক্তা (১৯৬৫)।

বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭)

জন্মস্থান: রাধানগর পাবনা। কবিতা, উপন্যাস, গল্প লেখেন। সরকারী চাকুরী (অবসর প্রাপ্ত)। কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষকতা করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ময়নামতীর চর। ৩য় সং। ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ১০০ পৃ.। ২.৫০। প্রথম প্রকাশ (১৯৩২)। কাব্যবীথিকা। ঢাকা, বিশ্বকোষ (১৯৬১)। ২০৪ পৃ.। ৪.০০। (বিভিন্ন কবি রচিত কবিতার সংকলন ও সম্পাদনা)।

দক্ষিণ দিগন্ত (১৯৬৯)। ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস। ৬৮ পৃ.। ২.০০। (গ্রন্থকার কর্তৃক প্রচ্ছদ অঙ্কিত।)

অস্তাচল, অনুরাগ।

উপন্যাস : অরণ্য গোধূলী (১৯৫৭), ঘূর্ণি হাওয়া (১৯৪০), জাগ্রত যৌবন (১৯৪৯), ঝড়ের সংকেত (১৯৬১), দিবা স্বপ্ন (১৯৫৩), নারী রহস্যময়ী (১৯৪৫), নীড়ভ্রষ্ট (১৯৪১)।

গল্প : তাসের ঘর (১৯৫৪)।

স্মৃতিকথা : জীবনের দিনগুলি (১৩৭৩)

নাটক : আলাদীন (১৯৬৯), জোয়ার ভাটা (১৩৬৬), কামাল আতাতুর্ক মসনদ (১৩৬৮)।

বদরুল হাসান (১৯৩২)

জন্ম নারেঙ্গা, বর্ধমান। প্রবন্ধ, কবিতা ও গান লেখেন এবং অনুবাদ করেন। এম. এ.। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

অনুবাদ : আলয় ও বিদ্যালয়।

বদরুন্নেসা আবদুল্লাহ (১৯৩৮)

জন্ম ঢাকায় (১৯৩৮)। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখেন। এম. এ.। প্রযোজিকা, বাঙ্‌লাদেশ টেলিভিশন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : প্রত্যাবর্তন (১৯৬০), কাজলদীঘির উপকথা (১৯৬২), বরবর্ণিনী (১৯৬৩), বনচন্দ্রিকা (১৩৭৩), সমুদ্রের ঢেউ (১৯৬৩), নূপুর নিক্বন (১৯৬৯), আজকের পৃথিবী।

বিপিনচন্দ্র রায়

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : লতা। বাঙ্গাল পাড়া, মোমেনশাহী, গ্রন্থকার,—। ৪৪ পৃ.।

বুলবুলখান মাহবুব

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : রক্তের কারুকাজ (১৯৬৭)। আমিনবাগ, ঢাকা, কল্লোল প্রকাশনী,। ৫৮ পৃ.। ২.০০।

বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১)

জন্মস্থান : বাখরগঞ্জ জেলার শায়েস্তা পরগণা। কবিতা, গল্প লেখেন। সমাজ সেবী। বাঙ্‌লা একাডেমী কর্তৃক ১৯৬২ সালে পুরস্কার প্রাপ্ত কবি। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : সাঁঝের মায়া (১৩৭৩)। ঢাকা, শাহেদ কামাল। ৭৯ পৃ.। ৩'০০। প্রথম সংস্করণ ১লা শ্রাবণ (১৩৪৫)।

মায়া কাজল ১৩৭৩। ঢাকা, শাহেদ কামাল। ৭৪ পৃ.। ২'৫০।

মন ও জীবন (১৩৬৪)। ঢাকা, বায়েজীদ খান পন্নী। ১৪২ পৃ.। ২'৫০।

দীওয়ান (১৩৭৩)। সিলেট, লিপিকা এণ্টারপ্রাইজেস লিঃ। ১০৭ পৃ.। ৪'০০।

প্রশস্তি ও প্রার্থনা (১৯৬৮) ঢাকা, শাহাদাত হোসেন। ৮৪ পৃ.। ৩'০০।

উদাত্ত পৃথিবী (১৩৭১)। ঢাকা, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ। ৮২ পৃ.।

গল্প : কেয়ার কাঁটা (১৩৭৪), মোর দাদুদের সমাধিপরে (১৯৭২)।

বেনজীর আহমদ (১৯০৩)

জন্মস্থান : ধামুয়া, নারায়ণগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা। কবিতা লেখেন। রাজনীতিবিদ। ১৯৬১ সালে বাঙলা একাডেমী কর্তৃক প্রাপ্ত সাহিত্যিক (কবিতা)। ১৯২১ সালে ইনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনে এঁর ভূমিকা ছিল।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বৈশাখী (১৩৬০)। ২য় সং। ঢাকা, মালেক মিনার। ১০০ পৃ.। ২'০০।

বন্দীর বাঁশি।

গদ্যগ্রন্থ : ইসলাম ও কম্যুনিজম।

বেলায়েত হোসেন ফিরোজী, মীর (১৮৯১)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বজ্রহুঙ্কার (১৩৭৫)। সিরাজগঞ্জ, মীর মোহাম্মদ অলিউল্লাহ মধুপুরী, ফিরোজী সাহিত্য মঞ্জেল।

২ খণ্ড একত্রে ১০'০০।

১ম খণ্ড „ ২৬৮ পৃ.।

২য় খণ্ড ১৬৭ পৃ.।

মনিরুজ্জামান (১৯৪০)

জন্মস্থান : ঢাকা। গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপক, বাঙ্‌লা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৬৯)

সম্পাদনা : নিসর্গ।

মতিউল ইসলাম (১৯১৪)

জন্মস্থান : গুনিয়াতক, ত্রিপুরা। কবিতা ও ছোটগল্প লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মাটির পৃথিবী (১৩৫৪)। কলিকাতা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী। ২৯ পৃ.। ২·০০।

পুষ্পবীথি ১৯৬৩। ঢাকা, ষ্টাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। ৬৪ পৃ.। ২·০০। প্রিয়া ও পৃথিবী (১৩৬২)। চট্টগ্রাম শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী। ৩·০০। সপ্তকন্যা (১৯৫৭)। চট্টগ্রাম, ইসলামিয়া লাইব্রেরী। ২২ পৃ. ১·৫০।

কায়েদে আজম তোমার জন্যে। কলিকাতা, মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, (১৩৫৪)। ২৯ পৃ.। ২·০০

ছোটগল্প : দিবা ও রাত্রি (১৩৫৮)।

মনোমোহন বর্মণ

কবিতা, শিশু সাহিত্য লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : দীঘল ঘুমের শেষে (১৯৬৫)।

শিশু সাহিত্য : সবুজ কুঁড়ি স্বপন দেখে (১৯৭৩)।

মযহারুল ইসলাম, ডক্টর (১৯২৫)

জন্মস্থান : চরণীবপুর, পাবনা, ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯২৫)। কবিতা, গল্প, গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন এবং অনুবাদ করেন। এম. এ. (ঢাকা), পি. এইচ-ডি (রাজশাহী), পি. এইচ-ডি (ইণ্ডিয়ানা), এফ. আর. এ. এস. (লণ্ডন)। প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাঙ্‌লা একাডেমী। প্রাক্তন প্রফেসর ও অধ্যক্ষ, বাঙ্‌লা বিভাগ এবং কলা অনুষদের ডীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাক্তন ভাইস

চান্সেলর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙ্‌লা একাডেমী 'পুরস্কার' প্রাপ্ত (প্রবন্ধ গবেষণা) সাহিত্যিক।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মাটির ফসল (১৯৭০)।

বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি (১৩৭৬)। ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ৯৬ পৃ.। ৪'৫০।

আর্তনাদে বিবর্ণ (১৩৭৭)। ঢাকা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ৭৭ পৃ.। ৫'০০। সচিত্র। (কবিতাগুলি রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিরচিত।)

গল্প : তালমাতাল (১৯৫৯)।

গবেষণা : হেয়াত মামুদ (১৯৬১), পাগলা কানাই (১৯৬৯), ফোকলর পরিচিতি ও লোক সাহিত্যের পঠন পাঠন (১৯৬৭), লোক কাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস (১৯৭০), History of folktale collection in India and Pakistan (১৯৭১), সতী ময়না ও লোর চন্দ্রাণী।

সম্পাদক : সাহিত্যিক কী, গবেষণা পত্রিকা, বাঙ্‌লা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়(১৯৫৮-১৯৭১), উত্তর অন্বেষা, সৃষ্টিশীল সাহিত্য পত্রিকা (১৯৬৬-১৯৭১), উত্তরাধিকার (বাঙ্‌লা একাডেমীর সাহিত্য পত্রিকা)। বাঙ্‌লা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ধান শালিখের দেশ (শিশু পত্রিকা) ও Bangla Academy Journal.

প্রবন্ধ : সাহিত্যের পথে।

অনুবাদ : বাঙ্‌লাদেশ লাঞ্ছিতা (১৯৭৩)।

জীবনী : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (১৯৭৪)।

সম্পাদনা : গল্পবিচিত্রা (১৯৬৯), বাঙ্‌লা কবিতা (১৯৭১), বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রবন্ধ (১৯৭০)।

মহাদেব সাহা (১৯৪৪)

জন্মস্থান : পাবনা। কবিতা লেখেন। এম. এ.। সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : এই গৃহ
এই সন্ন্যাস (১৯৭২),
মানব এসেছি কাছে (১৯৭৪)

মহীউদ্দীন (১৯০৬)

জন্মস্থান : খরিয়া খাল পাড়া, ঢাকা। কবিতা, উপন্যাস লেখেন। ইনি অবিভক্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : পথের গান।
দিগন্তের পথে একা।

উপন্যাস : আলোর পিপাসা, দুর্ভিক্ষ, কামিনী কাঞ্চন, কঙ্কানদীর তীরে (১৯৬৭), নূতন সূর্য (১৯৬১), নির্যাতিত মানবতার নামে (১৯৪৪), বশির (১৯৬৫), শাদী মোবারক, শিল্পী স্বপ্ন (১৯৬০)।

মাহমুদ আলমবেগ

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : দিগন্তহীন (১৯৭০)। ঢাকা, বিশ্ববাদ প্রকাশনা কেন্দ্র। ৪৯ পৃ.। ২.০০

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী (১৯১০)

জন্মস্থান : গোবরা, চাঁদপুর, নদীয়া। কবিতা লেখেন। কলকাতায় আল ইসলাম পত্রিকায় নয় বৎসর বয়সে এঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : অরণ্যের সুর (১৩৬১)।
পশারিণী (১৯৩১)।
মন ও মৃত্তিকা (১৯৬০)।

মাহবুব তালুকদার (১৯৪০)

জন্মস্থান : ঢাকা। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ছড়া লেখেন। এম. এ.। সরকারী চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

উপন্যাস : ক্রীড়নক (:৩৭৬)।
অবতার (১৯৭৩)।

কবিতা : জন্মের দক্ষিণা (১৯৭৩)।

মাহবুব সাদেক (১৯৪৫)

জন্মস্থান : টাঙ্গাইল। এম. এ.। কবিতা ও গল্প লেখেন। অধ্যাপনা, করটিয়া সাদত কলেজ, টাঙ্গাইল।

মুফাখ খারুল ইসলাম (১৯২১)

জন্মস্থান : বেনীমাধব, টাঙ্গাইল। ১লা মে, (১৯২১)। কবিতা, প্রবন্ধ, ইতিহাস, নাটক, রম্যরচনা ও পুঁথি লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা (পেশা)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মুর্শিদ (১৯৫২)।
বয়তি (১৯৭০)।
হে পাক ফৌজ।

নাটক : আশ্রিত (১৯৫৯), ঈদের খুশী (১৯৭০) আওলাদ (১৯৫৮)।

মুহম্মদ নুরুল হুদা (১৯৫৫)

জন্মস্থান : কক্স বাজার। ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সাল। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ.। সহ পরিচালক, অনুবাদ ডিভিশান, বাঙ্‌লা একাডেমী।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : শোণিতে সমুদ্রপাত (১৯৭২)।

সম্পাদনা : হে স্বদেশ (যুগ্ম সম্পাদনা ১৯৭২)।

মোজহারুল ইসলাম (১৯২১)

জন্মস্থান : দেপাল, মেদিনীপুর। ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯২১) সাল। উপন্যাস, নাটক, কবিতা, সঙ্গীত, স্মৃতিকথা লেখেন। আই. এ.। চাকুরীজীবী (বাঙ্‌লা একাডেমী)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বীণা (১৯৫৩)

উপন্যাস : আমার পৃথিবী তুমি (১৯৬২), সোনাঝরা দিন (১৯৫৬), কখনো অন্যমনে (১৯৬৩)।

নাটক : দিল্লীর মসনদ্‌ (১৯৬৬), অগ্নিস্নান (১৯৫৯), মুক্তি বিষাণ (১৯৬০), বিচার (১৯৫৫), কবি সমাচার (১৯৬১), শেষদান (১৯৭৪), বিচারকের ফাঁসি (১৯৭৪)।

স্মৃতিকথা : হৃদয়ের রঙ্‌ (১৯৬৪)

সঙ্গীত : ক্লান্তবীণার শেষরাগিণী (১৯৬৫)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬)

জন্মস্থান : কাঞ্চনপুর, নোয়াখালি। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। এম. এ.। ইনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

প্রবন্ধ : সংস্কৃতি কথা (১৯৫৯)।

অনুবাদ : সুখ (১৩৭৫), সভ্যতা (১৩৭২)।

মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৪-১৯৬৪)

জন্মস্থান : জোকা, মুহম্মদপুর, যশোর, ২১শে ফাল্গুন, ১২৮০ (১৮৭৪), মৃত্যু : ৪ঠা এপ্রিল, (১৯৬৪)। বি. এ.। শিক্ষকতা করতেন। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বঙ্গ বীরাঙ্গনা (১৯০৬)। কাব্য যুথিকা (১ম খণ্ড ১১৬০)

প্রবন্ধ : বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান (১৯১০), দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ (১৯১২)।

অনুবাদ : পয়গামে মোহাম্মদী (১৯২২)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৩৬)

জন্ম : যশোর, ১৫ই আগস্ট, (১৯৩৬)।

কবিতা, সমালোচনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গান লেখেন এবং অনুবাদ করেন। এম. এ. পি, এইচ-ডি (ঢাকা), এফ. আর. এ. এস (লণ্ডন)। এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাঙ্‌লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক (কবিতা গ প, ১৯৭২)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : অনির্বাণ। ঢাকা, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, (১৩৭৫)। ৫৬ পৃ.। ২.৫০। দুর্লভ দিন। ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, ১৩৬৮। ৫৫ পৃ.। ২.৫০।

বিপন্ন বিষাদ। ঢাকা, কথাকলি, (১৩৭৫)। ৫৬ পৃ.। ৩.০০।

শঙ্কিত আলোক। ঢাকা, কথাকলি, (১৩৭৫)। ৫৬ পৃ.। ৩.০০।

গবেষণা : আধুনিক বাঙ্‌লা কাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (১৮৫৭-১৯২০)। (১৯৭০)। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য (১৯৬৫) ২য় সং (১৯৬৯), বাঙ্‌লা কবিতার ছন্দ (১৯৭০), আধুনিক কাহিনী কাব্যে মুসলিম জীবন ও চিত্র (১৯৬২)।

কিশোর সাহিত্য : কবি আলাউল (১৯৬০)।

নৃত্যনাট্য : কর্ণফুলী (১৯৬২)। নবারুণ (১৯৭২)।

সম্পাদনা : ঢাকার লোক কাহিনী (১৯৬৫)। ২য় সং, (১৯৭৪) প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৬৮), মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী (১৯৭০)। মধুসূদন নাট্য গ্রন্থাবলী (১৯৬৯)। নজরুল সমীক্ষণ (১৯৭২)। দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান (মুহম্মদ আবদুল হাই সহযোগে ১৯৬৮, ২য় সং ১৯৭০, ৩য় সং ১৯৭৪)।

অনুবাদ নাটক : জাম্বুবান (ও' নীলের হেয়ারী এপ এর অনুবাদ (১৯৬৭)।

মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ (১৯৩৬)

জন্মস্থান : নাউঘাট, কুমিল্লা। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। বি. এ.। পেশা সাংবাদিকতা। দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : জুলেখার মন (১৯৫৯),
অন্ধকারে একা (১৯৬৬)।
রক্তিম হৃদয়। ১৩৭৭। ঢাকা, মাহতাব জামিল, ৪১, আগা মসিহ লেন, ৬৪ পৃ.। ৩˙০০।

প্রবন্ধ : সমকালীন সাহিত্যের ধারা (১৯৬৫), নজরুলকাব্যের শিল্পরূপ (১৯৭২), বাঙ্‌লা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য (১৩৭২), মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ (১৩৭৪), নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতা (২য় সং ১৯৬৯) সাহিত্য, সংস্কৃতি জাতীয়তা (১৩৭৪)।

কিশোরগ্রন্থ : দিগ-দিগন্তরে (১৯৫৩)

সম্পাদনা : পূর্ব বাঙ্‌লার কবিতা (১৯৫৪)।

মোহাম্মদ রফিক (১৯৪২)

জন্ম বাগের হাট, খুলনা। কবিতা লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা, সরকারী কলেজ।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বৈশাখী পূর্ণিমা (১৯৭০)।

মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান (১৯৪৩)

জন্ম যশোর। কবিতা, গান, ও নাটক লেখেন। বি. এ. (অনার্স), সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক, বাঙ্‌লাদেশ বেতার, ঢাকা।

রওশন ইজদানী (১৯১৭-১৯৬৭)

জন্মস্থান : বিদ্যাবল্লভ, ময়মনসিংহ। কবিতা লিখতেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কাব্য : খাতমুন নবীঈন (১৯৫৩), কিস্মুবিবি (১৯৫১), রঙ্গিলাবন্ধু (১৯৫১), বজ্রবাণী (১৯৪৭), রাহগীর।

পুঁথি : পাকিস্তানের জঙ্গনামা।

সম্পাদনা : মোমেন শাহীর লোকসাহিত্য (১৩৬৪)।

রমেশ শীল

জন্মস্থান : গোসদাভী, চট্টগ্রাম। ২৬শে বৈশাখ, (১২৮৪)

মৃত্যু : ২৫শে চৈত্র, (১৩৭৩)। কবিতা লিখেছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

লোকগীতি (১৯৬৪)

রফিক আজাদ (১৯৪৩)

জন্মস্থান : খুনী, টাঙ্গাইল, কবিতা লেখেন। এম. এ. সহ পরিচালক, পত্রিকা বিভাগ, বাঙলা একাডেমী

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : অসম্ভবের পারে (১৯৭১)

সীমাবদ্ধ জলে সীমিত সবুজে (১৯৭১)

শশাঙ্ক পাল

জন্ম : বরিশাল, শহীদ ১৯৭১। কবিতা, উপন্যাস লিখতেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : ঝরাপাতার কান্না (১৯৬৬)

শহীদ কাদরী (১৯৪২)

জন্ম : ঢাকায়, ১৪ ই আগস্ট ১৯৪২ সাল। কবিতা লেখেন। সাংবাদিকতা (পেশা।)

১৯৭৩ সালে বাঙলা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক (কবিতা)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : উত্তরাধিকার (১৯৬৯),
তোমাকে অভিবাদন,
প্রিয়তমা (১৯৭৪)।

শামসুর রহমান (১৯২৯)

জন্মস্থান : ঢাকা। কবিতা লেখেন। বি. এ. (অনার্স) সাংবাদিকতা।

১৯৬৯ সালে কবিতায় বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত। ১৯৬৪ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পান। রেডিও পাকিস্তানে প্রোগ্রাম প্রোডিউসার ও মর্ণিং নিউজে সাব এডিটরের কাজ করেছেন। দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদকও ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে (১৯৫৯), ঢাকা, বার্ডস্ এণ্ড বুকস্। ৬৮'২। ২'৫০।

রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩) ঢাকা, লেখক সংঘ প্রকাশনী ৮০ পৃ. ২'৫০।

বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৭৩), চট্টগ্রাম, বইঘর। ৯০ পৃ. ৩'০০

নিরালোকে দিব্যরথ (১৩৭৫), ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ৯৫ পৃ. ৪'০০

নিজ বাসভূমে, ঢাকা, মাহতাবুন্‌নেসা. আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৭০। ৯৫ পৃ.। ৪'০০।

বন্দীশিবির থেকে (১৯৭)

দুঃসময়ের মুখোমুখী (১৯৭৩)

অনুবাদ : খাজা ফরিজের কবিতা (১৩৭৬), ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৫) মার্কো মিলিয়াটস (১৯৭৪)

শাহাদাৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩)

জন্মস্থান : পণ্ডিতপোল, চব্বিশ পরগণা। কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখতেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মৃদঙ্গ, চিত্রপট,

কল্পলেখা

রূপ ছন্দা।

উপন্যাস : রিক্ত, পথের দেখা, মরুর কুসুম, খেয়াতরী, সোনার কাঁকন, যুগের আলো, কাঁটাফুল, শিরি ফরহাদ, লাইলী মজনু, ইউসুফ জুলায় খাঁ।

নাটক : সরফরাজ খাঁ, নবাব আলীবর্দী, মসনদের মোহ, আনারকলী।

শাহেদ কামাল (১৯৪২)

কবিতা, নিবন্ধ লেখেন ও অনুবাদ করেন। এম. এ. (ঢাকা) সাংবাদিকতা পেশা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কবিতা সংকলন ছয় (১৯৬৬)

শেখ হবিবর রহমান (১৮৯১-১৯৬১)

জন্মস্থান : ঘোষ গতি, যশোর। কবিতা লিখতেন। সরকারী চাকুরী।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কোহিনূর কাব্য, ২য় প্রকাশ। কলিকাতা কিতাবমহল।
(১৯৪৯) ১ম প্রকাশ (১৯১৯) ১৪০ পৃ.। ২.৫০
চেতনা,
বাঁশরী,
পারিজাত,
গুলশান,
আবেহায়াত।

গদ্যগ্রন্থ : হাসির গল্প, ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

সন্তোষ গুপ্ত

প্রবন্ধ, কবিতা এবং সমালোচনা লেখেন।
সাংবাদিকতা।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ

গল্প, কবিতা লেখেন।
সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, জনতা ব্যাংক, ঢাকা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

বুধবার রাতের গল্প (১৯৭৩)

সানাউল হক (১৯২৩)

জন্মস্থান : চাউড়া, কুমিল্লা। কবিতা, অনুবাদ, রম্যরচনা, শিশু সাহিত্য লেখেন। এম. এ. রাষ্ট্রদূত, বাঙ্‌লাদেশ দূতাবাস, বেলজিয়াম। ১৯৬৪ সালে কবিতায় বাঙ্‌লা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : নদী ও মানুষের কবিতা। ঢাকা, ওয়ার্সী বুক সেণ্টার। (১৩৬৩)
৭২ পৃ.। ২.৫০।
সম্ভবা অনন্যা। ঢাকা, পূর্ববাণী, (১৩৬৯)। ৬২ পৃ.। ২.৫০।

সূর্য অন্তর ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, (১৩৬৯), ৯২ পৃ.। ৪'৫০।
ইচ্ছা অন্তর (১৯৭৩)।
বিচূর্ণ আর্শিতে। ঢাকা সমকাল প্রকাশনী, (১৯৬৮)। ৬২ পৃঃ। ৪'০০।

অনুবাদ: বরিস পাস্টার নাকের কবিতা। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী, (১৩৭১)। ১১০ পৃ.। ৩'০০। ইভান গলের প্রেমের কবিতা। ঢাকা, বাঙ্‌লা একাডেমী, (১৯৭১)। ৪০ পৃ.। ২'০০।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত: বন্দর থেকে বন্দরে।

সালাহউদ্দীন কে. এম.

প্রকাশিত গ্রন্থ:

কবিতা: এ দেশ এ মাটি। ঢাকা, জনসেবা হোমিও হল। (১৯৫৮)। ৬৪ পৃ.। ১২'০০।

যাত্রাশুরু: ঢাকা, সাহিত্য মেলা, (১৯৭০), ৪২ পৃ.। ২'০০।

সাহেদুর রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ:

কবিতা: প্রচ্ছদপট। বগুড়া, কামরুল হুদা, ৫৬ পৃ.। ২'০০।

সাইফুল্লাহ শেখ

প্রকাশিত গ্রন্থ:

কবিতা: অভিযান। ঢাকা, মনোয়ার আলী, (১৯৫৪)। ১০৫ পৃ.। ২'০০
অশ্রুধারা। ঐ ঐ (১৯৫৩)। ৮০ পৃ.। ২'০০
গুলবাগ। ঐ ঐ (১৯৫৩)। ৬৪ পৃ.। ১'৫০
ঝঙ্কার। ঢাকা, বুলবুল প্রকাশনী, (১৯৫৫)। ১৪০ পৃ.। ২'৫০
ঝরণা। ঐ ঐ (১৯৫৭)। ১৪৪ পৃ.। ২'৫০
দিলবাগ। ঐ ঐ (১৯৫৪)। ১০৭ পৃ.। ২'০০
প্রতিধ্বান। ঐ ঐ (১৯৫৫)। ১৩৪ পৃ.। ২'৫০
সঙ্গীত লহরী। ঐ মনোয়ার আলী (১৯৫২)। ৮০ পৃ.। ২'০০

সামীয়ুল ইসলাম (১৯৩১)

জন্মস্থান: বেলকা, রঙপুর। ৩১ ডিসেম্বর (১৯৩১)। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প লেখেন। সহঃ অফিসার, ফোকলোর ডিভিশন, বাঙ্‌লা একাডেমী।

প্রকাশিত গ্রন্থ:

প্রবন্ধ: উত্তর বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য (১৯৭৩)।

সাযযাদ কাদির (১৯৪৬)

জন্ম টাঙ্গাইল। কবিতা, গল্প লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : যথেচ্ছ ধ্রুপদ। ঢাকা, শব্দরূপ প্রকাশনী, (১৩৭৭)। ৪৮ পৃ.।

সিরাজদ্দৌলা চৌধুরী আ. ফ. ম.

কবিতা লেখেন। এম. এ. অধ্যাপনা

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কখনো কান্না। চট্টগ্রাম, রূপরঙ্গ প্রকাশনী (১৩৭৫)। ৬৫ পৃ.

সম্পাদনা : রূপরঙ্গ। কৌতুক ও হাসির কবিতার সংকলন। চট্টগ্রাম রূপরঙ্গ প্রকাশনী, (১৯৬৮)। ৭১ পৃ.। ২.০০

সিরাজউদ্দিন চৌধুরী

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : সাঁঝের বলাকা, টাঙ্গাইল শাম সুন্নাহার চৌধুরী (১৯৫৭)। ৬২ পৃ.। ১. ৫

সিরাজুল ইসলাম খান মুহম্মদ (১৯২৭)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : জয়নিশান। কুষ্টিয়া, গ্রন্থকার, ১৯৫৮। ৬৩ পৃ.। ১.২৫

রাণীর প্রেম। কুষ্টিয়া, মুহম্মদ শহীদুল হফসান (১৯৬০) ১৭ পৃ. ১.৫০।

সৈনিক। কুষ্টিয়া, ঐ, (১৯৫৯)। ৫৬ পৃ.। ১.০০

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮)

জন্মস্থান : খুলনা। কবিতা, নাটক লেখেন ও অনুবাদ করেন। পেশা সাংবাদিকতা। সমকাল পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৬৬ সালে নাটকে বাঙলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৪)। ঢাকা সমকাল প্রকাশনী, ৭৫ পৃ. ৪.০০

তিমিরান্তিক, (১৯৬৮)। ঢাকা, সমকাল প্রকাশনী, ৭৫ পৃ. ৩.০০

বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৪)। „ „ „ ৮০ পৃ.। ৩.০০

কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮) „ „ „ ৭৫ পৃ.। ৪.০০

মালব কৌশিক (১৩৭২) „ „ „ ১৬৮ পৃ. ৪.০০

নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান, সিরাজদৌল্লা (১৩৭২), মহাকবি আলাওল (১৯৬৬)

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ ওমর খৈয়াম (১৯৬৬), যাদুর কলস (১৯৬৮), সেণ্ট লুই-এর সেতু (১৯৬১), সিংয়ের নাটক।

সুব্রত বড়ুয়া (১৯৪৬)

জন্মস্থান : সিলোনিয়া, চট্টগ্রাম। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখেন ও অনুবাদ করেন। এম. এস-সি। সহ পরিচালক অনুবাদ ডিভিশন, বাঙ্‌লা একাডেমী।

সুফী মোতাহের হোসেন (১৯০৭)

জন্মস্থান : ভবানন্দপুর, ফরিদপুর। শিক্ষকতা করেছেন। কবিতা লেখেন। পৈতৃক নিবাস ছিল বাখরগঞ্জ জেলা। ১৯৬৫ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কবি।

প্রকাশিত গ্রন্থ : সনেট সংকলন। ফরিদপুর, সুফী মোতাহার হোসেন সনেট প্রকাশনী পরিষদ, ১৯৬৫। ১০০ পৃ.। ২'০০।

কবিতা : সনেট সংগ্রহ। ফরিদপুর। ওরিয়েণ্টাল পাবলিশার্স, ১৯৬৬। ৫২ পৃ.। ১'৫০

সৈয়দ আলী আসরাফ (১৯২৪)

জন্মস্থান : আলোক দিয়া যশোর। কবিতা লেখেন। এম. এ.। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ইনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কবিতা : চৈত্র যখন (১৯৫৯)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

জোনাকী শহর (১৯৭০), কাচপোকা (১৯৭৪) চাঁদে প্রথম মানুষ (১৯৬৯)

হরিনারায়ণ নন্দী

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আকাশ মাটি মানুষ। কধুরখিল, চট্টগ্রাম। শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী, ১৩৬৫। ৫৩ পৃ.। ১'৫০।

হাকিম ফকরুদ্দীন (১৯৩৪)

প্রকৃত নাম মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : আহত তরঙ্গ। ঢাকা, বদরুল হক, (১৯৬০)। ৩৬ পৃ. ১'৯০।

হামিদা রহমান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : স্বাতী। ঢাকা, বনশ্রী, (১৯৬৭)। ৭৫ পৃ., ৩'০০।

হাফিজ, এম. এ.

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : চৈত্রের দুপুর। ঢাকা, হাকিম মঞ্জিল, (১৩৬২)। ৮৬ পৃ.। ২'০০।

হানিফ খান

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : ভাঙ্গা বাঁশী। নারায়ণগঞ্জ, মোহাম্মদ হাসান, (১৯৬৫)। ৬৫ পৃ. ২'০০।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২)

জন্মস্থান : জামালপুর, ময়মনসিংহ। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লেখেন। এম. এ.। সাংবাদিকতাকে পেশা করেছেন। এককালের দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী সম্পাদক। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বাঙলার অধ্যাপক ছিলেন। প্রেস-কাউন্সেলর, বাঙলাদেশ দূতাবাস, মস্কো, রাশিয়া। ১৯৭১ সালে কবিতায় বাঙলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : বিমুখ প্রান্তর, ঢাকা, পাকিস্তান প্রকাশনী, (১৯৬৪)। ৮০ পৃ.। ১'৫০।

অন্তিম্ শরের মত। ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, (১৩৭৫)। ৫৬ পৃ., ৩'০০। (আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত—১৯৬৮)

আর্তশব্দাবলী। ঢাকা, পুঁথিপত্র, (১৩৭৫)। ৬৭ পৃ.। ৩'০০। আদমজী সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত—১৯৬৮)

যখন উদ্যত সঙ্গিন (১৯৭২)

প্রবন্ধ : আধুনিক কবি ও কবিতা (২য় সং ১৯৭২),

সাহিত্য প্রসঙ্গ (১৯৭২),

গল্প : আরো দুটি মৃত্যু (১৯৭০)।

ভ্রমণকাহিনী : সীমান্ত শিবিরে

হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ (ডাক্তার)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

অনুবাদ কবিতা : শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া। মুহম্মদ ইকবালের 'শিকওয়াহ ও জওয়াব ই শিকওয়াহ'র অনুবাদ। দিনাজপুর, নওরোজ সাহিত্য মজলিস, (১৯৬২)। ৬৮ পৃ.। '৭৫।

হাবীবুর রহমান (১৯২৩)

পৈতৃক নিবাস : পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান জেলা। কবিতা লেখেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : উপান্ত। ঢাকা, বাবুল পাবলিকেশন, (১৯৬২)। ৭২ পৃ.।

হেমায়েত হোসেন (১৯৩৪-১৯৭২)

জন্মস্থান : ফরিদপুর জেলার ভাট্টাই ধোবা গ্রাম। কবিতা, ছোটগল্প লিখতেন। রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'এলান' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা। ছয় ঋতু সাত রঙ। ঢাকা, কপোতাক্ষ, (১৩৭২)। ৬০ পৃ.।

গল্প : অনিদ্র পলাশ, আরশী নগর।

হোসেন আরা (১৯১৬)

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : মিছিল। ঢাকা, পাকিস্তান প্রকাশনী, (১৯৬৪)। ৮০ পৃ.।

হোসেন মোহাম্মদ

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : গুলশানে পাকিস্তান, নূকালী, পাবনা, নূকালী ষ্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন, ১৯৫০। ৩০ পৃ.। ৬২।

হোসেন মোহাম্মদ রেজা

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কতিপয় একটি লোক, ঢাকা, আলোক প্রকাশনী, (১৩৭৪)। ৬০ পৃ.। ১'৫০।

হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯)

জন্ম হুগলী। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ.। সোভিয়েত রাশিয়ায় চাকুরীরত। প্রকৃত নাম মুনিরুযযামান।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : স্বগত সংলাপ। ঢাকা সাহিত্য শিল্প, ১৯৬৭। ৩৬ পৃ., ২'৫০।

প্রবন্ধ : মৃত্যুচিন্তা রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জটিলতা।

কিশোর গ্রন্থ : রবীন্দ্রনাথ।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭)

জন্মস্থান : বিক্রমপুর। কবিতা, প্রবন্ধ লেখেন। এম. এ.। অধ্যাপনা বাঙ্‌লা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

ডক্টর শহীদুল্লাহ (১৯৭১), অলৌকিক ইষ্টিমার (কবিতা ১৯৭২), রবীন্দ্রনাথ : সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা (১৯৭৩)

হুমায়ুন কবীর (১৯৪৫-১৯৭২)

জন্ম বরিশাল। কবিতা লিখতেন। এম. এ.। প্রাক্তন অধ্যাপক, বাঙ্‌লা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ :

কবিতা : কুসুমিত ইস্পাত (১৯৭২)।

আদমজী সাহিত্য পুরস্কার—

আদমজী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১৯৬০ সালে ঘোষিত। পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ২০,০০০ টাকা। উর্দু এবং বাঙ্‌লা ভাষায় সৃজনধর্মী গ্রন্থের উপর পুরস্কার দেওয়া হয়।

দাউদ সাহিত্য পুরস্কার—

দাউদ ফাউণ্ডেশন এই পুরস্কার ঘোষণা করেন ১৯৬৩ সালে। পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ২৫·০০০ টাকা। উর্দু এবং বাঙ্‌লা ভাষায় ইতিহাস, গবেষণা ও সমালোচক গ্রন্থসমূহের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর সাহিত্য পুরস্কার–

পাকিস্তান লেখক সংঘ ১৯৬৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর উপলক্ষে এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। বাঙ্‌লা এবং উর্দু ভাষায় রচিত জাতীয় সংহতিমূলক গ্রন্থ-সমূহের জন্য এই পুরস্কার। পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ১০,০০০ টাকা।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সাহিত্য পুরস্কার—

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড ১৯৬৭ সালে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করেন। বাঙ্‌লা এবং উর্দু ভাষায় রচিত ও শিল্প সাহিত্যের গ্রন্থসমূহের উপর পুরস্কার প্রদত্ত হয়। পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ২০,০০০ টাকা।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব্ পাকিস্তান সাহিত্য পুরস্কার—

১৯৬৪ সালে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারের সর্বমোট পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা। উর্দু, বাঙলা ও ইংরাজীতে পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক এবং উচ্চতর শিক্ষার বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহের উপর এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' প্রাপ্ত সাহিত্যিক

কবিতা।

ফররুখ আহমদ	১৯৬০
আহসান হাবীব	১৯৬১
সুফিয়া কামাল	১৯৬২
আবুল হোসেন	১৯৬৩
সানাউল হক	১৯৬৪
বেন্‌জীর আহমদ	১৯৬৫
তালিম হোসেন	১৯৬৫
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী	১৯৬৬
সৈয়দ আলী আহসান	১৯৬৭
আল মাহমুদ	১৯৬৮
শামসুর রহমান	১৯৬৯
আতাউর রহমান	১৯৭০
হাসান হাফিজুর রহমান	১৯৭১
আবদুল গণি হাজারী	১৯৭২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	১৯৭২
ফজল শাহাবুদ্দীন	১৯৭৩
শহীদ কাদরী	১৯৭৩

আদমজী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থতালিকা ও গ্রন্থকার

১৯৬০

আবদুস সাত্তার : কবিতা (নাটক)

রওশন ইজদানী : খাতিমুন নবী (কাব্য)

১৯৬১

আবদুর রাজ্জাক : কন্যাকুমারী (উপন্যাস)

রশীদ করীম : উত্তম পুরুষ (উপন্যাস)

১৯৬২

কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুশলিম

শওকত ওসমান : সাধনা (গবেষণা)

১৯৬৩ : ক্রীতদাসের হাসি (উপন্যাস)

শহীদুল্লাহ কায়সার : সারেং বৌ (উপন্যাস)

শামসুর রহমান : রৌদ্র করোটিতে (কাব্য)

১৯৬৪

আহসান হাবীব : সারা দুপুর (কাব্য)

জাহির রায়হান : হাজার বছর ধরে (উপন্যাস)

১৯৬৫

সুফী মোতাহের হোসেন : সনেট (কাব্য)

সৈয়দ ওয়ালাউল্লাহ : দুই তীর (উপন্যাস)

১৯৬৬

আবুল ফজল : রেখাচিত্র (স্মৃতি কথা)

ফররুখ আহমদ : হাতেম তায়ী (কাব্য)

১৯৬৭

আবদুল কাদির : উত্তর বসন্ত (কাব্য)

সরদার জয়েনউদ্দীন : অনেক সূর্যের আশা (উপন্যাস)

দাউদ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক ও গ্রন্থ

১৯৬৩

জগলুল হায়দার আফরিক : সিন্ধুনিলার দেশে (ভ্রমণকাহিনী)

মহম্মদ বরকত উল্লাহ : নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মহম্মদ (জীবনী)

১৯৬৪

আকবর উদ্দীন : শহীদ লিয়াকত (জীবনী)

আশরাফ সিদ্দিকী : লোক সাহিত্য (গবেষণা)

১৯৬৫

আনিসুজ্জামান : মুসলিম মানস ও বাঙ্‌লা সাহিত্য (গবেষণা)

মুনীর চৌধুরী : মীর মানস (গবেষণা)

১৯৬৬

আবদুস সাত্তার : আরণ্য জনপদে (গবেষণা)

ওস্তাদ মুনসী রইসউদ্দীন : অভিনব শতরাগ (গবেষণা)

১৯৬৭

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ : যুগ বিচিত্রা (স্মৃতিকথা)

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : জসীমউদ্দীন (সমালোচনা)

ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও গ্রন্থ

১৯৬৪

আবুল কাসেম : মাধ্যমিক পদার্থিকা

এ. কে. এম. : চিল ময়না দোয়েল কোকেল

মোহাম্মদ মোর্তজা : জনসংখ্যা ও সম্পদ

১৯৬৫

গোলাম আজম সিদ্দিকী : পাকিস্তানের অর্থনীতি

মুহম্মদ আবদুল জব্বার : খগোল পরিচয়

১৯৬৬

আলী মোহাম্মদ ইউনুস : উদ্ভিদ বৃত্তান্ত

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ : ব্যবসা বাণিজ্য সংগঠন

১৯৬৭

আকবর আলী : বিজ্ঞানে মুসলমানের দান

শফিকুর রহমান : পাকিস্তানের অর্থনীতি

[illegible]

১৯৬৭

বুলবন ওসমান : কানামামা (কিশোর উপন্যাস)

শামসুল হক : মানুষ কি করে গুণতে শিখল (কিশোর বিজ্ঞান)

৬ই সেপ্টেম্বর সাহিত্য পুরস্কার

হাসান হাফিজুর রহমান : সীমান্ত শিবির (ভ্রমণ কাহিনী)

নির্ঘণ্ট

অ

ই

খ

গ

প

ফ

ব

ভ

ম

সংশোধনী

যথেষ্ট চেষ্টা করেও গ্রন্থটিকে প্রমাদমুক্ত করা গেল না। তার জন্য সবটুকু দায়িত্ব গ্রন্থকারের। একদিকে লোডশেডিং-এর দাপট তার উপর অস্বাভাবিক দ্রুততা এই

ভুই-এর প্রভাব কাটিয়ে আমার মত একজন নবীশ এবং অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে ভুলগুলি ঠিক ঠিক ভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হয়নি, সেজন্ত আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে যদি কখনও এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রয়োজন হয় তাহলে প্রথম মুদ্রণের ভুল সংশোধনের আন্তরিক প্রচেষ্টা করবো।

এসব ছাড়াও যে ভুলগুলি চোখে পড়েছে সেগুলির একটা সাধ্যমত তালিকা দিলাম। বানানে প্রমাদ ঘটেছে। ক্রটি প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রণজনিত। 'তাঁর' বহু জায়গায় 'তার' হয়ে গেছে। (২৭২ পাতায় ৬ লাইনে, ২৭৫ পাতায় ৭ লাইনে, ২৭৭ পাতায় ৫ লাইনে) ১৪৯ পাতায় ২৮ লাইনে 'তাহা' না হয়ে হবে 'তাঁরা'। ১১৫ পাতায় মালিকার জায়গায় 'র' অতিরিক্ত, তেমনি ১১৬ পাতায় ১৪ লাইনে 'দেহভার' হয়ে গেছে 'দেহভাব', ১৩৪ পাতায় ১৬ লাইনে 'উভয়বঙ্গ' হয়েছে 'উত্তরবঙ্গ', ১৪২ পাতায় 'স্বভাবতঃই'-এর 'ঃ' বাদ পড়েছে। ১৩১ পাতায় ২৪ লাইনে হবে 'রোমান্টিসিজিমের'। ১২৭ পাতায় ১৫ লাইনে লেখকদের পর দাঁড়ি ভুল বশতঃ ছেপে গেছে। এ ছাড়া ২১০ পাতার শেষ লাইনে গ্রন্থটির নাম হবে 'জাগ্রত প্রদীপে', ২২২ পাতায় ২ লাইনে 'সিদ্দিকী' হবে, ২৪২ পাতায় ২৫ লাইনে 'স্বক্রিয়' এর জায়গায় 'সক্রিয়' পড়তে হবে। ২৬১ পাতায় ১৩ লাইনে 'জন্যে'র জায়গায় 'মধ্যে', ২৬২ পাতায় ১৯ ও ২৩ লাইনে যথাক্রমে 'আচারনিষ্ঠ' ও 'অপসৃত' পড়তে হবে। ২৭২ পাতার ৬ লাইনে 'স্রোতোধারা' হবে স্রোতধারা নয়। ২৭৩ পাতায় ১২ ও ১৩ লাইনে 'কাব্য' এর জায়গায় 'কাব্যে' এবং 'উল্লেখিত' এর জায়গায় 'উল্লিখিত' হবে। ২৭৩ পৃষ্ঠায় কিন্তু এর 'ি' ছাপেনি, তেমনি ২৮৯ পাতার ১৭ লাইনে 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' জায়গায় হয়েছে 'দ্বিজাতীতত্ত্বের' এবং ২৯৯ পাতায় 'অঙ্গাঙ্গী' হয়ে গেছে 'অঙ্গাঙ্গি'। 'ঘতি' শব্দটি ছাপা হয়েছে 'ঘটিত' ৩১৪ পাতায় ১২ লাইনে। ২৭৫ পাতায় ৭ লাইনে 'যা' কথাটা অতিরিক্ত ছাপা। ওটা বাদ দিয়ে পড়তে হবে।

এ ছাড়াও আরও কতকগুলি গুরুতর প্রমাদ সংশোধনযোগ্য। ৫১ পাতায় ২৮ লাইনে কূপমণ্ডুকতা থেকে 'বেরিয়ে আসার' প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে পড়তে হবে। 'বেরিয়ে আসার' কথাটা বাদ পড়ে গেছে। ৬৯ পাতায় ১৫ লাইনে পড়তে হবে নিজের সত্তা থেকে দৃপ্ত। ৭৯ পাতায় ⁿ লাইনে ছয়টি ঋতুর শীত ও বসন্ত ছাপা হয়নি।

২০৫ পাতায় ॥ ১১ ॥ বসবে সৈয়দ আশরাফ আলীর আলোচনার আগে। ৩১৯ পাতায় আশরাফ সিদ্দিকীর আরও দু-একটি কবিতার জায়গায় এক প্রখ্যাত ভারতীয় কবির কবিতাকে অনুকরণের প্রয়াস দেখান হয়েছে। এটি মুদ্রণ প্রমাদ। ১. কবিতাটি আশরাফ সিদ্দিকীর নয় 'সেই' শব্দ দুবার প্রয়োগ হয়েছে, হবে একবার (৫০ পাতার ৯ লাইনে)

কিছু " " বাদ পড়ে গেছে, কমার প্রয়োগ হয়নি কয়েকটি জায়গায়—কতকগুলি জায়গায় " দিয়ে সুরু হয়েছে ঠিকই কিন্তু শেষে " দেওয়া হয়নি। কতকগুলো যুক্ত শব্দের ছাড় হয়ে গেছে। এ সবই মুদ্রণ ক্রটি।